আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

অধ্যাপক আবদুল গফুর

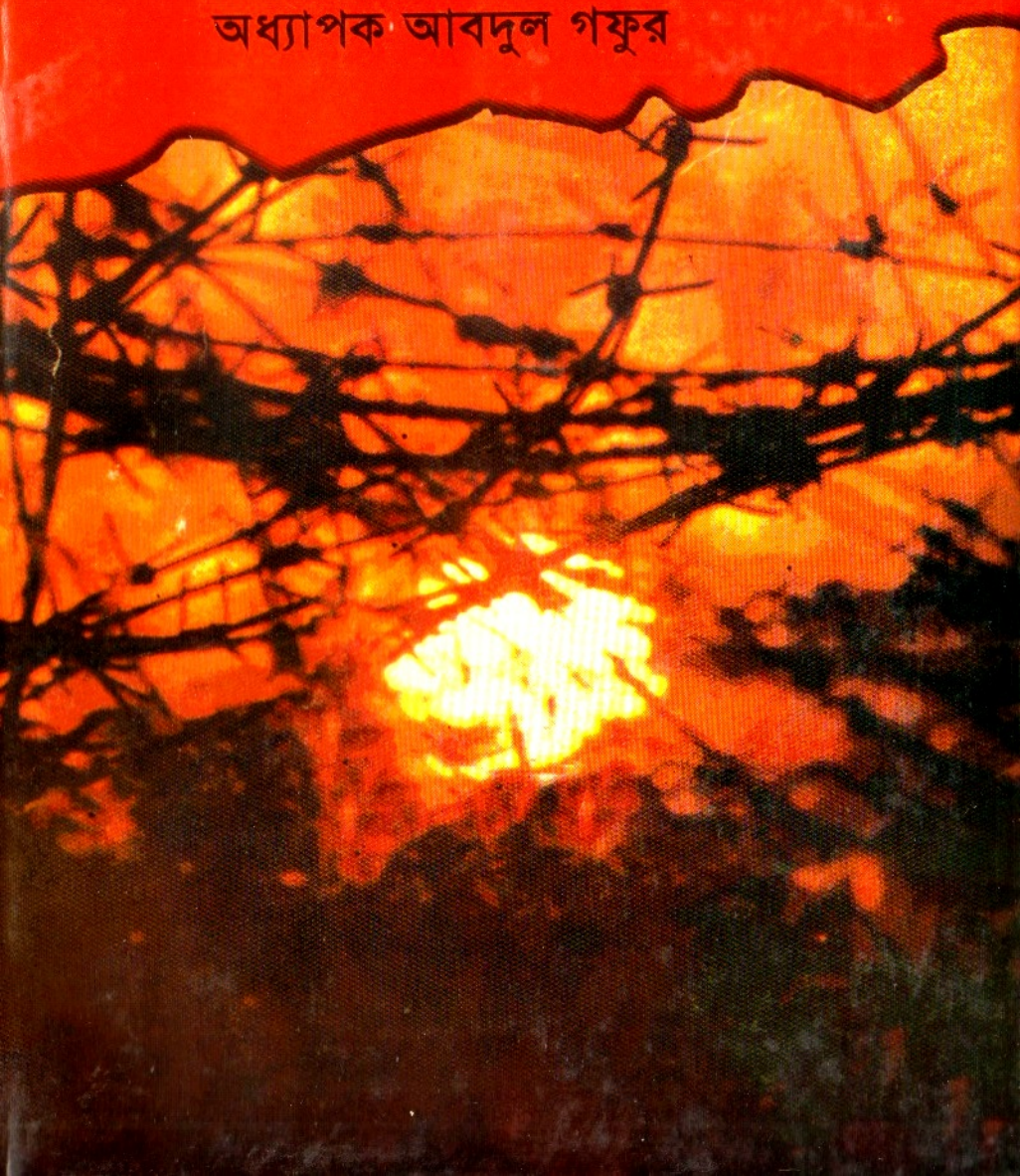

অধ্যাপক আবদুল গফুর

সাবেক কলেজ শিক্ষক, সাংবাদিক, কলামিষ্ট, গবেষক, সাংস্কৃতিক সংগঠক অধ্যাপক আবদুল গফুরের সাধারণ পরিচিতি একজন 'ভাষা সৈনিক' হিসাবে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন সহ জাতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সার্বক্ষণিক ভাবে অংশ গ্রহণের ফলে তাঁর জীবন থেকে খসে যায় তারুণ্যের মূল্যবান ১১টি বছর। ১৯৫১ সালে যার এম.এ. পাশ করার কথা, তিনি মাস্টার ডিগ্রী অর্জন করেন ১৯৬২ সালে। ছাত্র বয়সেই তিনি বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে অংশ গ্রহণের পাশাপাশি আজীবন তিনি সক্রিয় রয়েছেন পড়াশোনায়, লেখালেখিতে। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস নিয়ে তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দু'ডজন। তবে তাঁর সব চাইতে প্রিয় বিষয় যে স্বদেশের স্বাধীনতা। তার অন্যতম প্রমাণ বক্ষমান গ্রন্থ **আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম**।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কতদিনের? ১৭৫৭ সালে পলাশী বিপর্যয়ের পর থেকেই যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা, তার চূড়ান্ত সমাপ্তি ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে। অথচ এ সম্বন্ধে আমাদের নতুন প্রজন্মকে খুব কমই জানানো হয়েছে। ১৭৫৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ২১৪ বছরের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় এ ইতিহাসের এক একটি পর্বের সঙ্গে আরেকটি পর্বের যে ওতপ্রোত সম্পর্ক সে আনুপূর্বিক ইতিহাসই এ বইয়ে চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে দেশের খ্যাতনামা ইতিহাস গবেষক ও সুধী-পন্ডিতদের একগুচ্ছ গবেষণা সমৃদ্ধ রচনার মাধ্যমে। অধ্যাপক আবদুল গফুরের সম্পাদিত এ গুরুত্বপূর্ণ সংকলন-গ্রন্থ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এমন সব গৌরবময় অধ্যায়ের সংঙ্গে পরিচয় করে দেবে, যে সম্পর্কে শুধু তরুণ প্রজন্মই নয়, বহু প্রবীণেরও সম্যক ধারণা নেই। নবীন-প্রবীণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর পাঠকই নিঃসন্দেহে এ গ্রন্থখানি সংগ্রহে রাখার তাগিদ অনুভব করবেন।

প্রচ্ছদ : ফরিদী নুমান
গ্রাফিক্স : ডিজিটাল ক্যানভাস

www.nagorikpathagar.org

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

সম্পাদনায়

অধ্যাপক আবদুল গফুর

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

সম্পাদনায়
অধ্যাপক আবদুল গফুর

জ্ঞান বিতরণী ❑ ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০১

প্রকাশক ❑ **মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম** ❑ জ্ঞান বিতরণী ৩৮/২খ বাংলাবাজার (তাজমহল মার্কেট) ঢাকা-১১০০ **কম্পিউটার** ❑ বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ❑ স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৪, বাসা বাড়ী লেন, নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ ❑ ফরিদীনুমান **স্বত্ব** ❑ সম্পাদক

মূল্য ❑ ২৫০ টাকা

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক গ্রন্থাগার
অমরীনা বিনতে মুজাহিদ

উৎসর্গ

আমাদের ২১৪ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের
সকল জানা-অজানা শহীদদের উদ্দেশ্যে

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সম্পাদকের কথা

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস অদ্যাবধি রচিত হয়নি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কতদিনের, এ নিয়েও কম বিভ্রান্তি নেই। কেউ কেউ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে একাত্তরের কয়েক মাসে সীমাবদ্ধ কল্পনা করতে অভ্যস্ত। অনেকের মতে আবার আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে। এদের বক্তব্য মেনে নিলে ধরে নিতে হয়– সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগষ্টের পূর্বদিন পর্যন্ত আমরা 'স্বাধীন' ছিলাম, ঐ দিবসটিতে আমরা গোলাম হয়ে যাই বলে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করি। এটা কি সত্য? আসলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু ১৭৫৭ সালে পলাশী ট্রাজেডীর মারফৎ আমাদের স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যাবার পর থেকেই।

১৭৫৭ সালে নবাব দরবারের কতিপয় কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে আমাদের স্বাধীনতা হারানোর পর থেকেই স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম শুরু হয়। প্রথম একশ' বছর এ সংগ্রাম চলে সশস্ত্র পথে এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এ পর্বে প্রধানতঃ মুসলমানরাই স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। পরবর্তী কালে প্রতিবেশী সমাজের অনুসরণে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে দাবীদাওয়া আদায়ের পথে অগ্রসর হন। তবে শেষ অবধি নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের পথেই সাতচল্লিশ সালে আমরা বৃটিশ গোলামীর শৃংখল ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভ করি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইতিহাসে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ যুগান্তকারী ঘটনা। লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেই বাংলাদেশের আজকের স্বাধীনতার রূপরেখা সর্বপ্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লাহোর প্রস্তাবের আংশিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে যে ভূখণ্ডটিকে আমরা একটি প্রাদেশিক অবয়বে লাভ করি, আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র নির্মিত হয়েছে সেটাকে অবলম্বন করেই। সাতচল্লিশ পরবর্তী কালে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একুশ দফা হয়ে ছয় দফা আন্দোলন পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনে এ কারণেই বারবার লাহোর প্রস্তাবের উল্লেখ এসেছে অনিবার্য ভাবে। এসব আন্দোলনের সৃষ্ট স্বাধিকার চেতনাকে পশুশক্তির বলে ধ্বংস করে দেবার চক্রান্ত হলে তার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ, যার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্মলাভ করে বাংলাদেশ নামের নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র।

১৭৫৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত আমাদের দীর্ঘ ২১৪ বছরের এই গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন পর্বকেই বিচ্ছিন্ন বা খাটো করে দেখবার উপায় নেই। দুঃখের বিষয়, এই বাস্তব পটভূমি সামনে রেখে

www.nagorikpathagar.org

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রণয়নের তেমন উদ্যোগও নেই। বর্তমান গ্রন্থ এই অভাব পূরণের লক্ষ্যেই পরিকল্পিত।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, মাত্র কয়েক শ' পৃষ্ঠার একটি বইয়ে ২১৪ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তুলে ধরা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা যা করেছি, তাতে শুধু আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই রূপরেখার ভিত্তিতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে আমাদের এ প্রাথমিক প্রয়াস অধিকতর সার্থকতা লাভ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এ গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত রচনাগুলি পৃথক পৃথক ব্যক্তির রচনা বলে সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি এসেছে অনিবার্য ভাবে। কোন লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীকে ক্ষুণ্ন করা হয়নি কোনমতে। তবে বইয়ের মূল বক্তব্যে কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

ইতিহাসকে জাতির দর্পণ আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। যে জাতির ইতিহাস নেই, তাকে দুর্ভাগা বিবেচনা করা হয়। জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে থাকে। আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস সে নিরিখে বিবেচিত হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

এ গ্রন্থে যাদের মূল্যবান রচনা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, তাদের সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই "জ্ঞান বিতরণী"-র স্বত্তাধিকারী তরুণ প্রকাশক মোহাম্মদ শহিদুল ইসলামের প্রতি। তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ছাড়া এ মুহূর্তে এ গ্রন্থ আলোর মুখ দেখতো কিনা সন্দেহ। এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণ করতে হয় অনুজপ্রতীম কবি আবদুল হাই শিকদারকে। তিনিই প্রকাশকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে এ গ্রন্থ প্রকাশে তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। মামুলি ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে খাটো করতে চাই না। পরম করুণাময় আমাদের সকল সৎপ্রচেষ্টা কবুল করুন। আল্লাহ হাফেজ।

আবদুল গফুর

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

- পলাশীর পটভূমি এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে তার প্রভাব / ১১
  আবদুল মান্নান তালিব
- বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় মীর কাসেমের চেষ্টা / ২০
  এ.কে.এম. মহিউদ্দীন
- প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ ফকীর বিদ্রোহ /৩৫
  আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
- তিতুমীরের সংগ্রাম / ৪৫
  মুহম্মদ মনসুরউদ্‌দৌলাহ্‌ পাহলোয়ান
- ফারায়েজী আন্দোলন / ৫৩
  অধ্যাপক মোঃ মোজাম্মেল হক
- কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ ও বাংলার মুসলমান / ৬৩
  মেসবাহুল হক
- জিহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা / ৮২
  মুহিউদ্দীন খান
- বাংলাদেশে সিপাহী বিপ্লব এবং তার ব্যর্থতার পরিণতি / ৯৩
  দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
- সিপাহী বিপ্লবোত্তর মুসলিম রাজনীতি / ৯৮
  আবুল আসাদ
- মুন্সী মেহেরুল্লাহ ও তৎকালীন সমাজ / ১০৭
  ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ
- বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন ও সমসাময়িক রাজনীতি / ১১৪
  অধ্যাপক এ. কে. এম. ইদ্রিস আলী
- বিপ্লবী আন্দোলনে মুসলিম বাঙলা ঃ বেনজীর আহমদের ভূমিকা / ১২৯
  শামসুল আলম
- স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ শেরে বাংলা ও লাহোর প্রস্তাব / ১৩৯
  সানাউল্লাহ নূরী
- পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলার অবদান / ১৮৩
  এডভোকেট কে. এম. তাজুদ্দিন
- পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ / ১৯৪
  আবদুল গফুর

www.nagorikpathagar.org

➡ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ / ২০৪
অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়্যুম
➡ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও মওলানা ভাসানী / ২১২
আবদুল হাই শিকদার
➡ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন অধ্যায় / ২২৬
আবদুল গফুর
➡ বাংলায় মুসলিম নবজাগরণ / ২৩৩
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
➡ বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা / ২৭১
নূরুল আলম রইসী
➡ পরিশিষ্ট ঃ ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম সমাজের অবদান / ২৮০
মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
➡ লেখক পরিচিতি ২৮৭

www.nagorikpathagar.org

আবদুল মান্নান তালিব

পলাশীর পটভূমি এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে তার প্রভাব

[শুরুতেই আমি একটি কথা সুস্পষ্ট করে নিতে চাই। সেটি হচ্ছে এই যে, ইতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইসলামের একটি বিশেষ দৃষ্টিভংগী আমরা লাভ করি মহান আল্লাহর বাণী কুরআন থেকে। কুরআনে মানব জাতি ও মানুষের সভ্যতার উত্থান-পতনকে আল্লাহ-তা'আলা যে দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন আঠারো শতকে আমাদের ইতিহাসের আলোচ্য অধ্যায়টিরও আমরা সেই একই দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো— নিবন্ধকার]

দিল্লীতে শক্তিশালী মুসলিম সালতানাতের প্রতিষ্ঠার পরই বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়েছে। আর ত্রয়োদশ শতকে দিল্লীর পথেই মুসলিম শাসকরা বাংলায় এসেছেন। দিল্লীতে মুসলিম শাসন যখন শক্তিশালী হয়েছে, বাংলায়ও তার প্রভাব অনুভূত হয়েছে। দিল্লীতে যে সুলতান শক্তির সঞ্চয় করেছেন, তার শক্তির হাত বাংলা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। বাংলার সুলতানরা বেশ কিছুকাল দিল্লীর শাসন মুক্ত ছিলেন। কিন্তু দিল্লীর বারবার আক্রমণের মুখে আবার তাদের দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করতে হয়। শেষের দিকে নবাব মুরশিদ কুলি খাঁ থেকে সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত স্বাধীন নবাবদের শাসন চললেও দিল্লীর বাদশাহ্‌দের কাছ থেকে তাদের নবাবীর পরোয়ানা লিখিয়ে আনতে হতো। কাজেই দেখা যাচ্ছে বাংলার মুসলমানদের শাসনের সাথে দিল্লীর সালতানাত গভীরভাবে জড়িত।

বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসানের পরও নব্বই বছর পর্যন্ত দিল্লীতে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু দিল্লীর সেই মুসলিম শাসকরা বাংলার উপর তখন কোন প্রভাব ফেলতে পারে নি। কারণ তখন তারা নিজেরাই মৃত্যু শয্যায়। কাজেই অন্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই করার অবকাশ তাদের ছিল না।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার তথা সমগ্র উপমহাদেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, দিল্লীতে যদি শক্তিশালী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাহলে ১৭৫৭ সালে বাংলার এই ভাগ্য বিপর্যয় ঘটতো না। আর ঘটলেও তা রাজা গণেশের শাসনের ন্যায় নিছক সাময়িক প্রমাণিত হতো। কাজেই পলাশীর পটভূমি রচনায় দিল্লীর দুর্বলতার যে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

দিল্লীতে মুসলিম শক্তির পতনের কারণ

বাংলার ভাগ্য বিপর্যয়ের পরও ৯০ বছর পর্যন্ত দিল্লীতে মোগলদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সেটা ছিল অত্যন্ত দুর্বল শাসন। আসলে ১৭৫৭ সালের অনেক আগেই দিল্লীর শাসন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এ দুর্বলতার মূলে ছিল মূলত মোগল শাসকদের অযোগ্যতা। শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রতাপশালী মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর ৫০ বছর রাজত্ব করার পর ১৭০৭ সালে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পরই বিশাল মোগল সাম্রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে একজনেরও এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের যোগ্যতা ছিল না। তাদের অযোগ্যতার সুযোগে বিভিন্ন প্রদেশের সুবাদারগণ

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকেন। ফলে অচিরেই মোগলদের শাসন দিল্লী ও তার আশে-পাশের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

পাঞ্জাবে শিখ ও দক্ষিণ ভারতে মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থানও ভারতে মোগল শক্তির পতনের অন্যতম কারণ। মোগল বাদশাহ আকবরের ধর্মগত অবিমৃষ্যকারিতা উপমহাদেশের ধর্ম জগতে কম অনর্থ সৃষ্টি করেনি। গুরু নানক ও কবীরের ভক্তিবাদ এরই ফসল। ধীরে ধীরে গুরু নানক শিখ ধর্মের পত্তন করেন। জাহাঙ্গীরের আমলে শিখ গুরু তেগ বাহাদুরের হত্যার পর থেকেই শিখরা মোগলদের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে ওঠে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বিশেষ করে পাঞ্জাবে শিখরা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

ঠিক এ সময়ে দক্ষিণ ভারতে মারাঠাদের অভ্যুত্থান ঘটে। শাহজাহানের রাজত্বের শেষ ভাগে একটি লুটেরা দল হিসেবে মারাঠাদের উদ্ভব হয়। আওরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের ৫০ বছর মারাঠাদের বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ করেও তাদের দমন করতে পারেননি। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর ২৮ বছর পূর্বে মারাঠা অভ্যুত্থানের নায়ক শিবাজী ১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। কিন্তু শিবাজীর মৃত্যুর পরও মারাঠারা নিজেদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বজায় রাখে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে মারাঠারা পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণে সমগ্র মোগল ভারতে লুঠতরাজ ও ধ্বংস অভিযান চালায়। দিল্লী শহরও তারা কয়েকবার লুট করে। এভাবে দিল্লীর শাসকরা তাদের করুণার উপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকেন।

মোগল শাসকরা তাদের সমস্ত শৌর্য-বীর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। ভীরুতা ও কাপুরুষতা তাদের ভাগ্যের লিখনে পরিণত হয়েছিল। সমস্ত মিল্লাতের আত্মমর্যাদাকে ধূলায় লুণ্ঠিত করা ছাড়া তাদের দ্বিতীয় কোনো দায়িত্ব ছিল না। মিল্লাতের এহেন চরম দুর্দিনে উপমহাদেশের মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতাও শ্রেষ্ঠ আলেম হযরত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আফগানিস্তানের শাসক আহমদ শাহ আবদালীকে দিল্লী আক্রমণ করে মারাঠাদের সমুচিত শাস্তি দেবার ও মিল্লাতকে দুর্ভোগমুক্ত করার অনুরোধ জানান। আহমদ শাহ আবদালী ১৭৪৭ থেকে ১৭৬১ পর্যন্ত ১৪ বছরে হিন্দুস্তানে দশটি অভিযান চালান। ১৭৬১ সালে তৃতীয় পানি-পথের যুদ্ধে তিনি মারাঠা শক্তিকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করেন। কিন্তু হিন্দুস্তানে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠার কোনো লক্ষ্য তাঁর ছিল না। হিন্দুস্তানকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে রেখে তিনি দেশে ফিরে যান। ফলে উপমহাদেশে মুসলিম শক্তির পুনরুত্থানের সব আশাই তিরোহিত হয়। দিল্লীতে মুসলিম শক্তির পতনের এই প্রভাব সুদূর বাংলায়ও এসে পড়ে।

সমকালীন মুসলিম সমাজের অধঃপতন

সমকালীন মুসলিম সমাজের ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় একটি মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছিল। পলাশীর পটভূমি রচনায় এই অবক্ষয়ের ভূমিকা মোটেই অস্বীকার করার মতো নয়। আকীদা- বিশ্বাস, আচার-আচরণ, নৈতিক বৃত্তি, সাংস্কৃতিক ও তমদ্দুনিক ক্ষেত্রে মুসলিম মিল্লাত স্বাতন্ত্রের অধিকারী হলেও আঠারো শতকে এসে তাদের অবক্ষয় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। হিন্দুস্তানে একটি সম্পূর্ণ মুশরিকী পরিবেশের মধ্যে এই

www.nagorikpathagar.org

মিল্লাত নিজেকে গড়ে তুলছিল। উলামায়ে কেরাম ও সুফিয়ানে ইসলাম মিল্লাতের দ্বীনি তা'লিম ও তরবিয়াতের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। কিন্তু মুসলমানদের ছয়-সাত শ' বছরের শাসন কালের মধ্যে একমাত্র আওরঙ্গজেব আলমগীর ছাড়া কোনো মুসলিম শাসক রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মিল্লাতের তা'লিম তরবিয়াতের প্রয়োজন অনুভব করেননি। এটা যে আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে তাদের ওপর অর্পিত একটা পবিত্র দায়িত্ব এ বোধটাও তাদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। বরং তাদের অনেকেই প্রতিবেশী মুশরিকী ধর্ম সমাজ-সংস্কৃতির সাথে আপোষের পথ বেছে নিয়েছিলেন। ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের উন্নতি অগ্রগতির পরিবর্তে নিজেদের বংশীয় শাসন ও গদী রক্ষাই তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

ফলে মিল্লাতের ভাগ্যাকাশে দেখা দিল কালো মেঘের ঘনঘটা। কারণ, ইসলামকে বাদ দিয়ে এ মিল্লাত কোনদিন কোনো দেশে আত্মমর্যাদা সহকারে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। ইসলামকে গ্রহণ করেই সে দুনিয়ায় সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ইসলামকে বাদ দেবার পর সে ধীরে ধীরে লাঞ্ছনার আবর্তে নেমে গেছে। মুসলিম মিল্লাতের গত চৌদ্দ শ' বছরের ইতিহাস এর সাক্ষী। আঠারো শতকে এ লাঞ্ছনার ইতিহাসের একটি ধারার পুনরাবৃত্তি হয়েছে মাত্র।

আঠারো শতকের এ দেশের মুসিলম সমাজ-জীবন বিশ্লেষণ করলে আমরা সেখানে দেখতে পাই একদিকে শাসক সমাজ, আমীর-উমরাহ ও রাজানুকূল্য লাভকারী মুসলিম ধনিক শ্রেণীর চরম বিলাসিতা। সুরাপান তাদের জন্য ছিল একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। নাচগানের আসর বসানো ছিল তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের একটি অপরিহার্য অংগ। আর অবৈধ নারী সম্ভোগকে তারা নিজেদের বৈধ অধিকার মনে করতো। এজন্য কখনো কখনো তাদের হেরেমে দাসী-বাঁদীর সংখ্যা হতো অগণিত। শাসক সমাজ ও ধনিক শ্রেণীর এই জীবনাচরণ সাধারণ মুসলমান সমাজেও সংক্রমিত হয়েছিল। হযরত ইমাম শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৭০৩ – ১৭৬৩ইং) তাঁর 'তাফহীমাতে ইলাহীয়া' গ্রন্থে সমকালীন আমীর-উমরাহদের সম্বোধন করে বলেছেন : "তোমাদের কি আল্লাহ্ ভয় নেই? তোমরা ক্ষণস্থায়ী আরাম আয়েশের সন্ধানে লিপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষকে পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবার জন্য ব্যাপক সুযোগ দান করেছ? প্রকাশ্যে শরাব পান করা হচ্ছে অথচ তোমরা বাধা দিচ্ছ না। প্রকাশ্যে যিনা, জুয়া ও শরাব পানের আড্ডা চালু রয়েছে অথচ তোমরা এর প্রতিরোধে অগ্রসর হচ্ছ না। ..... তোমরা নানা রকম খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ, স্ত্রীদের মান অভিমান এবং গৃহ ও বস্ত্রের বিলাসিতার মধ্যেই ডুবে রয়েছো।"

আঠারো শতকে মুসলিম সমাজে দিল্লী থেকে নিয়ে মুরশিদাবাদ, ঢাকা, সোনারগাঁও ও চাটগাঁ পর্যন্ত সর্বত্র এ অবস্থা বিরাজিত ছিল। সতেরো শতকের কবি আলাউল তাঁর 'পদ্মাবতী" ও "তোহফায়" বাংলার নগর বন্দরগুলোয় মুসলিম ধনিক শ্রেণীর শরাব পান, বাইজি নাচ ও বিলাসী জীবন যাপনের জঘন্য চিত্র তুলে ধরেছেন।

আঠারো শতকে পৌছতে পৌছতে শাসক সমাজ থেকে নিয়ে সাধারণ মুসলমানদের পর্যন্ত ধর্মীয় জীবনের চেহারা অনেক পাল্টে গিয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম তার সঠিক রূপে বিরাজিত ছিল না। শিরক ও বিদআতে মুসলমানদের সমগ্র ধর্মীয় জীবন ভরে গিয়েছিল। কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে তারা এক ধরনের জীবন বিমুখ সূফিদের তত্ব কথার

www.nagorikpathagar.org

পেছনে দৌড়াতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা গায়রুল্লাহর জন্য কুরবানী করতো। সালার সাহেব ও মাদার সাহেবের মাজার যিয়ারত করে হজ্জ সম্পাদন করতো। তাদের মধ্যে এমন সব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছিল, যা ছিল দ্বীন ও শরীয়তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শাহ অলিউল্লাহ (র.) তাঁর তাফহীমাত গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, মুসলমানদের একটি দল আশুরার দিন একত্রিত হয়ে কুকর্মে লিপ্ত হয়। কিছু লোক ঐ দিনটিকে খেলার দিনে পরিণত করেছে। আবার শবে-বরাতের দিন একদল লোক মূর্খ জাতিসমূহের ন্যায় খেলাধূলায় মত্ত হয়। একটি দল মনে করে ঐ দিন মুর্দাদের নিকট বেশি করে খাদ্য পাঠানো উচিত। বিবাহে অমিত-ব্যয়িতা করা হয়। তালাককে নিষিদ্ধ কর্মে পরিণত করা হয়েছে। মেয়েদের অবিবাহিত অবস্থায় বসিয়ে রাখা হয়।

এভাবে মনে হয়, মুসলমানরা ইসলামের নামে নিজেদের জন্য যেন একটি নতুন ধর্ম তৈরি করে নিয়েছিল।

ইসলাম যে একটি বিপ্লবী শক্তি, একটি বৈপ্লবিক মতবাদ ও আদর্শ-এ চিন্তা থেকে মুসলমানরা সরে পড়েছিল অনেক দূরে। ইসলামের বিপ্লবী কালেমা মরুভূমির একটি অশিক্ষিত অনুন্নত, অনাহারক্লিষ্ট জাতির বাজুতে এমন অসাধারণ শক্তি যুগিয়েছিল যার ফলে তারা অতি স্বল্পকালের মধ্যে বিশ্বের বিরাট অংশকে পদানত করতে সক্ষম হয়েছিল এবং মানবেতিহাসের পাতায় আদল, ইনসাফ, দেশ শাসন ও সভ্যতা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন অত্যুজ্জ্বল এক ধারার সংযোজন করেছিল। আমাদের দেশে মুসলিম বিজেতাদের আগমন এরি একটি সূত্র মাত্র। এই বাংলার মাটিতে ত্রয়োদশ শতকে মাত্র সতের জন ঘোড় সওয়ার যে দুর্দমনীয় ঈমানী তেজের স্ফুরণ ঘটিয়ে ছিলেন– আঠারো শতকে তার স্ফুলিংগের একটি কণাও কি অবশিষ্ট ছিল? মুসলমানরা সংগ্রামী জীবনের স্বাদ ভুলে আয়েশী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে কোনো ইসলামী প্রেরণা ছিল না। তারা হয়ে উঠেছিল নিছক ভাড়াটিয়া বা চাকুরে। জুলুম, অত্যাচার, লুণ্ঠনকে তারা পেশায় পরিণত করেছিল।

এ ধরণের পরিবেশ একটি জাতির সার্বিক পতনের জন্য যথেষ্ট।

ইংরেজ- হিন্দু আঁতাত ও সিরাজউদ্দৌলার পতন

পলাশীর নায়ক ইংরেজ ভারত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে। আকবর, জাহাঙ্গীরের দরবার ঘুরে আসতে আসতে আওরঙ্গজেবের আমল শেষ হবার আগেই তারা দক্ষিণ ভারতে ঠাঁই করে নিয়েছিল। আওরঙ্গজেবের আমল শেষ হতে না হতেই বণিকের কুঠি হয়ে উঠতে লাগলো রাজনীতির ঘুঁটি চালার মোক্ষম কেন্দ্র। শাসক সমাজের দুর্বলতা, অযোগ্যতা, রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশৃঙ্খলা ও বাংলার বেনিয়া হিন্দুদের অপার লোভ ইংরেজকে বাণিজ্যের রাজনীতি থেকে সাম্রাজ্য গড়ার রাজনীতির দিকে টেনে আনলো।

সতের শতকের শুরুতেই বাংলায় ইংরেজদের অনেকগুলো বাণিজ্য কুঠি গড়ে ওঠে। বাংলায় ইংরেজদের বাণিজ্যিক কাজ কারবারে সহায়তার মাধ্যমে সতের শতকের শেষে এবং আঠার শতকের প্রথম দিকে হিন্দুদের মধ্যে দু'টি ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

www.nagorikpathagar.org

এই দু'টি শ্রেণী হচ্ছে 'শেঠ' ও 'বেনিয়া'। এই শ্রেণী দু'টি দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্য থেকে আবার বেশ কিছু সংখ্যক পরিবার ব্যাংকার এবং রেভিনিউ কালেক্টর ও রেভিনিউ প্রশাসক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি ও শক্তির অধিকারী হয় এবং তারা শীঘ্রই দেশের রাজনীতিতেও অংশ গ্রহন শুরু করে। দেশের শাসক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের ক্ষমতা ব্যবহার করতে থাকে। নবাব সুজাউদ্দীন খানের শাসন আমলে (১৭২৭-১৭৩৯) এই শেঠ ও বেনিয়াদের ভূমিকাই হয়ে ওঠে মুখ্য। তারাই হয়ে ওঠে দেশের আসল শাসক। সে সময় তাদের নেতৃত্ব দেয় আলম চাঁদ ও জগৎ শেঠ। সুজাউদ্দীন খানের পরে আলীবর্দী খাঁর ক্ষমতা দখলেও এই গোষ্ঠী সহায়তা করে। ফলে আলীবর্দী খাঁ তাদের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তিনি এই বেনিয়া ও শেঠ গোষ্ঠীকে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন করেন। এ সময় এদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন রায় দুর্লভ রাম, জগৎশেঠ ভ্রাতৃবৃন্দ, মাহতাব রায়, স্বরূপ চাঁদ, রাজা জানকী রাম, রাজা রাম নারায়ণ ও রাজা মানিক চাঁদ।

স্বভাবতই দিল্লীর কেন্দ্রীয় মোগল নেতৃত্বে দুর্বলতার প্রভাব উপমহাদেশের দুই জংগী জাতি শিখ ও মারাঠাদের ন্যায় অপেক্ষাকৃত নিরীহ হিন্দুদের উপরও পড়েছিল। মোগল শাসনে তারা যে সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল কেবল তাই নিয়ে এখন তারা সন্তুষ্ট থাকতে রাজী ছিল না। সমগ্র ভারত ব্যাপী তাদের মধ্যে একটা 'জাগরণ অনুভূতি' লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। বাংলার এই বেনিয়া ও শেঠ গোষ্ঠী এই সর্ব ভারতীয় অনুভূতি থেকে মুক্ত ছিল না। মারাঠা ও শিখদের মতো তাদের হাতে কোনো সামরিক শক্তি ছিল না। তাই তারা প্রত্যক্ষ পথে অগ্রসর না হয়ে কোনো পরোক্ষ পথের কথা চিন্তা-ভাবনা করছিল। এটাকে তাদের সৌভাগ্যই বলা যায়।

এ সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের সহায়তা লাভ করে। এই ইংরেজ বণিক গোষ্ঠী এ সময় বাণিজ্যের সাথে সাথে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লাভের উপায় খুঁজছিল। এই উদ্দেশ্যে তারা প্রত্যন্ত প্রদেশ বাংলাকেই বেছে নিয়েছিল। ইংরেজ বণিক গোষ্ঠী এবং হিন্দু বেনিয়া ও শেঠ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য প্রায় একই হবার কারণে তারা আন্তরিকতার সাথে পরস্পরের সহযোগিতায় এগিয়ে যায়। আর বিশেষ করে প্রায় একশো বছর পর্যন্ত ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট ও কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করার কারণে এই দুই বিদেশী ও স্বদেশী গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থের একাত্মতা সৃষ্টি হয়। ফলে তৃতীয় কোনো দলের (যেমন নবাবের) সাথে বিরোধ বা সংঘর্ষের ক্ষেত্রে তারা সহজেই হাত মিলিয়ে ফেলতো। এভাবে অচিরেই জগৎ শেঠ– মানিক চাঁদ গোষ্ঠী অনুধাবন করতে পারলো, যে, তাদের ব্যবসায়িক ও পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বাংলায় কোম্পানীর রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি প্রয়োজন। ওদিকে ইংরেজ বণিক দলও মনে করলো, তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং এদেশে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য গণ-সমর্থন লাভ করতে হলে একজন স্থানীয় নবাবের পরিবর্তে হিন্দু শেঠ ও বেনিয়া গোষ্ঠীর সাথে হাত মিলানোই তাদের জন্য সব চাইতে বেশি প্রয়োজন।

শীঘ্রই তারা একটা সুযোগ পেয়ে গেলো। এ সুযোগ সদ্ব্যবহার করার জন্য তারা উঠে পড়ে লাগলো। এ সুযোগটা হলো নবাব আলীবর্দী খাঁ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে নাতি ও ভাগিনেয়র মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা ছিল। ইংরেজ মনে

www.nagorikpathagar.org

করলো এই সুযোগে যদি তারা বাংলায় তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে তাহলে হিন্দু রাজা ও সাধারণ হিন্দু প্রজা, যারা মুসলমান শাসনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে– তাদের সহায়তায় তারা এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে তারা ১৭৫৪ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণ করে। ফোর্ট উইলিয়ামের পরিকল্পনাকরী ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল স্কটের সেক্রেটারী F. Noble ফোর্ট সেন্ট জর্জের সিলেক্ট কমিটির কাছে ১৭৫৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর যে পত্র লেখেন তা থেকে এ তথ্য জানা যায়। S. C. Hill তাঁর Bengal in 1756-1757 Indian Records Series, Vols ও P-326-328-এ একথা উল্লেখ করেছেন। পাঠকদের সুবিধার্থে নোবেলের পত্রাংশ এখানে উদ্বৃত করছি :

'Colonel Scott understood that on the death of the old Nabob (Nawab) there would be a dispute for the crown between the gentlemen, his nephews and his grand sons who has already diseovered ambitious views....

Colonel scott observed in Bengal the Jentue rajahs (Hindu Rajas) and inhabitants were very much disaffected to the Moor (muslim) Government, and secretly wished for a change and opportunity of throwing of their tyrannical Yoke. And was of opinion that if a European force began successfully, that they would be inclined to join them if properly applied to and encouraged, but might be cautious how they acted at first until they had a probability of success in bringing about Revolution of their advantage.

I look on Omy Chand (Umi Chand) as the man in Bengal the most capable servicing us if he has a mid to it..... There is a man named Nimo Gosseyng (Nim Gossain নিমু গোসাঁই)the High priest of the Gentues, who a great influence among the Jentue rajahs and with has particular caste of people who go up and down the kingdom well armed in great bodies, of the facuir of religious beggar caste, who might possibly be of service to us if they could be engaged to our interest, which by Nimo Gosseyng's means I have particular reasons to belive might be done.

This priest gave Colonel Scott very good information and advice relating to the affairs of that country and told he could bring 1,000 of these men to assist the English in four days warning when needfull. The Colonel did him some service while he lived and I dare say he has a respect for his memory to this days".

নবাব আলীবর্দী খাঁ ইংরেজদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। কলকাতায় ইংরেজরা তাঁর হুকুম অমান্য করে দুর্গ নির্মাণ করেছে, একথাও তিনি জানতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু নিজের মারাত্মক অসুস্থতার কারণে তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহনে সক্ষম হননি। আলীবর্দীর উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌলাই ইংরেজদের সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন এবং তাদের সামরিক উদ্দেশ্যকে বানচাল করার পরিকল্পনা নেন। এ অবস্থা স্বভাবতই ইংরেজদের সিরাজের প্রতি বিরূপ করে তোলে। তারা আলীবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজের পরিবর্তে তাঁর অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। এভাবে হিন্দু বেনিয়া ও শেঠদের সাথে ইংরেজরাও সরাসরি বাংলার রাজা বানাবার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে।

কিন্তু ইংরেজ ও হিন্দু বেনিয়াদের চক্রান্ত সত্বেও আলীবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজের সিংহাসনে বসতে মোটেই বাধা পেতে হয়নি। সিংহাসনে বসেই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান চালান। সিংহাসনের এক দাবীদার তাঁর খালা ঘসেটি বেগমকে বন্দী করেন এবং অন্যদিকে দ্বিতীয় দাবীদার তাঁর খালাত ভাই পুর্নিয়ার নবাব শওকত জঙ্গকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেন। তৃতীয় শত্রু ছিল ইংরেজ। কলকাতা অভিযান কর ১৭৫৬ সালে ২০ জুন ফোর্ট উইলিয়াম দখল করেন। ফলে কলকাতার গভর্নর ড্রেক ইংরেজ সৈন্যদের নিয়ে কলকাতায় আশ্রয় নেয়। ফোর্ট ইউলিয়ামের পতনের খবর শুনে দক্ষিন থেকে কর্নেল ক্লাইভকে বাংলায় পাঠানো হয়। নবাবের নিযুক্ত কলকাতার শাসক মানিক চাঁদের ষড়যন্ত্রে ইংরেজ ফোর্ট উইলিয়াম পুনরুদ্ধার করে। ফোর্ট উইলিয়াম পুনরুদ্ধার করার পর ক্লাইভ ইংরেজ সেনাদল নিয়ে হুগলী আক্রমণ করে এবং বন্দর ও আশেপাশের এলাকায় লুঠতরাজ চালায়। এ খবর পেয়ে নবাব ১৭৫৭ সালের ২০ জানুয়ারি হুগলীর দিকে সৈন্য পরিচালনা করেন। নবাবের সৈন্যদলের আগমনের খবর শুনে ক্লাইভ সেখান থেকে পলায়ন করে।

এ সময় ইউরোপের ন্যায় ভারতেও ফরাসীদের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ চলতে থাকে। ইংরেজদের সামরিক শক্তিকে খর্ব করার জন্য নবাব ফরাসীদের পক্ষে যোগ দেন। ফলে ইংরেজরা নবাবের আরো বেশি বিরোধী হয়ে উঠে।

নবাবের বিরুদ্ধে কয়েকটি ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে ক্লাইভ শেঠ ভ্রাতৃবৃন্দ, রায় দূর্লভ রাম ও উঁমিচাঁদের সাথে মিলে নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করে। শেঠ ভ্রাতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে নবাবের আত্মীয় ও মীর বখশী (অর্থ বিষয়ক প্রধান) মীর জাফরের সামনে নবাবীর টোপ ফেলা হয়। মীর জাফর এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করে। ফলে ১৭৫৭ সালের ১ মে কলকাতায় ইংরেজ কমিটি তাদের হিন্দু সহযোগীদের সহায়তায় মীর জাফরের সাথে ১১ দফা ভিত্তিক একটি গোপন চুক্তি সম্পাদন করে। এ চুক্তিগুলি বাংলায় ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ চুক্তির শেষ দফায় বলা হয়, 'মীর জাফর যদি উপরোক্ত শর্তগুলি পালন করতে স্বীকৃত হয় তাহলে ইংরেজ তাকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদার পদে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করবে।' এ চুক্তিকে একটি পাকা দলিলে রূপান্তরিত করার পর মীর জাফর ১০ জুন (১৭৫৭) এটিকে ক্লাইভের কাছে পাঠান।

অতঃপর ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের দিকে তার সেনাবাহিনী পরিচালনা করে। নবাব তার সেনাবাহিনী আনেন পলাশীতে। সেখানে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ক্লাইভ নবাবকে পরাজিত

www.nagorikpathagar.org

করে। কিন্তু যুদ্ধ করে নয়, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও উৎকোচ দিয়ে মীর জাফর, রায় দুর্লভ রাম, উমিচাঁদ ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের বশ করে। নবাবের বড় বড় সেনাপতিরা নীরবে দাঁড়িয়েছিল। তারা যুদ্ধ পরিচালনাই করেনি। তাঁর অনুরক্ত সেনাপতি মীর মদন যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেন।

এভাবে ১৭৫৭ সালে ২৩ জুন পলাশীতে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়।

আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে এর প্রভাব

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতন কোনো এক ব্যক্তির পতন ছিল না, এটা ছিল একটি জাতির পতন, একটি শাসন যুগের অবসান। একটি সম্পূর্ণ বিদেশী শক্তির হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার জন্য দেশের আলো- হাওয়ায় প্রতিপালিত এক শ্রেণীর বেনিয়াদের গভীর চক্রান্তের ফসল। আলীবর্দী খাঁ সিরাজউদ্দৌলাকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন, এটাকে সিরাজের কোনো অপরাধ বলা যায় না। ১৪ মাসের শাসনকালে সিরাজ নিজের কতিপয় আত্মীয়ের ষড়যন্ত্র বানচাল করার জন্য সফল প্রচেষ্ঠা চালিয়েছিলেন। কিন্তু বাইরের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করা ছিল তার সাধ্যাতীত। মীর জাফর যদি এই ষড়যন্ত্রে যোগদান না করতো, এমন কি যদি সিরাজ তাকে গ্রেফতার করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতেন, তবুও সিরাজের জন্য অবস্থার কোনো পরিবর্তন হতো না। সিরাজ ব্যর্থ হয়েছিলেন কেবল নিজের কিছু অযোগ্যতার ও সীমাবদ্ধতার কারণে নয়, বরং তাঁর লোকদের চরিত্রহীনতাও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে। তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন, কারণ সময় ও পরিস্থিতি ছিল তাঁর সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাঁর পরিবর্তে একদল স্বার্থান্ধ মানুষ বিদেশী ইংরেজকে প্রভু হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন বলে। দিল্লীতে মোগল শক্তির দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলার শিকার হবার এবং কেবল বাংলারই বা কেন, উপমহাদেশের কোনো সরকারের বিদেশী শক্তির, বিশেষ করে তাদের নৌ-শক্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতা না থাকায়, আর এই সংগে ইউরোপীয় রেনেসাঁর অন্যতম নায়ক ইংরেজের উপমহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদগ্র বাসনার যোগফলই সিরাজের পতনের জন্য দায়ী। সিরাজউদ্দৌলা তাঁর স্বদেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি ও বিদেশী বেনিয়ার হাতে তিনি দেশ বিক্রিত করে দেননি। দেশের জন্য তিনি নিজের শেষ রক্ত পর্যন্ত দান করে ছিলেন। সিংহাসনে বসেই তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেছিলেন ভিতরের ও বাইরের ষড়যন্ত্রের মধ্যে। কিন্তু এজন্য তিনি একটুও বিচলিত হননি, বা মুহূর্তকালের জন্য বুদ্ধিভ্রষ্টও হননি। নিজের বুদ্ধি বলে ও সামরিক শক্তি দিয়ে এর মোকাবিলা করেছিলেন চৌদ্দ মাস ধরে। এক মুহূর্তের জন্য তিনি ষড়যন্ত্র ও প্রতিকূলতার সামনে মাথা নত করেননি। এই বিরাট নাটকের তিনিই একমাত্র নায়ক, যিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জাতির কাছে প্রতারণা করেননি।

সিরাজউদ্দৌলার পতন ছিল একটি জাতিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামজিক ও সাংস্কৃতিক গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করার প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। পলাশীর আম্র কাননে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হবার পর বিদেশী ও দেশীয় বেনিয়াদের যোগ সাজসে যে লুটপাটের রাজত্ব শুরু হয়, ইতিহাসে তা নজীরবিহীন। বাংলা বিক্রয়ের মূল

www.nagorikpathagar.org

চুক্তিতে ক্লাইভ মীর জাফরের কাছে এক'শ লাখ টাকা দাবী করে কোম্পানীর জন্য, ৫০ লাখ ইংরেজের জন্য এবং ২০ লাখ হিন্দু শেঠ, বেনিয়া, পুরোহিত ও অন্যান্য প্রধানদের জন্য। (S. C. Hill, Bengal in 1756-57, Indian Records Series, Vol. II Page 383-385)

এভাবে দিনের পর দিন বাংলার জনগণ জুলুম ও শোষণের শিকার হতে থাকে। পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বছর পর ইংরেজরা সরাসরি ক্ষমতা দখল করে। ইংরেজ শাসনে এদেশের কিছু উন্নতিও হয়। উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের সাথে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক সম্পর্কও গড়ে উঠে। পরবর্তী কালে এদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতা ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু ইংরেজের শোষণ চলে অব্যাহত গতিতে। ইংরেজরা যখন বাংলা অধিকার করে, তখন এটি ছিল উপমহাদেশের ধনভাণ্ডার, রত্ন প্রসবিনী বাংলাদেশ। আর প্রায় দুশ' বছর রাজত্বের পর যখন তারা এদেশ ছেড়ে চলে যায়, তখন এ উপমহাদেশের সবচেয়ে অনুন্নত ও দরিদ্রতম এলাকায় পরিণত হয়েছিল। ইংরেজরা যখন বাংলা দখল করেছিল তখন এটি ছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা সমন্বিত একটি বিরাট রাজ্য, স্বাধীন 'সুবা বাংলা'। আর যখন তারা এদেশ ত্যাগ করে তখন বিভক্ত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

এদেশ দখল করার পর ইংরেজ প্রথমেই বাংলার মুসলমানদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। কারণ মুসলমানরাই ছিল তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। মুসলমানদের হাত থেকেই তারা শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। বাঙালি হিন্দুদের সাথে যোগসাজশে মুসলমানদের ক্ষমতাচ্যুত করতে সক্ষম হবার কারণে সব ক্ষেত্রে তারা হিন্দুদের দান করেছিল বিপুল সুযোগ সুবিধা। বরং বলা যায় হিন্দুদের সহায়তায় তারা দেশ শাসন করছিল। মুসলমানদের হাত থেকে সব সুযোগ সুবিধা কেড়ে নিয়ে তা একচেটিয়া ভাবে হিন্দুদের দান করা হলো। ফলে অর্ধ শতাব্দী পার হতে না হতেই মুসলমানরা দরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত হলো। জমিদার হিন্দু, আড়তদার হিন্দু, বড় বড় চাকরিতে নিযুক্তও হিন্দু। মুসলমানদের জন্য হিন্দু জমিদারের জমি চাষ করাই রয়ে গেল প্রধানতম সম্বল। এমনকি মুসলমানদের ভাষাটি পর্যন্ত কেড়ে নেবার জন্য ইংরেজ হিন্দুর সাথে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। ইউরোপীয় সাহেব ও হিন্দু পণ্ডিতদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাত্র কিছুদিনের মধ্যে মুসলমানদের আরবী ফাসরী মিশেল বাংলা ভাষা হয়ে গেলো সংস্কৃতের দুহিতা।

এভাবে ইংরেজ শাসনে এদেশীয় হিন্দুরা যে উজ্জ্বল প্রভাতের স্বপ্ন দেখেছিল, তার থেকে অনেক বেশি তারা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা যা হারিয়েছে, লাভ করেছে তার চেয়ে অনেক কম।

www.nagorikpathagar.org

এ, কে, এম, মহিউদ্দীন

বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় মীরকাসেমের চেষ্টা

মুর্শিদকুলি খাঁ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদেশের রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে ২৩ মাইল দক্ষিনে ভাগীরথী নদীর তীরে ২৩ জুন ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে সংগঠিত যুদ্ধের ঠিক ছয় বছর পর ১৭৬৩ সালের ২৩ জুন তারিখে স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে এদেশবাসী প্রথম অস্ত্র ধারণ করেছিল। পলাশীর যুদ্ধ ছিল উদীয়মান ইংরেজ শক্তিকে দমন করার সর্বশেষ প্রচেষ্টা। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলা তখনও স্বাধীন। পলাশীর পর উচ্চাকাঙ্খী রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, উঁমিচাঁদ, রাজবল্লভ ও ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ও সহায়তায় মীর জাফর নবাব হলেও তিনি ছিলেন অনেকটা অসহায় ও কার্যত ইংরেজদের আজ্ঞাবহ। নবাব মীর জাফরের এই দুঃখজনক পরিণতির কারণ ছিল, ষড়যন্ত্রকারী এদেশীয় দোসরদের স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইংরেজদের অর্থ লিপ্সা ও রাজশক্তি নিয়ন্ত্রণে তাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ। এর পরিণতি এতদূর গড়িয়েছিল যে, মাত্র তিন বছরের মধ্যে ইংরেজদের চাপের মুখে তিনি কাসিম বাজারে বিনা প্রতিবাদে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[১]

বস্তুত পক্ষে বণিক হিসাবে পরিচিত হলেও পলাশীর যুদ্ধের ছয় বছরের মধ্যে ইংরেজরা এদেশে একটি পৃথক শক্তি হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে এবং যদৃচ্ছা কাজকর্মের মাধ্যমে রাজশক্তিকে উপেক্ষা করে নবাবের পরাধীনতা ও নিজেরদের প্রভুত্ব শক্তির প্রমাণ দেয়। এই প্রভুত্বের বিরুদ্ধেই এদেশবাসী অস্ত্র ধারণ করেছিলেন ১৭৬৩ সারে ২৩ জুন। এই প্রতিরোধ তাৎক্ষণিক ভাবে যত স্বল্প স্থায়ী হোক না কেন, এটাই ছিল উপমহাদেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম, স্বাধীনতার জন্য প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধ, যে যুদ্ধের মূল স্থপতি ছিলেন নাসির-উল-মূলক ইমতিয়াজউদ্দৌলা মীর মুহাম্মদ কাসেম আলী খাঁ নসরৎ জংগ বাহাদুর। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার তিনিই ছিলেন শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাব। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মীর কাসেম আলী খাঁ। ইতিহাসে তিনি মীর কাসিম নামে আখ্যায়িত হয়েছেন।

আমাদের ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বিদেশী স্বার্থে প্রভাবিত হয়ে পলাশীর যুদ্ধের কারণে মীরজাফরের নবাবী লাভকে বঙ্গের প্রথম বিপ্লব বলে চিহ্নিত করেছে। এটা মোটেই ঠিক নয়। পলাশীর যুদ্ধ উপমহাদেশের তৎকালীন পরিবেশের বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। মোগল রাজশক্তির দুর্বলতার কারণে ভারতের প্রায় সব এলাকাতেই তখন অশান্তি, বিশৃঙ্খলা এবং সমাজের উচ্চ পর্যায়ে স্বার্থান্ধতা, ষড়যন্ত্র ও শক্তির হাত বদলের ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বঙ্গ দেশের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের অনেকেই তৎকালীন এই পরিবেশে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এবং অনেকে নিজেরাই ছিলেন স্বার্থান্ধতার কারণে প্রশাসনিক পট পরিবর্তনের হোতা। তাই সিরাজউদ্দৌলার নিকট থেকে মীরজাফরের নবাবী লাভের মধ্যে বিপ্লবের কিছু ছিল না। কারণ সরফরাজ খাঁর নিকট থেকে অলীবর্দী খাঁর নবাবী লাভ আর সিরাজউদ্দৌলার নিকট থেকে মীরজাফরের নবাবী লাভের মধ্যে যে পার্থক্যটুকু আছে তাতে বিপ্লবের স্থান কোথায়? অথচ বাধ্য হলেও, পাটনার যুদ্ধে এদেশীয় সৈনিকরা সেদিন ইংরেজ সৈনিকদের

www.nagorikpathagar.org

বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্রধারণ করেছিল যার পরিণতিতে ঘটে সেনাপতি সমরুর পাটনা আক্রমন, গংগা তীরের যুদ্ধ, কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, উদয়নালা ও বক্সারের যুদ্ধ এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যান্য ঘটনা। অতএব ১৭৬৩ সালের ২৩ জুনের প্রতিরোধকেই ন্যায়ত বঙ্গের প্রথম বিপ্লবের মর্যাদায় ভূষিত করা উচিত। বিষয়টি ঐতিহাসিকদের যথাযথ বিবেচনার দাবী রাখে।

প্রসংগত উল্লেখ করা যায় যে, পলাশীর যুদ্ধ বঙ্গদেশে এবং পরিণামে সারা ভারতে ইংরেজদের বিজয়ের পথ সুগম করেছিল বলে মন্তব্য করেছেন ডক্টর মজুমদার।[২] স্যার জেমস স্টিফেন বলেছেন, পলাশীর চেয়ে বক্সারই ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তির উৎপত্তি স্থল হিসেবে বিবেচনার অধিক দাবী রাখে।[৩] ঘটনা ও ফলাফলের বিবেচনায় উভয় অভিমতই মনে হয় বহুলাংশে সত্য। কিন্তু এর চেয়েও সত্য এই যে, ভারতীয় মুসলমানরা কোনদিনই পরাধীনতাকে নির্বিবাদে স্বীকার করে নেয়নি। আলীবর্দী খাঁনের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে সিরাজউদ্দৌলা যে পারিবারিক অসন্তোষের শিকার হয়েছিলেন, পরবর্তীতে তাই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের রূপ লাভ করে এবং মীরজাফর "শত্রুর শত্রু মিত্র" হিসেবে রাজা রাজবল্লভ, রায় দুর্লভ, জগৎশেঠদেরসহ ইংরেজদের সহায়তায় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নবাবী লাভ করেন। কিন্তু মীরজাফর ইংরেজ ও রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ-জগৎশেঠদের মূল চক্রান্ত সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না বলে এই ষড়যন্ত্রকারীদের পরবর্তীকালের যথেচ্ছাচার ও ইংরেজদের প্রভূত্বকে তিনি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। মীর জাফর ইংরেজদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করেছেন ঠিকই, তবে তিনি সুবোধ ক্রীড়নক ছিলেন না। পরিবেশের কারণে অনেকটা নিজের নির্বুদ্ধিতা ও লোভের ফলে সময়ের অগ্রগতিতে তিনি অধিকতর বশংবদ হয়ে পড়ছিলেন। ইংরেজদের অধিকতর ক্ষমতালাভ ও মীরজাফরের ক্রমবর্ধমান অসহায়তা– এই অবস্থার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী হয়েছিলেন মীরকাসেম।[৪] অতএব নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর মীরজাফর নবাব হয়ে স্বীয় অসহায়তার কারণে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে সক্ষম হননি, কিন্তু ইংরেজদের আধিপত্য স্বীকারে তাঁর অনিচ্ছা ক্ষীণতর হয়েও কিছুটা বর্তমান ছিল। এই অনিচ্ছাই হয়ত কাশিম বাজারে স্বীয় সুযোগ্য জামাতা মীর কাসেমের হাতে নবাবী অর্পণে কিছুটা উৎসাহিত করেছিল পুত্র-সন্তান-হারা বয়োবৃদ্ধ নবাব মীর জাফরকে। ইংরেজদের আধিপত্য স্বীকারে এই একই ধরণের অনিচ্ছা ক্রমে শক্তিশালী হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বোধিত করে থাকবে মীর কাসিমকে, যার প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে পাটনার দুর্গে আক্রান্ত নবাব সৈন্যদের প্রতিরোধের মাধ্যমে। অতএব নিজেদের মধ্যে হানাহানি করা সত্ত্বেও ভারতীয় মুসলমানরা কোনদিনই ভিন্ন জাতির বশ্যতা স্বীকার করেনি। ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থেকে বঙ্গের ও ভারতের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল সত্য, কিন্তু একথাও সত্য যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনাও মুসলমানরাই করেছিল এবং ইতিহাস সাক্ষী উপমহাদেশের স্বাধীনতায় মুসলমানদেরই অবদান বিপুল।

বস্তুত পলাশীর যুদ্ধের পর পরই এদেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছিল যা সর্বগ্রাসী হয়ে উঠার আগে বক্সারের যুদ্ধে অনেকাংশে নিস্প্রভ হয়ে যায় এবং এই অগ্নিশিখাকে সযত্নে লালন ও তীব্রতর করার কাজে ব্যয়িত হয়েছিল

www.nagorikpathagar.org

মীরকাসেমের পুরো নবাবী আমল। ইংরেজদের ঘৃণা করতে শিখেই মীরকাসেম নবাবী লাভ করেছিলেন, ইংরেজদের ঘৃণা করেও সুকৌশলে অনেকদিন তাদের বন্ধু হিসেবে পরিচিত ছিলেন[৫]। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। অতএব বঙ্গদেশ তথা ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা এবং বলা যায় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার বিষয়ক আমাদের সংগ্রামের প্রথম নায়ক ছিলেন নবাব মীর কাসেম। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই দীর্ঘ ও জটিল অধ্যায় সবিশেষ অনুধাবন করেতে হলে নবাব মীর কাসিমের সমগ্র নবাবী আমল সংক্ষেপে আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৭৬০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি লর্ড ক্লাইভ বিলাত গেলে মি. হলওয়েল কিছু দিনের জন্য কলিকাতার ইংরেজ দরবারের সভাপতি হন। মি. পিটার অমিয়ট, মেজর কেলড, মি. সমনার এবং মি. ম্যাওয়ার ছিলেন দরবারের অন্যান্য সদস্য। এই সদস্যদের বেশির ভাগই ছিলেন নবাগত ও অর্থলিপ্সু। স্বার্থসিদ্ধির আশায় তারা নানা ফন্দী ফিকিরে নিয়োজিত ছিলেন, এমনকি নবাব বদলের বিষয়টিও তাদের কারো কারো চিন্তার বাইরে ছিল না। প্রভাবশালী দু'একজন বরং নবাব মীরজাফরের পতনই কামনা করছিলেন।

নবাব জামাতা মীর কাসিম এ সময়ে ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। মি. হলওয়েলের সংস্পর্শে এসে তিনি বুঝতে পেলেছিলেন যে, ইংরেজরা অচিরেই মীরজাফরকে পদচ্যুত করে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে নামমাত্র নবাব রেখে নিজেরাই বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাবী করার খায়েশ রাখে। দেশপ্রেমিক ও ইংরেজ বিদ্বেষী মীরকাসেম এতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন এবং এর প্রতিকারের উপায় খুঁজতে থাকেন। হলওয়েল সাহেবকে ষড়যন্ত্রের নায়ক হিসেবে বুঝতে পেরে মীরকাসেম তাকে অবলম্বন করে রইলেন এবং নবাবের পতন অত্যাসন্ন বুঝে অপর কাউকে দৃশ্যপটে আনার সুযোগ না দিয়ে নিজেই হলওয়েলের বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন। মীরকাসেম আসলে ইংরেজদের বিশ্বাস করতেন না। সিরাজউদ্দৌলার মত তিনিও ইংরেজদের ঘৃণা করতেই শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি একজন কর্মচারী হওয়ায় ইংরেজরা মীরকাসেমের মনোভাব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। লর্ড ক্লাইভ বিলাত যাওয়ার সময় মীরকাসেমের পদোন্নতির সুপারিশ করে গিয়েছিলেন এবং সুযোগ বুঝে মীরকাসেম সেই সুপরিশ নামাকেই কাজে লাগান। মি. হলওয়েল কলিকাতার গভর্ণরের দায়িত্বভার গ্রহণের পর মীরকাসেমের অনুরোধে সেনাপতি কেলডকে পত্র লিখেন যে– 'মীরকাসেমের জন্য কর্ণেল ক্লাইভ যে অনুরোধ করে গেছেন সে কথা আমি এখানেই নিবেদন করছি। আমার সাথে এ বিষয়ে আপনার মত পার্থক্য না হলে আপনি কাসিম আলীর পদোন্নতির চেষ্টা করলে বিশেষ অনুগৃহীত হবো।" মেজর কেলড অবশ্য গভর্ণর হলওয়েলের এই পত্র প্রাপ্তির পরও প্রথমে ইতস্তত করতে থাকেন, কারণ তাঁর মতে নবাব মীরজাফরের পদচ্যুতির জরুরী কোন কারণ ছিল না। যাহোক, মীরকাসেম জানতেন যে ইংরেজ কর্মচারীদের সবারই মূল্য আছে এবং যথাযথ ভাবে মূল্য নির্ধারণ করতে পারলে সবাইকে ক্রয় করা যায়। অতএব তিনিও মূল্য নির্ণয় এবং ক্রয় কার্যে তৎপর হন।

এ সময় নবাব মীর জাফরের পুত্র মীরনের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। মুর্শিদাবাদের অবস্থা তখন শোচনীয়। পুত্র শোকে মীরজাফর ম্রিয়মান। সন্ধির শর্ত মোতাবেক ইংরেজদের

www.nagorikpathagar.org

প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। ঢাকা প্রদেশের রাজকরও সংগৃহীত হয়নি। ইংরেজদের যথেচ্ছাচারে শুল্ক বিভাগের আয়ও লুপ্ত হওয়ার পথে। বেতন না পেয়ে অসন্তুষ্ট সেনারা প্রায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। রাজ বল্লভ পাটনার নবাব হওয়ার চেষ্টায় লেগে গেছেন। দুর্লভ রাম চেষ্টা করছেন প্রধান সেনাপতির পদলাভ করার। এদিকে কলিকাতার নব নিযুক্ত গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টও অবস্থা বুঝে হলওয়েলের পক্ষই সমর্থন করলেন। অতএব রাষ্ট্র বিপ্লবের সমূহ সুযোগ সমুপস্থিত। মি. হলওয়েল "তখন সামরিক পরামর্শের জন্য কাসিম আলীর কলিকাতায় আসা প্রয়োজন" বলে নবাবকে পত্র দিলে মীরজাফর কলিকাতায় আসার জন্য মীর কাসিমকে অনুমতি দেন।

অতপর ১৭৬০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কলিকাতায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গোপন দরবার বসে। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ছিলেন সভার সভাপতি এবং উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্নেল কেলড, মি. সমনার, মি. হলওয়েল ও মি. ম্যাওয়ার। সভায় মীরকাসেমের পক্ষাবলম্বন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় ও প্রয়োজনীয় নীলনক্শা প্রণীত হয়। ইংরেজদের পক্ষে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট মীরকাসেমের সাথে আলাপ-আলোচনা শেষ করেন এবং মীরকাসেমও সবাইকে যথাযোগ্য পুরস্কারদানে সম্মত হন।

তখনকার দিনে নবাবের সাথে সাক্ষাতের জন্য গভর্ণর সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ গমনাগমন করতেন। অতএব পরিকল্পনা মুতাবিক গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ও সেনাপতি কেলড কাসিম বাজারের ইংরেজ কুঠির দিকে রওয়ানা হন। নয়া গভর্ণরের সম্মানার্থে নবাবও কাসিম বাজারে গমন করেন। এ ঘটনা সম্পর্কে জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিকের বিবরণ হলো– প্রথম দর্শনে শিষ্টাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হলো, দ্বিতীয় দর্শনে গভর্ণরের নিকট থেকে নবাব স্বীয় শাসন শৈথিল্যের কথা শুনলেন এবং তৃতীয় দর্শনের আগেই প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করা মাত্র মীরজাফর প্রাসাদ বাতায়ণ পথে দেখলেন– চারিদিকে লাল উর্দি পরিহিত ইংরেজ সৈনিক এবং তাদের মধ্যস্থলে মীরকাসেমের রণ-পতাকা। প্রাসাদের সিংহদ্বারে পত্রহস্তে স্বয়ং সেনাপতি কর্ণেল কেলড সশস্ত্র অবস্থায় দণ্ডায়মান।[৬] নবাব মীরজাফর তখন আত্মসমর্পণ করেন এবং এখানেই তার জন্য কলিকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে জীবন যাপনের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, মীর জাফরের মতই মীরকাসেমও উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশায় ইংরেজদের প্রভুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের সহায়তায় নবাবী লাভ করে আত্মশক্তিতে রাজ্য শাসন করার জন্যই মীর কাসিম এটা করেছিলেন। একাজে মীরকাসেমের উদ্দেশ্যে ছিল আত্মবিসর্জনের বিনিময়ে হলেও মোগল রাজশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা। লক্ষ্যযোগ্য যে, ইংরেজরা মীর জাফরকে ঘৃণা করেও তার নিকট বন্ধু হিসেবে পরিচিত ছিল; আর মীরকাসেম ইংরেজদের ঘৃণা করেও তাদের বন্ধু হিসেবে দীর্ঘদিন পরিচিত ছিলেন।[৭] মোগল শাসন শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল মীর কাসিমের প্রধান সংকল্প। অতএব নবাবী লাভ করার পর ইংরেজদের দমন করাই হল তাঁর মূল লক্ষ্য ।

মুর্শিদাবাদের রাজকোষে তখন অর্থ নেই। সেনাদল বেতনের অভাবে বিদ্রোহোন্মুখ।[৮] পাত্রমিত্রগণ লুণ্ঠনপরায়ণ। এ অবস্থায় সাধারণভাবেই হতাশাগ্রস্থ হওয়ার কথা। কিন্তু মীরকাসেমের ছিল ধৈর্য্য, সংকল্পে দৃঢ়তা, উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী উপায় উদ্ভাবনে সামর্থ,

www.nagorikpathagar.org

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শানিত প্রতিভা।[৯] ক্ষমতালাভ করেই তিনি অর্থ সংগ্রহ, বিদ্রোহ দমন ও প্রজাদের কল্যাণ কামনায় মনোনিবেশ করেন এবং এ বিষয়ে ইংরেজদেরও সমর্থন লাভ করেন। নবাবের আদেশে মোগল রাজ প্রাসাদের ইতিহাস বিশ্রুত বিলাসিতার অবসান ঘটল, নৃত্য-গীত স্তব্ধ হল, দাস-দাসীর সংখ্যা সীমিত হল, এক কথায় সব বিষয়েই ব্যয় সংকুচিত হল। রাজশক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য এভাবে আত্মসুখ বিনষ্টকারী দ্বিতীয় কোন শাসনকর্তা বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেননি। এই কৃচ্ছ্রতা সাধন ছাড়াও কর আরোপ এবং কর আদায়ের মাধ্যমে অল্প কিছুদিনের মধ্যে পরিস্থিতিকে সন্তোষজনক করে তুলে মীরকাসেম বেতন প্রদান করে সেনাদলকে শান্ত করলেন, ইংরেজ বণিক সমিতিকে আড়াই লক্ষ টাকা দিলেন এবং পাটনা প্রদেশের ইংরেজ ও নবাব সেনাদের জন্য কর্ণেল কেলডের হাতে সাত লক্ষ টাকা অর্পণ করেন। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের বিবরণ মতে মীরকাসেম এই সময় অর্থাৎ ১৭৬১ সালের ১২ মার্চ তারিখে পাটনায় মোগল শাহজাদা শাহ আলমের নিকট থেকে ২৪ লক্ষ টাকা বার্ষিক রাজকর দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বঙ্গ-বিহার -উড়িষ্যার সুবাদারীও লাভ করেন।[১০] এইভাবে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসার পর মীরকাসেম সেনাবাহিনীর আমূল সংস্কারে মনোনিবেশ করেন এবং নবাব বাহিনীর ঐতিহ্যগত বাহুবলের সাথে ইংরেজদের সমর কৌশল যোগ করতে সচেষ্ট হন। উন্নতমানের অস্ত্র নির্মানের জন্য তিনি অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপন করেন এবং ইউরোপীয় বিশেজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে উৎকৃষ্ট কামান-বন্দুক তৈরির জন্য দেশীয় লোকদের প্রশিক্ষণ দেন। তাছাড়া ইউরোপীয় বণিকদের আনা অস্ত্রশস্ত্রও তিনি সংগ্রহ করেন। সেনাবাহিনীকে কৌশলগত যুদ্ধ বিদ্যায় পারদশী করে তোলার জন্য মীরকাসেম জনৈক আরমেনীয় বণিক খোজা পিদ্রুর ভাই-গ্রেগরীকে প্রধান সেনাপতি হিসেবে গ্রহন করেন। এই গ্রেগরীই গুরগিন খাঁ নামে ইতিহাসে সুপরিচিত। তাকে গুরগণ খাঁ নামেও অভিহিত করা হয়েছে। যাহোক গ্রেগরী সেনাদলকে অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও পদাতিক এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন এবং অশ্বারোহীদের নেতৃত্বে মোগল সেনানায়ক এবং গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে আরমেনীয়, জার্মান, পর্তুগীজ ও ফরাসীসেনা নায়কদের হাতে অর্পণ করেন। মীর কাসেমের সেনাপতিদের মধ্যে মার্কার ও সমরু সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই ইউরোপে সামরিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। মোট কথা, মীর কাসেম ইংরেজদের উপর বলপ্রয়োগের লক্ষ্যেই স্বীয় সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন।

মীরকাসেমের এই রণ-প্রস্তুতি ইংরেজদের অগোচর ছিল না। তারাও নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির কাজে মনোনিবেশ করেন। এভাবেই নীরবে এগিয়ে চলে উভয় পক্ষের যুদ্ধ-প্রস্তুতি।

অবশ্য বিবাদ শুরু করার উপলক্ষের অন্ত ছিল না। দেশের সার্বিক অবস্থা উন্নত হলেও ইংরেজ রাজ-কর্মচারীরা বাণিজ্যের নামে দেশে অরাজকতা বাড়িয়ে তুলছিল। ইংরেজ কোম্পানীর বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার সুযোগ থাকলেও কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগতভাবে অধিকার ছিল না, কিন্তু কর্মচারীরা কেবল বিনাশুল্কে বাণিজ্যই করত না, তারা দেশে বাণিজ্যের নামে নান ধরনের অত্যাচার-অবিচারের মাধ্যমে রীতিমত জনজীবন অসহনীয় করে তুলেছিল। বিলাত থেকেও এসব কাজের প্রতিবাদ আসে, কিন্তু গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট এসবের কোন প্রতিকারই করেননি। এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট এবং হলওয়েল কোম্পানীর কর্মচারীদের এসব গর্হিত কাজ সমর্থন করতেন।

www.nagorikpathagar.org

মীর কাসেমের পক্ষে এই অনাচার অধিক দিন সহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠায় তিনি কলিকাতার ইংরেজ দরবারে এসবের প্রতিকার চাইলেন। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট তখন হেস্টিংসের প্রতি এই প্রতিবাদের অভিযোগের প্রতিকারের দায়িত্ব অর্পন করেন।[১১] কিন্তু এতেও শেষ পর্যন্ত কোনই সুফল ফলেনি। বরং কোম্পানীর কর্মচারীরা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের অত্যাচারের সীমা বাড়িয়ে দেয়। নবাব তখন অনন্যোপায় হয়ে দেশীয় বাণিজ্যের স্বার্থে সব ধরনের বানিজ্য শুল্ক রহিত ঘোষণা করেন। নবাবের এই আদেশ জারি করা হয় ১৭৬৩ সালের ৫ মার্চ তারিখে। শুল্ক রহিতের এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে রাজকোষের জন্যও ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। দেশবাসীর স্বার্থে কোনও শাসকের পক্ষে এই ধরনের নির্দেশ জারি করা যে কত বড় মারাত্মক ও ঝুঁকিবহুল কাজ, আমাদের ইতিহাসে তার যথাযথ মূল্যায়ণ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। আমাদের মতে এই ধরনের ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসেই নজীরবিহীন। স্বার্থত্যাগ, দৃঢ়চিত্ততা, দেশপ্রেম ও জনকল্যাণের এই আদর্শ এবং দেশকে শত্রুমক্ত করার প্রয়োজনে এধরনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টান্ত অবশ্যই নিতান্ত বিরল। কিন্তু ইংরেজ মাত্রই কোম্পানির কর্মচারীদের বাণিজ্যের নামে স্বেচ্ছাচারের সমর্থক হওয়ায় তারা এ ব্যাপারে মীরকাসেমকেই দোষী সাব্যস্ত করে এবং তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইংরেজদের এই সিদ্ধান্তও মীরকাসেমের গৃহীত ব্যবস্থার যথার্থতাই প্রতিপাদন করে।

যাহোক, ইংরেজ দরবারের সিদ্ধান্ত মুতাবেক পাটনার ইংরেজ শিবিরের অধ্যক্ষ এলিসের নির্দেশে একদিকে বিহার প্রদেশের নবাবের কর্মচারীগণ প্রকাশ্যভাবে সিপাহীদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং কলিকাতা থেকে কয়েক নৌকা ভর্তি সিপাহী ও গুলিগোলা পাটনায় পাঠান হয়। অপরদিকে নবাবকে সতর্ক করার জন্য মি. অমিয়ট ও মি. হেকে মুংগেরে দৌত কার্যে প্রেরণ করা হয়। ইংরেজদের কিছুটা নাগালের বাইরে থাকার লক্ষ্যে মীরকাসেম ইতিপূর্বে রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুংগেরে স্থানান্তরিত করেছিলেন। এখানে লক্ষ্যযোগ্য যে, মীরকাসেমকে মসনদ থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য ইংরেজরা এদেশীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথেও ষড়যন্ত্র করেছিল এবং এই প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ ছিলেন সেই মূরলী ধর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ প্রমুখ। দুঃখজনক এই যে, আমাদের ইতিহাসে, নির্বুদ্ধিতা ও ক্ষমতালোভ এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির শিকার মীরজাফরও মীরনের সঙ্গে এই দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী তেজোদৃপ্ত পুরুষসিংহ মীর কাসিমকে এখনও ষড়ন্ত্রকারী, ক্ষমতালিপ্সু ও আত্মসুখসর্বস্ব এবং বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই চিত্রিত করা হচ্ছে, আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের মূল দোসর রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ ও জগৎশেঠদের চিহ্নিত করা হচ্ছে ষড়যন্ত্রের সহায়তাকারী নিতান্ত গোবেচারা হিসেবে। অথচ সত্য কথা এই যে, এরাই ছিল মুসলমানদের রাজস্ব খতম করার লক্ষ্যে ইংরেজদের সাথে মুখ্য ষড়ন্ত্রকারী, হিন্দু শাসন কয়েম করার স্বপ্নে বিভোর, ক্ষমতালিপ্সু, আত্মসুখসর্বস্ব, চরম বিশ্বাসঘাতক এবং দেশকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়ার তথা দেশকে পরাধীন করার মূল কুচক্রীদল। আমাদের ইতিহাসের এই দৈন্যদশা আমাদের ঐতিহাসিকদের, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের সময় ও সুযোগের অভাব, সৎসাহসের অভাব এবং শ্রম বিমুখতার ফল। ন্যায় ও অন্যায়ের ব্যবধান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

অন্যায়কে ভ্রান্ত হিসেবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এবং সত্যকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মুসলমানদের জীবনদৃষ্টিতে হীনমন্যতার কোন স্থান নেই।

মুংগেরে দূত প্রেরণ করলেও বিহারে নবাব কর্মচারীদের আক্রমণ এবং পাটনায় সৈন্য ও গোলাগুলি প্রেরনের বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইংরেজদের জন্য রাজদ্রোহের শামিল ছিল। তথাপি নবাব কলিকাতার দরবারে অভিযোগ দায়ের করেন এবং প্রতিকার লাভে ব্যর্থ হয়ে কেবল নৌকাই আটক করলেন না, অমিয়ট এবং হে সাহেবকেও মুংগেরে আটক করে রাখলেন, যেখানে ইতিপূর্বে আটক করে রাখা হয়েছিল দেশদ্রোহী মুরলী ধর, রাজবল্লভ ও জগৎশেঠকে তাদের রাষ্ট্রবিরোধী হীন কার্যকলাপের জন্য। এই অবস্থায় কলিকাতা থেকে নবাবের দূত ফেরত না আসায় তিনি মি. হেকে মুংগেরে রেখে অমিয়টকে কলিকাতায় পাঠালেন পুনরায় মিটমাটের আশায়। কিন্তু ইংরেজদের হিসেব ছিল অন্যরূপ। ২৩ জুনের মধ্যে হে এবং অমিয়ট মুংগের থেকে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং সেই তারিখেই এলিস নবাবের পাটনা দুর্গ আক্রমণ করবেন বলে তারা আগে থেকেই ঠিক করে রিখেছিল। কিন্তু অমিয়ট এবং হে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেছেন কিনা তা জানার আগেই পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক এলিস পাটনা দুর্গ আক্রমণ করে বসেন ২৩ জুনের রাতে। অবশ্য নবাবের সেনাপতি মার্কার পাটনার দিকে সসৈন্যে এগিয়ে আসছেন এ খবরও এলিসকে ব্যস্ত করে তুলেছিল।

এ সেই ২৩ জুনের ঘটনা, যাকে আমরা বঙ্গদেশের প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ ও প্রথম বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেছি। নবাবের নির্দেশে পাটনা দুর্গকে সুরক্ষিত করার জন্য সেনাপতি মার্কার সসৈন্যে এগিয়ে আসছিলেন। পাটনা দুর্গ ছিল সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে নায়েব-নবাব মীর মেহেদী খাঁ পাটনায় নিরুদ্বেগে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ২৩ জুনের রাতে নবাব সেনারা নিদ্রিত হওয়ার পর এলিস ইংরেজ কুঠিতে সেনা সমাবেশ করেন এবং প্রভাতের প্রাক্কালে ইংরেজ সেনারা নগর প্রাচীর লংঘন করে সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। শুরু হয় হত্যা আর লুঠতরাজ। সদ্যোত্থিত নবাব সৈন্যরা বিশৃংখলার মাঝেও ইংরেজদের প্রতিহত করতে অস্ত্র হাতে ছুটে যায়। কিন্তু বিশৃঙ্খলা তখন চরমে। ইংরেজদের হাতে পাটনা দুর্গের পতন ঘটে। নায়েব-নবাব মীর মেহেদী খাঁ মুংগেরের পথে পলায়ন করেন। কিন্তু পথেই তার সাথে সেনাপতি মার্কারের সাক্ষাৎ ঘটে। মার্কার দ্রুত অগ্রসর হয়ে ইংরেজদের পরাজিত করে পাটনা দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। মার্কার মীর নাসীরকে পাটনা শহরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিয়ে ইংরেজ কুঠির দিকে এগিয়ে যান এবং তাদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। চারদিন অবরুদ্ধ থাকার পর ইংরেজ সেনারা গঙ্গার পথে পলায়নের চেষ্টা করলে মার্কার তাদের গতিরোধ করেন। ১ জুলাই পলায়নপর ইংরেজ সেনারা উপায় না দেখে গঙ্গাতীরে পরাজিত হয় এবং মি. এলিসসহ তাদের অনেক সৈন্য বন্দী ও নিহত হয়।

নবাব এ খবর পেয়ে অমিয়টের গতিরোধের জন্য মুর্শিদাবাদের শাসনকর্তা সৈয়দ মুহাম্মদ খাঁ-কে পত্র লিখেছিলেন। মি. এ্যামক্ল্যাট, ওয়াল্টন, হচিন সন, জোস, গর্ডন, কুপার ও ডাক্তার ক্রুক কিছুসংখ্যক সৈন্যসহ নৌকাযোগে পালিয়ে কলিকাতা অভিমুখে গমন করছিলেন। মুর্শিদাবাদের নিকট তাদের নৌকার গতিরোধ করা হল। কিন্তু আত্মসমর্পণের

www.nagorikpathagar.org

আহ্বানের জবাবে অমিয়ট সংগীদের গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দেন, যার ফলে একজন হাবিলদার ও দুইজন সিপাহী ছাড়া আর কারো প্রাণরক্ষা পায়নি।[১২] কোন কোনে ইতিহাসে প্রকৃত অবস্থা গোপন করে এ ঘটনাকে হত্যাকাণ্ড বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মি. অমিয়টই এ ঘটনার জন্য দায়ী। নিজের হঠকারিতার জন্য মি. এলিস যেমন বন্দী হন, তেমনি অমিয়টও নিহত হন। এ ঘটনার পর মীরকাসেম কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কাছে যে পত্র দেন তাতে নরহত্যা, নগর লুণ্ঠন, সন্ধি ভঙ্গ ইত্যাকার বিষয়াদির কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ইংরেজরা এতে কর্ণপাত না করে বাহুবলের সাথে পুনরায় তাদের ষড়যন্ত্রের কৌশল যুক্ত করে এবং তাদের আশ্রিত মীরজাফরকে ব্যবহারের চেষ্টা করে। মীরজাফরের সমর্থন লাভের পরই তারা মীরকাসেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল।

ইংরেজরা এবার যুদ্ধ শুরু করেছিল রীতিমত ঘোষণা দিয়ে এবং এই ঘোষণায় মীরকোসেম কর্তৃক ইংরেজদের উপর অত্যাচারের, কোম্পানির স্বার্থ বিনষ্ট করার এবং কোম্পানির কর্মচারী ও সহযোগীদের ক্ষতি সাধন করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। ইতিহাসে এখনো সে কথাই লিখিত আছে। কিন্তু এসব অভিযোগ সবই কাল্পনিক। ইংরেজদের ও তাদের কোম্পানির সহযোগীদের উপর মীরকাসেম কর্তৃক কোন প্রকার অত্যাচারের বাস্তব কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মীরকাসেম কেবল ইংরেজ কোম্পানির জনকতক স্বার্থপর কর্মচারীর অন্যায়-উৎপীড়নের প্রতিরোধ করেছিলেন। এ অবস্থায় ইংরেজ জাতির ও কোম্পানির নামের দোহাই দিয়ে মীরকাসেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য, যুদ্ধের ফলাফল ভিন্নতর হলে, ব্রিটিশ সরকারই কলিকাতার কর্তৃপক্ষকে শায়েস্তা করতেন।

যাহোক ইংরেজদের একাজে এদেশে তাদের দোসরের অভাব ছিল না। সুশাসন যাদের কাম্য নয়, জনকল্যাণকামী শাসক যাদের স্বার্থের পরিপন্থী, এরূপ লোকের অভাব এদেশে কোনদিন হয়নি। তখনও ছিল না। এরা মীরজাফরের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করল। এ প্রসংগে খ্যাতনামা গবেষক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়'র কিছু কথা আমরা উদ্বৃত করছি: 'মীরকাসেমের কঠোর শাসন তাদের উত্যক্ত করে তুলেছিল। ইংরেজ দমনের পর মীরকাসেম প্রজার স্বার্থে জমিদারদের দমন করবেন, এটা তারা বুঝতে পেরেছিল। সুতরাং যারা প্রজাপীড়ক, তারা মীরকাসেমের অধঃপতন কামনা করত। যারা ইংরেজ গোমস্তার গুপ্ত বাণিজ্যের অংশীদার হয়ে অর্থোপার্জন করত, যারা ইংরেজ গোমস্তাকে উৎকোচ দিয় কোম্পানির দস্তক নিয়ে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করে অর্থশালী হয়ে উঠেছিল, মীরকাসেমের স্বাধীন বাণিজ্যের ঘোষণাপত্র তাদের সবাইকে হতাশ করে দিয়েছিল। মীরকাসেমকে ইংরেজরা নবাবী চ্যুত করত, চাইলে তারা সবাই প্রফুল্লচিত্তে ইংরেজদের সহায়তা দানে অগ্রসর হল। মুসলমানদের অপেক্ষা হিন্দুদের মধ্যেই এ প্রবৃত্তি সমধিক প্রবল হয়ে উঠেছিল। মুসলমান তরবারি হাতে সেনাদলে প্রবেশ করত, হালকর্ষণে শস্য উৎপাদন করত, কেহবা সঞ্চিত ঐশ্বর্য নিয়ে আলস্যে জীবন অতিবাহিত করত। ইউরোপীয় বণিকবর্গের সাথে মিলিত হয়ে যারা অর্থোপার্জনের অভিনব উপায় অবলম্বন করত, তারা ছিল হিন্দু। অতএব এদেশের অনেকেই যে মীর জাফরকে নবাব হিসেবে সেলাম করার জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছিল তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।"[১৩]

জুলাইয়ের অসহ্য গরমের দিনেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইংরেজরা অজয় নদীর তীরে উপনীত হওয়ামাত্র জাফর খাঁ, আলম খাঁ ও শেখ হায়াতুল্লার সেনাদল ইংরেজদের

www.nagorikpathagar.org

গতিরোধ করে। এ যুদ্ধে নবাব সেনা তিনবার ইংরেজদের কামান কেড়ে নিয়েছিল এবং তিনবারই ইংরেজদের এদেশী সেনারা কামান উদ্ধার করেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা এ যুদ্ধে জয়ী হলেও তাদের ইউরোপীয় গোলন্দাজ ও সার্জেন্টদের অধিকাংশ নিহত হয়। ফলে ইংরেজ সেনাপতি গ্লিন যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে এডামসের সেনাদলের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য এগিয়ে যান।

এরপরের যুদ্ধে ইতিহাসে কাটোয়ার যুদ্ধ নামে খ্যাত। কিন্তু যুদ্ধ আসলে হয়েছিল পলাশীর নিকটে, ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে, কাটোয়া থেকে কিছুটা দূরে।

কাটোয়ার যুদ্ধ ছিল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ যুদ্ধে মীরকাসেমের নিতান্ত বিশ্বাসভাজন সেনাপতি মুহাম্মদ তকি খাঁ নিহত হন। তিনি কেবল মীরকাসেমের বিশ্বাসভাজন ছিলেন না, তিনি ছিলেন বীর এবং দেশপ্রেমিক। তাছাড়া এ যুদ্ধে পলাশীর ঘটনারও পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল।

ঐতিহাসিক ম্যালিসন তাঁর সামরিক ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন যে, এ যুদ্ধে পরাজিত হলে ইংরেজরা আর বেশি দূর এগিয়ে যেতে সমর্থ হত না। যারা মুহাম্মদ তকি খাঁর অনুগমনে অসম্মত হয়েছিল– তারা যদি সম্মত হত তাহলে এ যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজয় ঘটত। কিন্তু এ ধরনের স্বদেশদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। তকি খাঁর সেনানায়কগণ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে দূরে শিবির স্থাপন না করলে ইংরেজদের জয়লাভ সহজ ছিল না।[১৪]

ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন, মুস্তফা খাঁ ও স্কটের বিবরণ মতে এ যুদ্ধে মুহাম্মদ তকি খাঁ এবং তাঁর রোহিলা ও আফগান সিপাহীরা যে বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিল তার চেয়ে অধিক বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় ইতিহাস কোন ঘটনা উপলক্ষে লিপিবদ্ধ করে নাই। তকি খাঁর একটি ঘোড়া নিহত হলে তিনি দ্বিতীয় ঘোড়ায় এবং দ্বিতীয় ঘোড়া নিহত হলে তৃতীয় ঘোড়ায় আরোহণ করে সৈন্যদল পরিচালনা করেন। দীর্ঘক্ষণ যাবত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু নদী খাতের মধ্যে পলায়নকারী ইংরেজ সৈন্যদের গুলীর আঘাতে তিনি নিহত হলে জয় ইংরেজদেরই ঘটে। তাঁর ঈর্ষাপরায়ণ সেনানায়করা দূরে দাঁড়িয়ে থেকেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই। এ যুদ্ধে তকি খাঁর মৃত্যু হওয়ায় মীরকাসেমের পরাজয়ও প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠে।

কাটোয়ার দুর্গ হস্তগত হওয়ার পর ইংরেজরা মুর্শিদাবাদের পথে অগ্রসর হয়। মুর্শিদাবাদে প্রেরিত নবাব সৈন্যরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করাতে মতিঝিলে অবস্থিত সামান্য কিছু সংখ্যক নবাব সেনার প্রতিরোধের পরই ইংরেজরা মুর্শিদাবাদ দখল করে নেয়। মুর্শিদাবাদ দখলের পর ক্যাপ্টেন ক্যাম্বেল নতুন সিপাহী সংগ্রহ করে একটি নয়া পল্টন গঠন করেন, অপরদিকে কলিকাতায়ও ক্যাপ্টেন আয়রণ সাইড অপর একটি নয়া পল্টন তৈরি করে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধি করে। নবাব সেনারা এরপর গিরিয়ার নিকটে সমবেত হয়। সেনাপতি মার্কার, সমরু ও মীর আসাদুদ্দৌলা খাঁ নিজেদের বাহিনী নিয়ে এখানে মিলিত হয়েছিলেন। মীরকাসেমের বাহিনীর অবস্থান এত সুন্দর ছিল যে, ধৈর্য ধারণ করে ইংরেজদের আক্রমণের অপেক্ষা করলে নবাব বাহিনীর পরাজয় প্রায় অসম্ভব ছিল। যাহোক, ১ আগস্ট তারিখে ইংরেজ সেনা বাঁশলী উত্তীর্ণ হওয়ামাত্র নবাব সেনা

www.nagorikpathagar.org

তাদের সুরক্ষিত ছাউনী ছেড়ে আক্রমণের জন্য এগিয়ে যায়। ইংরেজরা মধ্যস্থলে গোটা সৈন্য রেখে উভয়দিকে এদেশীয় সৈন্য দিয়ে ব্যূহ রচনা করে। ২ আগস্ট উভয় পক্ষের কামান গর্জন শুরু হয়। এভাবে শেষ পর্যন্ত উভয় বাহিনী পরস্পরের নিকটবর্তী হয়ে পড়ে এবং প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হয়।

যুদ্ধে মীর আসাদুদ্দৌলার বাহিনী ইংরেজদের বাম পার্শ্ব ভেদ করে ক্যাপ্টেন স্টিবাটির বাহিনীর উপর পতিত হয়। ইংরেজরা বাঁশলীর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, কিন্তু ডুবেও অনেকে প্রাণ হারায়। একই সময়ে শের আলী খাঁ ইংরেজদের ব্যূহের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করলেই নবাবের জয় নিশ্চিত ছিল কিন্তু তিনি তা করেন নাই। তাছাড়া বাম পার্শ্ব আক্রমণকারী সেনানায়ক মীর বদরুদ্দীন আহত হলে তদীয় সেনারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। এই অবস্থায় এডামস নবাব সেনাকে আক্রমণ করলে মীর নাসির খাঁ প্রাণপণে যুদ্ধ চালাতে থাকেন। কিন্তু সেনাপতি সমরু ও মার্কার এই সময়ে তাঁদের সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পিছু হটে এলেন। কি কারণে এলেন, সে ইতিহাস আজও অস্পষ্ট। তবে মীরকাসেম যে এদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন না, তা তাঁর সেনাপতিদের সমাবেশ থেকেই বুঝা যায়। যাহোক গিরিয়াতেও কাটোয়া ও পলাশীর নাটক অভিনীত হল। নবাব মীরকাসেমের পরাজয় ঘটল।

এরপর উদয়নালা। কারণ ইংরেজদের গতিরোধের অন্য কোন সুবিধাজনক স্থান অতঃপর আর তেমন ছিল না। স্থানটির নাম ইতিহাসে উল্লিখিত উদয়নালা নয়, উধুয়ানালা।

ভাগীরথী নদীর তীরে উধুয়ানালার গিরিসঙ্কটের পাশে ছিল মীরকাসেমের দুর্গ। এর এক পাশে ভাগীরথী, অন্যপাশে উধুয়া। স্থানটি কেল্লা হিসেবে পূর্ব থেকেই সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত থাকায় দুর্ভেদ্য ছিল। মীরকাসেম এখানে নয়া দুর্গপ্রাচীর নির্মাণ করে কামান সাজিয়ে শত্রুর গতিরোধের জন্য বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। এডামস সসৈন্যে উপস্থিত হয়ে অনেক চেষ্টা করেও নবাব সৈন্যের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারল না। নবাব সেনারা এতে আশ্বস্ত হয়ে উঠে এবং তাঁদের মধ্যে কিছুটা শৈথিল্যের ভাব দেখা দেয়।[১৫] কিন্তু এতেও ইংরেজদের কোন লাভ হয়নি। চিরাচরিত স্বভাব অনুসারে ইংরেজরা এখানেও বিশ্বাসঘাতক লাভের চেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং অচিরেই একজন নবাব সেনাকে বশীভূত করতে সক্ষম হয়। এই সৈন্যটি রাতের অন্ধকারে দুর্গ ত্যাগ করে ইংরেজ বাহিনীর সাথে মিলিত হয়। এবং এডামসকে দুর্গের পার্শ্ববর্তী নালার অগভীর স্থানের সন্ধান দেয়। লোকটির কোন বিস্তারিত খবর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই; তবে ঐতিহাসিকগণ সবাই একে একজন ইংরেজ সেনা বলে উল্লেখ করেছেন।

যাহোক সে রাতেই ইংরেজরা নালা অতিক্রম করে দুর্গমূলে সমবেত হয়। প্রাচীররক্ষী কতিপয় নবাব সেনার পক্ষে তাদের গতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। ইংরেজরা দুর্গদ্বার খুলে সুপ্তোত্থিত নবাব সেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মীরকাসেমের মুসলমান সেনানায়কগন অনন্যোপায় হয়ে পলায়নপর নবাব সেনাদের উপরই গুলি বর্ষণ করা শুরু করেন। এভাবে স্বপক্ষীয় সেনানায়কদের নির্দেশে উধুয়ানালার দুর্গে প্রায় ৫০ হাজার নবাব সেনা নিহত হয়। এ যুদ্ধে জয় লাভের জন্য ইংরেজদের অধিক বীরত্ব প্রদর্শন করতে হয় নাই। কারণ নবাবের সমরু, মার্কার, আরাটুস ও অন্যান্য বিদেশী সেনাপতি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেও যুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

মোটেই অংশগ্রহণ করেন নাই। বিদেশী প্রভাবিত আমাদের অনেক ইতিহাসে এ যুদ্ধকে ইংরেজদের অভূতপূর্ব বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু নবাব মীরকাসেম ইংরেজ সেনাপতিকে এ যুদ্ধ সম্পর্কে নিজেই লিখেছিলেন যে, "এ যুদ্ধ ও এর পরবর্তী দু-একটি যুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও নৈশ অভিযানের মাধ্যমে আমার কতিপয় জমাদারের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে খুব গৌরবান্বিত বোধ করবেন। আল্লাহ ইচ্ছায়, কিভাবে এর প্রতিশোধ নেওয়া হয় তা দেখবেন।'[১৬]

যুদ্ধে নবাবের বিদেশী সেনাপতিরা উপস্থিত থেকেও কেন অংশগ্রহণ করে নাই তা সহজেই অনুমেয়। ইতিপূর্বেও আমরা এ ধরনের ঘটনা দেখেছি। এ সম্পর্কে সেনাপতি এডামস যে তাদের কৌশলে হাত করার চেষ্টা করেছিলেন তা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায়।[১৭] যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকেও সসৈন্যে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কেবল মীর জাফরের একার ইতিহাস নয়।

এই পর্যায়ে মীরকাসেমের মানসিক অবস্থা রীতিমত গবেষণার বিষয়। সেনাপতিরা যখন ক্রমেই অধিকহারে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিতে লাগলেন, তখন আত্মসংবরণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। আরাব আলি খাঁ নামক এক সেনানায়কের উপর মুংগের দুর্গের শাসনভার ন্যস্ত করে তিনি পাটনা অভিমুখে যাত্রা করলেই ইংরেজ সেনারা ১ অক্টোবর তারিখে মুংগের দুর্গ আক্রমণ করে এবং আরাব আলী খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় দুর্গ দখল করে দুই হাজার নবাব সৈন্যকে কারারুদ্ধ করে। এসব খবর শোনার পর মীরকাসেম বহু আলেচিত হত্যাকাণ্ডের আদেশ প্রচার করেন। পলাশী ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রের নায়ক রাজা রামনারায়ণ, জগৎশেঠ, স্বরূপ চাঁদ, রাজবল্লভরা তো নিহত হলেনই, গর্গিন খাঁ স্বীয় দেহ রক্ষীদের দ্বারাই নিহত হলেন এবং পাটনায় বন্দী ইংরেজদের মধ্যে একমাত্র ডা. ফুলারটন ছাড়া অন্য কেউ রক্ষা পায় নাই। ইতিহাসে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অনেকে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছেন। এই হত্যাকাণ্ড হয়ত সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নয় বলে আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু এবিষয়ে কোন মন্তব্য করার আগে মীর কাসেমের পারিপার্শ্বিক ও মানসিক অবস্থা এবং বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহীদের অপরাধও বিবেচিত হওয়া উচিত।

এখানে লক্ষ্যযোগ্য যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়ার পর কোম্পানির ডিরেক্টরগণ এরপরও মীরকাসেমের পক্ষই অবলম্বন করেছিলেন এবং তারা এলিস, অমিয়ট অন্যান্য এ ধরনের কর্মচারীকে বরখাস্ত করে মীরকাসেমের সাথে সন্ধি করার জন্য কলিকাতায় নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১৮] কিন্তু সে নির্দেশ ভারতে পৌঁছে যথেষ্ট বিলম্বে এবং ইতিমধ্যেই ঘটনাপ্রবাহ অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল।

১৭৬৩ সালের ৫ অক্টোবর পাটনার হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। মুংগের জয়ের পর সেনাপতি এডামস সেখানেই অবস্থান করছিলেন। ১৫ অক্টোবর এডামস মুংগের থেকে যাত্রা করে ২৮ অক্টোবর সসৈন্যে পাটনায় উপনীত হন। মীরকাসেম এডামসকে পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণের জন্য সুশিক্ষিত একদল সৈন্য নিয়ে পৌঁছার আগেই দুর্গ ত্যাগ করেন। পাটনার দুর্গ প্রাচীরের উচ্চতা ছিল ৩২ ফুট এবং এর পাদদেশস্থ পরিখাটি ছিল ৫০ ফুট প্রশস্ত।

www.nagorikpathagar.org

৬ নভেম্বর এডামস পাটনা দুর্গ আক্রমণ করেন। মীরকাসেম ইংরেজ বাহিনীকে পশ্চাৎদিক থেকে আক্রমণের জন্য অশ্বারোহী সৈন্যসহ সেনানায়ক মীর আবু আলী খাঁ ও বক্সী রওশন আলী খাঁকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা পৌঁছার আগেই পাটনা দুর্গের পতন ঘটেছিল।

এভাবে কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, উধুয়ানালা, মুংগের ও পাটনায় পরাজিত হয়ে মীরকাসেম দেশত্যাগ করেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সিরাজউদ্দৌলার সময়ে যা ঘটেছিল তার সময়েও তাই ঘটতে চলেছে। মীরকাসেম পরিবারের মহিলাদের রাহোতাস গড়ে পাঠিয়ে দিয়ে অযোধ্যার পথে এগিয়ে গেলেন পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার আশায়।

মীরকাসেম সমস্ত অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট অনেক উপঢৌকন দিয়ে দূত পাঠিয়ে দেন তাঁকে সাহায্যের আশায়। কর্মনাশা নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে তিনি সুজাউদ্দৌলার জবাব পান। পবিত্র কুরআনের আবরণী পৃষ্ঠায় সুজাউদ্দৌলা স্বহস্তে লিখে মীরকাসেমকে 'ধর্মভ্রাতা' বলে সম্বোধন করে তাকে আশ্রয় ও সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। মীরকাসেম এতে আশ্বস্ত হন। মীরকাসেম বারানসীতে পৌঁছলে সুজাউদ্দৌলার প্রধান সামন্ত বলবন্ত সিংহ তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর করেন। এরপর মীরকাসেম সসৈন্য এলাহাবাদে পৌঁছেন। এলাহাবাদে মীরকাসেমের সাথে সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের সম্মিলন ঘটে। ভারতে মুসলমান শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তখন এই তিনজনই ছিলেন যথেষ্ট।

অপরদিকে ইংরেজদের অবস্থা তখন বেশ শোচনীয়। কঠোর পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্যহানি জনিত কারণে সেনাপতি এডামস-এর মৃত্যু হয়। মীরকাসেমের পরাজয়ের পর সৈন্যদের যে পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি মীর জাফর দিয়েছিলেন তা পূরণ না হওয়ায় প্রথমে গোড়া সৈন্যরা ও পরে এদেশীয় সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মীর জাফর ও ইংরেজদের কিছুদিন এ বিদ্রোহ দমনেই ব্যস্ত থাকতে হল।

সিপাহীদের শান্ত করার পর ইংরেজরা আবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। মহারাজা নন্দকুমারের পরামর্শে মীর জাফরকে দিয়ে বাদশাহ শাহ আলমের কাছে পত্র লেখা হল সিংহাসন অধিকারে ইংরেজদের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। বাদশাহ প্রলুব্ধ হলেন এবং সিদ্ধান্ত রায়কে আলোচনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন মীর জাফরের কাছে।

একদিকে এই ষড়যন্ত্র আর অপরদিকে মীরকাসেমের প্রতি প্রদর্শন করা হল অশেষ শিষ্টাচার। মীরকাসেমকে বলা হল যে, বুন্দেলখণ্ড দখল না করে বাদশাহ ও সুজাউদ্দৌলার পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু এতে অনেক সময় নষ্ট হবে মনে করে বাদশাহের অনুমতি নিয়ে মীরকাসেম নিজেই সেনাপতির পদ গ্রহণ করে বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করেন ও জয়লাভ করে ফিরে আসেন। এরপর বাদশাহ ও সুজাউদ্দৌলার জন্য মীরকাসেমকে সাহায্য না করার কোন যুক্তি রইল না। একটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হল এবং এ চুক্তি অনুসারে সম্মিলিত বাহিনী গংগা পার হয়ে বিহারে পদার্পণ করার পর থেকে প্রতিমাসে ব্যয়ভার বহনের জন্য ১১ লক্ষ টাকা দিতে, রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলে বাদশাহকে প্রাপ্য কর দিতে এবং সুজাউদ্দৌলাকে প্রয়োজনে সৈন্য সাহায্য করতে সম্মত হলেন।

www.nagorikpathagar.org

মেজর কর্নাক তখন এডামস-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। তিনি বক্সারের নিকট শিবির স্থাপন করে সম্মিলিত বাহিনীর জন্য অপেক্ষায় রইলেন। সম্মিলিত বাহিনী এগিয়ে আসতে থাকলে মেজর কর্নাক নিরাপত্তার অভাব বোধ করে পাটনায় পিছু হটে এলেন। মীরকাসেম সসৈন্যে পাটনায় এসে ইংরেজ শিবির অবরোধ করলেন। ফলে পাটনার পশ্চিম দিকস্থ সারা এলাকা বিনাযুদ্ধে মীরকাসেমের হস্তগত হয়।

নবাব সেনা প্রায় একমাস ইংরেজ শিবির অবরোধ করে রইল। খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হল বটে কিন্তু জয়-পরাজয় নির্ধারিত না হওয়ায় ও বর্ষাকাল এসে পড়ায় মীরকাসেম বক্সারে এসে শিবির স্থাপন করেন। তখন ইংরেজ বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মেজর সমরো। তিনিও বর্ষাকাল পাটনায় কাটানোই স্থির করেন। এরই মধ্যে পাটনা হত্যাকাণ্ডের নায়ক ও মীরকাসেমের খ্রিষ্টান সেনাপতি সমরু সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে প্রচার করে দেন যে, মীরকাসেম পাটনায় সুজাউদ্দৌলাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। সমরুর প্রচারণা বৃথা গেল না। এর ফলে প্রথমে কোন্দল ও পরে মনোমালিন্য তীব্রতর হয়ে উঠল। মীরকাসেমের ধনরক্ষক মীর সোলায়মান এ সময়ে তাঁর সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে সুজার শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করল। মীরকাসেম অনন্যোপায় হয়ে সুজাউদ্দৌলার কাছেই বিচার চাইলেন। কিন্তু অর্থের ভাগ পেয়ে সুজাউদ্দৌলা মীরকাসেমকে দোষী সাব্যস্ত করে স্বীয় শিবির থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

আমাদের ইতিহাসে মীরকাসেম বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফকিরী গ্রহণ করে নিরুদ্দেশ হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথা সত্য নয়।

প্রকৃত সত্য এই যে, মীরকাসেম সুজাউদ্দৌলা কর্তৃক এভাবে অপমাণিত হয়ে এবং নিজের ধনরক্ষক ও সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুণ্ন হয়ে স্বীয় বেশ ত্যাগ করে দীন-হীনের বেশ ধরে নিজের শিবিরের দ্বার দেশে উপবেশন করেন। বস্তুত কপর্দকহীন মীরকাসেম, সেনাপতির ষড়যন্ত্রের শিকার মীরকাসেম এবং যার উপর এত ভরসা করে কোটি কোটি মুদ্রা দুহাতে খরচ করে তিনি এ পর্যন্ত এগিয়েছেন সেই 'ধর্মভ্রাতা' সুজাউদ্দৌলার এহেন অমানবিক ব্যবহার নিজেকে ধিক্কার দেওয়ার পক্ষে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাসেমের জন্য যথেষ্ট ছিল।

মীরকাসেমের এই চরম মনোভাবের শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সৈন্যরা সুজাউদ্দৌলার ব্যবহার সম্পর্কে নানা কথা বলতে শুরু করল। কিন্তু নবাবের সেনাপতি সমরু এ সময়ে চরম বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করলেন। তিনি সসৈন্য সুজাউদ্দৌলার পক্ষাবলম্বন করলেন এবং মীরকাসেমের শিবির অবরোধ করে লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগ করলেন এবং নবাব মীরকাসেমকে বন্দী করে সুজাউদ্দৌলার শিবিরে নিয়ে গেলেন।

ইংরেজ সেনাপতি মনরো এরই মধ্যে পাটনা থেকে বক্সারের পথে এগিয়ে গিয়ে সম্মিলিত বাহিনী কর্তৃক আরার নিকটে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। মোগল শিবিরের কাহিনী তাঁর অজানা রইল না। সম্মিলিত বাহিনীকে তিনি আক্রমণ করে বসলেন। প্রথম দিন সুজাউদ্দৌলারই জয় হয়েছিল। ফলে ইংরেজ বাহিনী সতর্ক ও মোগল বাহিনী কিছুটা অসতর্ক হয়ে পড়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

১৭৬৪ সালের ২৩ অক্টোবর প্রত্যুষে মোগল বাহিনী শিবির থেকে বেরিয়ে এল যুদ্ধের জন্য। সুজাউদ্দৌলা একটি খঞ্জ হাতীর পিঠে মীরকাসেমকে সওয়ার করিয়ে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়ে বেরিয়ে এলেন ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য। মীরকাসেম শিবির থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। যুদ্ধে মোগল সেনানায়কদের অনেকেই নিহত হওয়ায় ইংরেজদেরই জয় হয়েছিল, কারণ যে সেনানায়ক নিহত হতেন তার অধীনস্থ সেনারাই শিবিরে ফিরে নিজেদের ধনরত্ন লুণ্ঠনে মত্ত হত।

বাদশাহ শাহ আলম যুদ্ধ ক্ষেত্রের কাছেই দর্শকের ভূমিকা পালন করছিলেন। জয় হওয়া মাত্র তিনি ইংরেজদের অভিনন্দন জানালেন এবং নিজেকে তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বলে ঘোষণা করলেন। তিনজন মুসলিম নরপতির মধ্যে শাহ আলমই ইংরেজদের শরণাপন্ন হলেন, সুজাউদ্দৌলা পালিয়ে দেশে ফিরে গেলেন, আর মীরকাসেম যুদ্ধ করারও সুযোগ পেলেন না। খঞ্জ হাতীর পিঠে চড়ে রওয়ানা হলেন রোহিলাখণ্ডের দিকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একের পর এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মীরকাসেম তখন শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক দিক থেকে চরমভাবে বিপর্যস্ত। তাছাড়া ইংরেজরা তাঁকে ধরিয়ে দিতে পারলে একলক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করেছিল। অতএব মীরকাসেম হাতীর মাহুতকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। হাতীর পিঠ থেকে তিনি নেমে গেলেন। শ্রান্ত-ক্লান্ত মীরকাসেম উপনীত হলেন রোহিলাখণ্ডে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় অরাজক হল, ইংরেজ মাত্রই দুর্ধর্ষ হয়ে উঠল। দ্বিতীয় বার নবাবী প্রাপ্ত মীরজাফর নিজের আত্মসম্মান পর্যন্ত রক্ষা করতে ব্যর্থ হলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল। ইংরেজ কোম্পানি, কোম্পানির কর্মচারী ও তাদের সহযোগীদের যুদ্ধের কাল্পনিক ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৫ লক্ষ টাকা দিয়েও মীরজাফর ঋণ মুক্ত হতে পারলেন না।[১৯]

মীরকাসেমের জীবনের শেষ দিনগুলো সম্পর্কে আমাদের ইতিহাস অনিশ্চয়তার কারণে প্রায় নীরব। কিন্তু এখন সে অবস্থার অবসান হবে বলে আমরা আশা করি। কারণ, ভারত সরকারের দফতর খানার ফার্সী বিভাগে রক্ষিত কতিপয় পত্র থেকে জানা গেছে যে, নজফ খাঁ রোহিলাখণ্ডে তাঁকে প্রথমে সাদরে গ্রহণ করে কিছুকালের জন্য একটি বৃত্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রোহিলাদের সমর্থনের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ায় মীরকাসেম মারাঠা এবং তদানীন্তন ভারতের অন্যান্য রাজন্যকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এতে ব্যর্থ হয়ে তিনি হায়দারাবাদের (দাক্ষিণাত্য) নিজাম এবং আহমদ শাহ আবদালীর সাহায্য কামনা করেন। কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে কেউ এগিয়ে না আসায় মীরকাসেম পুনরায় বাদশাহ শাহ আলমের সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়ে দিল্লী পৌঁছেন। আশা ছিল পরাধীনতার গ্লানিতে যদি তাঁর শুভবুদ্ধির উদয় হয়ে থাকে, যদি তিনি এখনো সম্মত হন কাটিয়ে উঠতে পরাধীনতার দুর্বিসহ অভিশাপ। কিন্তু সাহায্য করা দূরের কথা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও মীরকাসৈমকে তিনি সাক্ষাৎ পর্যন্ত দিলেন না। উপরন্তু উদরী রোগে আক্রান্ত মীরকাসৈমের মৃত্যু হলে বাদশাহের অনুচরদের হাতে তাঁর পরিবাবরবর্গ নিগৃহীত হয়। এটা ছিল ১৭৭৭ সালের ৭ জুন শাহ জাহামাবাদের (দিল্লী) ঘটনা।[২০] এ সম্পর্কে কর্নেল আয়রন সাইডের নিকট লিখিত মেজর স্পিলিয়ারের পত্রে বলা হয়েছে– "অবশেষে কাসেম আলী খাঁ মৃত্যুবরণ করেছেন। শুনেছি শেষকৃত্য সমাপন করতে তাঁর

www.nagorikpathagar.org

শেষ শালখানি পর্যন্ত বিক্রয় করতে হয়েছে। কাসিম আলী খাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে সম্রাটের অনুচরেরা তাঁর পালিত পশু ও অস্থাবর সম্পত্তি লুট এবং পরবারের মহিলা ও শিশুদের বন্দী করেছিল। যাহোক, নজফ খাঁর মধ্যস্থতায় সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নজফ খাঁর আশ্রয়ে কাসেম আলীখাঁর দুই শিশু সন্তান এখানকার শিবিরে আছে।[২১]

এটাই ইতিহাস। এটাই হল স্বাধীনতা রক্ষায় মীরকাসেম আলী খাঁর চেষ্টার পরিণতি। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাসেমের ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম এমনিভাবেই চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

তথ্যসূত্র:

1. Maileson: Decisive Battle of India, P-140.

2. R.C Majumder; Advanced History of India.

3. Buxar deserves far more than blassey to be considered as the origin of the British power in India— Sir J. Stephen.

4. Maileson: Decisive Battle of India.

5. Early History of British india, P-273.

6. Decisive Battle ef India, P-140

7. Early History of India, P-273.

8. Rise and Progress of Bengal Army, Vol. 1, P-316.

9. Rise and Progress of Bengal Army, Vol. 1, P-315

10. Seir Mutakherin, Vol,II P-170-172.

11. Procedings of Council, Oct.14. 1962.

12. Broome's Bengal Army, P-361.

13.Akkhoy Kumar Moitreyo. Mir Kassim, P : 144-145

14. Decisive Battle of India, P-158.

15. History of Bengal : Scott.

16. Vansitarts Narratives, Vol. III, P-369.

17. Long's Selections. Vol I, P-339

18. Court's letter dated Feb. 8, 1768 as published in Long's Selections. Vol. I. P:370-372.

19. Broome's Bengal Army, P-497.

20. Calendar of Parsian Correspondence, Vol. V. (1776-80) Letter No. 1273, P-254.

21. Asiatic British Register : 1800 Mis. Tracts, P-36.

www.nagorikpathagar.org

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ: ফকীর বিদ্রোহ

উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম কে বা কারা প্রথম শুরু করে এবং কখন তা শুরু হয়, এককালে তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বাংলার "ফকীর বিদ্রোহের ইতিহাস" উদ্‌ঘাটিত হবার পর এ বিতর্কের একটা সুরাহা হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা। বিষয়টি নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন যে নেই তা নয়, বরং আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপূর্ণ ইতিহাস রচনার স্বার্থেই সে ইতিহাস খুঁজে বের করবার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই সংগে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তী স্তরগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত 'ত্রিপুরার শমশের গাজীর বিদ্রোহ', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহ', 'ওহাবী আন্দোলন', 'ফারায়েজী আন্দোলন', 'সন্দ্বীপের বিদ্রোহ', '১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব' ও 'নীল বিদ্রোহের' পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংকলন করা দরকার, দরকার তা ভবিষ্যত বংশধরদের হাতে তুলে দেবার।

সুদীর্ঘ ৭০০ বছর ধরে ভারতের বুকে যে মুসলিম শাসন অব্যাহত ছিল- পলাশীর বিয়োগান্ত প্রহসনের মাধ্যমে তার হাত বদল মুসলমানরা স্বাভাবিক কারণেই মেনে নিতে পারেনি। মেনে নেওয়া সম্ভবও ছিল না। আর কোন আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন জাতির পক্ষেই রাতারাতি এই পরিবর্তনকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। পলাশীর আম্রকাননের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত এই ভাগ্য বিপর্যয়ে বাংলার মুসলমান সাময়িকভাবে দিশেহারা ও মুহ্যমান হয়ে পড়লেও সম্বিৎ ফিরে পেতে তাদের বেশি দেরিও হয়নি। সিরাজউদ্দৌলার পর শাসকদের পক্ষ থেকে মীর কাসেম আপ্রাণ চেষ্টা চালান দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে। কিন্তু তাঁর এ চেষ্টা ফলবতী হয়নি। পরাধীনতার অভিশাপ সম্বন্ধে জনগণের চেতনা প্রথমেই জাগেনি। তার কারণ প্রথম দিকে আপামর জনসাধারণ একে শাসকের পালাবদল হিসেবে ধরে নিলেও মাত্র কিছুদিনের ভেতরই তাদের সামনে এ সত্যও ধরা পড়ল– শাসকের পালাবদলের সংগে তাদের ভাগ্যেরও পালাবদল ঘটেছে। আর এই সত্য উপলব্ধির সংগেই শুরু হল প্রতিরোধ সংগ্রাম। ব্রিটিশ শাসকেরা একে বিদ্রোহ বলে চালাতে চাইলেও এবং এসব বিদ্রোহকে (অবশ্য তাদের ভাষায়) নির্মম হস্তে দমন করতে সমর্থ হলেও স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের কাছে তা স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবেই সম্মান ও শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয় হয়ে রইল-আর সেসব 'বিদ্রোহে' (?) যারা অংশ নিতে এগিয়ে গেলেন, নির্যাতন সইলেন, প্রাণ বিলিয়ে দিলেন, সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও শোষকদের লেখায় তারা দস্যু, তস্কর, লুটেরা ও সন্ত্রাসবাদী হিসেবে আখ্যায়িত হলেও এদেশের মানুষ কিন্তু তাদের ঠিকই স্বাধীনতার বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অমর শহীদ হিসেবেই হৃদয়ে ঠাঁই দিল।

এখানে অনিবার্যভাবেই একটি প্রশ্ন মনে না জেগে পারে না তাহল–পলাশী প্রহসন অনুষ্ঠিত হবার যে দিনটিতে আম্রকাননের কিছু দূরেই ভূমি কর্ষণরত যে কৃষকের হাতে লাঙলের মুঠি ধরা রইল, এতটুকু ভাবান্তর যাকে বিব্রত করল না,– হস্তীপৃষ্ঠে শহীদ

www.nagorikpathagar.org

সিরাজের লাশ দৃষ্টেও যে মুর্শিদাবাদবাসী ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল, লাশ বহনকারী হাতীর সামনে আলুথালুবেশী নবাব মাতা আমিনার ভূলুণ্ঠিত চেহারা যাদের চোখের কোণে এক বিন্দু অশ্রু ভিন্ন আর কিছু দিতে পারল না, হঠাৎ এমন কি ঘটল যে, সেই লাঙলের মুঠি ধরা হাতই প্রতিরোধের শাণিত অস্ত্র তুলে নিল? সে এক ইতিহাস; বড় করুণ, বড় নির্মম।

ষড়যন্ত্র এবং কূটকৌশলের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ক্ষমতা দখল করলেও দেশের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করতে তারা প্রথমেই সাহসী হয়নি। সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারের সাদা চামড়ার শাসন এদেশবাসী সহজে কিংবা আদৌ মানবে কিনা এই ভয় তাদের গোড়াতেই ছিল। নির্লজ্জ শোষক ও লোভী হায়েনার চেহারা নিয়ে হঠাৎ করে দেশের সাধারণ মানুষের সামনে হাজির হতে প্রথমে তাদের সংকোচ বেধেছিল। তাই তারা মীরজাফর প্রমুখ কতিপয় সাক্ষী-গোপালের আড়ালে নিজেদের হিংস্র ও লোভী চেহারা লুকিয়ে রাখার ভেতর নিজেদেরকে নিরাপদ ভেবেছিল। পর্দার আড়াল থেকে চালিয়ে যেতে থাকল শাসন, শোষণ এবং উৎপীড়ন। বাংলার অফুরন্ত ধন-সম্পদ লুট করবার মূল চাবিকাঠি কোম্পানি নিজ হাতে রেখে এদেশের মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের কারণ হিসেবে এদেশের কতিপয় কুলাংগারের মাথায় সব দোষের বোঝা তুলে দিল। রবার্ট ক্লাইভ সব অপকর্মের নায়ক হয়েও চাতুর্যের বদৌলতে ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে রইলেন।

"বিজয়ের সাথে সাথে ক্লাইভ ও তার অনুচরেরা সমগ্র দেশের উপর কায়েম করলো লুণ্ঠন ও অত্যাচারের বিভীষিকা। পলাশী যুদ্ধের পর ক্লাইভ মীরজাফরের নিকট থেকে উৎকোচ স্বরূপ লাভ করলেন দু'লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউন্ড। রাতারাতি লর্ড ক্লাইভ গণ্য হলেন ইংলন্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী বলে। নবাবী লাভের ইনাম স্বরূপ মীরজাফরের কাছ থেকে কোম্পানির কর্মচারীরা গ্রহণ করলো ৩০ লক্ষ পাউন্ড এবং চব্বিশ পরগণা জেলার জমিদারী। এরপর একটানা চললো উৎকোচ গ্রহণ, লুণ্ঠন ও ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব আদায়। ১৭৬৬ সালে (ব্রিটিশ) পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটি ইংরেজ কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণের যে তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন তাতে দেখা যায়, "১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলাদেশ ও বিহার থেকে মোট ৯ কোটি টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেছিল।"

লুণ্ঠনের এমন দুঃখজনক ইতিহাস দুনিয়াতে বোধ করি অল্পই আছে। এই শোষণ-নির্যাতনের রূপ যে কত ঘৃণিত ও ভয়াবহ ছিল তা তাদেরই একজন লর্ড মেকলের ভাষায় শুনুন:

"ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী স্বার্থে নয়, নিজেদের জন্যই কোম্পানির কর্মচারীরা এদেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যক্ষেত্রে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। দেশীয় লোকদের তারা দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য অল্প দামে বিক্রয় এবং ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বেশি দামে ক্রয় করতে বাধ্য করলো। কোম্পানির আশ্রয়ে প্রতিপালিত দেশীয় কর্মচারীরা সমগ্র দেশে সৃষ্টি করেছিল শোষণ ও অত্যাচারের ভয়াবহ বিভীষিকা। কোম্পানির প্রতিটি কর্মচারী ছিল তার

www.nagorikpathagar.org

প্রভুর শক্তিতে শক্তিমান, আর এইসব প্রভুর শক্তির উৎস ছিল স্বয়ং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কোলকাতায় ধন-সম্পদের পাহাড় তৈরি হল, অপরদিকে তিন কোটি মানুষ দুঃখ-দুর্দশার শেষ স্তরে উপনীত হল। সত্য কথা যে, বাংলার মানুষ শোষণ-উৎপীড়ন সহ্য করতে অভ্যস্ত; কিন্তু এমন ভয়াবহ শোষণ ও উৎপীড়ন তারা কোনদিন দেখেনি।" (Essays on Lord Clive).

এদেশ দখলের পর এদেশের বুকে তাদের শাসন ও শোষণকে পাকাপোক্ত ও কায়েমী করবার লক্ষ্যে বেনিয়া কোম্পানি প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ধ্বসিয়ে দিল। পূর্ব থেকে চালু সমষ্টিগতভাবে গ্রাম্য সমাজের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রথা বাতিল করে চাষীদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব আদায়ের প্রথা চালু করল। মোগল আমল থেকে প্রচলিত উৎপন্ন ফসলের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ও বাতিল হল। পরিবর্তে চালু করা হল মুদ্রার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়। ফলে ব্যক্তিগতভাবে মুদ্রার মাধ্যমে রাজস্ব পরিশোধের জন্য মুদ্রা সংগ্রহ করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দিল। আর সেই মুদ্রা সংগ্রহের প্রয়োজনে ফসল বিক্রি করা ছাড়া চাষীর অন্য কোন উপায় রইল না।

চাষীর ফসল ক্রয় করবার জন্য ইংরেজ বণিকেরা বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে ক্রয়কেন্দ্র খোলে। শুধু তাই নয়, বেশি মুনাফার আশায় এই সব ক্রয়কৃত খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা শুরু করল। পরে সুযোগ-সুবিধামত এইসব খাদ্যই চড়ামূল্যে সেই চাষীদের নিকটই আবার বিক্রি করত। ফলে খাদ্য গুদামজাতকরণের মাধ্যমে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির কারণেই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে দুর্ভিক্ষ ঘনিয়ে এল। ১৭৬৯ সালে ক্রয়কৃত সমস্ত ফসল ১৭৭০ সালেই আবার বেশি দামে বিক্রি হল। বাংলার চাষী তা ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়ে নজীরবিহীন দুর্ভিক্ষের শিকার হল। মারা গেল কয়েক লক্ষ আদম সন্তান। বাংলা ১১৭৬ সালের এই দুর্ভিক্ষই "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে ইতিহাস খ্যাত। ইংরেজ ঐতিহাসিক 'ইয়ং হাজব্যান্ড'-এর ভাষায়:

"তাদের (ইংরেজ বণিকদের) মুনাফার পরবর্তী উপায় ছিল চাউল কিনে গুদামজাত করে রাখা। তারা নিশ্চিত ছিল যে, জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য এ দ্রব্যটির জন্য তারা যে মূল্যই চাইবে, তা পাবে।..... চাষীরা তাদের প্রাণপাত করা পরিশ্রমের ফল অপরের গুদামে মজুদ থাকতে দেখে চাষবাস সম্বন্ধে এক রকম উদাসীন হয়ে পড়ল। ফলে দেখা দিল ভয়ানক খাদ্যাভাব। দেশে যে সব খাদ্য ছিল, তা ইংরেজ বণিকদের দখলে। খাদ্যের পরিমাণ যত কমতে থাকল, ততই দাম বাড়তে লাগল। শ্রমজীবী দরিদ্র জনগণের চির দুঃখময় জীবনের উপর পতিত হল এই পুঞ্জিভূত দুর্যোগের প্রথম আঘাত। কিন্তু এটা এক অশ্রুতপূর্ব বিপর্যয়ের আরম্ভ মাত্র।"

"এই হতভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ কোন অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা নহে। কিন্তু দেশীয় জনশত্রুদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ যে অভূতপূর্ব বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখা দিল, তা ভারতবাসীরাও আর কোনদিন চোখে দেখেনি বা কানে শোনেনি। চরম খাদ্যাভাবের এক ভয়াবহ ইঙ্গিত নিয়ে দেখা দিল ১৭৬৯ সাল। সংগে সংগে বাংলা-বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক তাদের সকল আমলা, গোমস্তা রাজস্ব

www.nagorikpathagar.org

বিভাগের সকল কর্মচারী যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সেখানেই দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান-চাউল কিনতে লাগল। এই জঘন্যতম ব্যবসায়ে মুনাফা এত শীঘ্র ও এত বিপুল পরিমাণে পেয়েছিল যে, মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে নিযুক্ত একজন কপর্দক শূন্য ভদ্রলোক এ ব্যবসায় করে দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রায় ৬০ হাজার পাউন্ড (দেড় লক্ষাধিক টাকা) দেশে পাঠিয়েছিল।"

ব্রিটিশ বেনিয়া রাজের সৃষ্ট ভয়াবহ এই দুর্ভিক্ষ কেবল বাংলাদেশের নয়–গোটা মানব জাতির ইতিহাসের একটি কলংকিত অধ্যায়। মানব শিক্ষা ও সভ্যতার ইতিহাস থেকে বাংলার ভয়ঙ্কর এই দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলার কথা কোনদিন মুছবার নয়।

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার এই দুর্ভিক্ষের বর্ণনা করে লিখেছেন:

"১৭৭০ সালের সারা গ্রীষ্মকালব্যাপী লোক মারা গিয়েছে। তাদের গরু-বাছুর, লাংগল-জোঁয়াল বেচে ফেলেছে এবং বীজধান খেয়ে ফেলেছে। অবশেষে তারা ছেলেমেয়ে বেচতে শুরু করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একসময় আর ক্রেতাও পাওয়া গেল না। তারপর তারা গাছের পাতা ও ঘাস খেতে শুরু করে এবং ১৭৭০ সালের জুন মাসে দরবারের রেসিডেন্ট স্বীকার করেন যে, জীবিত মানুষ মরা মানুষের গোশ্ত খেতে শুরু করে। অনশনে শীর্ণ, রোগে ক্লিষ্ট, কঙ্কালসার মানুষ দিনরাত সারি বেঁধে বড় বড় শহরে এসে জমা হতো। বছরের গোড়াতেই সংক্রামক রোগ শুরু হয়েছিল। মার্চ মাসে মুর্শিদাবাদে পানি বসন্ত দেখা দেয় এবং বহুলোক এই রোগে মারা যায়। শাহজাদা সাইফুতও এই রোগে মারা যান। মৃত ও মরণাপন্ন রোগী স্তূপাকারে পড়ে থাকায় রাস্তাঘাটে চলাচল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। লাশের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তা পুঁতে ফেলার কাজও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। প্রাচ্যের মেথর, কুকুর, শিয়াল ও শকুনের পক্ষেও এত বেশি লাশ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব ছিল না। ফলে দুর্গন্ধযুক্ত গলিত লাশ মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল।" (পল্লী বাংলার ইতিহাস; সুপ্রকাশ রায়)।

হান্টারের লেখায় আরও জানা যায় যে, সরকারি হিসেবে ১৭৭০ সালের মে মাস শেষ হওয়ার আগেই জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। জুন মাসে প্রতি ষোলজনের ৬ জন মারা গিয়েছিল। শেষাবধি জমিতে আবাদ করার মত পর্যাপ্ত লোকও আর অবশিষ্ট ছিল না।

এত বেশি রায়ত মারা গিয়েছিল এবং জমি পরিত্যাগ করেছিল যে, ভূস্বামীদের পক্ষে বকেয়া খাজনা আদায় করার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছিল।

"কোম্পানি সরকারের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তবুও মেটেনি, শোষণ-পীড়ন চলছিল সমান গতিতেই। শকুনের মত লাশের উপর বসেও কোম্পানির কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল মৃতপ্রায় চাষীদের উপর। তাই দেখা যায়, দুর্ভিক্ষের পূর্বে (১৭৬৮) যেখানে বাংলাদেশের রাজস্ব, ১,৫২,০৪,৮৫৬ টাকা, দুর্ভিক্ষের পর ১৭৭১ সালে সমগ্র দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক মরে যাওয়ার পরও মোট রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ১,৫৭,২৬,৫৭৬ টাকায়।" (পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ পৃ. ০৯-১১)

www.nagorikpathagar.org

এতো গেল কৃষি ও কৃষির উপর নির্ভরশীল কৃষকদের দুরবস্থার কথা। এবার আসুন, আমরা পলাশী যুদ্ধোত্তর আমাদের শিল্পী ও কারিগরদের অবস্থার দিকে তাকাইঃ ব্রিটিশ বেনিয়া রাজ এদেশের শিল্প-পণ্যের উপর কি পরিবর্তন চাপিয়ে দিয়েছিল এবং তার ফল কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এর আগে এদেশের গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থা ছিল কৃষি ও শিল্প পেশানির্ভর। তাঁত এবং চরকাই ছিল একমাত্র অর্থকরী শিল্পের মূল ভিত্তি। বেনিয়া শাসক ও শোষকেরা সেখানেও ছোবল হানল। তাঁত ভেঙে ছারখার করল, চরকা করল ধ্বংস। যে দেশের শিল্প-পণ্য সম্ভার দিয়ে ইংলন্ডে ব্যবসায় চলত, ইউরোপের কোন দেশের পণ্য সম্ভার এদেশের বাজারে বিক্রি করার কথা যখন কেউ কল্পনাও করেনি—বাংলাদেশের তথা উপমহাদেশের বস্ত্র শিল্পের সংগে প্রতিযোগিতায় নামার কল্পনাও যখন ইউরোপ করেনি, পলাশী যুদ্ধ সেই ইউরোপের ভাগ্য ফিরিয়ে দিল। ব্রুক এডামস-এর ভাষায়: ১৭৫০ সালে যখন বার্ক ইংলন্ডে আসেন, তখন সমগ্র প্রদেশে বারটার বেশি ব্যাংক ছিল না। অথচ ১৭৯০ সালে শহরের প্রত্যেকটি বাজারেই ব্যাংক ছিল। বাংলাদেশ থেকে রৌপ্য আসার পর শুধু অর্থের প্রচলন বেড়ে যায়নি, (ব্যাংক) আন্দোলনও জোরদার হয়েছে। কারণ হঠাৎ দেখা গেল, ১৭৫৯ সালে ব্যাংক ১০ পাউন্ড ও ১৫ পাউন্ডের নোট বাজারে ছেড়েছে।

শিল্প বিপ্লবের পূর্বেকার ইংলন্ডের অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ব্রুক এডামস অন্যত্র বলেছেন:

"পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই বাংলাদেশের লুণ্ঠিত ধন-রত্ন ইংলন্ডে আসতে লাগল এবং তখনই এর চাক্ষুষ ফল বোঝা গেল। পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল ১৭৫৭ সালে। তারপর থেকে (ইংলন্ডে) যে পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল তার তুলনা বোধ হয় ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে না। ১৭৬০ সালের আগে ল্যাংকাশায়ারে বস্ত্র-শিল্পের যন্ত্রপাতি এদেশের মতই সহজ-সাধারণ ছিল এবং ১৭১০ সালে ইংলন্ডে লৌহ শিল্পের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। ..... ইংলন্ডে ভারতের ধন-সম্পদ পৌছার এবং ঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত প্রয়োজন অনুরূপ শক্তি(মূলধন) ইংলন্ডের ছিল না।" (পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ : পৃ. ৫৫-৫৬)

বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যের মুকাবিলায় টিকতে না পেরে যেখানে ব্রিটিশ বস্ত্র-শিল্পের মালিকরা তাঁতের অনুন্নত বস্ত্র-শিল্প বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে আন্দোলন শুরু করে, সেখানে ১৭৬০ সালের পর দেখা দিল বিস্ময়কর পরিবর্তন। '৬০ সালে এল তাঁতের উড়ন্ত মাকু, '৬৪ ও '৭৬ সালে তৈরি হল সুতা কাটার যন্ত্র 'জেনি' ও 'সিউল'। '৬৮ সালে আবিষ্কৃত হল বাষ্পীয় যন্ত্র। এসব আবিষ্কারের সংগে যুক্ত হল ভারতবর্ষের অফুরন্ত লুণ্ঠিত সম্পদ। ফলে অঢেল অর্থ আর বাষ্পীয় শক্তির যৌথ সহযোগে অসম্ভব সম্ভব হল। ইংলন্ডের বস্ত্র-শিল্পের মান ও পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বাজারে এদেশের বস্ত্র-শিল্পের চাহিদা কেবল কমেই গেল না,—অধিকন্তু তাদের উদ্বৃত্ত কাপড় এদেশে রফতানি করবারও প্রয়োজন বোধ করল

www.nagorikpathagar.org

ইংলন্ডের বস্ত্র-শিল্প মালিকরা। এরপরও দেশীয় বস্ত্র-শিল্পের চাহিদাকে শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার এবং সেই সংগে বিলেতী বস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলার স্বার্থে বেনিয়া শোষক গোষ্ঠী দেশী পণ্যের উপর ট্যাক্সের গুরুভার চাপিয়ে দিল। কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও দেশী পণ্যের মুকাবিলায় টিকতে না পেরে অবশেষে বস্ত্রের উপর ৭০-৮০ ভাগ শুল্ক চাপিয়ে দিল আর বিলেতী মালের উপর থেকে শুল্ক উঠিয়ে নিল। ফলে দেশীয় শিল্প আত্মরক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেল। একই অবস্থা হল অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও। অতএব এসব শিল্প ধ্বংস হবার সংগে শিল্পের সংগে জড়িত বিরাট শ্রম ও জনশক্তি গেল ধ্বংস হয়ে। দৈহিক অত্যাচার ও অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পড় তাঁতীরা তাঁত ছেড়ে দিল। পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে তাঁতীদের সংগে অন্যান্য শিল্পের লোকেরাও কৃষির দিকে হাত বাড়াল শেষ সম্বল হিসেবে। অথচ সেখানেও যে তাদের জন্য কোন আশ্বাস ছিল না—তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

ব্রিটিশ বেনিয়া শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর নির্মম শাসন ও শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে এদেশের কৃষক, তাঁতী, মজুরসহ সর্বশ্রেণীর মানুষের বঁচার ন্যূনতম পথও আর খোলা রইল না। কেবল তখনই দুটো পথ তাদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিল। এক, শোষণ-নির্যাতনের চাপে তিল তিল করে অনিবার্য ধ্বংসে পরিণত হওয়া। দুই, বাঁচার শেষ চেষ্টায় বিদ্রোহের মাঝে মরণ আঘাত দেওয়া, বিপ্লবের মাধ্যমে শোষক বেনিয়া গোষ্ঠীর উচ্ছেদ সাধন করে আজাদী ও মুক্তির স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভাত ছিনিয়ে আনা। বাংলা ও বিহারের মানুষ দ্বিতীয় পথকেই বেছে নিল। শোষণ-নিষ্পেষণে অতিষ্ঠ ও মরণোন্মুখ এদেশের শ্রমজীবী মানুষ, চিরকালের নিরীহ মানুষ মুখ বুঁজে মার খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করে হয়ে উঠল বিদ্রোহী ও প্রতিবাদমুখর। যে হাত ছিল একদিন লাঙলের মুঠোয়, যে হাত সৃষ্টি করত বিখ্যাত মসলিন, সে হাত উঠিয়ে নিল সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র। শত্রুকে ক্ষমা না করার এবং 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'র নীতি গ্রহণ করল সে হাত শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জয় ধ্বজা উড়িয়ে যিনি সর্বপ্রথম মজলুম মানুষের মুক্তি মিছিলের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসলেন- তিনিই ইতিহাস খ্যাত ফকীর মজনু শাহ। আমাদের আযাদী সংগ্রামের সর্বপ্রথম সৈনিক।

ফকীর মজনু শাহ বর্তমান ভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের নেওয়াত এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদারী-বোরহানা তরীকার ফকীর বা দরবেশ ছিলেন। এই তরীকার ফকীরদের সম্পর্কে মরহুম নওয়াবযাদা আবদুল আলী বলেন: "তারা মাথায় লম্বা চুল রাখে, রঙীন কাপড় পরে এবং লোহার শিকল ও লম্ব চিমটা ব্যবহার করে। প্রধানত আতপ চাল, ঘি ও নুনই তাদের খাদ্য। তারা মাছ-গোশ্‌ত খায় না এবং কিছুকাল আগেও তারা কৌমার্যব্রত পালন করত। সফরের সময় তারা মৎস্যশোভিত পতাকা বহন করে এবং বিরাট দলবল নিয়েই তারা চলাফেরা করে। তাদের উপাধি 'বোরহানা' এসব ফকীর 'বসরিয়া' তরীকার 'তৈফুরিয়া খানেওয়াড়ো' ও 'তাবাগাতি' ঘরের অন্তর্ভুক্ত। ..... শাহ মাদার হচ্ছেন এ তরীকার প্রবর্তক।" (বাঙলার ফকীর বিদ্রোহ : পৃ. ৬)

১৬৫৯ সালে বাংলার তদানীন্তন সুবেদার শাহ সুজাবোরহানা ফকীর শাহ সুলতান হাসান মুরিয়া বোরহানাকে এক সনদ দান করেন। উক্ত সনদবলে বোরহানা ফকীরগণ

www.nagorikpathagar.org

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার যে কোন স্থানে যাতায়াতে তাদের পতাকা, বাদ্যযন্ত্র, অন্যান্য জিনিসপত্র বহনের অধিকার লাভ করে। সনদে মালিকবিহীন ভূ-সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকারও তাদের দান করা হয়। অধিকন্তু তারা যেখানেই যাক, সেখানকার জমিদার কিংবা প্রজা তাদের খাওয়া খরচ বহন করবে এবং তাদের কোনরূপ কর দিতে হবে না বলেও উক্ত সনদে উল্লেখ করা হয়।

এরা এক সময় দলবেঁধে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বসবাস ও ইতস্তত ঘোরাফেরা করে আসলেও কালক্রমে এরা দেশের নানাস্থানে পতিত ও খাস জমি দখল করে কিংবা মুসলিম শাসকদের থেকে 'দান' প্রাপ্ত জমিতে চাষাবাদ শুরু করে। কালক্রমে স্থায়ী কৃষকে পরিণত হলেও পোশাক-আশাকে এরা কিন্তু নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখে। ব্রিটিশ বেনিয়া শাসন হঠাৎ করেই এদের যাতায়াতের উপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করে (দ্র. পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, পৃ. ৮৫-৮৬)। এমন কি তীর্থ ক্ষেত্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাতায়াতকারী ফকীরদের উপরও বিরাট কর ধার্য করে। যে জমি তারা নিষ্কর ভোগ করত, তার উপরও অতিরিক্ত কর প্রয়োগ করা হল। ফলে একদিকে জীবিকা, অপরদিকে ধর্মীয় অধিকারের উপর এই বাধা-নিষেধ তাদেরকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। আর এই ক্ষোভই তাদেরকে বিদ্রোহের পেছনে মদদ যোগায়। অতএব জীবিকার স্বাভাবিক তাগিদে একদিকে খাদ্যশস্য গুদামজাতকারী মহাজন ও কুঠিয়ালদের উপর তারা আক্রমণ চালাতে শুরু করে এবং অধিক মুনাফার আশায় মজুদ করা খাদ্য লুট করতে শুরু করে, অপরদিকে এই জালিম শাসক ও শোষকদের সহযোগী যেকোন লোকদের তারা আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করতে থাকে।

১৭৬৩ সালে ফকীর বাহিনী সর্বপ্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঢাকা কুঠি আক্রমণ করে। সে সময় ঢাকা কুঠির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মি. র‍্যালফ লিসেস্টার নামক জনৈক শ্বেতাংগ ফকীর বাহিনীর আগমনে ভীত হয়ে কোনরূপ প্রতিরোধের চেষ্টা না করেই বুড়ীগঙ্গার বুকে আশ্রয় নেন। ফলে বিনা বাধায় ফকীরদের লুণ্ঠন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। কোম্পানির তৎকালীন গভর্নর কুখ্যাত লর্ড ক্লাইভ মি. র‍্যালফ লিসেস্টারকে কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে ফকীরদের 'ছোট লোকের দল' হিসেবে অভিহিত করে।

ঢাকা কুঠি থেকেই ফকীর বাহিনীকে অব্যাহত অগ্রাভিযানে লিপ্ত দেখা যায়। এসব অভিযানের সবগুলোরই লক্ষ্যস্থল হিসেবে দেখা যায় কোম্পানি কুঠি এবং তাদের খাজনা আদায়কারী অত্যাচারী পাষণ্ড জমিদারদের কাছারিগুলো। অনেক সময় তারা জমিদারদের নিজস্ব বসতবাটি এবং সুদখোর-মহাজন ও দালাল-ফড়িয়াদের বাড়িতেও আক্রমণ চালিয়েছে। আক্রমণ অভিযানগুলোর অধিকাংশই যে দলপতি ফকীর মজনু শাহ্‌র নেতৃত্বে পরিচালিত হত-এ ব্যাপারে সকল বর্ণনাই একমত এবং আরও একমত যে, মুসা শাহ্, পরাগল শাহ, চেরাগ আলী শাহ্, সোবহান শাহ্, করিম শাহ্ প্রমুখ এক্ষেত্রে ফকীর মজনু শাহ্‌র বিশিষ্ট শাগরিদ ও সহচর ছিলেন। মূসা শাহ্ ছিলেন তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা এবং দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। প্রধানত তাঁর সঙ্গে পরামর্শক্রমেই তিনি অভিযানের সকল পরিকল্পনা তৈরি করতেন। অধিকন্তু এই মুসা শাহ্‌ই ফকীর মজনু শাহ্‌র মৃত্যু-পরবর্তী বহু বছর ফকীর বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

মজনু শাহ্ ভারতের কানপুর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে মকানপুর নামক শাহ্ মাদারের দরগায় বাস করতেন। এখান থেকেই তিনি প্রতি বছর সহস্রাধিক অনুচরসহ বেনিয়া কোম্পানির অধিকারভুক্ত বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করতেন। বিহারের পূর্নিয়া, কুচবিহার, বাংলার রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি, মালদহ, পাবনা ও ময়মনসিংহ জেলায় অধিকাংশ সময়ে এবং ঢাকা ও সিলেট জেলায় মাঝেমধ্যে অভিযান পরিচালনা করতেন তারা। এসব অভিযানে ফকীরদের সঙ্গে উট, ঘোড়া, হাউই, গাদা-বন্দুক, বর্শা, কয়েকটি ঘূর্ণায়মান কামান থাকত। এই ঘূর্ণায়মান কামানটিকে 'ভেলা' বলা হত। এর সংগে একটা চক্র যুক্ত ছিল এবং চক্রটি ঘূর্ণনের ফলে চতুর্দিকে অজস্র ধারায় অগ্নিবর্ষিত হত। হয়তো এজন্যই লোকে একে 'ঘূর্ণায়মান কামান' বলে জানত।

ফকীর মজনু শাহ্ পরিচালিত অভিযানগুলোর ভেতর আমরা ১৭৬৩ সালের ঢাকা কুঠি আক্রমণ ছাড়া, পরবর্তী কয়েক বছর অন্য কোন আক্রমণ অভিযানের সংবাদ অবগত নই। ১৭৬৯ সালে ফকীর বাহিনীর বিরুদ্ধে লে. কীথের নেতৃত্বাধীনে একটি সেনাদল প্রেরিত হয়। পূর্নিয়ার উত্তরে বোরাং অঞ্চলে ফকীর দলের সংগে সংঘর্ষে কীথ নিহত হন এবং অন্যরাও মারা যান। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরে ফকীরদের বিরুদ্ধে ১০ জন সিপাই ও ১০০ বরকন্দাজের সমন্বয়ে একটি কোম্পানি পাঠানো হয়। ফকীরদের সংখ্যাধিক্যে তারা ভয় পেয়ে ফিরে আসে। পরের বছর ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে পাবনার বেলকুচি ও লক্ষ্মীনামপুর নামক স্থানে ফকীরদের আগমন ঘটেছিল বলে ক্যাপ্টেন রেনেল মুর্শিদাবাদ কর্তৃপক্ষকে জানান। পরে তারা সেখানে থেকে ময়মনসিংহ জেলার পুখরিয়া পরগণার দিকে গেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। ক্যাপ্টেনের চিঠি পেয়ে লে. টেইলরের নেতৃত্বে দু'দল সিপাই পাঠান হয়। তার সঙ্গে লে. ফেলথামের নেতৃত্বে আর দুটো দল ফকীরদের পথরোধ করবার জন্য ঘোড়াঘাট (রংপুর) পাঠানো হয়। গোবিন্দ গঞ্জ (রংপুর) থেকে ১২ মাইল দূরে কাজীপাড়া নামক স্থানে ফকীর বাহিনী ফেলথাম বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়। ফকীর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের নেতা মজনু শাহ বগুড়ার মস্তানগড়ের দিকে পালিয়ে যান। পরে দলবল সেখানে তাঁর সংগে মিলিত হয়। মস্তানগড়ে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ দেখা যায়।

১৭৭২ সালে তিনি উত্তর বংগে আবির্ভূত হন। এ সময় ক্যাপ্টেন টমাস ফকীরদের সংগে এক সংঘর্ষে মারা যান। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় দিনাজপুরে ফকীর বাহিনীর তৎপরতার খবর পাওয়া যায়।

১৭৭৬ সাল থেকে শুরু করে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফকীর মজনু শাহ্ ও তার বাহিনী নতুন করে তৎপরতা শুরু করে। '৭৬ সালের ১৪ নভেম্বর লে. রবার্টসনের অধিনায়কত্বে বহরমপুর থেকে প্রেরিত একদল সৈন্যের সংগে বগুড়ার চার মাইল দূরে ফকীর মজনু শাহর সংঘর্ষ ঘটে। এখানে ফকীর বাহিনী গা-ঢাকা দেয়। ১৭৭৮ সালে ঘোড়াঘাটে (রংপুর) ফকীর মজনু শাহর আবির্ভাব ঘটে এবং আলাপসিং পরগণার দিকে অগ্রসর হয়। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে একদল ফকীর ময়মনসিংহ জেলার কেন্দ্রস্থলে হাযির হয়। এদের সংগে

www.nagorikpathagar.org

রামভাওয়াল পরগণার ইন্নাৎপুর থেকে আট-দশ ক্রোশ দূরে ছাতাকাইত নামক স্থানে কোম্পানি সৈন্যের ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে লে. ক্রো ফকীর বাহিনীর একটি দলের সংগে সংঘর্ষের সম্মুখীন হন। সংঘর্ষে কোম্পানির একজন সেপাই নিহত এবং একজন আহত হয়। গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় ক্রো ফিরে আসেন। ১৭৮৬ সালে একটি দল মজনু শাহর নেতৃত্বে ময়মনসিংহ এবং অপর দলটি মূসা শাহর নেতৃত্বে উত্তর বংগে অভিযান চালায়। ব্রিটিশ শক্তিকে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করে তোলাই ছিল সেবারকার অভিযানের উদ্দেশ্য। এ বছরেই লে. আশলী পরিচালিত বাহিনীর সংগে 'সেলবরষ' এবং লে. ব্রেনান পরিচালিত অপর বাহিনীর সংগে 'কালেশ্বর' নামক স্থানে ফকীর দলের সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষেই হতাহত হয়!

১৭৮৭ খ্রি. এর মার্চ-মে মাসে মকানপুরে জিন্দাশা মাদারের দরগায় আযাদী সংগ্রামের প্রথম পতাকা উত্তোলনকারী বীর অধিনায়ক ফকীর মজনু শাহ্ ইন্তিকাল করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েক বছর অবধি তদীয় ভ্রাতা মূসা শাহর নেতৃত্বে ফকীর বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল। এরপর ব্রিটিশ কোম্পানি শক্তি এই আযাদী সংগ্রামকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়।

ফকীর বাহিনীর সদস্য সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মত দেখতে পাওয়া যায়। তবে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, প্রথমদিকে এদের সংখ্যা হাজারের বেশি ছিল না। পরে এদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিষয়ে অবগত হয়ে জমিহারা, গৃহহারা কৃষক তাদের সবরকম সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করতে কেবল চেষ্টাই করেনি— তাদের সংগে যোগ দিয়ে বাহিনীর সৈন্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করেছিল। ১৭৭৬ সালে মন্বন্তরের বর্ণনায় উইলিয়াম হান্টার বলেন: দুর্ভিক্ষের পরবর্তী কয়েক বছরে সহায়-সম্বলহীন বহু নিরন্ন চাষী যোগ দেওয়ায় তাদের (ফকীর সন্ন্যাসীদের) সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। এই সকল কৃষকদের না ছিল বীজধান, না ছিল চাষাবাদের সাজ-সরঞ্জাম। ফলে একরকম বাধ্য হয়েই তারা সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দেয়। (পল্লী বাংলার ইতিহাস: পৃ. ৬২) কৃষক ছাড়া আর যারা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল তারা হল মোগল বাহিনীর ধ্বংসপ্রাপ্ত সৈন্য বাহিনীর বেকার ও বুভুক্ষু সৈন্যগণ। ..... এরাই হল তথাকথিত গৃহত্যাগী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী-ফকীর। -এক সময় এরা সংখ্যায় পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল। ১৭৫৮ সাল থেকে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত কৃষকদের সাথে সাথে কারিগরদেরও একটা বিরাট অংশ বেকার হয়ে পড়ল। এ সময় ঢাকার মসলিন বস্ত্রের এক-তৃতীয়াংশ কারিগর ইংরেজ বণিকদের শোষণ ও পীড়নে অস্থির হয়ে বন-জংগলে পলায়ন করে। পরে সুযোগমত ফকীর সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে (ভারতে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম: পৃ. ২৪)।

ফকীরদের এ মহান সংগ্রামকে কিছু ঐতিহাসিক দস্যুবৃত্তি ও লুটেরাপণা হিসেবে আখ্যায়িত করতে চেষ্টা করেছেন এবং শ্বেতাংগ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সুরে সুর মিলিয়ে এর নায়কদেরকে 'দস্যু ও তস্কর' আখ্যা দিতে চেষ্টা পেয়েছেন। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি এর জবাব হিসেবে যথেষ্ট হবে বলে আমাদের ধারণা— "একথা সত্য যে, প্রথমদিকে পেটের দায়ে তারা কিছু লুটতরাজ করেছিল। সংঘবদ্ধ হয়ে এরা প্রথমে স্থানীয় অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিদের ধন-সম্পত্তি লুট করে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করলো। কিন্তু শীঘ্রই তারা বুঝতে পারলো যে,

www.nagorikpathagar.org

এভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। কারণ আশেপাশে প্রতিবেশীদের অবস্থাও প্রায় একই রূপ। ধন-সম্পদ জমা হয়ে রয়েছে জমিদার, জোতদার, মহাজন ও ইংরেজ বণিকদের কুঠি-কাছারিতে। গুদামে জমানো শষ্য ও ধনসম্পদ কেড়ে নিতে না পারলে বেঁচে থাকা যাবে না।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম–সুপ্রকাশ রায় পৃ. ১৯-২২)।

এরপর তারা নিতান্ত বাধ্য হয়েই কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে জমিদার- মহাজন ও ইংরেজ সরকারের কুঠি লুণ্ঠন করতো। তারা কখনই স্থানীয় কৃষকদের উপর উৎপীড়ন কিংবা তাদের সম্পত্তি লুট করেনি। এসব বিদ্রোহীর প্রতি নেতাদের কঠোর নির্দেশ ছিল যাতে তারা সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি বা ধন-সম্পদ লুট না করে। আর এজন্যই সাধারণ মানুষের হৃদয়-নিঃসৃত অবিমিশ্র সমর্থন ও সহানুভূতি ফকীরদের প্রতি ছিল–একথা স্বয়ং হান্টার সাহেবও স্বীকার না করে পারেননি। নাটোরের জমিদার রাণী ভবানীর নিকট লিখিত এক পত্রে ফকীর নেতা মজনু শাহ নিজেও তাঁর শক্তির উৎস তাঁর প্রতি নিরন্ন ও মজলুম মানুষের অকৃত্রিম সমর্থন–সে কথা অসংকোচে উল্লেখ করেছেন। আর এটা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, কোন দস্যু কিংবা তস্করের প্রতি সাধারণ জনমানুষের সমর্থন ও সহানভূতি থাকে না,—থাকতে পারে না।

ফকীর মজনু শাহর পর তাঁর উত্তরাধিকারী মুসা শাহ দলীয় লোকদের হাতে নিহত হলে যোগ্য নায়কের অভাবে এ বিদ্রোহে ক্রমশ ভাটা দেখা দেয়;—যদিও ছোবহান আলী, রমজান শাহ, জহুর শাহ, মতিউল্লাহর ন্যায় ফকীর বিদ্রোহী শোষণ উৎপীড়নে জর্জরিত সাধারণ কৃষকের সহায়তায় বিদ্রোহের এই অগ্নি-শিখা জ্বালিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং ব্যর্থ হন।

আদর্শ, সুনির্ধারিত লক্ষ্য ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে উপমহাদেশের এই প্রথম আযাদী সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে গেলেও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিটি সংগ্রামে তা অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে—এটা নিঃসন্দেহ।

তথ্যপঞ্জী:

১. পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ: মেসবাহুল হক;

২. ফকীর মজনু শাহ্: অধ্যাপক আবু তালিব;

৩. বাংলার ফকীর বিদ্রোহ: চৌধুরী শামসুর রহমান (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত)।

www.nagorikpathagar.org

মুহম্মদ মনসুরউদ্‌দৌলাহ্ পাহ্‌লোয়ান

তিতুমীরের সংগ্রাম

"আযাদী সংগ্রামে প্রথম শহীদের গৌরব তিতুমীরের, অন্য কারও নয়", এ মন্তব্যটি করেছেন প্রখ্যাত গবেষক বিচারপতি আবদুল মওদুদ তাঁর "মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর" গ্রন্থে। মর্দে মুজাহিদ তিতুমীর সম্পর্কে তাঁর এ মন্তব্য যথার্থ। বাংলার শ্যামল মাটির এই অকুতোভয় যুবক হিন্দের ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবী (র.)-এর চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল উন্মোচন করার লক্ষ্যে চব্বিশ পরগনা জেলার নিভৃত এক পল্লীতে জিহাদের ডাক দেন। তাঁর ডাকে সাড়া দেন সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণীভুক্ত চাষী, মজুর, তাঁতী ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত মেহনতী মানুষ।

তিতুমীরের সংগ্রামকে সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য তৎকালীন বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ কিছুটা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। ১৭৫৭ সালে ইংরেজরা বাংলায় প্রভুত্ব বিস্তারের এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করে। সিরাজউদ্দৌলার এই পতন শুধু বিশ্বাসঘাতকতায় সংঘটিত হয়নি। পুঁজিপতিদের হাতে সিরাজউদ্দৌলার এ পতন ছিল অনিবার্য। সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে বাঙলার মুসলমান সম্ভ্রান্ত শ্রেণী, হিন্দু ব্যবসায়ী, মহাজন ও জমিদার শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষমতা হারালো। ইংরেজদের সহায়তায় নব্য পুঁজিপতি হিন্দু শ্রেণী ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠলো। মীরজাফরের নবাবীর সুযোগ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যারা কোম্পানিতে মুন্সী, মুৎসুদ্দী, দোভাষী বা গোমস্তার চাকরি করতো তারাই লাভবান হলো। আর এ শ্রেণীর বেশির ভাগই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা স্বদেশী মুসলমান নবাবের স্থলে বিদেশী ইংরেজের প্রভুত্ব মেনে নিতে কুণ্ঠিত হলো না। ১৭৭৪ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় ঐ অঞ্চলের মহাজন, দালাল মুৎসুদ্দীদের বিশেষ সুবিধা হয়। মুর্শিদাবাদের প্রাধান্য বক্সারের যুদ্ধে মীরকাসেমের পরাজয়ের সাথেই শেষ হয়ে যায়, আর সেই সাথে বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের ভূমিকাও স্তিমিত হয়ে আসে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে বাংলায় একটি নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এ নব্য জমিদার শ্রেণীর প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এ নব্য জমিদার বা 'বাবু শ্রেণী' নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে ব্রিটিশের পদলেহন করার কাজে নিয়োজিত হলো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশে দুটো পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর সৃষ্টি করে। একটি এ বন্দোবস্তে উপকৃত জমিদার শ্রেণীর অপরটি উৎপীড়িত ও বঞ্চিত কৃষক শ্রেণী।

সরকারি চাকরি, আইন ব্যবসায় প্রভৃতিতে মোগল আমলে মুসলমানদের যে কর্তৃত্ব ছিল ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ফারসীর বদলে ইংরেজি ভাষা সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষিত হওয়ায় তাদের সে কর্তৃত্বে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলো: ধীরে ধীরে তারা আইন ব্যবসায় ও সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘু শ্রেণীতে পরিণত হলো। ইতিমধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যেই Resumption Proceedings- এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের নিষ্কর জমিগুলো দখল করে নেয়ায় বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় আরও অধিক

www.nagorikpathagar.org

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোগল আমলে মুসলমানদের হাতে তমগা, আইমা, মদদ-ই-মাশ ও অন্যান্য নামে যেসব নিষ্কর বা লাখেরাজ জমি দান করা হয়েছিল, কলমের এক খোঁচায় তা বাতিল করে দেয়া হল।

এ সময় মুসলমান অভিজাত শ্রেণী দরিদ্র হয়ে পড়ায় তারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে অপারগ হয়ে পড়ে। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ব্যাপক বিতৃষ্ণা মুসলমানদের কোনদিনই ছিল না। এমন কি তথাকথিত ভারতীয় ওহাবী নেতৃবৃন্দও সবাই ইংরেজি শিক্ষাকে হারাম বা অবৈধ মনে করতেন না। শাহ আবদুল আজিজ ভারতকে ব্রিটিশ কবলিত দেশ মনে করলেও ইংরেজি শেখাকে অবৈধ বলে মনে করতেন না। ফরসীর স্থলে ইংরেজির সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করায় হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন অসুবিধা হয়নি। তারা বিদেশী ফারসীর পরিবর্তে বিদেশী এবং উন্নত ইংরেজি ভাষা শিখে বরং লাভবান হলো। ফারসী ভাষার প্রধান্য লুপ্ত হবার প্রাক্কালে হিন্দু অভিজাত শ্রেণী খুবই আনন্দ প্রকাশ করে, কেননা এর ফলে মুসলমান বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সরকারি চাকরি ও আইন ব্যবসায়ে তাদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না বলে তারা মনে করলো। ১৮৩১ সালের ১৮ নভেম্বর 'সমাচার দর্পণ' প্রত্রিকায় ফারসী ভাষা অবলুপ্তি আইন ঘোষিত হওয়ার পরে উল্লাস প্রকাশ করে বলা হয়: "প্রথম এবং প্রধান কথা হইতেছে যবনদের ঔদ্ধত্য ধূলিসাৎ করিবার সুযোগ এইবার আসিয়াছে, এখন আমাদের সামনে অনেক উজ্জ্বল আশা। বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হইবার সংগে সংগে মুসলমানরা লুপ্ত হইয়া যাইবে। কেননা তাহারা বাংলা পড়িতে বা লিখিতে এখনও সক্ষম নয়, কোনদিন হইবেও না।"

বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুর ন্যায় ইংরেজি শিখে তাদের সমকক্ষ হতে পারতো। কিন্তু ব্রিটিশ মিশনারীদের খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারকে তারা সন্দেহের চোখে দেখে। ইংরেজির প্রবর্তন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাপার বলে বিবেচিত হলে মুসলমানরাও এ শিক্ষা থেকে পিছিয়ে থাকতো না। তাছাড়া রিজাম্পশন প্রসিডিং-এর দ্বারা ও ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে বাংলার তাঁত শিল্প ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থাও ইতিমধ্যেই শোচনীয় হয়ে পড়ে। তারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই হারিয়ে ফেলে।

খ্রিস্টান মিশনারীদের আক্রমণ থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার জন্য রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ সালের দিকে ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেন। হিন্দু ধর্মের কিছু সংস্কার সাধন করে একেশ্বরবাদী বর্ণহীন সমাজ গঠনের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের ন্যায় উপবীত ধারণ করেন, এমন কি ১৮৩০ সালে বিলাত যাত্রার সময় তাঁর সাথে ব্রাহ্মণ পাচক ও দুটি দুগ্ধবতী গাভীও নিয়ে যান। তিনি হিন্দু ধর্মের বিলোপ কামনা করেননি। তাঁর সংস্কার আন্দোলন ছিল মূলত প্রতিরক্ষামূলক, হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী তো ছিলই না, বরং ব্রিটিশদের বদৌলতেই তিনি চল্লিশ টাকার চাকরিতে জীবন শুরু করে বিরাট জমিদারী গঠন করেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের স্থায়িত্ব কামনা করে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন ঠাকুর প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়ে ১৮২৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন এবং ইংরেজদের

www.nagorikpathagar.org

অধিক সংখ্যায় এদেশে এসে বসবাস ও উপনিবেশ স্থাপনের জন্য আইনগত অনুমতি প্রদানেরও তিনি আবেদন জানান। তিনি নীলকর সাহেবদেরও সমর্থন করেন এবং নিজস্ব ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দেশে লবণ উৎপাদন বন্ধ করে বিলাত থেকে লবণ আমদানির সুপারিশ করেন।

ব্রাহ্ম সমাজ, হিন্দুমেলা ও ইয়ং বেঙ্গলের পাশাপাশি হিন্দু পুনরুত্থান আন্দোলন এ যুগের বাঙালি হিন্দুদের অধিক প্রভাবিত করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজ কোম্পানির বাঙালি কর্মচারীবৃন্দ–যাদের অনেকেই পরে জমিদারী লাভ করেছিল, শ্রেণী হিসেবে তারা ছিল ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং তাদের ছিল বিস্তর অবসর। এই অবসরে তারা বাঙলা সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চার অন্যান্য শাখায় মনোনিবেশ করে। তাদের এই সাহিত্য সাধনা ছিল কোলকাতাকেন্দ্রিক। ফলে কোলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কথ্যভাষা নবগঠিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্টান্ডার্ড ভাষা হিসেবে চালু হয়ে গেল। পূর্ব বঙ্গবাসী বাঙালি, যাদের পশ্চিম বঙ্গীয়রা নিম্নশ্রেণীভুক্ত "বাঙাল" বলে ব্যঙ্গ করতো, তারা এ সাহিত্যাঙ্গন থেকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য হলো। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নতুন করে আর এক ষড়যন্ত্র শুরু হয়। সংস্কৃত পণ্ডিতদের সহায়তায় দীর্ঘদিন থেকে বহুল ব্যবহৃত আরবি, ফারসী শব্দ বর্জন করে জবরদস্তি করে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে এক শুদ্ধি অভিযান চালানো হয়। শাহ গরীবুল্লাহ্ ও অন্যান্য মুসলমান লেখকের রচনার ধারাকে 'দোভাষী পুঁথি' আখ্যায়িত করে মুসলমানের দৈনন্দিন ব্যবহৃত আরবি-ফারসী শব্দসমূহকে সাহিত্যের ভাষা থেকে নির্বাসন দেয়া হয়। এই সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রের ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুসলমানেরা সাহিত্য চর্চা থেকে পিছিয়ে থাকে।

বাঙালি হিন্দুদের একাংশ যে যুগে সর্বভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং ধর্মকে দেশাত্মবোধের প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়ে সমাজ সংস্কারের কাজে মনযোগ দেয়, সে যুগে বাংলার মুসলমান উত্তর ভারতীয় মুসলমান সংস্কারকদের আহ্বানে ইসলাম ধর্মের পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। উত্তর ভারতে শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ ও তাঁর পুত্র শাহ আবদুল আযীয ভারতীয় ইসলামের চর্চায় প্রবিষ্ট হিন্দু আচার-আচরণ ও অন্যান্য কুসংস্কার দূরীকরণের এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। শাহ আবদুল আযীযের শিষ্য সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী বাংলাদেশ, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের সনাতন ইসলামে ফিরে যাবার আহবান জানিয়ে যে আন্দোলন গড়ে তোলেন বাংলার মুসলমানদের উপর তার সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়েছিল এবং সে প্রভাব এখনও বিদ্যমান। তাঁর এ আন্দোলন মূলত অসাম্প্রদায়িক হলেও হিন্দুয়ানী আচার-আচরণ, যেমন পীরপূজা, কবরে সৌধ নির্মাণ, কবরে মানত করা, দূর্গা পূজার অনুকরণে মুহররমের তাজিয়া নির্মাণ, বিধবা বিবাহে অনীহা ও অন্যান্য অনৈসলামী আচারের বিরোধিতা করায় পরোক্ষভাবে এ আন্দোলন হিন্দুবিরোধী মুসীলম পুনরুত্থানের রূপ গ্রহণ করে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে শিখনেতা রণজিৎ সিংহের মুসলিম বিদ্বেষী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে

www.nagorikpathagar.org

সাহয়েদ আহমদ বাংলা ও বিহার থেকে বহু মুসলমান স্বেচ্ছাসেবী পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রেরণ করেন। তাঁর এ কাজে বাংলার অনেক মুসলমান সংস্কারক সাহায্য করেন এবং বহু বাঙালি মুসলমান পায়ে হেঁটে পাঞ্জাব ও সীমান্তে গিয়ে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৩১ সালে বালাকোট নামক স্থানে সাইয়েদ আহমদ শহীদ হওয়ার পরেও পাঞ্জাবে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর তাঁর অনুসারীরা ইংরেজবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ ভারতীয় মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য এ আন্দোলনকে 'ওহাবী আন্দোলন' বলে আখ্যায়িত করে। বাংলার হিন্দু ভদ্রলোক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথাকথিত ওহাবী আন্দোলন দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা বাংলাদেশে সাইয়েদ আহমদের সমর্থকরা ছিল নিম্নবিত্ত শ্রেণীভুক্ত কৃষক ও তাঁত সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে বাংলার তাঁত শিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তাঁতী সম্প্রদায় পথে বসে। বাংলার তাঁতীদের প্রায় সবাই ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই তথাকথিত ওহাবী আন্দোলনের প্রতি এই শ্রেণী একটু বেশি আকৃষ্ট হয়। আন্দোলন ছিল পরোক্ষভাবে ব্রিটিশবিরোধী ও প্রত্যক্ষভাবে জমিদার মহাজন তথা ভদ্রলোক, বাবু শ্রেণীবিরোধী কৃষক-শ্রমিকের সংগ্রাম। এই আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষক ও তাঁতীদের দাবী আদায়ের জন্য ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর পুত্র মুহসিনউদ্দীন দুদু মিয়া 'ফরায়েজী আন্দোলন' শুরু করেন। এই আন্দোলনও ছিল জমিদার ও ব্রিটিশ সরকারবিরোধী।

উনিশ শতকে বাংলাদেশে তিনজন মহাপ্রাণ মুসলমান সমাজসংস্কারক সমাজ সংস্কার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের নাম শহীদ তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ও মাওলানা কেরামত আলী। নিরক্ষর পল্লীবাসী কৃষক ও তাঁতীদের মধ্যেই তাঁরা কাজ করেছিলেন বেশি করে। তিতুমীরের কর্মক্ষেত্র ছিল চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, যশোর ও ফরিদপুরে এবং অন্য দু'জনের সারা পূর্ব বাংলায়।

বাংলার মুসলমান যখন ইসলাম বিরুদ্ধ প্রথা ও অনুষ্ঠানের অনুসারী হয়ে বিপথগামী হয়ে পড়েছিল তখন হাজী শরীয়তুল্লাহ সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রধান শিক্ষা ছিল মুসলমানদের 'ফরয' কাজের অনুসারী করা। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দুদুমিয়া ওরফে মুহম্মদ মুহসিনউদ্দীন পিতার আরব্ধ কাজ বলিষ্ঠভাবে প্রসারিত করেন। তাঁর প্রাথমিক আন্দোলন ছিল অর্থনৈতিক অত্যাচারী জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের বিরুদ্ধে। হিন্দু জমিদার ও নীলকররা তাঁর অনুগামী মুসলমান কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাতো দরিদ্র কৃষকদের দাড়িতে দাড়িতে বেঁধে নাকে মরিচের গুঁড়া দেয়া হতো। দাড়ি রাখার জন্য ও বিয়ে-খৎনা উৎসবকালে কর দিতে হতো। মুসলমান রায়তকে কালী, সরস্বতী প্রভৃতি পূজা উপলক্ষে চাঁদা দিতে বাধ্য করা হতো। এমন কি গো-হত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। দুদুমিয়া এসব অবমাননাকর খাজনা দেয়া বন্ধ করার আহবান জানান। তিনি আরও শিক্ষা দেন, "লাঙল যার জমি তার", জমিন আল্লাহ্‌র অফুরন্ত দান এবং যে কেউ জমি চাষ করে ফসল ফলাতে পারে বিনা বাধায় ও বিনা খাজনায়। তিনি খাস মহলের জমি দখল করার নির্দেশ দেন শিষ্যদের এবং এ থেকেই সরকারের সংগে বিরোধ বাধে। ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত ছয়বার তাঁকে নানা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে কারারুদ্ধ করা হয়। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাঁর অপরাধ প্রমাণিত হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

তিতুমীরের ভূমিকা ছিল প্রধানত সশস্ত্র বিদ্রোহের। কিন্তু এ বিদ্রোহের পটভূমি ছিল ধর্মীয় সংস্কার। মুহসিনউদ্দীন আহমদ (দুদুমিয়া)-এর মতো তিনিও মক্কায় যান এবং সেখানে বসবাস কালে আবদুল ওয়াহাবের অনুসারীদের সংস্রবে আসেন। দেশে প্রত্যাগমন করে প্রথমে তিনি সংস্কার কর্মে আত্মনিয়োগ করেন এবং শিষ্যদের দাড়ি রাখতে ও ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। তিনি রায়তদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট হাজী শরীয়তুল্লাহ বা তাঁর সুযোগ্য পুত্র দুদুমিয়ার মতো প্রত্যক্ষ করে গভীর বেদনা অনুভব করেন এবং জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণরায় যখন দাড়ি রাখার জন্য জন প্রতি আড়াই টাকা কর ধার্য করেন, তখন তার সংগে তিতুমীরের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাধে। সে বিরোধ পরে নীলকরদের ও সরকারের সংগে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পরিণত হয়। তাঁর শিষ্যদের বলা হতো মওলবী ও হিদায়েতী।

এই বঙ্গ-শার্দুল তিতুমীর সম্পর্কে আমরা কয়েকটি সূত্র থেকে তথ্যাবলী জানতে পারি। প্রথমত ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীরের বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক অভিযান সম্পর্কিত সরকারি দলিলপত্র থেকে। দ্বিতীয়ত, একজন মুসলমান লেখকের "নারকেলবাড়িয়ার জঙ্গ" নামক পুঁথি থেকে। পুঁথিটি ১৮৫৩-৫৪ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে অবশ্য এই মূল্যবান পুঁথিটির সন্ধান পাওয়া যায় না। রেভারেন্ড টি. লঙ পুঁথিটির কথা উল্লেখ করেছেন। তৃতীয়ত, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জাফর আলী নদভীর "তারিখ ই আহমদী" নামক গবেষণা পত্র থেকে, যা ১৮৫৫ সালে লিখিত হয়। পরবর্তীকালে বিহারীলাল সরকার ও আবদুল গফুর সিদ্দিকী তিতুমীরের সংগ্রাম সম্পর্কে পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইদানীং ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিক, ডক্টর মুহম্মদ আবদুল বারী এবং ডক্টর মুয়ীন উদ্দীন আহমদ খান তিতুমীর সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ করে, তাঁর চরিত্রের সততা এবং আদর্শের দৃঢ়তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবুও তিতুমীরের জীবনী সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ রয়েছে বলে আমরা মনে করি। ডক্টর মুয়ীন উদ্দীন আহমদ খান ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মরহুম মোমতাজ হাসানের সহায়তায় লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে কিছু মূল্যবান দলিলপত্র সংগ্রহ করেন। Titumir and His Followers নামে দলিলপত্রগুলি জনাব মুয়ীন উদ্দীন আহমদ খানের সম্পাদনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলার চান্দপুর গ্রামে মীর নিসার আলী জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে মীর নিসার আলী 'তিতুমীর' নামেই খ্যাতি অর্জন করেন। আবদুল গফুর সিদ্দিকীর মতে শৈশবে তার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। জ্ঞান অর্জনের সংগে সংগে তিতুমীর স্থানীয় একটি আখড়াতে নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। কুস্তিতে তিতুমীর পরবর্তীকালে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীর হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কা শরীফে গমন করেন। হান্টার উল্লেখ করেছেন, While he was at Mecca, he met Saiyyid Ahmed Shahid of Rai Barily and became his disciple. মক্কায় অবস্থানকালে তিনি সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী পরিচালিত 'তরিকায়ে

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মদীয়া' আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিতুমীর একজন খালেস মুবাল্লিগের মতো সত্যিকার ইসলামের শিক্ষা প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিতুমীর তাঁর অনুসারীদের ইসলামের বিধান মতো দাড়ি রাখতে আদেশ করেন। তাঁর অনুসারীগণ হিন্দুদের অনুকরণে ধুতি পরিধান করতেন না। পোশাকের বিশেষত্ব ও দাড়ির মাধ্যমে সহজেই তার অনুসারীদের চিহ্নিত করা যেতো। হিন্দুদের দেখাদেখি অজ্ঞতাপ্রসূত যে সমস্ত আচরণ মুসলমানগণ গ্রহণ করেছেন, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি অনুসারীদের আহ্বান জানান। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত ভূমির চিরস্থায়ী মালিকানা পদ্ধতি, এ দেশের লক্ষ লক্ষ প্রজাকে ভূমিহীনে রূপান্তরিত করেছিল, যা ছিল মুঘল যুগের বন্দোবস্তী প্রথার বিপরীত এবং অনৈসলামিক। তিতুমীর এই পদ্ধতির ফলে সৃষ্ট প্রজাদের অবর্ণনীয় দুঃখে মর্মজ্বালা অনুভব করেন। তিনি প্রচার করেন, আল্লাহ্‌র দেয়া জমিনে আল্লাহ্‌র ফরমান মুতাবিক শাসন ব্যবস্থা না থাকায়, ভূমির মালিকানা লুণ্ঠন করা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেকেই তার পরিশ্রমের ফসল ভোগ করার পূর্ণ অধিকারী। পরবর্তীকালে দুদুমিয়া আরও খোলাসাভাবে তিতুমীরের বক্তব্যের অনুসরণে ঘোষণা করেন "লাঙল যার জমি তার"।

তিতুমীরের মুবাল্লিগ জীবন অতি দ্রুত সংকটের সম্মুখীন হয়। যে সমস্ত জমিদার তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ষড়যন্ত্র করে তাদের কয়েকজনের পরিচিতি উল্লেখ করা হলো:

১. লাটুবাবু (কলিকাতা)
২. কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (গোবরডাঙ্গা)
৩. দেবনাথ রায় (গোবরা গোবিন্দপুর)
৪. নুর নগরের জমিদারের ম্যানেজার
৫. ঢাকার জমিদারের সদর নায়েব
৬. রাণাঘাটের জমিদারের ম্যানেজার
৭. কৃষ্ণ দেব রায় (পুঁড়া)
৮. রায় রাম চক্রবর্তী (বশিরহাট থানার দারোগা)
৯. দূর্গাচরণ চন্দ্র চৌধুরী (যদুর আটি)

উল্লিখিত জমিদার ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকার নীলকুঠির সাহেবরাও এই ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যোগায়। জমিদাররা দাড়ির উপর আরোপিত কর আদায়ের নামে তিতুমীরের সহচরদের উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালাতে থাকে। এক পর্যায়ে নামায পড়া অবস্থায় সমস্ত মুসল্লীসহ তিতুমীরের অনুসারীদের নির্মিত মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়। অনেক সহচরকে দৈহিক নির্যাতন করে তিতুমীরের সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য বাধ্য করে। তিতুমীর মসজিদে আগুন দেয়ার বিরুদ্ধে কোর্টে বিচার প্রার্থনা করেন। কিন্তু বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তিতুমীর আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কাল করে, এই যুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সংকল্প গ্রহণ করেন। স্থানীয় জমিদার ও নীলকর সাহেবরা তিতুমীরের আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য একের পর এক মিথ্যার আশ্রয় নিতে শুরু

www.nagorikpathagar.org

করে। পরবর্তীকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে একদল গোরা সৈন্য নারকেলবাড়িয়া আক্রমণ করে। তিতুমীর ও তাঁর সহচরেরা বাঁশের লাঠিকে সম্বল করে হক প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। গোলার আঘাতে তিতুমীর শাহাদত বরণ করেন। সিপাহসালার মাসুম খাঁকে বিচারের প্রহসন করে ফাঁসী দেয়া হয় এবং একশত চল্লিশজনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। হিন্দু জমিদার ও নীলকর সাহেবরাই শুধু নয়, তৎকালীন হিন্দু সম্প্রদায় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলোতেও তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, দুদুমিয়া ও অন্যান্য মুসলিম সংস্কারকদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ করা হতো। "ব্রাহ্মনিকাল ম্যাগাজিন", "সমাচার চন্দ্রিকা", "সংবাদ কৌমুদী", "সংবাদ প্রভাকর" প্রভৃতি পত্রিকায় মুসলিম বিদ্বেষ ও ইংরেজের গুণকীর্তন ছিল অন্যতম প্রধান বিষয়। উল্লেখ করা যেতে পারে সিপাহী বিদ্রোহকালে কবি ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকায় এ বিদ্রোহের জন্য যবনদের (মুসলমান) মূলত দায়ী করে বাঙালিদের (হিন্দুদের) ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করার পরামর্শ দেন।

তিতুমীর সম্পর্কে জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলম মন্তব্য করেন: "With the initiative and leadership of Titumir, it took the shape of a mass movement, which latterly produced indigo rebellion and the peasant movement of Bengal. The undercurring protesting and revolting spirit produced a threatening and agitational politics and massleadership, such as was visible under Dudu Miyan and A.K Fazlul Haq. It also gave birth to the political elan of the people's force which eventually galvanized the Muslim social force in Bengal and prepared the grounds for the freedom struggle in 1940-1947 and the liberation struggle in 1971. ডক্টর মুয়ীন উদ্দীন আহমদ খান "Titumir and His Followers" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "There is reason to believe that it was the self-same spirit begotten of the self-same grievences which gave birth to the mass leadership of A. K. Fazlul Haq, Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani and Sheikh Mujibur Rahman in course of the 20th century A.D. In a word, there are good grounds to believe that the political process of the mass protest of the 19th century eventually produced the political elan of the people's force in the 20th century eventually produced the political elan of the people's force in the 20th century, which, however, the lethargic, English education oriented, Middle-class muslim Leadership of Bengal, failed to adquately understand.

সাইয়েদ আহমদ ও শরীয়তুল্লাহর মতবাদ উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের নিকট সম্পূর্ণভাবে গ্রহণীয় হয়নি। কেননা নিম্নশেণীর কৃষক-তাঁতীদের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম তাদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের পরে তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া ও ফরায়জী আন্দোলন ব্রিটিশবিরোধী গোপন কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলেও বাংলার মুসলমান সমাজের

www.nagorikpathagar.org

"আশরাফ" শ্রেণী বা সম্ভ্রান্ত শ্রেণী মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখের শান্তিকামী সংস্কার আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কারামত আলী ও ফরায়জীদের মাঝে এক সময় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ব্রিটিশ-ভারতে ঈদ ও জুমার নামাযের সার্থকতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয় এবং বাংলার মুসলমান জনগণ কারামত আলী পন্থী ও ফরায়জী পন্থীতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে ফরায়জীদের জনপ্রিয়তা কমতে আরম্ভ করে এবং শান্তিকামী সংস্কারক কারামত আলী ও তাঁর বংশধরদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। পরে তাঁরা রাজনীতির প্রতি অনীহা প্রকাশ করে ধর্মসংস্কার ও "পীরমুরীদ" প্রথার প্রতিও অধিক জোর দেয়া শুরু করেন। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা ও ১৮৭০-এর পরে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নীতির পরিবর্তনের ফলে বাঙালি মুসলমানেরা শান্তিকামী সংস্কারকদের দলে ভিড়তে আরম্ভ করে। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও অন্যান্য মুসলিমবিদ্বেষী সাহিত্যিকদের রচনার ফলে বাঙলার মুসলমান ইংরেজদের সহযোগিতার মাঝে নিরাপত্তা খুঁজে পায়। ইতিমধ্যে সরকারি চাকরির সীমাবদ্ধতা ইংরেজিনবিশ বাঙালি হিন্দুদের নৈরাশ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায় করার সংগ্রামের দিকে ঝুঁকতে আরম্ভ করে।

পরিশেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, যদিও তিতুমীরের সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী কিংবা দেশব্যাপী ছিল না তবুও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিতুমীরের সংগ্রাম উজ্জ্বল মাইল-ফলক হিসেবে উদ্ভাসিত। সোনার চামচ মুখে নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করেনি কিংবা গজদন্ত মিনার চূড়ে যাদের আবাস নয়, সেই সব নিরন্ন নিরক্ষর মেহনতী মানুষকে তিনি সংগঠিত করে তাঁদের আত্মশক্তি জাগ্রত করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এখানেই তিতুমীরের সার্থকতা। ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তিনি ফরাসী কিংবা ওলন্দাজদের সহায়তা কামনা করেননি। তিতুমীরের মুজাহিদ বাহিনীতে কিছুটা ক্ষীণ হলেও বখতিয়ারের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া যায়। তিনি যে পথ রচনা করেন সে পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তী মহানায়কগণ। জনগণের ইচ্ছাশক্তির নিকট কামান-বন্দুকের শক্তি পদানত হতে বাধ্য, আধুনিক যুগের এই বিশ্বাস উপমহাদেশে তিনি প্রথম অনুধাবন করেন। আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এখনও ঔপনিবেশিক আমলের অনেক আইন-কানুন অপরিবর্তিত রয়েগেছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, আজও প্রকৃত চাষী ভূমির মালিকানা ফিরে পায়নি।

পৃথিবীর দেশে দেশে অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে মেহনতী মানুষের মিছিলে যখন বজ্রমুষ্ঠি উত্তোলিত দেখি তখনই তিতুমীরের কথা আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হয়। শুধু তাই নয়, পরাশক্তির দর্প-দাপটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলি যখন মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না, সেই সময় আর্যাবর্তের একটি দেশে সাধারণ মানুষের মিছিলে আমরা তিতুমীরের পদচারণা লক্ষ্য করি।

www.nagorikpathagar.org

অধ্যাপক মোঃ মোজাম্মেল হক

ফারায়েজী আন্দোলন

পটভূমি

মুঘল শাসক আওরঙ্গজেব-আলমগীরের ইন্তেকালের পর ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল তথা মুসলিম রাজশক্তি দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এমনি এক পরিবেশে ১৭৫৭ সনের ২৩ জুন পলাশীর মাঠে বাংলার শাসনকর্তা নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার সাথে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বাধীনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর তথাকথিত যুদ্ধে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলে একদিকে যেমন ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ সুগম হয় এবং ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সুদীর্ঘ সময়ের জন্য তাদের পদানত হয়ে পড়ে, অন্যদিকে প্রথম পর্যায়ে বাংলার এবং পরবর্তীকালে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের জীবনে নেমে আসে চরম দুর্দিন।

পলাশীর মাঠে তথাকথিত যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর পরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রধানত দুটি দিকে মনোযোগ দেয়: ১. ক্ষমতা সুসংহত করণ ও ২. ব্যবসায় ক্ষেত্রে বেশি বেশি সুযোগ-সুবিধা অর্জন তথা অর্থনৈতিকভাবে শোষণের নীলনক্শা প্রণয়ন। এ অবস্থা দেখে এবং এর চেয়েও সহস্র গুণ দুর্বিষহ অবস্থার আশঙ্কা করে ১৭৬৪ সনে অর্থাৎ স্বাধীনতা হারানোর ঠিক অষ্টম বছরে নওয়াব মীর কাসেম এই অবস্থার প্রতিকার এবং হারানো স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। কোম্পানি তথা ইংরেজ শক্তি তখন বুঝতে পারে, ক্ষমতা কুক্ষিগত রেখে ফায়দা লুটতে হলে কাদের সাথে কি আচরণ করতে হবে। ঠিক এর এক বছর পর ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানী লাভ করলে বিশেষভাবে মুসলমানদের উপর এবং সাধারণভাবে বাংলার গণ-মানুষের উপর শুরু হয় চরম নির্যাতন ও নিপীড়ন। কোম্পানির ইংরেজরা শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেই ক্ষান্ত থাকলো না। তারা সাংঘাতিক অর্থ-লিপ্সা দেখাতে থাকে এবং এদেশের সাধারণ মানুষকে শোষণের নানারকম ফন্দি-ফিকির করতে থাকে।

এই পরিবর্তনের ফলে অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, বাংলার যে সব মুসলমান এতদিন পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল তারা রাতারাতি হয়ে পড়লো শাসিত—পরাধীন। নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এক কথায় তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব প্রকট হয়ে দেখা দিলো। নতুন শাসকরা হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতি দ্বি-মুখী নীতি গ্রহণ করলো। সব গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে মুসলমানদের সরিয়ে দেয়া হলো। কয়েক বছর আগেও যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন এবং সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন তাঁদের আইনগত ও রাজনৈতিক মর্যাদা কেড়ে নেয়া হলো। লাখেরাজ ও আয়েমা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হলো। নিপীড়নমূলক আইন, অবৈধ ট্যাক্স এবং নানা প্রকার বাধ্যবাধকতার জটাজালে আটকিয়ে তাঁদের উপর দারিদ্র চাপিয়ে দেয়া হলো। ক্ষমতা হাতে পাওয়ার সাথে সাথে ইংরেজরা রাতারাতি সরকারী নীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করে এবং সেনাবাহিনী থেকে মুসলমান সৈন্যদের ছাঁটাই ও বহিষ্কার

www.nagorikpathagar.org

করে। ১৭৫৭ সন থেকে ১৭৬৫ সন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শুধু সামরিক বাহিনী থেকেই আশি হাজার মুসলমানকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। ১৭৯৩ সনে গ্রাম্য পুলিশ ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করা হলে অসংখ্য মুসলমান কর্মহীন হয়ে যায় এবং শুধু দু'বেলা খাবারের জন্যই তারা অন্যদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এভাবে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক পদসমূহ নিজেদের কুক্ষিগত করে ফেলে। এরপর ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনযুগ অর্থাৎ ১৭৭২ থেকে ১৭৯৩ সন পর্যন্ত সময়কালে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং ১৭৯৩ সনে লর্ড কর্নওয়ালিশের সময়ে যে ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা চালু করা হয় তাতে মুসলমানদের আর্থিক মেরুদণ্ড একেবারেই ভেঙে যায়। এ ছিলো উচ্চ শ্রেণীর ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সচ্ছল মুসলমানদের অবস্থা।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, সাধারণ মুসলমানদেরকেও পঙ্গু করে দেয়ার জন্য ইংরেজ শাসকগণ ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সুতরাং যেসব মুসলমানের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় ছিলো কৃষি কাজ কিংবা বস্ত্র বয়ন শিল্প, তাদেরকেও দরিদ্রে পরিণত করার সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হয়। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মুসলমানদের নিকট থেকে ভূমি কেড়ে নিয়ে তা হিন্দু জমিদারদের দিয়ে দেয়া হয়। সম্ভাব্য সকল পন্থায় মুসলমানদের শোষণ করার অনুমতি এসব হিন্দু জমিদারের ছিলো। এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তারা মুসলমানদের উপর বৈধ অবৈধ নানা প্রকার ট্যাক্স ধার্য করে। কত বিচিত্র ও জঘন্য ধরনের ট্যাক্স ধার্য করা হতো, তা দাড়ির উপর ট্যাক্স ধার্য করা থেকেই অনুমান করা যায়। ১৭৬৫ থেকে ১৮২০ সন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভূমি বন্দোবস্ত ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করা হতো, আর যাই হোক না কেন, তাতে মুসলমানদের বিপাকে ফেলার ব্যবস্থা পুরোপুরিই থাকতো। তাই কখনো পাঁচসালা, কখনও দশসালা এবং সবশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করা হয়। এ ছাড়া ছিলো সূর্যাস্ত আইন, ওয়াক্ফ বিলোপ ইত্যাদি ব্যবস্থা। এসব ব্যবস্থাও শোষণের নানা ফন্দি-ফিকির বাস্তবায়ন ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

এভাবে মুসলমান জমিদারদের স্থলে তাদের নায়েব-গোমস্তা জমিদার হয়ে বসলো। হিন্দুদের উপর পড়লো খাজনা আদায়ের ভার। জমিদার ও তহশীলদারদের শোষণ ও পীড়নে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মুসলমানদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। ১৭৭৪ সনের ৭ জানুয়ারি মালদহের প্রধান কর্মচারী জর্জ গ্রে যা লিখেছিলেন, রাম গোপাল তার 'How the British Occupied Bengal' গ্রন্থে ভ্যান্সিটার্টের পুস্তক থেকে এভাবে উদ্ধৃত করেছেন: কলকাতার রাস্তায় যারা ছেঁড়া কাপড় পড়ে ঘুরে বেড়াত, তারাই এখানে দেশের রাজা হয়ে বসেছে। এরা রায়ত ও ব্যবসায়ীদের ধরে জেলে পুরেছে এবং ফৌজদার ও অফিসারদের সাথে নির্বিচার ব্যবহার ও অভদ্র আচরণ করেছে।

১৭৯২ সন পর্যন্ত একটা আইন চালু ছিল, যার ভিত্তিতে সমাজ-দুশমন ও দুষ্কৃতকারীকে দুষ্কর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জমিদারকে দায়ী করা হতো। এসব দুষ্কৃতিকারী দমনের দায়িত্ব ছিলো জমিদারদের। সুতরাং কোন এলাকায় কোন চুরি বা ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হলে সেই চোরাই মাল উদ্ধার করা কিংবা ফিরিয়ে দেয়া ছিলো জমিদারদের কাজ। ফলে সমাজবিরোধী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাতে মাথাচাড়া দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

উঠতে না পারে সেজন্য জমিদারদের সদা তৎপর থাকতে ও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হতো। কিন্তু ১৭৯২ সনের পর এই আইন রহিত হয়ে গেলে চোর-ডাকাত, গুণ্ডা-পাণ্ডা ও সমাজ-বিরোধী চক্র জমিদারদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। এ সময় থেকে জমিদাররা এসব সমাজ-বিরোধী চক্রের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের ভার গ্রহণ করে। ১৮৪৪ সনের ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় এর কারণ উল্লেখ করে বলা হয়, চোর-ডাকাত ও গুণ্ডা-পাণ্ডাদের ভরণ-পোষণ ও আশ্রয় দান ছিলো জমিদারদের নিজস্ব স্বার্থে। এরা ছিলো এসব জমিদারদের অর্থোপার্জনের একটি সহায়ক শক্তি ও হাতিয়ার। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্টে ঢাকার জামালপুরের ম্যাজিস্ট্রেটও বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

এরপর ইংরেজরা এদেশের শিল্প ধ্বংসের দিকে মনোনিবেশ করে। বিশেষ করে এখানকার বস্ত্র শিল্প ধ্বংস করার জন্য তারা উঠেপড়ে লাগে। কে না জানে, ঢাকাই মসলিনের সুখ্যাতি ছিলো দুনিয়া জোড়া। এখানকার বস্ত্র শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য তারা যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার মধ্যে ইংল্যান্ড থেকে বিপুল পরিমাণ বস্ত্র আমদানি ছিলো অন্যতম। যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানে গড়ে উঠেছিলো নানা কৌশলে তার অধিকাংশই ইংরেজরা কব্জা করে ফেলে। এভাবে ইংরেজ ব্যবসায়ী ও গোমস্থা এবং হিন্দু দালালরা এদেশের তৎকালীন শিল্প কারখানার অধিকাংশ হস্তগত করে ফেললো। ফলে শিল্পাঙ্গন থেকেও মুসলমানরা বিতাড়িত হলো। পক্ষান্তরে যাদের হাতে এসব শিল্প-কারখানা ও ব্যবস্থাপনা চলে গেলো তারা এ শিল্পের যথাযথ যত্ন ও পোষকতা না করে বরং ধ্বংস সাধন করলো এবং ব্রিটেনে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি করে দিলো। ১৭৮৭ সনে শুধু ঢাকা থেকেই ৩০ লক্ষ টাকার মসলিন ইংল্যান্ডে রফতানি হয়েছিলো। সেখানে ১৮১৭ সনে তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এছাড়া ১৭৯৫ সনের পর ইংরেজরা বাংলার গ্রামাঞ্চলে নীল চাষের ব্যবস্থা করে এবং তা লাভজনক দেখে তারা এটিও নিজেদের কুক্ষিগত করে নিলো এবং পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে উনিশ শতকের শেষ দিকে এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্যে উন্নীত করলো। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন এলাকায় ইংরেজ মালিকানায় বড় বড় নীল কারখানা গড়ে উঠলো। বাংলার চাষীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তিমূলকভাবে নীল চাষের কথা সর্বজনবিদিত। লবণ ব্যবসায়ও যেহেতু মুসলমানদের হাতে ছিলো, তাই ১৮৬৬ সালে এর উপরও কর আরোপ করা হলো; যাতে লবণ উৎপাদন অলাভজনক হয়ে পড়ে এবং গোটা লবণ ব্যবসায় ইংরেজদের হস্তগত হয় সেজন্য প্রতিমণ লবণের উপর দুই টাকা করে কর ধার্য করা হয়। এভাবে পদে পদে মুসলমানদের আর্থিক কর্মকাণ্ডে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে কোনদিনই তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে না পারে।

ধর্মীয় অবস্থা

উপরিউক্ত রাজনৈতিক ও আর্থিক দুরবস্থা ছাড়া ও ধর্মীয় দিক থেকেও বাংলার মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে শিরক ও বিদ'আত অত্যন্ত দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিলো। সমাজ জীবনেও ছিলো শিরক, বিদ'আত এবং অ-ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপের ছড়াছড়ি। কারণ মুসলিম জনগণের অধিকাংশই পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত সব কিছুকেই বিনাবিচারে অনুসরণ ও অনুকরণ করতে বদ্ধপরিকর ছিলো। পূর্ব পুরুষের নিকট থেকে প্রাপ্ত শির্‌ক ও বিদ'আত ভিত্তিক

www.nagorikpathagar.org

আচার-অনুষ্ঠানকেই তারা দীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ তথা অবিকল দীনে ইসলাম বলে মনে করতেন। তাই কোন অবস্থাতেই তারা এসব ছাড়তে রাজি ছিলো না। এমনকি এ থেকে ভিন্নরূপে কোন কথা শুনতে বা বরদাশত করতেও তারা রাজি ছিলো না। তদানীন্তন বাংলার মুসলমানদের কাছে এরূপ আরো যেসব জিনিস পছন্দনীয় ও প্রিয় ছিলো তার মধ্যে এক ধরনের অন্ধ পীরপরস্তি ছিলো অন্যতম।

এখানে উল্লেখ্য যে, জেমস ওয়াইজের মতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় বেশরা (শরীয়তকে যারা অনুসরণ করে না) ও বা-শরা (শরীয়তকে যারা সঠিক অর্থে অনুসরণ করে) এই দু'ধরনের পীর বর্তমান ছিলো। পীরপরস্তির পরেই যে বিষয়টির কথা উল্লেখ করা যায় তা হলো পীরপরস্তি প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গড়ে ওঠা আচার-আচরণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মেলা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি। হিন্দুদের সাথে এবং অন্যান্য ধর্মের পাশাপাশি সুদীর্ঘকাল বসবাস এবং ওঠাবসার কারণে এ ধরনের অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। সাধারণ মুসলমানেরা এসব আচার-অনুষ্ঠান অতীব উৎসাহের সাথে পালন করতো। যেমন পাঁচ পীর, মানিক পীর, ঘোড়া ফকীর এবং মাদারী পীরের নামে মানত করা এবং তাদের উদ্দেশ্যে ফুলদান করা হতো। তেমনি খাজা খেজের, জিন্দাগাজী, পীর বদর, শেখ সাধু এবং আরো অনেক পীরের বাংলার ঘরে ঘরে জনপ্রিয়তা ছিলো। এর সাথে সাথে আরো কিছু আচার-অনুষ্ঠানও পালন করা হতো। যেমন, কোন কোন এলাকায় স্ত্রীলোকেরা বসন্ত রোগের পরিচালক শীতলাদেবীর পূজা করতো। শিশুদের রোগ নিবারণের জন্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই ওঝা ডেকে আনতো এবং এভাবে মনে করতো যে, এবার সে রোগ আক্রমণের হাত থেকে নিরাপদ হলো। কোন বাড়িতে শিশু জন্ম নিলে আঁতুড় ঘরের সামনে আগুন জ্বালানো হতো। আর এ আগুন সর্বক্ষণই জ্বালিয়ে রাখা হতো যাতে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ভূত-প্রেত কিংবা পাপাত্মাসমূহ আঁতুড় ঘরে প্রবেশ করে শিশুর ক্ষতি করতে না পারে। এ ধরনের বহুবিধ কুসংস্কার এবং শিরক-বিদ'আত ও অ-ইসলামী কার্যকলাপ মুসলমানদের পরিবার ও সমাজে বন্দোবস্ত পেয়ে বসেছিল।

বাংলার বুকে শিয়াদেরও বেশ প্রভাব ছিলো। মুর্শিদ কুলী খানের সময় থেকে পরবর্তীকালের বাংলার প্রত্যেক নওয়াবই ছিলেন শিয়া। তারা শিয়া আকীদা বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠান-এর ব্যাপারে সর্ব প্রযত্নে সহযোগিতা করেছেন। এসব অনুষ্ঠানের কোন কোনটি দ্বারা সাধারণ মুসলমানরা প্রভাবান্বিত হতো এবং এ কারণেই এখানকার অনেক সাধারণ অ-শিয়া মুসলমানও মুহাররমের তাজিয়া ও মিছিলে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করতো।

অবশেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, মুসলমান তার আত্মপরিচয় ভুলে যেতে বসলো। নামায আদায় ও রোযা আদায় বা পালনের কথা তারা ভুলতে বসলো। হজ্জ-যাকাত ছিলো তাদের একেবারেই অজানা। তারা পূজার চাঁদা দিতে এবং পূজায় অংশগ্রহণ না করলেও দর্শন করে নয়ন যুগল পরিতৃপ্ত করতে শুরু করলো। তারা গো-মড়কের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গোয়ালের দরজায় গোরক্ষণাথেব মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে গো-রক্ষার ব্যবস্থা করে। সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য মনসাদেবীর পূজা করে। ভিটা থেকে উচ্ছেদ না হওয়ার জন্য হিন্দুয়ানী কায়দায় প্রার্থনা করে। ইংরেজের শাসন যুগে এ ধরনের নানা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হলে ইসলাম যেন এখানে উৎখাত প্রায় হয়ে গেলো।

www.nagorikpathagar.org

বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা যখন এই, তখন মুসলমানদের দীন ও ঈমানকে রক্ষা করার জন্য হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র আবির্ভাব ঘটে। এই মহান মুজাহিদ ও বীর পুরুষের অবদান সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় কিছুটা তুলে ধরা দরকার।

হাজী শরীয়তুল্লাহ তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মাদারীপুরের শামাইল গ্রামে ১৭৮১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুল জলিল তালুকদার ছিলেন একজন সাধারণ মুসলমান। তাঁর তেমন কোন বিশেষ খ্যাতি বা পরিচিতি ছিলো না। তাঁর বয়স যখন আট বছর, তখন তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। ইতিপূর্বেই তাঁর মা ইন্তেকাল করেছিলেন। ফলে তিনি তাঁর চাচা আযীমুদ্দিনের পরিবারে লালিত-পালিত হন। অন্য কারো স্নেহ পিতার স্নেহের বিকল্প হতে পারে না। তাই চাচা তাঁকে স্নেহ-যত্নে লালন-পালন করলেও এক পর্যায়ে তাঁর প্রতি কিছুটা রূঢ় ব্যবহার করেন, যার ফলে তিনি মাত্র বার বছর বয়সে কলকাতায় চলে যান। সৌভাগ্যবশত কলকাতায় তিনি মাওলানা বাশারত আলী নামক একজন সুযোগ্য আলেমের সাক্ষাৎ লাভ করেন। মাওলানা সাহেব তাঁকে নিজের মকতবে ভর্তি করে নেন। এখান থেকে কুরআন শিক্ষা শেষ করে তিনি তাঁর উস্তাদ মাওলানা বাশারত আলীর পরামর্শে হুগলী জেলার অন্তর্গত ফুরফুরায় যান এবং দুই বছর পর্যন্ত সেখানে আরবী ও ফার্সী ভাষা অধ্যয়ন করেন। সেখান থেকে এদু'টি ভাষায় বেশ দক্ষতা লাভের পর তিনি মুর্শিদাবাদে তাঁর অন্য এক চাচা আশেক মিয়ার কাছে চলে যান এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে আরবী ও ফার্সী ভাষায় আরো দক্ষতা অর্জন করেন। কিন্তু একটি দুর্ঘটনায় তাঁর এ চাচার মৃত্যু হলে তিনি ভগ্ন-হৃদয়ে পুনরায় তাঁর ওস্তাদ মাওলানা বাশারত আলী সাহেবের কাছে কলকাতায় ফিরে আসেন। মাওলানা বাশারত আলী এই সময়ই ইংরেজদের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হয়ে ১৭৯৯ সনের দিকে মক্কায় হিজরত করেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌ও তাঁর সাথে মক্কায় চলে যান।

যে সময় হাজী সাহেব মক্কা পৌছলেন তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ১৮ বছর। তিনি ১৭৯৯ সন থেকে ১৮১৮ সন পর্যন্ত সুদীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থান করেন। মক্কা নগরীতে অবস্থানের এই দীর্ঘ সময়ে তিনি তার যোগ্যতার সদ্ব্যবহার করেন। মক্কায় অবস্থানের প্রথম দুই বছরে তিনি মওলানা মুরাদ নামে একজন বাংলাভাষী আলেমের নিকট আরবী সাহিত্য ও ফিকাহ্‌ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং জ্ঞানানুশীলনমূলক প্রতিটি বৈঠক ও সাহিত্য সভায় অংশগ্রহণ করতে থাকেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত আবু হানীফা আসগার নামে খ্যাত এক বিখ্যাত হানাফী আলেম তাহের সমবলের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে তিনি ইসলাম সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাসাওফ ও তরীকত সম্পর্কেও তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন। এরপর তিনি তাঁর উস্তাদ তাহের সমবলের অনুমতি নিয়ে কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং অধিকাংশ সময় পড়াশোনায় ব্যয় করেন।

এরপর আল-আযহার থেকে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারাতে অবস্থান করার পর জন্মভূমি বাংলায় ফিরে আসতে মনস্থ করেন। তিনি চাচ্ছিলেন স্বদেশ ভূমিতে ফিরে এসে ইসলাম প্রচার তথা ইসলামী

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করবেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর উস্তাদ তাহের সমবল তাঁকে দেশে ফিরে আসার অনুমতি দেন। এভাবে বিশ বছর পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থান করে ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তিনি স্বদেশভূমি বাংলায় ফিরে আসেন। জেমস ওয়াইজের মতে, তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন তখন তিনি আরবী ভাষায় পারদর্শী ভাল বক্তা ও যুক্তিবাদী তার্কিক ছিলেন।

আন্দোলন

সুদীর্ঘ বিশ বছর পর দেশে ফিরে এসে তিনি দেখতে পেলেন, দেশের মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা বিশ বছর পূর্বের তুলনায় ভাল তো হয়ইনি বরং কল্পনাতীতভাবে অধঃপতিত হয়েছে। তিনি দেখলেন মুসলমানরা যেভাবে জীবন যাপন করছে তার সাথে ইসলামের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করছে তারাই আবার দ্বিধাহীনচিত্তে শির্ক ও বিদআতমূলক অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করছে। শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকেও মুসলমানরা অনেক পিছনে পড়ে আছে। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগে হিন্দু জমিদার ও দেশী-বিদেশী আমলারা তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। আর মুসলমানরা অসহায় হয়ে নীরবে তা হজম করছে। প্রতিবাদ করার ভাষা এবং মনোবল উভয়ই যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে। বিশেষ করে মুসলমান কৃষকদের অবস্থা আরো করুণ হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করার সাথে সাথে হিন্দু জমিদাররা তাদেরকে পূজা পার্বণের চাঁদা পর্যন্ত দিতে বাধ্য করছে। এসব জমিদাররা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পর্যন্ত পালন করতে দিচ্ছে না। দাড়ির ওপর ট্যাক্স ধার্য করে, হিন্দু জমিদারদের এলাকায় কুরবানী বন্ধ করে, আযান দেয়া নিষিদ্ধ করে এবং গরুর গোশত খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মর্যাদাবোধকে আহত করা হচ্ছে। অন্যদিকে নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে চলছে। মুসলমানরা এ অবস্থার মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

এ অবস্থা দেখে তিনি নিজের মধ্যে কিছু করার তাগিদ অনুভব করলেন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, মুসলমানদেরকে এ অবস্থার হাত থেকে মুক্তি দিতে হবে এবং সেজন্য তাদেরকে আত্ম-সচেতন করতে হবে। তিনি বুঝতে পারলেন, মুসলমানরা আত্ম-সচেতন নয় বলেই তাদেরকে অতি প্রিয় ও মূল্যবান স্বাধীনতা হারাতে হয়েছে। আর স্বাধীনতা হারানোর কারণেই আজ বিভিন্ন রকমের জুলুম নির্যাতন তাদের ভাগ্যে জুটছে এবং অশিক্ষা, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার তাদের ঘরে স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে। তিনি আরো উপলব্ধি করতে পারলেন, কোন জাতি সত্যিকার অর্থে সচেতন হলে তবেই স্বাধীনতা লাভের তাকিদ ও প্রেরণা লাভ করতে পারে। তাই তিনি ঘোষণা করলেন, এদেশ দারুল হারব—যা বিধর্মীরা কব্জা করে আছে। তাই এখানে জুম'আ ও ঈদের নামায পড়া জায়েজ নয়। হিন্দুদের পূজা-পার্বণে আর্থিক বা শারীরিক কোন প্রকার সহযেগিতা করা এবং দেখতে যাওয়া হারাম। তিনি মুসলমানদের ধুতি ছেড়ে ইসলামী লিবাস পরতে আহ্বান জানালেন এবং পূর্বকৃত সব রকমের পাপ ও অন্যায়ের জন্য তওবা করে নতুনভাবে ইসলামী জীবন যাপন করতে বললেন। তিনি আরো ঘোষণা করলেন, যত প্রকার শির্ক ও বিদ'আত ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে তা দূর করতে হবে এবং সত্যিকার ইসলামের

www.nagorikpathagar.org

অনুসারী হয়ে জীবন যাপন করতে হবে। তিনি মুহাররমের তাজিয়া ও উৎসব নাজায়েজ ঘোষণা করলেন, মসজিদসমূহ সংস্কার করার কর্মসূচিও গ্রহণ করলেন এবং মাযার পূজা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সবাইকে তাওহীদ পন্থী খাঁটি মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করতে আদেশ করলেন। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারিত হলো "দারুল হারব" কে "দারুল ইসলামে" রূপান্তরিত করার। ড. মজুমদার তার Sepoy Mutiny গ্রন্থে লিখেছেন : There was a general feeling that the real object of the Faraizis was expulsion of the British and the restoration of Muslim power.

ঢাকা জেলার নয়াবাড়ি নামক স্থানকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর এই আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। মুসলমানরা দলে দলে তাঁর এই আন্দোলনে যোগদান করে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ এবং তাঁর নির্দেশ ও পরামর্শ মত জীবন যাপন শুরু করলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ, দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ সংগঠক। তাঁর এই আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি সাড়া দিলো সাধারণ কৃষক শ্রেণী। তিনি তাঁর দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে এসব কৃষককে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় জীবন যাপনের শপথ গ্রহণ করাতে থাকলেন। তাঁর মতানুযায়ী একজন মুসলমানকে ন্যূনপক্ষে ইসলাম নির্ধারিত ফরয কাজসমূহ অবশ্যই পালন করতে হবে। এ কারণেই এ আন্দোলনের নাম হলো ফারায়েজী আন্দোলন। অল্পদিনের মধ্যে প্রায় বার হাজার কৃষক তার নেতৃত্বে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ হলো। তিনি তাদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন ইসলামী আদর্শের আলোকে গঠন করার এবং সব রকমের অনৈসলামী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিলেন। পূজা-পার্বণের চাঁদা এবং অন্যায় ট্যাক্স দিতে নিষেধ করলেন। ঢাকা, পাবনা, বরিশাল, নদীয়া ও মোমেনশাহী জেলায় তাঁর আন্দোলনের প্রভাব ও সাংগঠনিক কাঠামো দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকলো। অশিক্ষিত কৃষক ও তাঁতীদের মধ্যে তাঁর এ আন্দোলনের প্রভাব পড়লো সবচেয়ে বেশি। তারা সব রকম অনৈসলামী কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে সত্যিকার মুসলমানের মত জীবন যাপন করতে থাকলো। তারা নিয়মিত নামায আদায় ও রোযা পালন করতে লাগলো। ধুতি ছেড়ে লুংগী ও টুপী পরিধান করতে লাগলো। এভাবে তিনি তার স্বপ্নসাধ-দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে অনুসারীদের এগিয়ে নিয়ে চললেন।

তাঁর অনুসারীদের সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সংঘবদ্ধতা দেখে হিন্দু জমিদার ও মহাজন এবং সংস্কারমূলক কার্যকলাপ দেখে গোঁড়া কিছু মুসলমান তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে হয়ে উঠলো। কারণ তাঁর দলে ভিড়ে যারা সংঘবদ্ধ ও সচেতন হয়ে উঠেছিলো, তারা অধিকাংশই ছিলো হিন্দু জমিদারদের রায়ত মুসলমান কৃষককুল। সুতরাং তারা ভাবলো, এসব মুসলমান যদি একবার জেগে ওঠে তা'হলে তাদের অত্যাচারের ও শোষণের সুযোগ আর থাকবে না। তাই তারা হাজী শরীয়তুল্লাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটতে শুরু করলো। এভাবে ১৮৩১ সনের এপ্রিল মাসে হিন্দু জমিদারদের সাথে সরাসরি বিরোধ শুরু হলে তাঁকে প্রথমে পুলিশ হিফাজতে নেওয়া হলো এবং পরে নয়াবাড়ির বসতবাটি হতে বিতাড়িত করা হলো। এবার তিনি বাধ্য হয়ে তাঁর জন্মভূমি ফরিদপুর জেলার শামাইল গ্রামে চলে যান। সেখানেও অসংখ্য লোক এসে তাঁর আন্দোলনে যোগদান করে। যারা

www.nagorikpathagar.org

তাঁর সান্নিধ্যে আসতো তারাই তাঁরা ব্যক্তিত্ব ও আচরণের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে পড়তো। তাই ড. ওয়াইজ লিখেছেন: Venerated him as a father able to advise them in seasons of adversity and give consolation in time of afflicion.

যা-ই হোক এই মহান মর্দে মুজাহিদ তাঁর এই আন্দোলনের চূড়ান্ত ফলাফল দেখে যেতে পারেননি এবং এই অবস্থায় তিনি ১৮৪০ সনে ৫৯ বছর বয়সে শামাইল গ্রামে ইন্তেকাল করেন। তাঁর আন্দোলনের অসমাপ্ত কাজ চালানোর জন্য রেখে যান সুযোগ্য পুত্র মুহসিনউদ্দীন দুদুমিয়া ও অসংখ্য অনুসারী।

দুদুমিয়ার নেতৃত্বে ফারায়েজী আন্দোলন

হাজী শরীয়তুল্লাহর ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র মুহসিনউদ্দীন দুদুমিয়া ফারায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। বরং অনেক ক্ষেত্রে তিনি পিতা অপেক্ষাও অনেকখানি বেশি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও পিতার মত অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অগাধ দীনি জ্ঞানের অধিকারী তিনি ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ছিলো অসধারণ সাংগঠনিক যোগ্যতা।

ফরিদপুর জেলার বাহাদুরপুর গ্রামে ১৮১৯ সনে মুহসিনউদ্দীন দুদুমিয়ার জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি পিতার নিকট থেকেই আরবী ও ফার্সী ভাষা শিখেন। তাঁর বয়স যখন বার বছর, তখন তাঁকে শিক্ষা লাভের জন্য মক্কা শরীফ পাঠানো হয়। তিনি সেখানে পাঁচ বছর অবস্থান করে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করেন এবং দেশে ফিরে এসে পিতার সাথে আন্দোলনের কাজে যোগদান করেন। তাঁর দেশে ফেরার পাঁচ বছর পর পিতা যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁকেই এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয়।

আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের অতি অল্পদিনের মধ্যেই ফরিদপুর, পাবনা, ঢাকা, বাকেরগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলার ঘরে ঘরে তাঁর নাম অত্যন্ত সুপরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর সাংগঠনিক যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে এসব এলাকায় ফারায়েজীদের সংগঠিত ও আরো সংঘবদ্ধ করে তোলেন। সাংগঠনিক কাজে সুবিধার জন্য তিনি গোটা পূর্ববঙ্গকে কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করে প্রত্যেক।

এলাকায় একজন করে খলীফা মনোনীত করেন। এসব খলীফার কাজ ছিলো আন্দোলনের ব্যয় নির্বাহের জন্য সাধারণ মানুষের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা, আর সংশ্লিষ্ট এলাকায় সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে কেন্দ্রকে অবহিত করা। দলের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে জমিদার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বা তার প্রতি কোন জুলুম চালালে কেন্দ্র সর্বপ্রযত্নে তার মুকাবিলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। অত্যাচারী জমিদার ও নীলকররা কোন সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমার আশ্রয় নিলে কেন্দ্রীয় সংগঠন সেই সদস্যকে মামলা পরিচালনার জন্য টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতো। এভাবে দুদুমিয়া কৃষক শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন এবং তাঁদের মধ্যে সকল প্রকার জুলুম উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মনোবল ও প্রেরণা সৃষ্টি করেন।

দুদুমিয়া ঘোষণা করেন, সব মানুষ সমান। সবাই সমান অধিকার নিয়ে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। তাই সব মানুষের একই রকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে।

www.nagorikpathagar.org

তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, এ পৃথিবী আল্লাহ্‌র। কোনভাবেই এখানে কারো একচেটিয়া স্বত্ব নেই, সুতরাং কারো উপর কারো কর ধার্য করারও অধিকার নেই। তিনি তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দিয়ে সরকারি খাজনা ছাড়া আর সব রকমের কর প্রদান বন্ধ করে দিলেন। তিনি অনুসারীদের সরকারি খাস মহল জমিতে বাসস্থান নির্মাণ করতে উৎসাহিত করলেন; যাতে অন্য কোন প্রকার কর প্রদানের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়। এভাবে জমিদার, নীলকর ও অন্যান্য জালিমাদের বিরুদ্ধে দুদুমিয়া বুক টান করে রুখে দাঁড়ান। তাঁর এই মতামত ও চিন্তাধারা অতি দ্রুত সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়লো। এ দেখে তৎকালীন জমিদার শ্রেণী আতঙ্কিত হয়ে উঠলো এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা খাড়া করলো। ১৮৩৮ সনে পিতার জীবদ্দশায়ই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি কিছু বাড়িঘর লুট করতে উস্কানি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোর্টে নির্দোষ প্রমাণিত হন। ১৮৪১ সনে তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয় এবং এবারও তিনি বেকসুর খালাস পান। এভাবে বহু মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে গ্রেফতার করানো হয়, আর প্রতি বারই তিনি বেকসুর খালাস পান। এ ধরনের মিথ্যা মামলায় অতিষ্ঠ হয়ে তিনি জমিদার ও নীল কুঠিয়ালদের শায়েস্তা করার জন্য অভিযানও চালিয়েছেন। এভাবে তিনি মুসলিম জনতা তথা এদেশের মানুষকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাতে থাকেন। ইতিমধ্যে ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গ গোটা উপমহাদেশকে বিক্ষুব্ধ করে তুললে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী দুদুমিয়ার ব্যাপারে এই ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠে যে, দুদুমিয়া যদি তাঁর অসংখ্য অনুসারীসহ এই বিপ্লবের স্বপক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাহলে অবস্থা আরো সংগীন হয়ে উঠবে। তাই এ সময় তাঁকে কলকাতায় নজরবন্দী করে রাখা হয়। নিষ্ঠুরভাবে বিপ্লব দমন করার পর অবস্থা আয়ত্তাধীন মনে করে ইংরেজ শক্তি ১৮৫৯ সনে তাঁকে মুক্তি দেয়। মুক্তি লাভ করে তিনি তাঁর বাহাদুরপুরের বাড়িতে পৌঁছলে পুলিশ তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করে ফরিদপুরে নিয়ে যায় এবং বিনা বিচারে আটক রাখে। ১৮৬০ সনে তাঁকে পুনরায় মুক্তি দেয়া হয়। এরপর থেকে তিনি নিজ গ্রাম বাহাদুরপুরের বাড়িতে বাস করতে থাকেন। তাঁর নিযুক্ত সংবাদ সংগ্রহকারীরা সারা বাংলায় ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করতো এবং তাঁর নির্দেশ দূর গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত পৌঁছে দিতো। তিনি সাধারণ মুসলমানদের ঘরোয়া ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করতেন। কোন অমুসলিম তাঁকে না জানিয়ে কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন কারণে মামলা করলে তিনি তাঁকে শায়েস্তা করতেন। সংগঠনের গোপন চিঠিপত্রে তিনি "আহমদ নাম নামা'লুম" সই করতেন। এভাবে পিতার মৃত্যুর পর ১৮৪০ সন থেকে ১৮৬২ সন পর্যন্ত একটানা ২২ বছর সংগ্রাম করে এই মহান নেতা ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা শহরের বংশাল রোডের ১৩৭ নং বাড়িতেই ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

মুহসিন উদ্দীন দুদুমিয়ার ইন্তেকালের পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত ফারায়েজী আন্দোলন চলতে থাকে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই যেন এ আন্দোলন তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। কারণ পরবর্তী সময়ে তেমন কোন যোগ্য নেতার নেতৃত্ব এ আন্দোলন লাভ করতে পারেনি। তাই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে এর ধারা। আর এই ক্ষীণতর ধারাটিই এক ভিন্নরূপ নিয়ে আজও বেঁচে আছে।

www.nagorikpathagar.org

বৈশিষ্ট্য

উপরউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি, তা হলো :

১. মহান মুর্দে মুজাহিদ হাজী শরীয়তুল্লাহর গড়ে তোলা এ আন্দোলন ছিলো পূর্ব ভারতের একমাত্র ইসলামী আন্দোলন যার লক্ষ্য ছিলো মুসলমানদেরকে বিদেশীদের হাত থেকে স্বাধীন ও মুক্ত করা এবং ইসলামের আলোকে নৈতিক চরিত্র সংশোধন করে ইসলামী বিপ্লব সংগঠিত করা।

২. হাজী শরীয়তুল্লাহর ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র দুদুমিয়ার এ আন্দোলন কোন সাময়িক আবেগতাড়িত ব্যাপার ছিলো না, বরং এটি ছিলো একটি প্রাণবান আন্দোলন। আর একারণেই এত দীর্ঘ সময় ধরে আমরা এর প্রাণস্পন্দন দেখতে পাই।

৩. যদিও দেখা যায় প্রথম দিকে এ আন্দোলন ছিলো সংস্কারমূলক, কারণ তখনকার কর্মসূচি ছিলো আকিদা বিশ্বাসের সংশোধন এবং বিদ'আতমূলক' আচার-অনুষ্ঠানের উচ্ছেদ, কিন্তু পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলো এর সাথে জড়িয়ে যায়। এমন কি এক পর্যায়ে লাঠিয়াল বাহিনী রূপে সামরিক শক্তিও গড়ে তোলা হয়।

৪. ফারায়েজী আন্দোলনের আকীদা বিশ্বাসের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এ বিপ্লবের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়নি কিংবা বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কারণ আকীদা বিশ্বাসের তুলনায় এ আন্দোলনের সামাজিক কাজকর্ম বেশি মাত্রায় ফুটে উঠেছে; অথচ আকীদা বিশ্বাসের সংশোধন এবং ধ্যান-ধারণা পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রেও এ আন্দোলন ব্যাপক তথা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

৫. এ আন্দোলন ছিলো ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক স্বাধীনতা আন্দোলন। এতে যেমন ঈমান-আকীদার পরিশুদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছিলো তেমনি সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়েরও বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি এতে ছিলো। আর এ কারণে এর ছত্রতলে সংঘবদ্ধ হতে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলো অসংখ্য কৃষক। সে কারণে এ আন্দোলনকে যথাযথভাবেই কৃষক আন্দোলনও বলা যায়।

ফারায়েজী আন্দোলনের সবদিক বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমরা বিনাদ্বিধায় বলতে পারি যে, মর্দে মুজাহিদ ও বিপ্লবী নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ্ এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদুমিয়া এ আন্দোলনের মাধ্যমে যা অর্জন করতে চেয়েছিলেন, তা সঙ্কীর্ণ অর্থে নয় বরং ব্যাপক অর্থে স্বাধীনতা, যা একজন মুসলমান-এর জন্য সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা বলে বিবেচিত হতে পারে। যে স্বাধীনতা ইসলামী চেতনা রস সিঞ্চিত—তাই তারা পেতে আগ্রহী ছিলেন। তারা ছিলেন আমাদের পথের-দিশারী। তাঁদের দেখানো স্বাধীনতার ইসলামী পথেই আমাদের চলা কর্তব্য। তাই একথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম বহু পূর্বে শুরু হয়েছে এবং এখনো তা শেষ হয়নি– এখনো চলছে।

www.nagorikpathagar.org

মেসবাহুল হক

কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ ও বাংলার মুসলমান

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন পৃথিবীর ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা বটে, কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। পলাশীর রণক্ষেত্রে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইংরেজ শক্তির জয়লাভের রাজনৈতিক তাৎপর্য যতই গভীর হোক না কেন, একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে তা ছিল অতি তুচ্ছ ব্যাপার। ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত এবং মোগল সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে সুবেদার, নবাব, আমীর, ওমরাদের সংঘর্ষ এবং মুর্শিদকুলি খানের আমল থেকে যে সমস্ত হিন্দু প্রভাবশালী ব্যক্তি নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারে বিশেষ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, তাদের মুসলিম শাসন ক্ষমতা উৎখাত করার ষড়যন্ত্র ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে এই জয়ের ক্ষেত্র পূর্ব হতেই প্রস্তুত হয়েছিল।

ইংরেজ বণিকরাজ ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দুটি প্রদেশ বাংলা ও বিহারের ক্ষমতা অধিকার করল বটে, কিন্তু প্রথমেই দেশের সর্বত্র সর্বময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় সাহসী হল না, তাদের ভয় ছিল দেশের আপামর জনসাধারণ ষড়যন্ত্রকারী বিদেশীদের শাসন সহজে মেনে নিবে না। তাই তারা প্রথমে সাক্ষীগোপাল নবাব মীরজাফরকে সামনে রেখে পেছনে থেকে দেশের বুকে চালাতে থাকে তাদের অমানুষিক শাসন ও শোষণ। রাজস্ব আদায়ের সর্বময় ক্ষমতা রাখলো সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হাতে। প্রকৃত 'নবাব' হয়ে থাকল পলাশী যুদ্ধের নায়ক অর্থলোভী রবার্ট ক্লাইভ।

ক্ষমতা লাভের প্রথম থেকেই এই 'শ্বেত নবাব' দেশীয় কুচক্রী ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তায় বাংলা-বিহারের বুকে যে লুণ্ঠন প্রক্রিয়া গ্রহণ করে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা অতি বিরল। পলাশী যুদ্ধ জয়ের পুরস্কার ও নবাবী লাভের ইনাম স্বরূপ মীরজাফরের নিকট হতে আদায়কৃত ৩২ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউন্ড ছাড়াও ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলা ও বিহার থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেছিল মোট ৬০ লক্ষ পাউন্ড। তাদের এসব লুণ্ঠনের অংশীদার ছিল দেশীয় গোমস্তা, বেনিয়ান, জমিদার ও মহাজন। বলাবাহুল্য, প্রকৃতপক্ষে এদের সবাই ছিল মুসলিম শাসন ক্ষমতা উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হিন্দু জমিদার, মহাজন ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পালিত ব্যক্তি।

ইংরেজ রাজত্বের স্বল্পকালের মধ্যে মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে নেমে এলো এক ভয়াবহ দুর্দিন। কোম্পানির শাসন-চক্রের আবর্তে পড়ে মুসলমানরা হারাল তাদের রাজকীয় সম্মান, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আর সামাজিক জীবনের স্বস্তি। যে জাতি মহা গৌরবের সাথে সাড়ে পাঁচশ' বছর এদেশ শাসন করেছে, সহসা সে জাতির ভাগ্যাকাশে নেমে এলো অচিন্তনীয় দারিদ্র্য আর অজ্ঞতার অন্ধকার।

নবাবী লাভের পর পরই কোম্পানির নির্দেশে মীরজাফর ৮০ হাজার দেশীয় সৈন্য অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করলেন এবং তাদের সরাসরিভাবে বরখাস্ত করা হল। শুধু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্ম চালাবার উদ্দেশ্যে সামান্য সংখ্যক সৈন্য রাখা হল। সর্বশেষ

www.nagorikpathagar.org

ওয়ারেন হেস্টিংস যখন দ্বৈত শাসন বাতিল করে প্রকাশ্যভাবে দেশের সর্বময় শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করল, তখন সেই সামান্য সংখ্যক সৈন্যও বাতিল বলে ঘোষণা করা হল। ফলে এক বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনসংখ্যা বেকার হয়ে পড়ল। এছাড়া সামরিক সংস্থার বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত আরও হাজার হাজার মুসলিম কর্মচারী তাদের চাকরি হারাল। মুসলিম শাসন আমলে রাজস্ব আদায় ছিল সরকারী আয়ের প্রধান উৎস। রাজস্ব আদায়কারী হিন্দু কর্মচারী ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগে সাত শত মুসলমান কর্মচারী ছিল। তারাও চাকরি হারাল।

সুবার দেওয়ান অফিস ছিল বিরাট এক প্রতিষ্ঠান। তাতে কর্মরত ছিল হাজার হাজার মুসলমান কর্মচারী। ১৭৬৫ সালে কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর কয়েক বছর পর্যন্ত এসব কর্মচারী নিজ নিজ পদে বহাল ছিল। এক সময় হঠাৎ এ সমস্ত কর্মচারীও তাদের চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ল।

মুর্শিদকুলি খানের আমলে বাংলাদেশকে ১৩টি চাকলা, ১৬৬০টি মহলে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রত্যেক মহলকে বলা হল পরগণা। প্রতিটি পরগণায় একটি করে রাজস্ব অফিস ছিল। আমিল, আমিন, কারকুন, খাজাঞ্চী, কানুনগো প্রভৃতি বিভিন্ন পদে বহাল ছিল হাজার হাজার মুসলমান কর্মচারী। তারাও চাকরি হারিয়ে বেকার হল।

মুর্শিদাবাদ নিজামত ছাড়াও জাহাঙ্গীর নগর, আজিমাবাদ ও কটাক নায়েব নিজামত অফিস ও চাকলার ফৌজদারের অধীনে কর্মরত ছিল কয়েক হাজার মুসলমান কর্মচারী। কোম্পানির শাসন চক্রান্তে এসব হতভাগ্য মুসলমানরা চাকরি হারিয়ে বেকার জীবন-যাপন করতে লাগল। সারা দেশের বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে কাজী, মুফতি, মীর আদল হিসেবে কর্মরত ছিল কয়েক হাজার হতভাগ্য মুসলমান কর্মচারী। কোম্পানির শাসনের প্রাথমিক অবস্থায় শাসন বিভাগে মুসলিম আইন-কানুন চালু থাকায় বিচার বিভাগীয় সর্বস্তরে মুসলমানদের বেশ একটা প্রভাব ছিল। মোটকথা যতদিন ফার্সী সরকারি ভাষা রূপে পরিগনিত ছিল ততদিন বিচার বিভাগ ছাড়া অন্যান্য বিভাগেও মুসলমানদের চাকরির হার সন্তোষজনক ছিল।

মুসলমানদের ন্যায় হিন্দুদেরও ইংরেজ পদানত হতে হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হিন্দুরা সন্তুষ্টচিত্তে ইংরেজ শাসন ও অধীনতা মেনে নিয়েছিল। কারণ তাদের কাছে এ পরিবর্তনে লোকসানের কোন প্রশ্নই ছিল না। মুসলিম শাসনের অবসান তারা আন্তরিকভাবে কামনা করে আসছিল। এভাবেই এক শ্রেণীর মুসলিম-বিদ্বেষী হিন্দুদের বিশ্বাসঘাতকতা ও সহযোগিতা গুণেই একটা বিদেশী কোম্পানি অতি সহজে এদেশে রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল।

ইংরেজ প্রভুরাও তাই কৃতজ্ঞতাবশত এদেশে তাদের শাসন বিস্তারে সর্বক্ষেত্রে হিন্দুদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। ১৮১৩ সালে স্যার জন ম্যালকথ সিলেক্ট কমিটির সামনে এক বক্তব্যে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "ভারতে হিন্দুদের সহযোগিতাই ইংরেজ নিরাপত্তার প্রধান সহায়।"

অন্যদিকে মুসলমানরা রাজ্য হারাবার সাথে সাথে সমাজের সর্বস্তরে আধিপত্য হারাবার দুঃখ কিছুতেই ভুলতে পারলো না। ইংরেজরাও বুঝলো যে, মুসলমানরা

www.nagorikpathagar.org

কিছুতেই এ দুঃখ ভুলবে না। সুযোগ পেলেই স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হবে। তাই তারা সর্বকাজে সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের অবিশ্বাস করতে লাগল। মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে দাবিয়ে রাখার নীতি গ্রহণ করলো।

১৮৩৭ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক হঠাৎ এক আদেশ জারি করলেন যে, এখন থেকে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজি হবে সরকারি ভাষা। অফিস-আদালতের কাজ চলবে ইংরেজি অথবা দেশীয় ভাষা বাংলায়। হঠাৎ এ পরিবর্তনে মুসলমানরা দিশেহারা হয়ে পড়ল। এ পর্যন্ত সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সামান্যতম সুযোগ-সুবিধা যতখানি ছিল–এবার তাও হাতছাড়া হল। অফিস-আদালতে মুসলমানদের পরিবর্তে হিন্দু কর্মচারী নিযুক্ত হতে লাগল। কারণ হিন্দুরা পূর্ব থেকেই ইংরেজ শাসকদের সুনজরে ছিল এবং ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে সচেষ্ট ছিল। মুসলমানরা ছিল ইংরেজি শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে। বাংলা স্কুলগুলোতে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার আধিপত্য থাকায় মুসলমানরা কিছুতেই বাংলা স্কুলে শিক্ষা গ্রহণেও অগ্রসর হয়নি।

১৮৬৪ সাল পর্যন্ত সরকারি নির্দেশ ছিল ওকালতি অথবা মুন্সেফগিরির জন্যে ইংরেজি অথবা উর্দু ভাষাই যথেষ্ট। কিন্তু হঠাৎ সরকারি নির্দেশ পরিবর্তিত হল। নতুন নির্দেশ জারি হল, উচ্চ পর্যায়ের ওকালতি অথবা মুন্সেফগিরি পরীক্ষার মাধ্যম হবে একমাত্র ইংরেজি। আইন ব্যবসায়ে মুসলমানদের প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য ছিল, সেখানেও হঠাৎ মার খেল তারা।

সরকারি চাকরি পাওয়ার সব দরজাই বন্ধ হয়ে গেল মুসলমানদের জন্য। মুসলমানদের মধ্যে যারা ইংরেজি শিখে যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করল–তারাও সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট বাধার সম্মুখীন হল। মুসলমান প্রার্থীর সর্ববিধ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও হিন্দু কর্মচারী নিযুক্ত করা হত। সময় সময় চাকরির বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট উল্লেখ থাকত যে, শুধু হিন্দু প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণযোগ্য। 'দূরবীন' নামক কলিকাতার একটা ফার্সী পত্রিকা ১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুরবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিল–"উচ্চস্তরের বা নিম্নস্তরের সমস্ত চাকরি ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। সরকার সকল শ্রেণীর কর্মচারীকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য, তথাপি এমন সময় এসেছে যখন মুসলমানদের নাম আর সরকারি চাকুরিয়াদের তালিকায় প্রকাশিত হচ্ছে না, কেবল তারাই চাকরির জায়গায় অপাংক্তেয় সাব্যস্ত হয়েছে। সম্প্রতি সুন্দরবন কমিশনার অফিসে কতিপয় চাকুরিতে লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, কিন্তু অফিসারটি সরকারি গেজেটে কর্মখালির যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন– তাতে বলা হয় যে, "শূন্য পদগুলিতে কেবল হিন্দুদের নিয়োগ করা হবে।"

মুসলমানদের এমনি দুরবস্থা দেখা দিল যে, কলিকাতায় কদাচিৎ এমন কোন সরকারি অফিস চোখে পড়ত, যেখানে চাপরাশি ও পিয়ন শ্রেণীর উপরিস্তরে একজন মুসলমান কর্মচারী বহাল আছে। অফিস আদালত ও পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কেবল হিন্দু যুবকদের নিযুক্ত করার নির্দেশ ছিল।

www.nagorikpathagar.org

১৮৫২ সালের এক হিসেবে দেখা যায় ২৪০ জন সরকারি কর্মচারীর মধ্যে ২৩৯ জনই হিন্দু। একজন ছিল মাত্র মুসলমান। ১৮৭১ সালে হান্টার সাহেব প্রদত্ত আরেক হিসাবে দেখা যায়, সরকারি গেজেটেড পদগুলির মধ্যে ৬৮১টি ছিল হিন্দু। মুসলমান মাত্র ৯২ টি।

শৌর্যবীর্য ও বীরত্বে যে জাতি এক সময় সারা পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো, হঠাৎ তাদের এ দুরবস্থার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে হান্টার সাহেব বলেছেন, "হিন্দুরা নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট মেধার অধিকারী কিন্তু সরকারি কর্মক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করার জন্যে যে রকমের সার্বজনীন ও অন্যান্য মেধা থাকা দরকার, বর্তমানে তা তাদের নেই এবং তাদের অতীত ইতিহাসও একথার পরিপন্থী; বাস্তব সত্য হলো এই যে, এদেশের শাসন কর্তৃত্ব যখন আমাদের হাতে আসে তখন মুসলমানরাই ছিল উচ্চতর জাতি; এবং শুধু মনোবল ও বাহুবলের বেলাতেই উচ্চতর নয়, এমনকি রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনায় দক্ষতা এবং সরকার পরিচালনায় বাস্তব জ্ঞানের দিক থেকেও তারা ছিল উন্নততর জাতি। এ সত্ত্বেও মুসলমানদের জন্যে এখন সরকারি চাকরি এবং বেসরকারি কর্মক্ষেত্র এই উভয়ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"

শুধু চাকরি নয়—শিক্ষা ও ব্যবসায়ক্ষেত্রেও মুসলমানদের অবস্থা ছিল দুর্ভাগ্যজনকভাবে সঙ্কটময়। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ থেকেই ইংরেজি শিক্ষাকে মুসলমানরা তাদের স্বার্থ ও সামাজিক ঐতিহ্যের পরিপন্থীরূপে গণ্য করে আসছে। দেশী স্কুলগুলোতে যে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো– তাতে পুরোপুরিভাবে হিন্দু দেব-দেবী ও হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির আধিপত্য ছিল। কারণ শিক্ষকরা সবই ছিল হিন্দু। কাজেই সংগত কারণে মুসলমানরা পৌত্তলিক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পৌত্তলিক ভাবধারায় প্রদত্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যার ফলে মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে থাকল।

মুসলমানদের এই পিছিয়ে থাকার সুযোগে হিন্দুরা সহজ গতিতে এগিয়ে চলতে দ্বিধাবোধ করলো না। কারণ মুসলমান আমলে সরকারি ভাষা এবং ইংরেজ আমলের সরকারি ভাষা উভয়ই হিন্দুদের কাছে বিদেশী ভাষা। তাদের কাছে উভয় ভাষার মর্যাদাই সমান। জীবনে সাফল্য লাভের জন্য যেমন তারা এক সময় ফার্সী ভাষা শিখতে কার্পণ্য করেনি তেমনি ইংরেজি ভাষাও তাদের কাছে অনাদৃত হয়নি। মুসলমান আমলে হিন্দুরা যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পেয়েছে, তা ফার্সী ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থা রপ্ত করার বদৌলতেই সম্ভব হয়েছে।

দূরদর্শী হলে মুসলমানরা পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলতে পারতো। মুসলমানরা তা পারেনি–তার প্রধান কারণ ইংরেজদের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা। হিন্দুদের তত্ত্বাবধানে হিন্দু শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা না করে যদি ইংরেজ শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হতো এবং রাষ্ট্রীয় কাজে শুধু যদি ইংরেজি ভাষা চালু রাখা হতো, তাহলেও ধর্মীয় কারণে শিক্ষা গ্রহণে মুসলমানদের যে সমস্ত অসুবিধা ছিল তা বহুলাংশে লাঘব হতো।

ভারতে মুসলমান আমলে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল উৎকৃষ্টতর। এমন এক ব্যবস্থা চালু ছিল যার ফলে প্রতিটি মানুষ কিছু না কিছু শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হতো। মুসলমানদের

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে হান্টার সাহেব বলেছেন, "বাংলার প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে এমন একটা পৃথক তহবিলের ব্যবস্থা ছিল, যার ফলে ঐ পরিবারের ছেলেরা ছাড়াও আশেপাশে গরীব ঘরের ছেলেরাও বিনা খরচায় লেখাপড়া শিখতে পারত।"

মুসলমান আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যে নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল। এই জমির আয়ের উপর নির্ভর করেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে ছিল। ইংরেজ আমলে ঐ সমস্ত নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করার ফলে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা ধবসে পড়ল। শত শত প্রাচীন পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল।

অপরদিকে হিন্দু সম্পদশালী ব্যক্তি ও খ্রিষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় কলিকাতা এবং তার আশেপাশে হিন্দুদের জন্যে বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। সেসব স্কুল-কলেজে খুবই নগণ্য সংখ্যক মুসলমান ছাত্র শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে সমর্থ হল। শুধু হিন্দু ছাত্রদের শিক্ষার জন্য স্থাপিত হল কলিকাতায় হিন্দু কলেজ। অথচ মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কোথাও কোন ব্যবস্থা গৃহীত হল না; উত্থাপিত হল না কোন প্রস্তাব। অবশ্য ইংরেজরা তাদের বিভেদ নীতিকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলার জন্যে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করল বটে, কিন্তু তাতে শিক্ষার কোন প্রকার সুব্যবস্থাই থাকলো না। হিন্দুদের পরিপোষণ করার যে নীতি ইংরেজ শাসকগণ গ্রহণ করেছিল, তারই ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু জাগরণ সম্ভব হয়েছিল। আর মুসলমানরা উপনীত হল দুর্দশার শেষ সীমায়।

অভাব অনটন, কুশিক্ষা, রোগ ও মহামারীর কবলে পড়ে বাংলার মুসলমান এক চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হল। মুসলমানদের দুরবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে হান্টার সাহেব বলেছিলেন, "একশ' সত্তর বছর আগে বাংলার কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের দরিদ্র হওয়া ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার, আর বর্তমানে তাদের পক্ষে ধনী হওয়াই অসম্ভব ব্যাপার।" ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা আরও করুণ। ইংরেজদের কুটিল চক্রান্তের আবর্তে পড়ে এদেশে যাবতীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে গেল। ব্যবসায়-বাণিজ্য বলতে কিছুই থাকলো না মুসলমানদের হাতে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, মুর্শিদকুলি খানের আমল থেকেই হিন্দুরা মুসলিম শাসন উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়। ১৭৩৬ সাল থেকে ১৭৪০ সালের মধ্যে কোম্পানি কলিকাতায় ৫২ জন স্থানীয় ব্যবসায়ী নিয়োগ করেছিল। তাদের সবাই ছিল হিন্দু। ১৭৩৯ সালে কাশিমবাজারে কোম্পানি ২৫ জন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠিত করে। তাদেরও সবাই ছিল হিন্দু। কেবল ঢাকায় নিযুক্ত ১২ জন ব্যবসায়ীর মধ্যে ২ জন ছিল মুসলমান।

ইংরেজদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সংগে যুক্ত থেকে আরও এক শ্রেণীর হিন্দু লাভবান হল, তারা হল মহাজন ও ব্যাংকার। ১৭১২ সালের দিকে কোম্পানির যারা ব্যাংকার ছিল, তারা সবাই হিন্দু। কলিকাতার বাইরে বিভিন্ন ব্যবসায় কেন্দ্রে এক শ্রেণীর মহাজন পোদ্দার বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বলাবাহুল্য এদের সবাই ছিল হিন্দু। মোটকথা ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা ছিল আরো শোচনীয়।

এমতাবস্থায় সৈনিক, আমীর ওমরাহ, কাযী-মুফতি, উকিল-মোক্তার, কেরানী-চাপরাশি—সর্বশ্রেণীর লাখ লাখ লোক বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে ধাওয়া করল গ্রামের

www.nagorikpathagar.org

দিকে। উদ্দেশ্য কৃষিকে আঁকড়ে ধরে কোনভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা। কিন্তু গ্রামের অবস্থা তখন আরও ভয়াবহ। শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার সাথে সাথে ইংরেজ বণিকরা বাংলার প্রাচীন গ্রাম-সমাজের ভিত্তি ভেঙে চুরমার করেছিল। এ কাজে তারা প্রধানত দু'টি অস্ত্র ব্যবহার করল–ভূমি রাজস্বের নতুন ব্যবস্থা ও ভূমি রাজস্ব হিসেবে ফসল বা দ্রব্যের পরিবর্তে মুদ্রার প্রচলন। এই দুই অস্ত্রের প্রচণ্ড ধ্বংসকারী শক্তির আঘাতে স্বল্পকালের মধ্যে প্রাচীন গ্রাম-সমাজের ভিত্তি ধূলিসাৎ হয়ে গেল। শ্মশানে পরিণত হল বাংলার গ্রাম।

ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত শাসকগণ রাজস্ব আদায় করত গ্রাম-সমাজের নিকট হতে, কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট থেকে নয়। কৃষক রাজস্ব দিত তার উৎপাদিত ফসল দিয়ে। ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানির শাসকগণ গ্রাম-সমাজের নিকট থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রথা লোপ করে কৃষকগণের নিকট ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব আদায়ের প্রথা প্রচলন করল। দ্বিতীয়ত মুদ্রাই হল তাদের রাজস্বের একমাত্র গ্রহণযোগ্য রূপ। এভাবে সর্বপ্রথম রাজস্ব হিসেবে ফসল গ্রহণের পরিবর্তে মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হল। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ইংরেজ শাসকগণ ব্যক্তিগত মালিকানার পথ প্রস্তুত করল। সর্বপ্রথম তারা মোগল আমলের কিছু সংখ্যক জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারী গোমস্তাদের জমির মালিক বলে ঘোষণা করল। যেখানে জমিদার বা গোমস্তা থাকলো না সেখানে জমির মালিকরূপে ঘোষিত হল গ্রাম-সমাজের প্রধান বা অর্থবান ব্যক্তি। পরবর্তীকালে এরাই জমিদার রূপে পরিগণিত হল। তাদের প্রধান কাজ হল–কৃষকের নিকট হতে যত ইচ্ছা খাজনা আদায় করা এবং তা থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ রাজস্ব হিসেবে ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া। সাথে সাথে এসব জমিদারের ইচ্ছামত জমি বিক্রয়, নতুনভাবে জমি বণ্টন ও বন্ধক রাখার ক্ষমতাও দেওয়া হল। জমিদারগণ জমির বিলি-ব্যবস্থার মারফত সৃষ্টি করল তাদের সমর্থক গাঁতিদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, তালুকদার নামক উপস্বত্বভোগী। উৎপীড়কের ভূমিকা নিয়ে এসব শোষকরূপী পরগাছা চেপে বসল চাষীদের কাঁধের উপর। সবার উপরে থাকল স্বৈরাচারী ইংরেজ বণিকরাজ।

বহুমুখী শোষণ-উৎপীড়নের চাপে পড়ে বাংলার অসহায় কৃষক সমাজ সর্বস্বান্ত হয়ে অনিবার্য ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াল।

বাংলার কৃষক মানেই মুসলমান, আর জমিদার এবং বিত্তবান ব্যক্তি মানেই হিন্দু–এ সত্য সর্বজনবিদিত। মুর্শিদকুলি খানের আমল থেকেই এদেশের রাজস্ব আদায়কারী গোমস্তাদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু। ইংরেজ সরকার যে সমস্ত গোমস্তাদের জমিদাররূপে অভিহিত করলেন তাদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু। এছাড়া ক্ষমতা হারিয়ে, চাকরি খুইয়ে মুসলমানরা যখন দারিদ্রের নিষ্পেষণে হতাশাগ্রস্ত, হিন্দুরা তখন ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বস্তরে ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী। হিন্দু দেওয়ান, গোমস্তা, বেনিয়ান, মুনশী, মুৎসুদ্দিরা কোম্পানি সরকারের কৃপায় নব্য ব্যবসায়ী রূপে পরিগণিত। তাদের আয়ত্তে প্রচুর অর্থ। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে জমির মালিকরূপে পরিগণিত হল তারাই। শুধু অর্থ গুণে দেব, মিত্র, বসাক, সিংহ, মোঠ, মল্লিক, শীল এমনকি, তিলি আর সাহারাও রাতারাতি জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। পুরনো জমিদারদের অনেকেই নানা কারণে জমিদারী বিক্রি করেছিল এবং তা কিনে নিল এসব

www.nagorikpathagar.org

অর্থবান ব্যবসায়ীরা। এছাড়া মুসলমানদের লাখেরাজ, জায়েদাদ দখল করার জন্য হিন্দু-ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যেরা পাদ্রীদের সহায়তায় এক ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুললো। এর ফলে হঠাৎ একদিন কোম্পানি সরকার এক ঘোষণা জারি করলেন যে, লাখেরাজ সম্পত্তির দলিল-দস্তাবেজ ও সনদ পাঞ্জা ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোম্পানি সরকারের নিকট দাখিল করতে হবে। তা না হলে লাখেরাজ সম্পত্তি কোম্পানি সরকারের বাজেয়াপ্ত হবে। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই দলীল-দস্তাবেজ সময়মত দাখিল করতে পারলো না। জমি বাজেয়াপ্ত হল। পরে তা কিনে নিল সেসব হিন্দু ধনবান ব্যক্তি।

কাজেই সংগত কারণেই বাংলার অধিকাংশ জমিদার হিন্দু আর চাষী মানে দরিদ্র মুসলমান। নব্য জমিদারদের খাজনা ও বহুবিধ করের চাপে পড়ে এবং জমিদারের নায়েব-গোমস্তাদের রোষে পড়ে চাষী হল ভিটে ছাড়া। সরকার, জমিদার ও ইজারাদারদের মধ্যে জমির অধিকার হস্তান্তরই চাষীদের দুর্দশার অন্যতম কারণ। জমিদার তার অধিকার স্থায়ীভাবে ইজারা দেয়, ইজারাদার আবার অনুরূপভাবে ইজারা দেয় তার অধিকার। এভাবে খাজনা গ্রাহক ও খাজনা দাতাদের মধ্যে যে সুদীর্ঘ শৃঙ্খলের সৃষ্টি, সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ চাষী শোষণ-নির্যাতনে হল সর্বস্বান্ত।

একদিকে জমিদার-মহাজনের শোষণ-পীড়ন আর অমানুষিক অত্যাচার, অপরদিকে কুশিক্ষা, অভাব-অনটন, রোগ-মহামারী সবকিছু মিলিয়ে চাষীরা এমন এক করুণ ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হল–যার পরিণতি অনিবার্য ধ্বংস।

চাষীদের যখন এমন এক সংকটময় অবস্থা, তখনই নেমে এল দেশজুড়ে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ বাংলা ১১৭৬ সালে সংঘটিত হয়েছিল, তাই ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে খ্যাত। কোম্পানি সরকার ফসলের পরিবর্তে মুদ্রায় খাজনা আদায়ের রীতি প্রচলন করল। খাজনা দেওয়ার জন্য চাষীকে বিক্রি করতে হত ফসল। বাংলার চাষীর ফসল মানেই খাদ্য-ফসল, সেই খাদ্য-ফসল বিক্রয় করেই চাষীকে জোগাড় করতে হত খাজনার টাকা। ইংরেজ বণিকরা এতে মুনাফা লুণ্ঠনের আরেকটা নতুন পথ খুঁজে পেল। তারা বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে খুলে বসল ধান-চালের একচেটিয়া ব্যবসায় কেন্দ্র। এই ব্যবসায় মানেই বাংলার কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের জীবন নিয়ে খেলা। চাষীরা খাজনা আদায়ের জন্য অভাবের তাড়নায় তাদের খাদ্য-ফসল বিক্রয় করত, আর তা কিনে গুদামজাত করত ইংরেজ ব্যবসায়ীরা। পরে সময় ও সুযোগ মত তা বিক্রয় করত সেই চাষীদের কাছে। চাষীরা মহাজনের কাছে নিজেদের ঘটি-বাটি বিক্রয় করে জমিজমা বন্ধক রেখে ফসল কিনত।

এই ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের লোভ আরও বেড়ে গেল। ১৭৬৯ সালে ফসল উঠার সাথে সাথে ফসল কিনে গুদামজাত করে রাখল তারা এবং ১৭৭০ সালে তা চড়া দামে বিক্রয় করতে আরম্ভ করল। কিন্তু খাজনা আর নানাবিধ করের চাপে পড়া সর্বস্বান্ত চাষীর পক্ষে তা ক্রয় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। মহাজনের কাছে ঘটি-বাটি বিক্রয় করল, জমি বন্ধক রাখল; তবুও বছরের খোরাক জোগাড় করা সম্ভব হল না। ঘরে ঘরে হাহাকার উঠল। দেশের বুকে নেমে এল এক মহাদুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। মৃত্যুর শিকারে পরিণত হল কোটি কোটি মানুষ।

www.nagorikpathagar.org

কোম্পানি সরকারের চাকরি নীতি, শিক্ষা নীতি এবং বিভেদ নীতির ফলেই মুসলিম জনসাধারণ এক চরম দুর্দশা ও দারিদ্রের কবলে পড়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছিল। তদুপরি এ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। পল্লী বাংলার শতকরা ৯৫ জনই কৃষিজীবী। তন্মধ্যে অধিকাংশই হতভাগ্য মুসলমান। দুর্ভিক্ষের কবলে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকলো না। হান্টার তাঁর Annals of Rural Bengal গ্রন্থে দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "১৭৭০ সালের সারা গ্রীষ্মকাল ব্যাপী লোক মারা গিয়েছে। কৃষকেরা তাদের গরু-বাছুর, লাংগল-জোয়াল বিক্রি করে ফেলেছে এবং বীজধান খেয়ে ফেলেছে। অবশেষে তারা ছেলে-মেয়ে বেচতে শুরু করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক সময় আর ক্রেতাও পাওয়া গেল না। তারপর তারা গাছের পাতা আর ঘাস খেতে শুরু করল। ১৭৭০ সালের জুন মাসে কোম্পানির রেসিডেন্ট স্বীকার করেন যে, জীবিত মানুষ মরা মানুষের গোস্ত খেতে শুরু করে। অনশনে শীর্ণ, রোগক্লিষ্ট কঙ্কালসার মানুষ দিনরাত সারি বেঁধে বড় বড় শহরে জমা হতো। বছরের গোড়াতেই সংক্রামক রোগ শুরু হয়েছিল। মার্চ মাসে মুর্শিদাবাদে পানি বসন্ত দেখা দেয় এবং বহুলোক এ রোগে মারা যায়। মৃত ও মরণাপন্ন রোগী স্তূপাকার হয়ে পড়ে থাকায় রাস্তা-ঘাটে চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ে। লাশের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তা পুঁতে ফেলার কাজও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। প্রাচ্যের মেথর, শিয়াল ও শকুনের পক্ষেও এত লাশ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব ছিল না।"

সমসাময়িক কালের বিখ্যাত ইতিহাস "সিয়ারে মুতাখ্খারীন"–এর রচয়িতা ইংরেজ দস্যু ও তার দেশীয় দালালদের শোষণ-উৎপীড়ন ও তাদেরই সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে কোটি কোটি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আর মৃত্যু যন্ত্রণায় আকুল হয়ে লিখেছিলেন, "হে খোদা, তোমার দুর্দশাগ্রস্ত বান্দাদের সাহায্যের জন্য একটিবার তুমি ধরা পৃষ্ঠে নেমে আস। এই অসহনীয় উৎপীড়ন আর দুর্দশা হতে তাদের রক্ষা কর।"

বণিকরাজ সৃষ্ট ভয়াবহ এই দুর্ভিক্ষ শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র মানব জাতির ইতিহাস কলঙ্কিত করে রাখবে। ইতিহাস যতদিন থাকবে, মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্পর্শ যতদিন থাকবে, ততদিন মানুষ দুঃস্বপ্নের মত স্মরণ করবে বাংলার এ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলার কথা।

এভাবে ইংরেজ শাসকগণ ও তাদের তাঁবেদার জমিদার-মহাজন পরিবেষ্টিত দুষ্টচক্র হতভাগ্য মুসলমান কৃষক জনসাধারণকে অমানুষিক শোষণ যন্ত্রণায় তিলে তিলে মারতে থাকে। মার খেতে খেতে যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকলো, তখন তারা দেখলো– এখন তাদের সামনে দুটি পথ রয়েছে। শোষণ-পীড়ন আর অত্যাচার-অনাচারকে মেনে নিয়ে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া, নতুবা বিদ্রোহ- বিপ্লবের মাধ্যমে স্বৈরাচারের উচ্ছেদ সাধন। হতভাগ্য কৃষক জনসারণ শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে গ্রহণ করলো বিদ্রোহ-বিপ্লবের পথ। দেশের প্রতি কোণায় কোণায় জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের লেলিহান শিখা। সংগঠিত হল অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ।

হিন্দু মধ্যশ্রেণী যখন ইংরেজ শাসনের সাথে পূর্ণ মাত্রায় সহযোগিতা দিয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য, ভূমি-ব্যবস্থা, শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে সুবিধাজনক আসন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত, কৃষক জনসাধারণসহ সকল শ্রেণীর মুসলমান তখন ইংরেজ শাসনের

www.nagorikpathagar.org

বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে ভারতের বুক থেকে ইংরেজ শাসনের মূলোচ্ছেদ করার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর। সংগ্রামের ভয়াবহতা দেখে ভারতের রাজ প্রতিনিধি এক সময় সখেদে বলেছিলেন, "মহারাণীর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই কি মুসলমান ধর্মের একমাত্র অনুশাসন?"

ইংরেজ বণিকরাজ এবং তাদের তাঁবেদার জমিদার-মহাজনের অমানুষিক শাসন-শোষণ ও অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ—ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ আরম্ভ হয় ১৭৬৩ সালে।

'মাদারী' ও 'বোরহানা' সম্প্রদায়ভুক্ত ফকীরগণ বাংলা, বিহার ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে দল বেঁধে বাস করতো। দেশের নানাস্থানে পতিত জমি বা খাস জমি দখল করে কিংবা মোগল শাসকদের নিকট হতে দান হিসেবে প্রাপ্ত জমিতে চাষাবাদ করে এরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতো। আবার বিভিন্ন সময়ে দেশের নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতো। কালক্রমে এদেরই একাংশ কৃষকে পরিণত হয়।

১৬৫৯ সালে শাহযাদা সুজা বাংলাদেশের ফকীরদের জন্য এক সনদ জারি করেন। তাতে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল—ফকির-সন্ন্যাসীরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার পতিত জমি, মালিকবিহীন বা করমুক্ত জমি-জমা নিজেদের খুশিমত ভোগদখল করতে পারবে। তারা দেশের যে কোন স্থানে ভ্রমণ করুক না কেন, দেশের জমিদার বা প্রজারা তাদের খাদ্য বস্তু বা রসদ সরবরাহ করবে, কোন প্রকার টাকা বা কর তাদের উপর ধার্য থাকবে না।

যে ফকীর-সন্ন্যাসীরা বিনা খাজনায় জমি-জমা ভোগ দখল করে আসছিল এবং সর্বত্র যাদের অবাধ গতিবিধি ছিল, হঠাৎ ইংরেজ শাসক তাদের জমি-জমা বাজেয়াপ্ত করল, অতিরিক্ত কর ধার্য করা হল তাদের উপর। বিধি-নিষেধ জারি করা হল তাদের চলাফেরার উপর। এমনকি এক সময় তাদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ জারি করা হল।

এরা একদিকে কৃষক, অপরদিকে ফকীর-সন্ন্যাসী। উভয় দিক থেকেই তারা বিদেশী শাসকদের শোষণ ও উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হয়েছিল বলেই তারা নিজেদের জীবিকা ও ধর্ম রক্ষার জন্য বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। এক রকম বাধ্য হয়েই তারা জমিদার-মহাজনদের গোলায় জমানো ধান-চাল লুট করতে বাধ্য হল। লুট করলো ইংরেজ বণিকদের কুঠি-কাছারি। কালক্রমে এদের সাথে যোগ দিল সহায়সম্বলহীন নিরন্ন চাষী, বেকার সৈনিক, বেকার চাকরিজীবী, পেশা হতে বঞ্চিত তাঁতী। ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে 'কৃষক বিদ্রোহ' বলে ঘোষণা করে হান্টার লিখেছিলেন "বিদ্রোহীরা অন্য কেহ নহে, এরা হল মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনীর বেকার ও বুভুক্ষু সৈন্যগণ এবং জমিহারা-গৃহহারা বুভুক্ষু কৃষকের দল। এই অন্ন-বস্ত্রহীন বেকার সৈন্য ও কৃষক উভয়েই জীবিকা নির্বাহের শেষ উপায় বিদ্রোহ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। এরাই গৃহহারা ও সর্বহারা সন্ন্যাসী-ফকীররূপে দল বেঁধে সারা দেশে ঘুরে বেড়াতো। এক সময় এদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত হয়েছিল।"

সরকারি ইতিহাস ও গেজেটিয়ার রচয়িতা এল. এস. এস. ও. ম্যালিও-র মতে, "মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে যে বিপুল সংখ্যক সৈন্য তাদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, তাদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ লক্ষ।"

www.nagorikpathagar.org

অথচ স্বৈরাচারী ওয়ারেন হেস্টিংস এই মহান বিদ্রোহকে নানা সন্ন্যাসী ও ভোজপুরী দস্যু-ডাকাতদের আক্রমণ ও উৎপাত বলে জাহির করার চেষ্টা করেছেন। তার সাথে সুর মিলিয়েছেন–Sanyasi and Fakir Raidirs of Bengal গ্রন্থের রচয়িতা যামিনী মোহন ঘোষ ও সাম্প্রতিক কালের দেশীয় কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি। অথচ তারা চিন্তা করে দেখেননি যে–ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-এর মত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও এর পরিণতি স্বরূপ ভয়ঙ্কর মহামারীর ফলে বাংলা ও বিহারের দেড় কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল, বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ ও মহামারী কবলিত বাংলাদেশে কোন্ ঐশ্বর্য লুণ্ঠনের জন্য সুদীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে (১৭৬৩–১৮০০) আক্রমণ চালিয়েছিল এবং ইংরেজ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষ প্রাণ দিয়েছিল?

যাহোক বর্তমানে এ সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত যে, ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল মূলত কৃষক বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে যারা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল–তারা হল বাংলা-বিহারের অগণিত কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায়, বিপুল সংখ্যক বুভুক্ষু বেকার সৈন্য বাহিনী এবং ফকীর-সন্ন্যাসীরূপী কৃষক।

এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ছিলেন মজনু শাহ। বাংলা ও বিহারের বেকার সৈন্যবাহিনী, কারিগর ও সর্বহারা কৃষকদের একত্রিত করে একটা বিরাট বিদ্রোহীবাহিনী গঠন করার কাজে মজনু শাহ যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, ইতিহাসে তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। একজন সুদক্ষ সেনাপতিরূপে সৈন্য পরিচালনায় তিনি ছিলেন বিশেষ কৌশলী সংগঠক। তিনি ছিলেন বিদ্রোহের প্রাণ, প্রধান নায়ক। সাধারণভাবে মজনু ফকীর নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি।

এই বিদ্রোহের ক্ষেত্র ছিল ঢাকা, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা। গ্রাম-বাংলার প্রতিটি খেটে খাওয়া মানুষ এই বিদ্রোহের সমর্থক ছিল। কোথাও বিদ্রোহীদের সাথে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ বাধলে গ্রামবাসীরা লাঠি-বল্লম নিয়ে এগিয়ে আসতো বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্যে। এই বিদ্রোহ দমনের কাজে বহু ইংরেজ সৈন্য এবং বিশিষ্ট কয়েকজন ইংরেজ সেনাপতিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। কোন ব্যাপক গণ-বিদ্রোহের সফলতার জন্যে যে আদর্শ ও লক্ষ্য, যে নেতৃত্ব, যে সংগঠন ও সংগ্রামী অভিজ্ঞতার প্রয়োজন গ্রাম-সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ মানুষগুলোর মধ্যে তার বিশেষ অভাব ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত এই মহান বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু ব্যর্থ হলেও পরবর্তী কৃষক বিদ্রোহ ও জন-জাগরণের ক্ষেত্রে এ বিদ্রোহ একটা নতুন পথের ইংগিত দিয়ে গেছে। সেই রক্তাক্ত পথ ধরেই পরবর্তীকালে এদেশের বুকে আরও বহু কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। তাই এই বিদ্রোহ সফল বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত।

কোন দেশের উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। কৃষিপ্রধান দেশের অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি ও কৃষকই দেশের প্রাণ। কিন্তু বিদেশী শাসকদের শোষণমূলক নীতির প্রভাবে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। সামন্তবাদী সমাজ ও জমিদার

www.nagorikpathagar.org

শ্রেণীর শোষণের দায়ে পড়ে কৃষক হারায় তার জমি। এভাবে ক্রমান্বয়ে এক বিরাট সংখ্যক কৃষক ভূমিহীন হয়ে পড়ে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

এই কৃষকেরই আরেক মহাশত্রু মহাজন। খাজনার টাকা সংগ্রহের তাগিদে কৃষক তার জমি ও বাড়ি বন্ধক রাখে মহাজনের কাছে। এই ঋণ সুদসহ বৃদ্ধি পেয়ে একদিন গ্রাস করে কৃষকের জমি-জমা, বাড়ি-ঘর। ফলে কৃষক হয় জমিহারা আর মহাজন হয় জমিদার।

অপরদিকে ইংরেজ বণিকরাজের চক্রান্তে ধ্বংস হল এদেশের শিল্প। যে মসলিন কাপড় ছিল সমস্ত পৃথিবীর কাছে পরম বিস্ময়ের বস্তু, ইংরেজ শাসকদের চক্রান্তে সেই মসলিন কারখানা বন্ধ হল। দৈহিক অত্যাচার ও অত্যধিক করের চাপে পড়ে তাঁতীরা পালিয়ে গেল বনে-জংগলে।

মোটকথা, ব্রিটিশ দুঃশাসনে পড়ে কৃষি ধ্বংস হল, শিল্প বন্ধ হল। অভাব-অনটন আর হাহাকারে ভরে গেল সমগ্র দেশ। শোষণ-উৎপীড়নের চাপে আর অসহনীয় দুঃখ-যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো মানুষ। অনিবার্য ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাংলার কৃষক-শ্রমিক আত্মরক্ষার তাগিদে রুখে দাঁড়াল। অবতীর্ণ হল প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। আজ এখানে, কাল ওখানে এভাবে বিক্ষিপ্তভাবে চলতে লাগলো বেঁচে থাকার সংগ্রাম। সংঘবদ্ধ কোন দল নেই। সুষ্ঠু কোন নেতৃত্ব নেই। অসহায়ভাবে মার খেতে থাকলো; তবুও সংগ্রাম ছাড়লো না।

এ ধরনের একটা অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় কখনও কোন বিপ্লবে পূর্ণ সফলতা ছিনিয়ে আনতে পারে না। তবে তারা অবশ্যই বিপ্লবের হাতিয়াররূপে কাজ করতে পারে। তাই কৃষকদের স্বাধীন নেতৃত্বহীন এবং সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্যহীন এ সংগ্রাম বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্তরে পৌঁছতে পারেনি। তবুও অসহনীয় শোষণের জ্বালায় উদ্বুদ্ধ তাদের এ সংগ্রাম কোনমতেই অর্থহীন হয়নি।

১৭৬৩ সালের ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ১৮৯৫ সালের মুণ্ডা বিদ্রোহ পর্যন্ত সকল বিদ্রোহই ছিল মূলত একই সুরে গাঁথা। অত্যাচারী বেনিয়া কোম্পানি শাসকদের অমানুষিক শোষণ-পীড়নে ক্ষিপ্ত হয়েই এদেশের কৃষক, কারিগর ও ফকীর-সন্ন্যাসীরা একজোটে বিদ্রোহ করেছিল। পরবর্তীকালের সকল বিদ্রোহের মূল দাবী ও ধ্বনি ছিল একই। বিদেশী শাসকদের নাগপাশ থেকে মুক্তি এবং জমিদার-মহাজনের হাত থেকে ভূমিস্বত্ব উদ্ধার—এই ছিল এ সকল বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য। সময়ের ব্যবধান থাকলেও কোন বিদ্রোহই একেবারে পরস্পর সম্পর্কহীন ছিল না।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কৃষকদের এসব সংগ্রাম নেতৃত্বহীন হলেও আপোসমূলক ছিল না। সংগ্রামীরা কোন অবস্থাতেই আত্মসমর্পণ করেনি। সর্বাত্মক ধ্বংস অথবা পরাজয়ের মধ্য দিয়েই সমাপ্ত হয়েছিল প্রতিটি বিদ্রোহ। ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহে হাজার হাজার কৃষক-কারিগর এবং সাঁওতাল বিদ্রোহে ৫০ হাজার বিদ্রোহী সাঁওতাল যুদ্ধক্ষেত্রে আপোসহীন সংগ্রামীরূপে মৃত্যুবরণ করেছিল। ত্রিপুরার শমসের গাজীর বিদ্রোহী বাহিনী নির্ভয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল তবুও আত্মসমর্পণ করেনি। ওহাবী বিদ্রোহের তাপ ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতব্যাপী। নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম থেকে সংগ্রামী মানুষ অসহনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করে সুদূর বালাকোট পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিল। পরাধীনতার তীব্র জ্বালায় অস্থির হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হাজার হাজার বিদ্রোহী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। অন্ধকার

www.nagorikpathagar.org

কারাকক্ষে অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে, তবুও তারা আত্মসমর্পণ করেনি। ওহাবী আন্দোলন ছিল মূলত ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন। মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া নানা প্রকার বিধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার দূর করার সংকল্প নিয়েই ওহাবী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এই আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কার সাধন উদ্দেশ্য নিয়ে আরম্ভ হলেও, পরবর্তীকালে এই আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জমিদার-মহাজন ও নীলকর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে পরিণত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল ধর্মের ধ্বনিতে শুরু করা আন্দোলন।

বাংলা ও বিহারের জমিদার-মহাজনদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। আর কৃষক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছিল মুসলমান। তাই এদেশে সংঘটিত অধিকাংশ জমিদার-মহাজন বিরোধী কৃষক আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা অনেকাংশেই সফল হয়েছিল। যখনই বিদ্রোহীদের আক্রমণে জমিদার মহাজন ও নীলকর গোষ্ঠীর ধ্বংস আসন্ন হয়ে উঠতো, তখনই প্রভাবশালী হিন্দু জমিদারদের চক্রান্তে এই বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িকরূপে চিত্রিত করা হতো। অথচ সমসাময়িককালের বিবরণে দেখা যায়–বাংলাদেশে তীতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত ওহাবী আন্দোলনকারীদের সংখ্যাও ছিল প্রায় আশি হাজার। কোন ভেদাভেদ ছিল না তাদের মধ্যে, সবাই ছিল নিম্নশ্রেণীর মানুষ। বলাবাহুল্য, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল।

ওহাবী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক কলকাতার কলুটোলার বিখ্যাত ব্যবসায়ী আমীর খাঁর মামলার আপীলের শুনানির সময় বোম্বাই হাইকোর্টের বিখ্যাত এডভোকেট এনেস্ট্রি সাহেব প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, ওহাবী বিদ্রোহ মূলত কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়, এই বিদ্রোহ ছিল ভারতে বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্যে কোটি কোটি মানুষের বিদ্রোহ। এনেস্ট্রি সাহেবের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল, সে সকল তথ্য পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলনের শত শত কর্মীকে জুগিয়েছিল সংগ্রামী প্রেরণা।

বিচারে আমীর খাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হওয়ার পর পরই ১৮৭১ সালের অক্টোবর মাসে এই মামলার বিচারপতি নর্ম্যান সাহেব ওহাবীদের গুলিতে নিহত হন। এর কিছুদিন পর বড়লাট মেয়ো আন্দামান ভ্রমণে গেলে ওখানে দ্বীপান্তরিত ওহাবীদের একজনের ছুরিকাঘাতে নিহত হন। ওহাবীদের কর্ম-রীতি ও আন্দোলন প্রক্রিয়াই গ্রহণ করেছিল পরবর্তীকালের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কর্মীরা।

অনেকের মতে মুসলমানদের ধর্মের ধ্বনি থাকায় এই বিদ্রোহ সব মানুষকে কাছে টানতে পারেনি। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত যে, ধনতন্ত্র ও শিল্প বিকাশের পূর্ব যুগে প্রায় সকল দেশেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ধর্মীয় ধ্বনি ছিল একটি প্রধান শক্তি। এমন কি শিল্প যুগে আজও ধর্ম যে বিপ্লবের সহায়ক, এমন কি উৎস-শক্তি হতে পারে তারাও নজীর আধুনিক বিশ্বে একেবারে কম নেই।

ওহাবী বিদ্রোহের ন্যায় ফারায়েজী বিদ্রোহও সাম্প্রদায়িকরূপে আখ্যায়িত হয়, যদিও পরিশেষে এরও স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ নিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে।

www.nagorikpathagar.org

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহ সাংগঠনিক দিক থেকে ছিল অতিশয় সফল বিদ্রোহ। বাংলাদেশের কৃষক বিদ্রোহের ক্ষেত্রে সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই বিদ্রোহের পরিণতিস্বরূপ কৃষি জমির উপর প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। এই আলোচনারই চূড়ান্ত ফলস্বরূপ বিধিবদ্ধ হয়েছিল। প্রজাদের সনদ নামে কথিত ১৮৮৫ সালের বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ স্বৈরাচারী ইংরেজ আমলের একশ' বছরের শোষণ-পীড়নেরই অনিবার্য পরিণতি। এই বিদ্রোহের সূচনা বাংলাদেশে হলেও বিদ্রোহের তৎপরতা বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না।

সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসন, অত্যাচারী জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের বিরুদ্ধে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। এসব বিদ্রোহের মধ্যে একমাত্র নীল বিদ্রোহই উপমহাদেশের ইতিহাসে অন্যতম সফল কৃষক বিদ্রোহ। নীল বিদ্রোহ ছিল পূর্বগত স্বাধীনতাকামী সকল গণবিদ্রোহের ঐতিহ্যবাহী।

বাংলাদেশ ও বিহারের উর্বরা জমিতে উৎপাদিত যে সমস্ত দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য মারফত ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠন করত, নীল ছিল সে সবের অন্যতম প্রধান দ্রব্য। বাংলাদেশের রেশম, আফিম, বস্ত্র, লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের মতই নীল চাষ কৃষক শোষণের একটি প্রধান মাধ্যম রূপে পরিগণিত হয় এবং সুদীর্ঘ একশ' বছর ধরে এ শোষণ সমান গতিতে চলতে থাকে।

বাংলাদেশের নীল ছিল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং তাতে মুনাফা ছিল প্রচুর। প্রচুর মুনাফার লোভে কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা চাকরি ছেড়ে নীলের কুঠি খুলে বসে। ১৮০৩ সাল পর্যন্ত নীল চাষের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হত, তার সবই কোম্পানি অতি অল্প সুদে নীলকরদের আগাম দিত। লোভে পড়ে অনেক দেশীয় জমিদার নীলকুঠি স্থাপন করেছিল, কিন্তু তারা কোম্পানির তরফ থেকে কোন অর্থ সাহায্য লাভ করেনি।

১৮৩৩ সালে ইংরেজদের এদেশে এসে জমি ক্রয় ও বাগিচা শিল্প প্রতিষ্ঠার অধিকার দান আইন প্রণয়নের বহু পূর্ব থেকেই রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ জমিদার গোষ্ঠী ইংরেজদের এদেশে স্থায়ী বাসিন্দারূপে আনার ও তাদের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেয়ার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। ১৮২৯ সালে কলিকাতা টাউন হলে ইংরেজ ভারতীয় ব্যবসায়ী ও মুৎসুদ্দি জমিদার গোষ্ঠীর এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে মিলিতভাবে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের নিকট এক অনুরোধ জানান হয় যেন ইংরেজদের এদেশে বসবাসের এবং অর্থলগ্নি করে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়। রামমোহন ও দ্বারকানাথ সর্বান্তকরণে প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এক স্মারকলিপি পেশ করেন।

বলাবাহুল্য, রামমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের পক্ষে নীলকরদের সমর্থন ছিল খুবই স্বাভাবিক। কারণ তারা ছিলেন নীলকর শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজদের এদেশে জমি ক্রয় করে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের অধিকার দানের পক্ষে ওকালতি করে তারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। পার্লামেন্ট শেষ পর্যন্ত তাদের আবেদন সমর্থন করেছিল। ১৮৩৩ সালে বাগিচা শিল্পের দাস-পরিচালকগণকে এদেশে জমি ক্রয় করে

www.nagorikpathagar.org

স্থায়ী বাসিন্দারূপে এদেশে বসবাস করে রামমোহন-দ্বারকানাথের ভাষায়, "অসভ্য ভারতীয়দের সভ্য করার জন্য ও এদেশে কৃষকদের বৈষয়িক উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা" পাকাপাকি করা হয়।

অথচ রামমোহন, দ্বারকানাথের উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত নীলকরদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে লেয়ার্ড সাহেব ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে বলেছিলেন, "নীলকররা অসহায় কৃষকদের জমি দখল করে নিচ্ছে। তাদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে। গাছ কেটে বাগান ধ্বংস করে দিচ্ছে। যারা এতে বাধা দিচ্ছে তাদের হত্যা করা হচ্ছে অথবা অপহরণ করে জেলে আবদ্ধ রাখছে। সমগ্র দেশে একটা উদ্দাম অরাজকতা চলছে।"

১৮১০ সালে বাংলাদেশের নিরীহ চাষীদের উপর অন্যায়-অত্যাচার করার অভিযোগে ৪ জন নীলকরের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অথচ ১৮৩৩ সালে সেই অত্যাচারী নীলকরদেরই জমি কিনে জমিদার হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। তখন থেকে বাংলাদেশের সর্বত্র নীল ব্যবসার শাখা-প্রশাখা গজিয়ে উঠতে শুরু করে। ১৮৩৭ সালে গঠিত হয় নীলকর সমিতি। অর্থাৎ চাষীদের উপর অবলীলাক্রমে অত্যাচার চালাবার পাকাপাকি ব্যবস্থা তৈরি হয়।

নীল চাষে নীলকরদের কোন প্রকার দায়িত্ব ছিল না। তারা চাষীকে সামান্য কিছু টাকা দাদন দিয়ে সব দায়িত্ব চাষীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিত। নীলকররা কি করে চাষীদের দাদন দিত, সে বিষয়ে ১৮৬০ সালের জুন মাসের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় এক বিবরণী বেরিয়েছিল, তাতে বলা হয়েছে, "একজন নীলকর কোন গ্রামের ইজারা পাওয়া মাত্র তার প্রধান কাজ হল গ্রামে কয়টি লাঙ্গল আছে তা খুঁজে বের করা। তার পরের কাজ হল প্রত্যেককে দু'টাকা করে দাদন দেওয়া এবং লাঙ্গল প্রতি দু'বিঘা জমি চাষ করার জন্যে চাষীকে বাধ্য করা। এভাবে সমস্ত খবর দেওয়ার পর বায়তকে কুঠিতে ডেকে আনা হত। প্রত্যেক চাষীকে লাঙ্গল প্রতি দু'বিঘা থেকে ছ'বিঘা জমি চাষ করতে বাধ্য করা হত। সাদা স্ট্যাম্প কাগজে তাদের সই অথবা বুড়ো আঙ্গুলের টিপ নেওয়া হত। এরপর কুঠির লোক মাঠে গিয়ে ভাল ভাল জমিতে চিহ্ন বসিয়ে দিত। চাষীরা সেসব জমি হয়ত মূল্যবান কোন ফসল বোনার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল।"

নীল কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, "টাকায় ৮ বান্ডিল করে ৩২ বান্ডিল নীলের দাম হয় চার টাকা। অথচ ৩২ বান্ডিল নীল উৎপাদন করতে চাষীর খরচ পড়ে দশ টাকা তের আনা। অর্থাৎ চাষী পাচ্ছে মাত্র চার টাকা। লোকসান হচ্ছে ছয় টাকা তের আনা। সারা বছর পরিশ্রম করে চাষীকে শুধু লোকসানই দিতে হচ্ছে। এরপর তাকে কড়ায়গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হয় আমলাদের দস্তুরি। তার পরিমাণ দাঁড়ায় আট থেকে দশ আনা। এ অবস্থায় যে চাষী একবার দাদন নিত, আর কোনকালেই তার দাদন শোধ হত না।"

যে চুক্তিপত্রে সই করিয়ে বা বুড়ো আঙ্গুলের টিপ নিয়ে চাষীকে দাদন দেওয়া হত, সেই চুক্তির কোন একটা শর্ত পূর্ণ না হলে চাষীকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হত, তার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। নীল বুনতে অস্বীকার করলে চাষীর উপর চলত অকথ্য অত্যাচার। নীল বপনে স্বীকার না হওয়া পর্যন্ত চাষীকে নীলকরের কারাগারে আবদ্ধ থাকতে হত। জ্বালিয়ে দেওয়া হত চাষীর ঘার-বাড়ি। চাষীর স্ত্রী-পুত্রও নীলকরদের

www.nagorikpathagar.org

অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতো না। নীলকরদের চুক্তিপত্র ছিল চির জীবনের দাসখত স্বরূপ। মরেও চাষী রেহাই পেতো না এ অত্যাচারের হাত থেকে। তার স্ত্রী-পুত্রকে বংশ পরম্পরায় এ চুক্তির শর্ত মেনে চলতে হত।

নীলকর ছিল হতভাগ্য চাষীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা–ভাগ্য বিধাতা। নীলকররা যতই অত্যাচারী হোক না কেন, ইংরেজ আইনে তাদের কোন অন্যায়কে অপরাধ বলে গণ্য করা হত না। ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে নীলকর সাহেবের বন্ধুত্ব কিংবা আত্মীয়তা থাকতোই। আত্মীয় না হোক দেশের লোক তো বটেই। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা যখন শিকারে যেতেন, অবসর যাপন করতেন নীলকুঠিতে। ফিরে আসতেন নানা প্রকার উপঢৌকন নিয়ে।

এত যে অত্যাচার, অন্যায়, জুলুম-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোন উপায় ছিল না। প্রতিবাদ বা ওজর-আপত্তি করলেই চাষীকে সইতে হত নানা প্রকার দৈহিক নির্যাতন। অনেক সময় নির্যাতনের পর চাষীকে বন্ধ করে রাখা হত কুঠির কয়েদখানায়। এতে অনেক চাষী মারাও যেত। কুঠির পেয়াদা, গোমস্তা, কেরানী বা লাঠিয়াল এরা ছিল যমের চেয়েও ভয়ংকর এক জীব। এদের অত্যাচারে অনেক সময় চাষীরা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে জান বাঁচাতে। বলাবাহুল্য এসব পাটুক পেয়াদা-বরকন্দাজ লাঠিয়াল সবাই ছিল হিন্দু। বিশেষ করে মুসলমান চাষীদের উপর জুলুম অত্যাচার করতে পারলে তাদের পৈশাচিক উল্লাস বেড়ে যেত শত গুণে।

অথচ দেশে আইন-আদালত ছিল, পুলিশ-দারোগা ছিল। পুলিশের দারোগা আর জমিদারের নায়েব গোমস্তারা ছিল নীলকরদের অর্থে পরিতুষ্ট। তাই দেশে বিচার ছিল না, ছিল বিচারের প্রহসন।

ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ থেকে লাখ লাখ মুসলমান সৈনিক আর সরকারি কর্মচারি তাদের চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ল। ব্যবসায়-বাণিজ্য হারাল। শিল্প ধ্বংস হল। দুর্দশার শেষ সীমায় উপনীত হল শহর ছেড়ে দলে দলে ছুটে গেল গ্রামে। ভেবেছিল কোন রকমে চাষাবাদ করে জীবনটা কাটিয়ে দেবে। গ্রামে এসে প্রথমেই পড়ল তারা জমিদার-মহাজনরূপী রক্তশোষক আর নীলকর দস্যুদের কবলে।

কৃষকদের একমাত্র উপজীব্য কৃষিকাজ। ভূমিই তাদের একমাত্র সম্পত্তি। কে চায় এ সম্পত্তি অপরের হাতে তুলে দিতে? যে নীল চাষে ক্ষতির পরিমাণই বেশি, কে চায় তার সবচেয়ে ভাল জমিতে সেই নীল বুনতে? তবুও হতভাগ্য চাষীকে নিরূপায় হয়েই নীল বুনতে হয়। কিন্তু শোষণ-উৎপীড়নেরও একটা সীমা আছে। চাষীরা বুঝল—এবার তাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দিতে হবে নীল দস্যুদের। বাঁচতে হলে লড়াই করতে হবে– তা না হলে ধ্বংস অনিবার্য। ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শীর্ণদেহ নাড়া দিয়ে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়াল। সংকল্প করল তারা প্রাণ যায় যাক নীল আর বুনবে না তারা।

বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম যেদিন বাংলার মাটিতে নীলকর দস্যুদের আগমন ঘটল সেদিন থেকেই বাংলার কৃষক এর বিরুদ্ধে একাকী, স্থানীয়ভাবে বা আঞ্চলিকভাবে সংগ্রাম শুরু করেছিল এবং নীলচাষের শেষদিন পর্যন্ত এ সংগ্রাম অব্যাহত ছিল।

বিদ্রোহের প্রথম দু'টি স্তর অতিক্রম করে চাষীরা অবশেষে শেষ স্তর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত হল। প্রথম স্তর ছিল শাসক গোষ্ঠীর কাছে করুণা ভিক্ষা ও

www.nagorikpathagar.org

আবেদনের স্তর। দ্বিতীত স্তর অসহযোগিতার স্তর। অর্থাৎ নীলচাষে অস্বীকৃতি। এ অবস্থায় যখন অত্যাচার চরমে উঠল সামরিক ও পুলিশ বাহিনী যখন কৃষককে বলপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করার চেষ্টা চালাল–তখনই চাষীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নিল।

ম্যাজিস্ট্রেটগণ বরাবরই ছিল নীলকরদের সমর্থক। অধিকন্তু সরকার নীলকরদের মধ্য থেকে ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করে তাদের বিচারের ক্ষমতা দান করায় পুরো নীল হাঙ্গামা শাসনের অঙ্গীভূত হয়ে গেল। পুলিশ বাহিনীও ছিল নীলকরদের আজ্ঞাবহ। সুতরাং নীলচাষীর সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ বিপ্লবে পরিণত হল।

নীল চাষের প্রারম্ভ থেকে চাষীদের মনে যে ক্ষোভ ধূমায়িত হয়েছিল ১৮৫৯ সালের মধ্যভাগ থেকে তা বিস্ফোরিত হয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করল। প্রতি জেলায় গ্রামেগঞ্জে নীলকরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ কৃষক নীলচাষ বন্ধ করে তুলে ধরল বিদ্রোহের পতাকা। অনবরত নীলকুঠিগুলোতে আক্রমণ চালাতে লাগল তারা। ১৮৬০ সালের জুন পর্যন্ত নদীয়া, যশোর, পাবনা, রাজশাহী, ফরিদপুর, ২৪ পরগণা ও অন্যান্য জেলায় বিদ্রোহের আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। এই বিদ্রোহে মুসলমান কৃষকদের সাথে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও যোগ দিল। বিদ্রোহের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে কুঠিয়ালসহ সকল ইংরেজ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে আকুল আবেদন জানাল। ১৮৬০ সালের জুলাই মাসে ইংরেজ জমিদার ও বণিক সমিতির সভাপতি ম্যাকিন্‌টে ইংল্যান্ডে ভারত-সচিব চার্লস উড্‌কে এক পত্রে জানালেন যে, কৃষকরা তাদের ঋণ ও চুক্তিপত্র অস্বীকার করে তাদের মহাজন ও মালিকদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করছে। এ দেশ থেকে সকল ইউরোপীয়কে বিতাড়িত করে তাদের হৃত সম্পত্তি উদ্ধার করা এবং গৃহীত সকল ঋণ রদ করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

বলাবাহুল্য, অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে চাষীদের এ বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। এ বিদ্রোহে বাংলাদেশের পঞ্চাশ লক্ষ কৃষক যে দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিল তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। যেসব চাষীকে জেলখানায় আটক করে রাখা হয়েছিল, তারাও কোন প্রকার প্রলোভনে পড়ে নীলচাষ করতে শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়নি। ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বনেজঙ্গলে পালিয়ে গেছে, নিজে জেলখানায় আটক রয়েছে, অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করেছে, তবুও নীলচাষে সম্মত হয়নি।

তারা জানত নীলকরদের হাতে রয়েছে বন্দুক, রিভলবার, গোলাবারুদ আর লাঠিয়াল। তবুও তারা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ–যে কোন মূল্যে নীলকরদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে। হাজার হাজার কৃষক শুধু লাঠি আর বল্লম নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল সংগ্রামে। বহু চাষী প্রাণ হারাল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হল চাষীদের। এমনি করে কুঠির পর কুঠির পতন ঘটতে লাগল। কুঠিয়াল নীলকর প্রাণ নিয়ে পালাল। কুঠির আমিন গোমস্তা মার খেয়ে নাস্তানাবুদ হল। সর্বত্র বিদ্রোহীদের জয়-জয়কার।

বিদ্রোহের ভয়ঙ্কর রূপ উপলব্ধি করে শাসকগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। তারা স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, চাষীদের দাবী পূর্ণ না হলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

www.nagorikpathagar.org

১৮৬০ সালের ৩১ মার্চ নীল চাষীদের বিক্ষোভ ও নীলচাষ সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য "নীল কমিশন" গঠন করা হল। এ কমিশন যাদের নিয়ে গঠিত হল তাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সবাই ছিলেন ইংরেজ। তিন মাস যাবত তদন্ত চালিয়ে ১৩৬ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে কমিশন সরকারের কাছে এক রিপোর্ট পেশ করল। রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বলা হল যে, নীলকরদের ব্যবসায়পদ্ধতি পাপজনক, কার্যত ক্ষতিকারক এবং মূলত ভ্রমসঙ্কুল।

ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ থেকে যে ইংরেজ শাসকগণ মুসলমানদের দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় সর্বদা শত্রু বলে গণ্য করে আসছিল, মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে কেবল হিন্দুদের প্রাধান্য দিয়ে আসছিল, সেই ব্রিটিশ শাসক বাংলার ছোটলাট গ্রান্ট সাহেব নীলকরদের বিদ্রোহের ফলাফল সম্বন্ধে সতর্ক করে লিখেছেন :

"শাত সহস্র মানুষের বিক্ষোভের এ প্রকল্প, যা আমরা বাংলাদেশে আজ দেখছি, তাকে শুধু রং-সংক্রান্ত একটা সাধারণ বাণিজ্যিক প্রশ্ন মনে করে, একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে যিনি ভাবতে পারছেন না, আমার মতে তিনি সময়ের ইংগিত অনুধাবনে মারাত্মক ভুল করছেন।"

পরিশেষে নীল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর আইন করা হল যে, কোন নীলকরই আর চাষীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীলচাষ করাতে পারবে না। নীলের চাষ করা না করা চাষীদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

এই ঘোষণা দ্বারা ইংরেজ সরকার নীল বিদ্রোহেরই জয় ঘোষণা করলেন। বস্তুতপক্ষে নীল চাষীর এ জয় ছিল বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর সকল মানুষের জয়। কারণ ষাট লক্ষাধিক নীল চাষীর নেতৃত্বহীন এ সংগ্রাম যে সমস্ত সমস্যার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছিল–তা শুধু কৃষকের সমস্যা ছিল না, তা ছিল জাতীয় জীবনের মৌলিক সমস্যা। মুনাফার লোভে বিদেশী নীলকর গোষ্ঠী বাংলাদেশের অধিকাংশ উর্বরা জমি নীল চাষের জন্যে দখল করায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমে গিয়ে দেশব্যাপী খাদ্য সঙ্কট চরম আকার ধারণ করেছিল। অপরদিকে নীলচাষ হতে প্রাপ্ত মুনাফার অর্থ চলে যাচ্ছিল বিদেশে। ফলে দেশের মানুষ দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হয়ে পড়ছিল। নীলকরদের শোষণ, উৎপীড়ন, দুর্নীতি ও ব্যাভিচারের ফলে পল্লী বাংলার সমাজ-সংসার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। সর্বস্ব হারিয়ে কৃষক শ্রেণী দুর্দশার শেষ সীমায় উপনীতি হয়েছিল। তাই এ সত্য নিঃসন্দেহে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, নীলচাষীর এ সংগ্রাম সমগ্র দেশকে রক্ষা করেছিল, গোটা বাঙালি জাতিকে বাঁচিয়েছিল।

এ সত্যকে স্বীকার করার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন উদয় হয় যে, বাংলার এ জাতীয় সংগ্রামে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর ভূমিকা কি ছিল? তৎকালে বাংলাদেশের ব্যবসায়ি শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল হিন্দু। তারা ছিল ইংরেজ বণিক শ্রেণীর মুৎসুদ্দি বা দালাল মাত্র। নিজেদের স্বার্থ রক্ষাই ছিল তাদের এক-মাত্র উদ্দেশ্যে। নিজেদের স্বার্থেই এরা নীলকরদের সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং এরা বরাবরই নীলকরদের সমর্থকরূপে পরিচিত ছিল।

জমিদার শ্রেণীর শোষণ উৎপীড়নের প্রত্যক্ষ শিকার ছিল বাংলার হতভাগ্য কৃষক। বাংলার চাষীদের চোখে জমিদার-মহাজন এক জীবন্ত বিভীষিকা। সময় ও সুযোগ মত

www.nagorikpathagar.org

জমিদারগণ নীলকরদের সাহায্যই করেছে। তবে কিছুসংখ্যক জমিদারের জমি-জমা জোরপূর্বক গ্রহণ করায় তারা নীলকরদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। যশোরের তালুকদার শিশির কুমার ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন সত্যিকার মানবদরদী। নীল চাষীদের সংগ্রামে শিশির কুমারের দান অপরিসীম।

সবচেয়ে ভয়ানক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল গ্রাম-বাংলায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। ইংরেজ সৃষ্ট জমিদারী প্রথার কল্যাণে এরা সমাজের বুকে পরগাছা হয়ে শুধু কৃষক শোষণে মত্ত ছিল। অধিকাংশ জমিদার শহরবাসী থাকায় কৃষকের সাথে সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল জমিদারের নায়েব গোমস্তাদের। নীলকরদের সাথে যুক্ত হয়ে এরা কৃষক শোষণ আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। নীলকুঠির নায়েব, গোমস্তা আর দেওয়ান ছিল এরাই। পঞ্চাশ টাকা বেতনের এসব নায়েব দেওয়ান ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকার মালিক ছিল। নীলকর প্রভুদের সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য ও রক্ষা করার চেষ্টা করেছে এরা। নীলকরদের ইংগিতে এরা যেকোন অন্যায় কাজ করার জন্যে প্রস্তুত ছিল।

শহুরে শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন মানবদরদী উদারচেতা ব্যক্তি ব্যতীত বাকি সবাই ছিলেন নির্বিকার–মেরুদণ্ডহীন নির্বাক দর্শক মাত্র। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিস চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দূনবন্ধু মিত্র ও নওয়াব আবদুল লতিফের মত কয়েকজন মানবদরদী ব্যক্তি নীলচাষীদের এ সংগ্রামে যে নির্ভীক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা এক কথায় তুলনাহীন। নওয়াব আবদুল লতিফ স্বয়ং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েও অত্যাচারী ইংরেজ নীলকরের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারির দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁকে বারাসত হতে বদলী হতে হয়। নীল কমিশনের সম্মুখে তাঁর সাক্ষ্য ও দুঃসাহস ও দেশপ্রেমের জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে, যা দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামমোহনের মত তৎকালীন বুদ্ধিজীবীরা দেখাতে পারেননি।

সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা, সরকারি চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য হারিয়ে মুসলমানদের বিতাড়িত হওয়ার পর ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ইংরেজ অনুগ্রহভাজন হিন্দুরাই ছিল শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারা যে সর্ববিষয়ে ইংরেজ শাসকদের সমর্থন জানাতো বা ইংরেজ নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন করতো– এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

নীলকরদের অত্যাচার, চাষীদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, মামলা-মোকদ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা; পরিশেষে ভয়াবহ বিদ্রোহ এসব কিছুরই মূলে রয়েছে জমিদারী প্রথা তথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। অনেক জ্ঞানীগুণী, দেশপ্রেমিক, সমাজসেবক, দেশবরেণ্য নেতা এদেশে জন্মেছেন। তাঁরা বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে, পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে অনেক সারগর্ভ জোরালো বক্তৃতা করেছেন, জনারণ্যে অনেক বাণী ছড়িয়েছেন, কিন্তু বাংলার চাষীর অভিশাপ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ নিয়ে কেউ কখনও কোন কথা বলেননি। বরং কেউ জমিদারী প্রথা কায়েম ও নীলকরদের এ দেশে বসবাস করার স্বপক্ষে ওকালতি করেছেন। বাংলার চাষীর দুঃখময় জীবনে এ ছিল এক মর্মান্তিক পরিহাস।

বলতে বাধা নেই, সমস্ত উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ সমগ্র দেশের বুকে যে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, হিন্দু জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা দালালী ও

www.nagorikpathagar.org

মোসাহেবীর জোরে রাতারাতি অর্থবান হয়েছিলেন, ইংরেজি শিক্ষার জোরে সমাজের সর্বস্তরে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁরা যদি মুসলমানদের প্রতি বৈরীভাব প্রদর্শন করে ইংরেজ শাসকদের সাথে হাত না মিলাতেন, তা হলে বহু পূর্বেই ব্রিটিশ রাজশক্তির পতন ঘটতো। ইতিহাসের ধারা অন্যখাতে প্রবাহিত হতো–বদলে যেতো ভারতের গোটা মানচিত্র।

গ্রন্থ নির্দেশিকা :

হান্টার : দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স (অনুবাদ: বাংলা একাডেমী)

L.S.S.O. Malley : Bengla, Bihar and Orissa under Britis Rule. Hunter : Annals of Rural Bengal.

সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম।

G.H. Rahman : Siyar-al-Mutakherin (Translation).

J.M. Ghose : Sanyasi and Fakir Raiders of Bengal.

ডা. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম।

R.P. Sutta: India To-day.

প্রমোদ সেনগুপ্ত : নীল বিদ্রোহ ও বাঙালি সমাজ।

যতীশ চন্দ্র মিত্র : যশোর খুলনার ইতিহাস।

মেসবাহুল হক : পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ।

Berkland: Bengal under the Lt. Governors Vol. I

বিহারী লাল সরকার : তীতুমীর।

ড. আজিজুর রহমান মল্লিক : ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান।

ড. ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা

মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ্ : আমাদের মুক্তি সংগ্রাম।

M.A. Rahim : The Muslim Society and Politics in Bengal.

সুরজিৎ দাসগুপ্ত : ভারতবর্ষ ও ইসলাম।

সুপ্রকাশ রায় : ভারতে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস।

www.nagorikpathagar.org

মুহিউদ্দীন খান

জিহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা

রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদ শহীদ কর্তৃক পরিচালিত 'জিহাদ আন্দোলন' উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যাপক-ভিত্তিক এক গণ-অভ্যুত্থানরূপে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এ আন্দোলন ছিল প্রধানত পারিপার্শ্বিক নানা অপ-প্রভাবে কলুষিত মুসলিম জনগণের ঈমান-আকীদাকে শির্ক, বিদ'আত, বিজাতীয় অনুকরণ প্রভৃতি নানা জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে পূর্ণ ঈমানী জৌলুস ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পরিচালিত।

মোগল সালতানাতের পতন যুগ শুরু হওয়ার সাথে সাথে জাঠ, মারাঠা, শিখ প্রভৃতি মুসলিমবিদ্বেষী শক্তিগুলোর ব্যাপক অভ্যুত্থান শুরু হয়। পূর্বদিকে বাংলার শাসন ক্ষমতা ইংরেজ বণিকেরা দখল করে নেয়। শিখ সামন্তরাজা রঞ্জিত সিং ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সমগ্র পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দখল করে লাহোরকেন্দ্রিক একটা শক্তিশালী শিখ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বসে। নবোত্থিত এই শিখ শক্তির আগ্রাসী থাবায় পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম জনগণ পর্যায়ক্রমে পর্যুদস্ত হতে থাকে।

অপরদিকে সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী মুসলমানদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনে নেমে আসে মারাত্মক অধঃপতন। ঈমান-আকীদার স্থান দখল করে বসে নানা কুসংস্কার ও বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা। মুসলিম জনগণ পরিণত হয় নামসর্বস্ব মুসলমানে। সমাজের উচ্চবিত্তদের মধ্যে শিয়া ধ্যান-ধারণা, পীর পূজা, গোরপূজাসহ অগণিত শির্ক-বিদ'আত স্থায়ীভাবে শিকড় গেড়ে বসে। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নেমে আসা ক্রমবর্ধমান অধোগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হয়ে এ স্তরের লোকেরা ভোগ-বিলাসের আত্মঘাতী পথে গা ভাসিয়ে দেয়।

অপরদিকে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মুসলিম জনগণ পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজের নানা আচার-আচরণে ব্যাপকভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেক এলাকার মুসলিম জনগণ নামের সংগে হিন্দু পদবী গ্রহণ করাকে গৌরবজনক কৌলিন্যের লক্ষণ বলে বিবেচনা করতে শুরু করে।

পাঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশের বহু লুণ্ঠিত জনপদের মুসলিম নারীদেরকে শিখেরা বাঁদীরূপে ব্যবহার এবং প্রকাশ্য হাট-বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করতে থাকে। মসজিদে আযান এবং জুমা-জামাত বন্ধ হয়ে যায়।

ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহর সুযোগ্য সন্তান এবং সার্থক উত্তরাধিকারী শাহ আবদুল আজীজ তখন জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছেন। হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী (র.)-এর যে সংগ্রামী উত্তরাধিকার তাঁর ধমনীতে প্রবহমান ছিল, সে উত্তরাধিকারের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে তিনি একটা ব্যাপক সংস্কার আন্দোলন শুরু করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। সাংগঠনিক শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে তিনি আগ্রাসী শিখ ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করারও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু বার্ধক্যের

www.nagorikpathagar.org

কারণে এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। তাই তিনি তাঁর প্রিয় শাগরেদ মওলানা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেন। ঐতিহ্যবাহী এক বুযুর্গ পরিবারের সন্তান সুঠামদেহী যুবক সৈয়দ আহমদের অসীম মনোবল এবং আধ্যাত্মিক শক্তি লক্ষ্য করে এ গুরুদায়িত্ব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁর সংগে ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ ইসমাঈল, জামাতা মওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী এবং অন্য এক প্রিয় শাগরেদ মওলানা ইমামুদ্দিন বাঙালিকে যুক্ত করে দেন।

বলাবাহুল্য, সৈয়দ আহমদ শহীদের এ মহৎ আন্দোলন সংগঠন, পরিচালনা এবং প্রাণপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে বাংলার বীর সন্তান মওলানা ইমামুদ্দিনের দুঃসাহসী ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

সৈয়দ সাহেব প্রথমে মুসলিম জনগণের ধর্মীয় সংস্কারের লক্ষ্যে ব্যাপক তাবলিগী সফর শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি অনুধাবন করেন যে, বৈরী শক্তির মুকাবিলা করার মতো বাস্তব পদক্ষেপ ব্যতীত শুধু ওয়াজ-নসিহতের দ্বারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হবে না, তখন তিনি ইংরেজ সহযোগী শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হন। জিহাদ শুরু করার আগে নিবেদিতপ্রাণ একদল মুজাহিদ তৈরি করা এবং জনগণের মধ্যে এ ব্যাপারে ব্যাপক সাড়া জাগানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

পর্যাপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মুজাহিদ তৈরি করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটা অংশ হিসেবেই সদলবলে তিনি হজ্জের সফরে রওনা হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তখনকার দিনে এ সফর ছিল যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি সময়সাপেক্ষ। সৈয়দ সাহেব অন্তত তিন বছরে এই সফর সমাপ্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, সৈয়দ আহমদ শহীদ তাঁর আন্দোলন শুরু করার সূচনাতে স্বীয় উস্তাদ শাহ আবদুল আজীজের যে কয়জন শাগরেদকে তাঁর উপদেষ্টা এবং সার্বক্ষণিক সংগীরূপে পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন মওলানা ইমামুদ্দিন বাঙালি। এছাড়া জিহাদ আন্দোলনের আর একজন শীর্ষ স্থানীয় নেতা ও সংগঠক ছিলেন সূফী নূর মুহাম্মদ নামক বিশিষ্ট সাধক আলেম। এঁরা উভয়ই ছিলেন সৈয়দ সাহেবের বিশিষ্ট খলীফা এবং জিহাদ আন্দোলনের প্রথম কাতারের নেতা ও সংগঠক। এ দুই মহান সাধক বীর পুরুষের মাধ্যমেই জিহাদ আন্দোলনের সাথে বাংলার জনগণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। এঁদের মধ্যে মাওলানা ইমামুদ্দিন ছিলেন নোয়াখালী জেলার হাজীপুরের অধিবাসী এবং সূফী নূর মুহাম্মদ ছিলেন চট্টগ্রামের লোক। এছাড়া হজ্জের সফরে রওনা হয়ে কলিকাতায় দীর্ঘ তিনমাস অবস্থান করেও সৈয়দ সাহেব বহুলোককে প্রত্যক্ষভাবে এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সৈয়দ সাহেব হিজরী ১২৩৬ সনের ১ শওয়াল (১৮২০খ্রি.) ঈদের নামায বাদ রায়বেরেলী থেকে চারশ সংগীসহ নৌকাযোগে কলকাতার পথে রওনা হন। উদ্দেশ্যে, কলকাতা থেকে জাহাজ ভাড়া করে জেদ্দায় যাওয়ার ব্যবস্থা করা।

পথে পথে বিভিন্ন স্থানে মনযিল এবং তাবলীগী সমাবেশ করার পর দীর্ঘ চারমাস পর রাজমহলের পথে এই কাফেলা বাংলার জমীনে এসে প্রবেশ করে। বাংলার সীমান্তে কাফেলার অভ্যর্থনার বর্ণনা দিতে গিয়ে 'ওয়াকায়ে-এ আহ্‌মদী'র লেখক বলেন: রাজমহল

www.nagorikpathagar.org

থেকে মুন্সী মুহাম্মদী আনসারী নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হযরত সৈয়দ সাহেবকে দশ-বারো ক্রোশ দূরবর্তী তাঁর গ্রামে নিয়ে যান। সেখানে মুন্সী মুহাম্মদী আন্সারীর পিতা মুন্সী রউফউদ্দীন, মুন্সী মখদুম বখশ, মুন্সী হাসান আলী, ফজলুর রহমান এবং মুন্সী আযীযুর রহমান সৈয়দ সাহেবের হাতে বায়আত হন। এঁদের মধ্য থেকে মুন্সী রউফউদ্দীন ও মুন্সী ফজলুর রহমান কাফেলার সংগে শরীক হন।

রাজমহল থেকে রওনা হয়ে ৫ সফর কাফেলা মুর্শিদাবাদ পৌঁছে। মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট লোকদের অধিকাংশই ছিল তখন শিয়া মতের অনুসারী। তাযিয়া এবং বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল তাদের প্রধান উপজীব্য। সৈয়দ সাহেব মাওলানা আবদুল হাইকে ওয়ায করার নির্দেশ দিলেন। ওয়াযের প্রভাবে শত শত লোক সৈয়দ সাহেবের হাতে বায়আত হয়ে সকল কুসংস্কার মুক্ত হন। মুর্শিদাবাদ থেকে রওনা হয়ে কাফেলা একরাত কাটোয়ায় অবস্থান করে। সেখান থেকে কাফেলা হুগলী বন্দরে উপনীত হয়। হুগলীতে সাতদিন অবস্থান করে কয়েক হাজার লোককে মুরীদ করা হয়।

কাফেলা হুগলী বন্দরে থাকতেই কলকাতার বিশিষ্ট আইনজীবী মুন্সী আমিনউদ্দীন নৌকাযোগে এসে হযরত সৈয়দ সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং কাফেলার সব লোককে তাঁর মেহমান হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

মুন্সী আমিনউদ্দীন ছিলেন কলকাতার একজন প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। মুন্সী সাহেবের আন্তরিক ভক্তি এবং আগ্রহ লক্ষ্য করে সৈয়দ সাহেব তাঁর মেহমানদারী কবুল করতে সম্মত হন। মুন্সী আমিনউদ্দীন হযরত সৈয়দ সাহেবের কাফেলার মেহমানদারীর জন্যে শহরের উপকণ্ঠে একটা সুপ্রশস্ত বাগানবাড়ি ক্রয় করে রেখেছিলেন। কাফেলার নারী-পুরুষ সকলের জন্যেই এই বাড়িতে ভালভাবে সংকুলান হয়ে গেল। পথে পথে যারা কাফেলায় এসে শরীক হয়েছিলেন, তাঁদের নিয়ে তখন লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পাঁচশতের মতো।

সৈয়দ সাহেবের কাফেলা দীর্ঘ তিনমাস কলকাতায় অবস্থান করেছিল। এ সময়কালের মধ্যে প্রতিদিন বাদ ফযর কাফেলার অবস্থান স্থলে ওয়ায-মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। ভক্তদের অনুরোধে সৈয়দ সাহেব বিভিন্ন লোকের বাড়িতে আয়োজিত মজলিসে গিয়েও শরীক হতেন। বাংলার মুজাহিদীনের জামাত এখান থেকেই সংগঠিত হতে শুরু করে।

'ওয়াকায়ে-এ আহমদী'র বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিদিন শত শত লোক এসে মুন্সী আমিনউদ্দীনের বাগান বাড়িতে সমবেত হতো। সৈয়দ সাহেবের ওয়াজ-নসিহত শুনত এবং বায়আত গ্রহণ করে শির্ক-বিদ'আত থেকে তওবা করতো।

বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় সৈয়দ সাহেবের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য মওলানা ইমামুদ্দীন তাঁর জন্মভূমি নোয়াখালী এবং সূফী নূর মুহাম্মদ চট্টগ্রাম ও সিলেট এলাকায় রওনা হয়ে যান। মওলানা ইমামুদ্দীনের সংগে নোয়াখালী, কুমিল্লা এবং মোমেনশাহী এলাকায় অর্ধশত বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে উপনীত হন। সুফী নূর মুহাম্মদ নিয়ে আসেন সিলেট ও চট্টগ্রামের কিছু বিশিষ্ট লোক। সূফী সাহেবের এই কাফেলার সংগেই এসেছিলেন বাংলার অন্যতম মুজাহিদ সংগঠক মওলানা আবদুল হাকিম চাটগামী, ময়মনসিংহের মুন্সী ইবরাহীম ও সৈয়দ হামযা আরাকানী প্রমুখ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

www.nagorikpathagar.org

কলকাতার সফরেই মৌলভী বরকতুল্লাহ এবং মৌলভী এনায়েতুল্লাহ্ ওরফে কাযী মিয়াজান নামক আরও দু'ব্যক্তি হযরত সৈয়দ সাহেবের খিলাফত লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়।

দীর্ঘ দু'বছর হজ্জের সফরে কাটানোর পর সৈয়দ সাহেব বোম্বে হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। ফেরার পথেও সৈয়দ সাহেব কলকাতায় কিছুকাল অবস্থান করে বাংলার জামাতকে সুসংঘবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। মাওলানা ইমামুদ্দীন পূর্ব বাংলার নোয়াখালী, কুমিল্লা, ঢাকা ও মোমেনশাহী এলাকায় প্রেরিত হন। মৌলভী বরকতুল্লাহ্ উত্তর বঙ্গ এবং সূফী নূর মুহাম্মদ কলকাতার আশেপাশে প্রচার ও সংগঠনের কাজ শুরু করেন।

আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলিম জনসাধারণের আকীদা ও আমলের সংস্কার। দ্বিতীয় পর্যায়ে জনসাধারণের মধ্যে ইসলামী জীবনধারা সম্পর্কে তীব্র অনুভূতি সৃষ্টি করা। তৃতীয় পর্যায়ে সর্বপ্রকার বৈরী শক্তির মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা। চতুর্থ পর্যায়ে জান-মাল দিয়ে কেন্দ্রীয় মুজাহিদ আন্দোলনকে সহযোগিতা দান করার অংগীকার গ্রহণ করা।

মওলানা ইমামুদ্দীন, সূফি নূর মুহাম্মদ, মৌলভী বরকতুল্লাহ্ এবং মওলানা আব্দুল হাকিমের নেতৃত্বে বাংলার মাটিতে আন্দোলন চারটি পর্যায়েই ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। ইংরেজ আমলা হান্টারের ভাষায়–"বাংলায় এমন কোন জনপদ ছিল না, যেখানকার মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ সাহেবের সংস্কারের বাণী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। প্রতিটি ধার্মিক পরিবারের যুবকরা সীমান্তে গিয়ে জিহাদ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো, ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ করে একদিন তারা সীমান্তের মুজাহিদ কাফেলায় যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেত। জমির খাজনা পরিশোধ করতে অসমর্থ কৃষকরাও জিহাদের জন্য নিয়মিত অর্থ প্রদান করতে কুণ্ঠিত হতো না।"

দু'বছর এগারো মাস হজ্জের সফর সমাপ্ত করে সৈয়দ সাহেব রায়বেরেলী পৌঁছেন। ততদিন বার্মা সীমান্ত থেকে শুরু করে দিল্লী পর্যন্ত তাঁর দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে শির্ক ও বিদ'আতের সকল জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে খালেস তওহীদের বিপ্লবী মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল।

সৈয়দ সাহেবের সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল উপমহাদেশের প্রতিটি জনপদের মুসলিম জনগণের জন্য মুক্ত স্বাধীনভাবে আল্লাহ্র বন্দেগী করার মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। হজ্জ থেকে ফিরে যখন তিনি শুনতে পেলেন যে, আগ্রাসী শিখ সামন্ত শাসকেরা পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদশের সর্বত্র মসজিদে আযান এবং জামাত বন্ধ করে দিয়েছে, স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম করার সকল সুযোগ রুদ্ধ করা হয়েছে, অনেক এলাকার মুসলিম নারী-শিশুদের জবরদস্তি করে ধরে এনে গোলাম-বাঁদীতে পরিণত করা হচ্ছে, তখন আর কালবিলম্ব না করে তিনি শিখ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করলেন। মওলানা ইসমাঈল শহীদ, মওলানা আবদুল হাই, মওলানা ইমামুদ্দীন বাঙালি ও সুফি নূর মুহাম্মদ প্রমুখ প্রথম সারির খলীফাগণকে জিহাদের

www.nagorikpathagar.org

কাফেলায় লোকজন সমবেত করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হলো। উর্দু সাহিত্যের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় কবি মোমেন দেহলভী ছিলেন সৈয়দ সাহেবের একজন বিশিষ্ট মুরীদ ও খলীফা। তিনি জিহাদের গীত রচনা করলেন। মুরীদগণের মুখে মুখে তা সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়লো।

সৈয়দ সাহেবের হজ্জ থেকে ফেরার পথে এনায়েতুল্লাহ্ নামক ভাগীরথী তীরের এক নওজোয়ান তাঁর কাফেলায় শরীক হয়ে খিলাফত লাভ করেছিলেন। তিনি বংলার গ্রামে-গঞ্জে মোমেন দেহলভীর জিহাদী কাসীদা পাঠ করে লোকজনকে উদ্দীপিত করার দায়িত্ব নিলেন।

সৈয়দ সাহেব তাঁর আসন্ন জিহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে একটা ইশতেহার রচনা করলেন। ইশতেহারের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

"শিখ জাতি বেশ কিছুকাল যাবত লাহোর এবং আশপাশের এক বিস্তীর্ণ এলাকার উপর জবর দখল কায়েম করে বসে আছে। এদের অত্যাচার নির্যাতন সভ্যতার সকল সীমা অতিক্রম করেছে। এরা হাজার হাজার নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করেছে। অগণিত মুসলমানকে লাঞ্ছিত করেছে। মসজিদে আযান দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গরু জবেহ করা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে।

অত্যাচার নির্যাতন সীমাতিক্রম করার পর সংশ্লিষ্ট মুসলিম জনগণকে জাগ্রত ও সুসংগঠিত করে আগ্রাসী শিখ শক্তির মুকাবিলায় দাঁড়ানোর জন্য জিহাদ ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার মুজাহিদ জিহাদে অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে সীমান্ত প্রদেশের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছেন। ইন্‌শাআল্লাহ খুব শীঘ্রই সশস্ত্র জিহাদ শুরু হচ্ছে। প্রত্যেক মুসলমানকে স্ব স্ব সাধ্য অনুযায়ী এই মহত্তম কাজে অংশগ্রহণ করার জন্যে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে।"

মুজাহেদীনের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাজানো মোকদ্দমার নথিপত্র অনুযায়ী সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করার সেদিনটি ছিল ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর। সেদিন থেকেই সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র মুজাহিদগণ সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মওলানা জাফর থানেশ্বরী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : "মওলানা সৈয়দ আহমদ যখন শত শত মাইল দূরে গিয়ে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সংকল্প ঘোষণা করেন তখন অনেকেই তাঁকে প্রশ্ন করেছিল যে, দেশের অভ্যন্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে সুদূর সীমান্ত এলাকায় গিয়ে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অর্থ কিঃঃ

সৈয়দ সাহেব জবাবে বলেছিলেন, "প্রথমত ইংরেজরা এখানে মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেনি। শিখেরা ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ করছে। দ্বিতীয়ত এদেশে ইংরেজ আধিপত্য মজবুত করার পিছনে শিখদের সক্রিয় সহযোগিতা সর্বজনবিদিত। তৃতীয়ত সীমান্তে মুসলিম আধিপত্য কায়েম হলে পরবর্তী পর্যায়ে সমগ্র উপমহাদেশকে সর্ব প্রকার শত্রুর কবলমুক্ত করা সহজ হবে।"

উপরিউক্ত সুনির্দিষ্ট কতকগুলো লক্ষ্য সামনে নিয়ে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ হিজরী ১২৪১ (১৮২৫খ্রি.) সনের প্রথমদিকে জন্মস্থল রায়বেরেলী থেকে যাত্রা শুরু

www.nagorikpathagar.org

করলেন, তাঁর সংগী-সাথীর সংখ্যা ছিল পাঁচ থেকে ছয় হাজার। এর মধ্যে কাফেলার রোজ-নামচা লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী বাংলার মুজাহিদ সংখ্যা ছিল এক হাজারের কাছাকাছি। তন্মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন চল্লিশ জনের মতো। পাঞ্জাব ও সীমান্ত এলাকার মুসলমানদের হৃত ধর্মীয় অধিকার পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে অগ্রসরমান এই দীনি কাফেলা যাতে যাত্রা পথেই বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সেজন্যে পাঞ্জাবের পথ পরিহার করে তারা সিন্ধুর পথে অগ্রসর হতে থাকেন। পথে পথে হায়দারাবাদ, সিন্ধু, বাহওয়ালপুর হয়ে বোলান উপত্যকা অতিক্রম করে প্রথমে কান্দাহার ও পরে কাবুলে গিয়ে উপনীত হন। পথিমধ্যে সিন্ধর হায়দরাবাদ ও বাহওয়ালপুর এলাকার মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের দাওয়াত চলতে থাকে। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা আবদুল হাই, মাওলানা ইমামুদ্দিন বাঙালি, সূফি নূর মুহাম্মদ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় আলেম ও বুযর্গগণ স্থানে স্থানে ওয়ায-নসিহত করে জনগণকে জিহাদের মন্ত্রে উদ্দীপিত করতে থাকেন।

হিন্দুস্তান থেকে কাবুল পর্যন্ত নিয়মিত যোগযোগ রক্ষা এবং নতুন লোক ও অর্থ পৌছানোর সুব্যবস্থাও সম্পন্ন করা হয়।

কাবুলে কিছুকাল অবস্থান করে খায়বার গিরি পথ হয়ে কাফেলা এসে পেশোয়ার পৌঁছে। পেশোয়ারে তখন রঞ্জিত সিং-এর তরফ থেকে একজন সুবেদার নিয়োজিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায় করে লাহোরে প্রেরণ করতেন। শিখ সেনাদের ছাউনী ছিল আটক দরিয়ার পূর্বপারে পাঞ্জাব সীমান্তে অবস্থিত একটি দূর্গে। দূর্গ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত নিয়মিত সশস্ত্র প্রহরায় ডাক চলাচল করতো। কোন কসবা বা শহরের লোকেরা অবাধ্যতা শুরু করলেই দুর্গ থেকে সৈন্য প্রেরণ করা হতো । চালানো হতো অবাধ লুণ্ঠন এবং অগ্নি সংযোগ। নির্বিচারে হত্যা করা হতো সে এলাকার লোকজনকে।

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ সীমান্ত প্রদেশের কেন্দ্রস্থল পেশোয়ারের সাথে শিখদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে কাফেলাসহ পেশোয়ার উপত্যকা পেছনে রেখে নওশেরায় গিয়ে উপনীত হলেন। এখানে দরিয়া আবাসীনের তীরে অবস্থান গ্রহণ করে নিজস্ব একজন দূতের মারফত রঞ্জিত সিং-এর লাহোর দরবারে একটা বিস্তারিত পত্র প্রেরণ করলেন। পত্রে তাঁর এই অভিযানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে মুসলিম জনগণের সংগে এ পর্যন্ত যে সব জুলুম করা হয়েছে তা বন্ধ করার নিশ্চয়তা বিধান এবং জবর দখলকৃত মুসলিম এলাকাগুলো মুক্ত করে দেয়ার দাবী জানানো হলো।

উদ্ধত লাহোর দরবার একজন সংসারত্যাগী ফকীরের এ পত্রের কোন জবাব না দিয়ে মুজাহিদীনের এ কাফেলাকে শায়েস্তা করার হুকুম দিয়ে সরদার বুধসিং-এর নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিল। মুজাহিদগণের সংগে বুধসিং-এর মুকাবিলা হয় নওশেরা থেকে সাত-আট মাইল দূরবর্তী আকোড়াখটক নামক স্থানে। প্রথম এই মুকাবিলায় সরদার বধুসিং-এর বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

আকোড়াখটকের যুদ্ধে বুধসিং-এর পরাজয়ের ফলে পেশোয়ারের সাথে শিখদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পেশোয়ারের সুবেদার ইয়ার মুহাম্মদ খান এবং তার

www.nagorikpathagar.org

ভাই পীর মুহাম্মদ খান এ খবর শোনার পর পত্র মারফত মুজাহিদগণের সংগে যোগাযোগ করতে শুরু করেন।

সরদার বধুসিংকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর থেকেই মুজাহিদগণ শিখদের তরফ থেকে একটা বড় ধরনের আক্রমণের আশংকা পোষন করে আসছিলেন। নওশেরার পূর্বদিকে সিদোতে সম্ভাব্য সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে প্রস্তুতি শুরু করলেন। ইতিমধ্যে হাযরো নামক স্থানে শিখদের একটা সমাবেশের খবর আসলো। 'মনযুরা' নামক রোজনামচার বর্ণনা অনুযায়ী বাংলার মুজাহিদগণ দ্বারা গঠিত একটা নৈশ অভিযানকারী দল অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সে সমাবেশটা সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে দেয়। এ অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এবং রসদপত্র মুজাহিদগণের হস্তগত হয়।

পরপর দু'টি সংঘর্ষে জয়লাভ করার পর মুজাহিদগণের মনোবল বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে এলাকার জনগণের আস্থাও অনেকটা বর্ধিত হলো। এলাকার বিশিষ্ট আলেম এবং গোত্র সরদারগনের এক সমাবেশে ১৮২৭ সনের ১১ জানুয়ারি হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদকে "আমিরুল মুমেনীন" রূপে ঘোষণা করে তাঁর হাতে জিহাদ এবং ইমামতের বায়আত গ্রহণ করা হলো। পেশোয়ারের আমীর সরদার ইয়ার মুহাম্মদ খান দূত মারফত পত্র প্রেরণ করে 'আমিরুল মু'মেনীন' -এর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলেন। হযরত সৈয়দ সাহেব ইয়ার মুহাম্মদ খানকেই শাসন কর্তৃত্বে বহাল রেখে বিশিষ্ট আলেমগণের একটি পরামর্শ মজলিস কায়েম করে সমগ্র সীমান্ত প্রদেশে ইসলামী আইন কানুন জারী করার সুব্যবস্থা করেন। 'মনযুরার' লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী পেশোয়ারকেন্দ্রিক ইসলামী হুকুমতের পরামর্শ সভায় যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মওলানা ইমামুদ্দিন বাঙালি।

পাঠান গোত্রপতিদের একটা অংশ প্রথম থেকেই হযরত সৈয়দ আহমদের কর্মত ৎপরতার সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করতে পারছিল না। শিখদের সাথে এদের নানা ধরনের বৈষয়িক স্বার্থ জড়িত ছিল। তাছাড়া দীর্ঘকালের নানা কুসংস্কারের ভাগাড়ে নিমজ্জিত মন-মানসিকতায় সৈয়দ সাহেবের কঠোর সংস্কার আন্দোলন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল। পাঠানরা সাধারণত পীরভক্ত জাতি। এদের এই স্বাভাবিক প্রবণতার সুযোগ নিয়ে প্রতি এলাকায় গড়ে উঠেছিল অসংখ্য পীরের গদী। এসব পীরের অধিকাংশই ছিল শরীয়তের অনুশাসনের সাথে সম্পর্কহীন এবং আকণ্ঠ নানা কুসংস্কারে নিমজ্জিত। সৈয়দ সাহেবের সংস্কার আন্দোলন তাদের গদিভিত্তিক স্বার্থ বিপন্ন করার উপক্রম করেছিল। তাই তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার শুরু করলো। লাহোর দরবারের ইংরেজ উপদেষ্টারা এ বিরোধিতার আগুণে নানাভাবে ঘৃতাহুতি দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করলো না। পাঞ্জাব এবং সীমান্তের এক শ্রেণীর পেশাদার আলেমকে দিয়ে মুজাহিদ আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ফতওয়াবাজী শুরু করানো হলো। শিখদের কিছু অনুচরকে কৌশলে মুজাহিদগণের কাফেলার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করানো হলো। সিদুর যুদ্ধ যেদিন শুরু হয়, তার আগের রাত্রে হযরত সৈয়দ সাহেবের খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হলো। সকাল বেলায় মওনালা মুহম্মদ ইসমাইল সৈয়দ সাহেবের শয়ন কক্ষে গিয়ে

www.nagorikpathagar.org

দেখতে পেলেন তিনি অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁর মুখ থেকে ফেনা বের হচ্ছে। তড়িৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে কিছুটা উপশম দেখা দিল। ইতিমধ্যে সিদুর ময়দানের বিরাট শিখ বাহিনীর হামলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত এ বাহিনীর মুকাবেলা করার মত অস্ত্র বা লোকবল মুজাহিদগণের ছিল না। স্বয়ং সৈয়দ সাহেব ছিলেন বিষক্রিয়ায় মৃতপ্রায়। এ অবস্থার মধ্যেই মুজাহিদগণ যুদ্ধ শুরু করলেন। সৈয়দ সাহেব একটু সুস্থ বোধ করলে কয়েকজন লোকের কাঁধে ভর করে তিনি ঘোড়ার উপর সওয়ার হলেন এবং ময়দানে চলে গেলেন। তুমুল যুদ্ধের পর মুজাহিদগণের আংশিক পরাজয় হলো এবং ময়দান ছেড়ে তাঁরা কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হলেন। কিন্তু শিখ সৈন্যও সামনে অগ্রসর হতে পারলো না।

সিদুর যুদ্ধের ফলাফল প্রতিকূলে যাওয়ার পর থেকে মুজাহিদগণের সামনে একের পর এক নানা সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে আসলো। শিখ এবং ইংরেজদের নিয়োজিত অনুচরবৃন্দের নানা অপপ্রচারের তাণ্ডবের মুখে আন্দোলনের গতি মূল হিন্দুস্তানে অনেকটা শ্লথ হয়ে পড়লো। কাফেলার খাদ্য এবং অন্যান্য রসদ মূলত হিন্দুস্তানের সরবরাহ থেকেই আসতো। শিখেরা এ সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। ইতিমধ্যে এমন কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল যার ফলশ্রুতিতে মূল আন্দোলন মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হলো। মৌলবী মাহবুব আলী নামক একজন মুজাহিদ নেতার নেতৃত্বে বিহারের এবং বাংলার একদল মুজাহিদ পেশওয়ারের পথে রওনা হয়ে সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করার পর দুররানী পাঠানদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং লুণ্ঠিত ও সর্বস্বান্ত হয়ে মূল কাফেলা পর্যন্ত এসে উপনীত হন। পাঠানদের দুর্ব্যবহারে মৌলবী সাহেব এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে, কাফেলার লোকজনকে তিনি দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে তুমুল প্রচারণা শুরু করেন। ফলে কিছুলোক মনঃক্ষুণ্ন হয়ে তাঁর সাথে দেশে ফিরে আসে। এতে মুজাহিদ বাহিনীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড শীতে ও খাদ্যাভাবে মুজাহিদগণ চরম দুর্দশার সম্মুখীন হন। অনেক সময় দিনের পর দিন তাঁরা গাছের পাতা সিদ্ধ করে ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণ করতেন। এ সঙ্কটময় অবস্থার মধ্যেই হযরত সৈয়দ সাহেবের অন্যতম প্রিয় সাথী এবং সর্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞ উপদেষ্টা বলে পরিচিত মওলানা আব্দুল হাই লাখনৌভী ইন্তেকাল করেন। (২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮২৮ খ্রি.)।

'ওয়াকায়ে-এ আহমদী'র লেখকের মতে মুজাহীদ আন্দোলনের এই চরম দুর্দিনে সর্বপ্রথম নতুন লস্কর এবং অর্থ-সাহায্য এসেছিল বাংলাদেশ থেকে। ঢাকার মুজাহিদগণের প্রেরিত এই সাহায্য পৌঁছার পর থেকে একটানা উপবাসের অবসান হয়। মুজাহিদগণ নতুন করে উদ্দীপনা লাভ করেন।

জন্মভূমি এবং পরিবার-পরিজন থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অপরিচিত অনভ্যস্ত দুর্গম পার্বত্য এলাকার প্রতিকূল পরিবেশে সীমাহীন আপদ-বিপদের মধ্যেও মুজাহিদগণ শিখদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে যেতে লাগলো। মওলানা ইসমাঈল শহীদের নেতৃত্বে পরিচালিত এসব অভিযানের প্রতিটিতেই বিপুল সাফল্য অর্জিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাজা রনজিৎ সিং সৈয়দ সাহেবকে আবাসীন দরিয়ার বাম দিককার

www.nagorikpathagar.org

সমগ্র এলাকা ছেড়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করার প্রস্তাবসহ হাকীম আজীজুদ্দিন ও সরদার ওজীর সিংকে দূতরূপে প্রেরণ করে। সৈয়দ সাহেব মৌলবী খায়রুদ্দীন শিরকুটী ও হাজী বাহাদুর খানের মাধ্যমে সন্ধির শর্তাদি লিখে পাঠান। তাঁর দাবী ছিল, সীমান্তের যেসব এলাকায় ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে গেছে, সেসব এলাকায় শিখেরা আর আক্রমণ করবে না। শিখ শাসিত অবশিষ্ট এলাকায় মুসলমানদিগকে পূর্ণ ধর্মীয় আজাদী দিতে হবে। দখলীকৃত মসজিদগুলো ছেড়ে দিতে হবে।

রঞ্জিত সিং এসব শর্ত মেনে নিয়েই মুজাহিদগণের সংগে একটা সম্মানজনক সন্ধি করার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু লাহোর দরবারের ইংরেজ উপদেষ্টা জেনারেল ভিন্টোরা সন্ধির প্রস্তাবে একমত না হয়ে নানা কূটকৌশলের পথে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দিল। এরা এমন একটা ষড়যন্ত্রের নীলনক্শা তৈরি করলো, যদ্দ্বারা পাঠান সর্দার এবং মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে হানাহানি সৃষ্টি করে দেওয়া যায়। ফলে দেখা গেল, কিছুদিনের মধ্যেই শিখদের পরিবর্তে মুজাহিদগণ পাঠান সর্দারদের আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। পেশওয়ারের আমীর সরদার বাহাদুর খান জেনারেল ভিন্টোয়ার উস্কানীতে মুজাহিদগনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করলো। কিন্তু প্রথম হামলাতেই বাহাদুর খান নিহত এবং তার সৈন্যবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে গেল। তার কণিষ্ঠ সহোদর সর্দার সুলতান মুহাম্মদ খান আরবাব ফয়জুল্লাহর মাধ্যমে সৈয়দ সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং পেশওয়ারের আমীর পদে তাকে বহাল করা হয়। মওলানা সৈয়দ মাজহার আলী আজিমাবাদীকে প্রধান কাজী নিযুক্ত করে শাসন ও বিচার বিভাগের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত জারী করা হয়। কিন্তু ব্যাপক ষড়যন্ত্রের মুখে এ ব্যবস্থা বেশি দিন টিকে থাকতে পরলো না। ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত পাঠান সর্দারদের মধ্যে শরীয়তের স্বচ্ছ জীবন-ব্যবস্থা নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। এ সুযোগে লাহোর দরবারের উপদেষ্টা জেনারেল ভিন্টোরা পাঠান সর্দারদের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বণ্টন করে সৈয়দ সাহেবের তরফ থেকে নিয়োজিত ওশর আদায়কারী মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে একই রাতে হত্যা করার ব্যবস্থা করে। বার্মা সীমান্ত থেকে শুরু করে সমগ্র হিন্দুস্তান থেকে আগত আল্লাহর পথে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ, যাঁরা বাড়িঘর পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে সীমান্তের জনগণকে শিখ নির্যাতনের যাঁতাকল থেকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে এসেছিলেন, তাদের সবাইকে একই রাতে এশার নামাযে রত অবস্থায় অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হলো।

এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের খবরে সৈয়দ সাহেব এমন মর্মাহত হয়েছিলেন যে, পাঠানদের মধ্যে কাজ করার সকল উৎসাহ তিনি হারিয়ে ফেললেন। মুজাহিদগণকে ডেকে স্ব স্ব জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন। কিছুলোক তাঁর অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে এলো। কিন্তু অন্যান্য অনেকের সংগেই বাংলার মুজাহিদগণ সৈয়দ সাহেবের সংগত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন না। 'ওকায়ে এ আহমদী'র লেখকের মতে এই সঙ্কটজনক অবস্থায় মাওলানা ইমামুদ্দিন বাঙালির সার্বক্ষণিক উপস্থিতি এবং মৌলবী এনায়েতুল্লাহ উরফে মিয়াজান কাজীর উদ্দীপনা মুজাহিদগণের মধ্যে নতুন মনোবলের সৃষ্টি করেছিল।

www.nagorikpathagar.org

পেশোয়ার উপত্যকায় অবস্থান অর্থহীন বিবেচনা করে সৈয়দ সাহেব কাগানের পার্বত্য এলাকার দিকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেদিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু পথিমধ্যে বালাকোটের সন্নিকটে উপনীত হওয়ার সাথে সাথে সর্দার শেরসিং-এর নেতৃত্বে একটি বিরাট শিখ সৈন্যবাহিনী এসে সমগ্র এলাকা ঘিরে ফেললো। বালাকোটের ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো শেষযুদ্ধ। এ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে জয়ী হয়েও সংগীয় কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় আমীরুল মুমেনীন হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী এবং তাঁর প্রধান সহচর মওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ হলেন। (৬ মে, ১৮৩১খ্রি.)। সমাপ্ত হলো জিহাদ আন্দোলনের এক অধ্যায়।

বালাকোট যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাদের সংখ্যা দু'শতাধিক বলে বর্ণনা করা হয়। তন্মধ্যে নেতৃস্থানীয় একশো একচল্লিশ জনের নাম যুদ্ধের রোজনামচা থেকে সংগ্রহ করে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই অমর শহীদানের তালিকায় বাংলাদেশের শীর্সস্থানীয় অন্তত নয়জন মুজাহিদের নাম এ পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে। এরা হচ্ছেন– রাজমহলের মুন্সী মুহাম্মদী আনসারী, মাওলানা শরফুদ্দীন বাঙালি, নোয়াখালীর মাওলানা লুৎফুল্লাহ, মোমেনশাহীর মুন্সী ইবরাহীম, কলিকাতার নওমুসলিম মুহম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকার সৈয়দ মুজাফফর হোসাইন ও মৌ: করিম বখশ, চট্টগ্রাম এলাকার মৌলবী আলীমুদ্দিন এবং চব্বিশ পরগণার মৌলবী ফয়জুদ্দিন।

মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙালিসহ বাংলাদেশের যেসব মুজাহিদ গাজী গুরুতররূপে আহত হয়েছিলেন, তাদের সংখ্যা চল্লিশ জনের মতো বলা হয়। কিন্তু অনেক তালাশ করেও আহত গাজীগণের তালিকা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বালাকোটের ময়দানে কাফেলার ভিতরে কিছু সংখ্যক বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রের ফলেই আমিরুল মুমেনীন হযরত সৈয়দ আহমদ এবং তার শীর্ষস্থানীয় সংগীগণ শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু এই শাহাদত জিহাদ আন্দোলনকে এক মুহূর্তের জন্যেও স্তব্ধ করতে পারেনি। হতাবশিষ্ট মুজাহিদগণ সৈয়দ সাহেবের আকস্মিক শাহাদাতের শোক ভুলতে না পারলেও অবিশ্বাস্য রকম দ্রুততার সাথে পুনঃগঠিত হয়েছিলেন এবং পশ্চিমদিকে গভীর পার্বত্য এলাকায় সরে গিয়ে সিতানায় কেন্দ্র স্থাপন করে জিহাদ অব্যাহত রেখেছিলেন।

বাংলার মুজাহিদ গাজীগণ মাওলানা ইমামুদ্দিনের নেতৃত্বে দেশে ফিরে আসলেন। সূফী নূর মুহাম্মদ সীতাকুণ্ড পাহাড়ের পাদদেশে নিজামপুরে এসে আস্তানা স্থাপন করলেন। মওলানা আবদুল হাকিম স্থান নির্বাচন করলেন চট্টগ্রাম থেকে আরো দূরে আরাকান সড়কের পাশে গভীর অরণ্যানী ঘেরা চুনতী গ্রামে। মৌলবী এনায়েতুল্লাহ ওরফে মিয়াজান কাজী দেশে ফেরার পথে পানিপথে গ্রেফতার হয়ে ফাঁসীর মঞ্চে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। মওলানা ইমামুদ্দীন বাঙালি দীর্ঘকাল সিতানার কেন্দ্রে অবস্থান করার পর নোয়াখালীর হাজীপুরে ফিরে এলেন। এদিকে ঢাকার বংশাল এলাকায় গড়ে তোলা হলো আন্দোলনের গোপন কেন্দ্র। এখান থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে পাটনা এবং পাটনা থেকে বাহওয়ালপুরের খানপুর হয়ে মুজাহিদগণের কাফেলা নিয়মিত সিতানায় যাতায়াত

www.nagorikpathagar.org

করতে লাগলো। প্রায় এক শতাব্দিকাল ধরে অব্যাহত ছিল এই যোগাযোগ। বংশালের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী বদরুদ্দিন ছিলেন অত্র অঞ্চলের মুজাহিদগণের অন্যতম প্রধান মুরুব্বী। তিনি নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহ করে পাটনার কেন্দ্রে প্রেরণ করতেন। পাটনা থেকে সে অর্থ চলে যেতো মুজাহিদগণের সিতানার ছাউনীতে। লোক-লস্কর সংগৃহীত হতো এবং তাঁরাও হাজী সাহেবের লেখা নিয়ে চলতেন পাটনায় ফুলওয়ারীতে।

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের আন্দোলন ছিল মূলত সংস্কারধর্মী। সীমান্তে মুজাহিদ অভিযান ছিল এর একটা অধ্যায় মাত্র। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে তিনি মুজাহিদীনের কাফেলাকে সীমান্তের দুর্গম পার্বত্য এলাকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছিল। মুজাহিদীনের রক্তদানের বদলায় সীমান্ত এবং পাঞ্জাবের মুসলমানগণ আগ্রাসী শিখ শক্তির নির্যাতন থেকে অনেকটা রক্ষা পেয়েছিলেন। উপরন্তু পেশোয়ারকেন্দ্রিক একটি ইসলামী খিলাফত কায়েম করে চার বছরাধিককাল তা পরিচালনা করার মাধ্যমে পরবর্তী যুগের ঈমান-সমৃদ্ধ মুসলমানদের সামনে নবুওতের আদর্শে খিলাফতের এমন এক বাস্তব নমুনা তিনি পেশ করে গেছেন, যা আজ পর্যন্ত ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠাকামীদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে।

হযরত সৈয়দ সাহেবের সংস্কার আন্দোলনের উত্তরাধিকার যাঁরা এ বাংলার জমিনে বহন করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট খলীফা মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী। ইনি সারা জীবন বাংলা-আসামে ঈমান-আখলাক সংস্কারের প্রচেষ্টা চালিয়ে এ বাংলার মাটিতেই চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। তাঁর সে প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা তাঁর সুযোগ্য বংশধর এবং বহুসংখ্যক অনুসারীর মাধ্যমে এদেশে আজো অব্যাহত রয়েছে। মওলানা ইমামুদ্দিন ও মওলানা আব্দুল হাকিম প্রধানত মুজাহিদ সংগঠনের কাজেই নিয়োজিত থাকেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা এ কাজ করে গেছেন। মুসলিম জনগণের ধর্মীয় ও সামজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো।

সূফী নূর মুহাম্মদের সংস্কার আন্দোলনের প্রধান উত্তরাধিকারী ছিলেন কলকাতার সূফি ফতেহ্ আলী। সূফী ফতেহ্ আলীর খলীফা বাংলার মোজাদ্দেদ ফুরফুরার মওলানা আবু বকর সিদ্দিক এবং তাঁর খলীফাগণের মধ্যে শর্ষিনার মওলানা নেছারউদ্দিন ও চব্বিশ পরগণার মওলানা রুহুল আমীন সাহেবের দীনি খেদমত এদেশে সর্বজনবিদিত।

উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের এসব অনুসারীর কর্মপ্রচেষ্টা শুধু ওয়ায-নসিহতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এদেশের পর্যুদস্ত মুসলমানের ইমান-আকীদার সংস্কার করার সাথে সাথে শিক্ষা বিস্তার এবং শোষিত- নৈরাজ্য-পীড়িত জনগণের মধ্যে অধিকার সচেতনতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেও তাঁদের অবদান ছিল সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। অপরদিকে বালাকোট পরবর্তী সশস্ত্র সংগ্রাম সিপাহী বিপ্লব থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সনে উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়ন পর্যন্ত যতগুলো গণ-আন্দোলন হয়েছে, তার প্রতিটি আন্দোলন সংগঠনে সৈয়দ আহমদ শহীদের মুজাহিদ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব সমভাবে লক্ষ্য করার মতো।

www.nagorikpathagar.org

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

বাংলাদেশে সিপাহী বিপ্লব এবং তার ব্যর্থতার পরিণতি

সিপাহী বিপ্লব কোন প্রাদেশিক অভ্যুত্থান নয়। কাজেই এ বিপ্লব বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে উত্তর ভারতের সকল প্রদেশেই এ বিপ্লবের শিখা প্রজ্বলিত ছিল। সিপাহী বিপ্লবের মূলে ছিল মুজাহেদীন আন্দোলনের অনুপ্রেরণা, যে অনুপ্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে– "এ বিপ্লবের নব্বই বৎসর পূর্বে মহীশূরের সুলতান হায়দার আলী যে আওয়াজ তুলেছিলেন এবং যার জন্যে পরবর্তীকালে টিপু সুলতান জান কুরবান করেছিলেন, সেই একই উদ্দেশ্য হাসিলের দাওয়াতে তারাও জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালের প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে ১৮৩১ সালে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীও সে দাওয়াতই জানিয়েছিলেন। তাঁর সে দাওয়াত যদিও প্রথমে দেশবাসীকে সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত করতে পারেনি, তবুও তা মানুষের অন্তরে দীর্ঘকাল ক্রিয়াশীল ছিল এবং সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে তা দেখা দিয়েছিল আকস্মিক বিপ্লবের মত।"[১]

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে সীমান্ত প্রদেশের সিতানা ও বালাকোটে বিশ্বাসঘাতকদের অভিসন্ধির ফলে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদ যে মর্মন্তুদ শাহাদাত বরণ করেছিলেন, তারই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে প্রধানত উলেমা সমাজের লোকদের দ্বারা তৎকালীন যুক্ত প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশের) অন্তর্গত শামেলী নামক একটা স্থানকে কেন্দ্র করে এ বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছিল। পরে তার পার্শ্ববর্তী সাহরানপুর, থানাভবন প্রভৃতি কেন্দ্রেও এ বিপ্লবের হোতাগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন। বর্তমানকালে গবেষণার ফলে দেখা যায়, জিহাদী নেতাদের মধ্যে জেনারেল বখত খান ও মওলানা আহমদ উল্লাহ্ শাহ, মওলানা খয়রাবাদী দিল্লী কেন্দ্রে, হাজী ইমদাদউল্লাহ তাঁর অনুসারীদেরসহ শামেলী ও তার পার্শ্ববর্তী সাহরানপুর, থানাভবন প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজ সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সাহারানপুর ও পার্শ্ববর্তী শামেলী, থানাভবন কেন্দ্রে মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেবের বংশধর বাস করতেন। বালাকোটের পতনের পর এঁরা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় জীবন যাপন করলেও তাঁদের জিহাদী প্রেরণা নষ্ট হয়নি। এঁদের মধ্যে বালাকোটের শহীদ সৈয়দ আহমদের অন্যতম অনুসারী হাফিজ কাসিম সাহেবই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। হাফিজ সাহেব তাঁর অসংখ্য মুরীদ ও বিশিষ্ট মুজাহিদগণসহ বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। তাঁর মুরীদ ও বিশিষ্ট মুজাহিদীনের মধ্যে ছিলেন মহামান্য আলেম ও আধ্যাত্মিক সাধনার বলে উচ্চস্তরে অবস্থিত হযরত হাজী ইমদাদউল্লাহ মরহুম মগফুর (র.)। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসিম নানাতভি, মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগোহী, মাওলানা মোহাম্মদ মুনীর প্রমুখ আলেমও ছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ইংরেজদের বিরোধী এক একটা শক্তিকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। সেসব কেন্দ্রের ভার উলেমা সমাজের লোকদের হাতেই বিশেষভাবে ন্যাস্ত ছিল। তবে তাদের মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র আগাগোড়া বর্তমান ছিল।

www.nagorikpathagar.org

তার প্রমাণ এখনও ইতিহাসে জাজ্বল্যমান। সাহারানপুর ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানে হাফিজ জামেন তাঁর কর্মচারীদের নিয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হন। তিনি স্বয়ং সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। হাজী ইমদাদউল্লাহ সাহেবকে জিহাদের ইমাম, মওলানা কাসিম নানাতবিকে সেনাপতি ও মওলানা রশীদ আহমদ গাংগোহীকে কাজী নিযুক্ত করা হয়। মওলানা মুগীর সাহেব হাফিজ জামেন সাহেবের সাথে সৈন্য চালনার কাজে অগ্রসর হন।

শামেলী ও তৎসংলগ্ন জায়গা ব্যতীত দিল্লী, এলাহাবাদ ও কানপুর প্রভৃতি স্থানেও মুজাহিদগণের নানা কেন্দ্র ছিল এবং সেসব কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন প্রধানত আলেম সাহেবগণ। দিল্লী কেন্দ্রের নেতা ছিলেন জেনারেল বখ্‌ত মোহাম্মদ খান, মওলানা আহমদউল্লাহ শাহ, মওলানা ফজ্‌লে হক খয়রাবাদী প্রমুখ আলেম।

যদিও হিন্দু সমাজের মারাঠা নেতা নানা ফড়নবিশ ও ঝাঁন্সির রাণী লক্ষ্মী বাঈ এ বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তবুও এর প্রধান হোতা ও উদ্যোক্তা ছিলেন আলেমগণ। বিশ্বাসঘাতকদের নানা ষড়যন্ত্রের ফলে উত্তরাঞ্চলের এ বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যায়।

বর্তমান উত্তর প্রদেশ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে এ বিপ্লব ভীষণ আকারে দেখা দিলেও- এ বিপ্লবের প্রথম আগুন জ্বলে উঠে বঙ্গদেশের বারাকপুরে। বারাকপুরের সেনানিবাসেই সর্বপ্রথম এ বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। কারণ যদিও শামেলী প্রভৃতি কেন্দ্রে তার মূল অধিনায়কগণ উপস্থিত ছিলেন তবুও তারা রক্তপদ্ম ও লাল চাপাতির মাধ্যমে এ বিপ্লবের আগুণ সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। সে বিপ্লব এমন সুসংগঠিত ছিল যে, দিল্লী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রত্যেক দিন বিপ্লবীদের কীর্তি-কলাপের সংবাদ সরবরাহ করা হত।

বারাকপুরে এ বিপ্লবের বহ্নি সর্বপ্রথম দেখা দিলেও বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলে তার শিখা ছড়িয়ে পড়েছিল। "চট্টগ্রামের ৩০০ সীমান্ত রক্ষী সৈন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে ট্রেজারী লুট করে কুমিল্লা জেলা হয়ে সিলেটে প্রবেশ করেন। বিদ্রোহী সিপাহীরা পৃথিমপাশার প্রখ্যাত জমিদার গৌস আলী খাঁর নিকট থেকে বলপূর্বক রসদ সংগ্রহ করে, সিলেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। আরেক তথ্যানুসারে জানা যায়, পৃথিমপাশার জমিদার স্বেচ্ছায় সেনাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য দান করেছিলেন। ফলত জমিদার সাহেব ইংরেজদের কোপানলে পতিত হয়েছিলেন। সিলেটে অবস্থানরত ইংরেজ সেনাপতি মেজর বিং এই সংবাদ পেয়ে বিদ্রোহী সেনাদের গতিরোধ করার জন্যে সিলেট থেকে প্রতাপগড়ের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। বড়লেখা থানাধীন লাতুতে ইংরেজ ও বিদ্রোহী সিপাহীদের এই যুদ্ধ বিখ্যাত লাতুর যুদ্ধ নামে সুপরিচিত।[২] লাতুর এ সংগ্রামে পরাজিত এদেশীয় সৈন্যগণকে শৃঙ্খলাবস্থায় সিলেট নিয়ে আসার পর তাড়াতাড়ি তাদের বিচার হয়ে যায়। কারণ এ বিদ্রোহ নির্বাপিত হওয়ার সংগে সংগেই পূর্ব পরিকল্পনামত বিচারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।" এ বিদ্রোহ নির্বাপিত হওয়ার পর ব্রিটিশেরা মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করতে শুরু করলো। আর এজন্য জেলায় জেলায় ফাসী দানকারী জল্লাদেরও অভাব ঘটেনি।[৩] সিলেটে এখনও প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে যে, এসব বিদ্রোহীকে লাতু থেকে সিলেটে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বর্তমান হাসন মার্কেটে (পূর্বতন গোবিন্দচরণ পার্কে) অবস্থিত বটগাছের এক একটা ডালে এক একজন সিপাহীকে প্রকাশ্য দিবালোকে ফাঁসি

www.nagorikpathagar.org

দেয়া হয়েছিল এবং তাদের লাশ কোন আত্মীয়স্বজনকে দাফন করার জন্যে দেয়া হয়নি। তাদের এ গলিত শবগুলো নরমাংসাশী শকুনদের আহার্যে পরিণত হয়েছিল এবং তাদের অস্থিপাঞ্জরগুলো দীর্ঘকাল তাদের এ অভিশপ্ত জীবনের পরিচয় বহন করতো।

কেবলমাত্র সিলেটেই নয়, এ ঢাকার বুকেও সে অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হয়েছে। "বর্তমানে শহীদ বাহাদুর শাহ পার্ক নামে পরিচিত ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে একযোগে ষাট জন মুসলমানকে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল এবং তাদের লাশ মাসের পর মাস বৃক্ষ শাখায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।"[৪] হলফেজ লিখেছেন–"কোর্ট মার্শালে যে সকল অফিসার বিচারক নিযুক্ত হতেন, তারা এ শপথ করতেন যে দোষী বা নির্দোষী বন্দীদের তারা ফাঁসি দেবেন।"[৫]

তবে বিদ্রোহীদের এ বহুবিধ শাস্তি দান করেও ইংরেজরা স্বস্তি লাভ করেনি। তাদের সমূলে ধ্বংস করার জন্যে তখন থেকে তারা মরিয়া হয়ে উঠে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়– ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করেই সংগে সংগে এ দেশের শাসনভার তাদের হস্তে গ্রহণ করেনি। বণিকজাতি হিসেবে তারা কিছুদিন ব্যবসায় বাণিজ্যেই লিপ্ত ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুখপাত্র ক্লাইভ ১৭৬৩ সালে দিল্লীর নামেমাত্র বাদশাহ শাহ আলমের নিকট থেকে বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। ফৌজদারী বিভাগ তখনও এদেশীয় আমলা বিশেষ করে মুসলমানদের হাতেই ছিল। দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানির কর্মচারিগণ নানাভাবে দেওয়ানি বিভাগ থেকে মুসলিমদের সরিয়ে, তাদের স্বনির্বাচিত হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করেন। তাদের এ নিয়োজিত কর্মচারীদের মধ্যে রংপুরের রাজস্ব আদায়কারী দেওয়ান দেবী সিংহের অত্যাচার এখনও নানা কাহিনীতে জীবন্ত রয়েছে। ১৭৬৩ সালের দেওয়ানি লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ১৭৮৩ সালে দশসালা বন্দোবস্তের প্রবর্তন করা হয়। এ বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য স্বরূপ বলা হয়, এদেশে জমিদারদের অনুকূলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন সফল হবে কি-না, তা-ই পরীক্ষা করার জন্যে এ বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। তবে একথা অত্যন্ত হীন অজুহাত ব্যতীত কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে এ বন্দোবস্তের মাধ্যমে পূর্বতন মুসলিম অভিজাত শ্রেণী বরাবরে মুঘল (কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠন) আমলে যে ভূমি বেরানী মদদে মা'আস, লাখেরাজ, জায়গীর প্রভৃতি বাবদ দান করা হয়েছিল, এগুলোর অধিকাংশকেই পরীক্ষামূলকভাবে মুসলিম আশরাফদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের শরণাগত হিন্দুদের কাছে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছিল। ১৭৯৩ সালে কোম্পানি সরকারের গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস জমিদারদের বরাবরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দান করেন। এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্বতন মুসলিম জমিদারদের স্থলে তাদের অধীনস্থ কর্মচারী, এমনকি তাদের ছাপোষা চাকর শ্রেণীর হিন্দুদের সংগেও বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে।

এতে মুসলিম বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। তবে এখানেই তাদের অত্যাচার থামেনি। ১৮৩৭ সালে অফিস-আদালতে ব্যবহৃত ফার্সী ভাষার স্থলে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন করা হয়। তার ফলে তৎকালীন ফার্সী ভাষার বিজ্ঞলোকেরা সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়েন। কারণ তখন এরাই মামলামোকদ্দমা পরিচালনা করতেন, দলীল-দস্তাবেজ

www.nagorikpathagar.org

লিখতেন এবং সমাজে উচ্চ স্থানে আসীন ছিলেন। ইংরেজদের পরবর্তী অত্যাচার হচ্ছে ১৮৪৭ সালে Regulation Act-এর প্রবর্তন। এই এ্যাক্টের মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বাইরে মুসলিমদের হাতে যেসব জমিজমা তাদের নিজস্ব ভোগের জন্যে অবশিষ্ট ছিল, তা সম্পূর্ণভাবে দখল করে অন্য লোকদের কাছে বন্দোবস্ত দেয়া হয়। এতগুলো আঘাত সহ্য করেও এদেশীয় মুসলিম সমাজ কোনমতে টিকে রয়েছিল, তবে সিপাহী বিপ্লবের পরাজয়ের পরে তাদের জীবন অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। পথে-ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে যেখানেই ইংরেজরা মুসলিমদের দেখতে পেতো, সেখানেই তাদের উপর অমানুষিক জুলুম শুরু করতো। তার ফলে মুসলিমরা এদেশ থেকে হিজরত করে মিসরে চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি শুরু করে। সে সময় এদেশের মুসলিমরা কি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, তার বিবরণ একজন ইংরেজের মুখেই শোনা ভাল। এ সময় মুসলিমেরা ইংরেজদের দ্বারা চরম নির্যাতন ভোগ করলে মুসলিম রেনেসাঁর প্রবর্তক স্যার সৈয়দ আহমদ কর্মস্থলে অবতীর্ণ হয়ে মুসলিমদের উপর থেকে এ সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমানদের যোগদানের অভিযোগ স্খালনের উদ্দেশ্যে 'আসবার-ই-বাগাওয়াত-ই-হিন্দ' নামক একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। এতে তিনি প্রমান করতে চেষ্টা করেন, শাসন বিভাগে নানা ত্রুটি থাকার দরুন এ বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোনভাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় ভারতে এ চরম দুর্যোগ দেখা দিয়েছে। তবে স্যার সৈয়দের হস্তক্ষেপের পূর্বেই ইংরেজরা মুসলিমদের সর্বস্বান্ত করে দিয়েছিল। ইংরেজ আগমনের পূর্বে এদেশে মুসলিমদের যে অবস্থা ছিল– সে সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ বলেন : They (The Muslims) had permitted power to slip from their hands because of lack of foresight and of failure to understanding the issues which were involved in the rise of the new powers in the realm,. until it was too late– অর্থাৎ তারা (মুসলিমরা) ভবিষ্যত দৃষ্টির অভাবের ফলে এবং যেসব ভবিষ্যতে নতুন শাসন কর্তৃপক্ষের এদেশে শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পরে দেখা দেবে, তা-না বোঝার ফলে তাদের হস্তস্থিত সে ক্ষমতা চলে যাওয়াতে কোন আপত্তি করেনি।[৬]

তবে তৎকালীন মুসলিমদের সম্বন্ধে ইংরেজ লেখক ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার যা বলেছেন, ইংরেজ কর্তৃক এদেশ অধিকৃত হলে– "As a matter of fact, the British occupied the higher posts in the administration including those of district officers and the Hindus got the lower posts and the Muslims who were dependent on state services for their livelihood found themselves out of place. They were bound to seek appointments as porter, messenger, filler of inkpots and mendars of pen."[৭] অর্থাৎ হান্টার বলেছেন– ব্রিটিশ আমলারা সর্বোচ্চ আসনগুলো দখল করে; এমনকি জেলার সদরেও তারা সর্বোচ্চ আসনগুলো দখল করে যে হিন্দুগণ নিম্ন পর্যায়ের চাকরিগুলোতে নিযুক্ত হয়; (সেজন্য)

www.nagorikpathagar.org

মুসলিমদের মধ্যে যারা জীবিকার জন্য রাষ্ট্রীয় চাকরির উপর নির্ভরশীল ছিল– তারা কর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। তারা বাধ্য হয়ে দারোয়ান, পিয়ন দোয়াতের কালিভর্তি-কর্তা এবং কলমগুলো দুরস্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করে।

প্রকৃতপক্ষে হান্টার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তখনকার দিনের মুসলিমদের অবস্থা তার চাইতে আরও শোচনীয় ছিল। মুসলিম আমলে যারা দেশের আশরাফ বলে সমাজের লোকের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, তাদের মধ্যে কোন কোন পরিবারের লোকেরা তাদের মদনই-মা'আশ, আয়মা, জায়গীর প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত হওয়ার পরে কেউ বা চাষী শ্রেণীতে, আবার কেউ বা জেলে শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন। সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতাকে তাই বাঙালি মুসলিমদের জীবনে এক চরম অভিশাপ বলা যায়।

প্রমাণপঞ্জী

১. মোহাম্মদ আজরফ : ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে

২. শতাব্দী : মৌলবীবাজার মহকুমার শতবর্ষ পূর্তি স্মরণিকা।

৩. Kaye & Malleson : History of Indian Mutiny– Quoted by Abul Hashim in "Intedgartion of Pakistan"

৪. ঐ

৫. ঐ

৬. I. H. Qureshi: History of freedom Movement, Vol. III.

৭. W. W. Hunter: The Indian Mussalmans.

www.nagorikpathagar.org

আবুল আসাদ

সিপাহী বিপ্লবোত্তর মুসলিম রাজনীতি

১৮৫৭ সাল ব্রিটিশ-ভারতীয় রাজনীতির একটা টার্নিং পয়েন্ট। এই বছর ভারত শাসনকারী ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় সৈন্যের ব্যারাকসহ ভারতবর্ষের এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহী বিপ্লব অন্য কথায় প্রবল এক গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এই জন-অভ্যুত্থানকে আমাদের অনেক ইতিহাসকার "প্রথম আযাদী আন্দোলন" হিসেবে অভিহিত করেছেন। আমাদের মতে ইতিহাসের সাথে এমন বে-ঐতিহাসিকের মত কাণ্ড আর কিছুই হতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে পলাশী যুদ্ধের পর আযাদী হারা মুসলমানরা যখনই তাদের পরাধীন অবস্থার কথা অনুভব করেন, তখন থেকেই তাদের আযাদী আন্দোলনের শুরু। নবাব মীর কাসেমের উত্থান প্রচেষ্টা যদিও ১৭৬৪ সালে বক্সারের রণাঙ্গনে অঙ্কুরেই নির্বাণ লাভ করে, তবু তাকে স্বাধীনতা প্রচেষ্টা না বললে ভুল হবে। তবে প্রতিরোধ ও আযাদী আন্দোলনের প্রকৃত আগুন জ্বলে ওঠে মুসলিম জনগণের কাতার থেকেই। তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজনেতা অর্থাৎ আলেম সমাজই এ সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন। পলাশীর যুদ্ধের মাত্র ৬ বছর পরে ফকির আন্দোলনের নেতা মজনু শাহ্‌র বাহিনীর সাথে ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নবাবের অনেক পলাতক সৈন্য এবং স্বাধীনতাকামী মানুষ ফকির মজনু শাহ্‌র পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল। প্রায় তিন দশক ধরে বাংলার এক বিরাট অঞ্চলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। এদের সংগ্রাম স্তিমিত হয়ে পড়ার পরে পরেই আমরা হাজী শরিয়তুল্লাহ, তিতুমীর, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী প্রমুখ মুসলিম জননেতাকে ব্যাপক এবং প্রবল আযাদী সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে দেখি। এঁদের সকলেরই সংগ্রাম সাধনার উৎস ছিল শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ এবং তাঁর পুত্র শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলবীর শিক্ষা ও সংস্কার পরিকল্পনা। বস্তুত তিতুমীরের নারকেলবাড়িয়া এবং সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর বালাকোটের মত দেশের অসংখ্য স্থানে তাঁরা উনিশ শতকের শুরু থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে রক্তলিখা ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেন, তারই একটা দৃশ্য ১৮৫৭ সালের সিপাহী আযাদী সংগ্রাম। তাই বলছিলাম, ১৮৫৭ সালের আযাধী সংগ্রাম প্রথম আযাদী সংগ্রাম নয়, সংগ্রামের অনেক দৃশ্যের মধ্যে একটা অতিস্মরণীয় দৃশ্য মাত্র। বলেছি, এই দৃশ্য ১৮৫৭ সালের আযাদী সংগ্রামের এই ঘটনা, ব্রিটিশ-ভারতীয় রাজনীতির একটা টার্নিং পয়েন্ট। ১৭৫৭ সালের পর থেকে চলে আসা রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস যেন একটা বড় মোড় পরিবর্তন করে এখানে এসে। সমাজের সম্মুখ সারিতে কিছু চরিত্র বদল হয়, কিছু রূপ পরিবর্তন ঘটে। ঐতিহ্যিক সংগ্রামী চেতনা এখানে এসে যেন মুখ থুবড়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের পর যে মৌল রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো দৃশ্যমান হয়ে উঠে তা এই :

ক. ব্রিটিশ-ভারতের শাসনভার কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে হস্তান্তর।

খ. ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু বাবু শ্রেণীর মাধ্যমে হিন্দু জাতীয় চেতনার উত্থান।

www.nagorikpathagar.org

গ. মুসলিম সংগ্রামী শক্তির ধ্বংসস্তূপ থেকে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম আপসকামী শক্তির উদ্ভব।

এই রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলো সামনে রাখলেই ১৮৫৭ সাল [illegible]-উত্তর মুসলিম রাজনীতির চরিত্র আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথমে ধরা যাক, ভারতের কর্তৃত্ব কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ রাজের হাতে যাওয়ার বিষয়টা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতের দখলপর্ব সমাপ্ত করার পর ক্ষমতা হস্তান্তরের এই অভিনয় সংঘটিত হয় ১৮৫৮ সালে। বাংলাদেশ পদানত করার সময় ক্লাইভ মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, মারাঠা ও দিল্লীকে বশে আনার সময় ওয়েলেসলী ও কর্নওয়ালিস এবং সিন্ধুসহ পশ্চিম ভারত দখলে আনার জন্য ইংরেজ গভর্নর নেপিয়ার ষড়যন্ত্র ও পশুশক্তি বলে যে পাপের পাহাড় রচনা করেছিলেন যার বিরুদ্ধে সিপাহী জনতার একটা মরিয়া প্রতিক্রিয়া ছিল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ, সে পাপকেই ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারা ব্রিটিশরাজ ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিতে চেয়ে ছিলেন। এই ক্ষমতা হস্তান্তরের মূলে আর যত কারণই থাকুক, সব দোষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঘাড়ে চাপিয়ে ভারতীয়দের কাছে ব্রিটিশ সরকার ও জাতিকে নির্দোষ সাজানোর লক্ষ্যই ছিল মুখ্য। এই অস্ত্র তাদের বৃথা যায়নি। অন্তত স্তাবকরা নতুন ব্রিটিশ রাজের পক্ষে ওকালতি করার বিরাট সুযোগ পেয়েছিল। আর ব্রিটিশ সরকারও নতুন করে যাত্রা শুরুর যে সুযোগ থাকে, তা পুরোপুরি নিয়েছিল। বলাবাহুল্য, এই কৌশল প্রতিক্রিয়াকে ভিন্নমুখী করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি মজবুত করার পক্ষেই সহায়ক হয়েছিল। লক্ষ্যণীয়, ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত প্রতিরোধের যে বহ্নিশিখা ইংরেজ শাসনকে নিরন্তর পুড়িয়েছে, পরবর্তী ৯০ বছর তাকে আমরা অনুপস্থিত দেখি। 'রাজানুগত প্রজা'দের দাবী আদায়ের যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হয়েছে বটে, কিন্তু নারিকেলবাড়িয়া ও বালাকোটের শহীদানদের মত উন্নতশির স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জ্বালানো বহ্নিশিখায় জ্বলতে হয়নি ব্রিটিশরাজকে। ১৮৫৭ সালের পর উইলিয়াম হান্টারের পর্যালোচনা এবং লর্ড মেকলের পরিকল্পনা অনুসরণ করে ব্রিটিশ রাজ আপসমূলক রাজনীতির যে বীজ বপন করেছিলেন, তারই পুরস্কার ছিল এটি। ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে এই আপসের রাজনীতির যাঁরা উপকরণ হয়েছিলেন তাঁদের ইতিহাসই পরবর্তীকালের রাজনীতি। আমরা এখন সেই রাজনীতির আলোচনায় আসছি।

এ পর্যায়ে প্রথমে আসে ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু বাবু শ্রেণীর কথা। কিন্তু এ সম্পর্কে বলার আগে পলাশী-উত্তর হিন্দু রাজনীতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, ভারতে ব্রিটিশ শাসন অধিকাংশ হিন্দু নেতার কাছে প্রভু পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মুসলিম শাসনে তারা আশাতিরিক্ত ভালো ব্যবহারই পেয়েছে– একথা গুণীজনদের মুখ থেকে শুনুন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রাজা রামমোহান রায় বলছেন, "মুসলিম শাসনে এ দেশের হিন্দু অধিবাসীরা মুসলমানদের মত সকল প্রকার রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। রাষ্ট্রের উচ্চতম পদ, সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব, প্রাদেশিক শাসন ক্ষমতা, সম্মানিত

www.nagorikpathagar.org

মন্ত্রীর আসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারে ধর্ম কিংবা জন্মস্থান কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতো না। হিন্দুরা ভূমি মঞ্জুরী লাভ করত, খাজনা মওকুফ পেত এবং উচ্চ বেতন ছাড়াও অফিস-সংলগ্ন ভূমি ব্যবহারের দেদার সুযোগ তাদের ছিল।" (Memorial to the Supreme Court in Calcutta, 1823)। কিন্তু মুসলিম শাসকদের এই ভালো ব্যবহারের কোন প্রকার স্বীকৃতি পলাশী-উত্তর হিন্দুদের ব্যবহারে মেলেনি। এই সময় তাদের রাজনীতির সার কথা ছিল নতুন প্রভুদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে দিয়ে এবং তাদের সাহায্য নিয়ে পুরাতন প্রভু মুসলমানদেরকে যত পারা যায় নির্যাতন- নিষ্পেষনে নিষ্পিষ্ট করে ফেলা। হিন্দুরা ইংরেজ-প্রেমে এতখানিই অন্ধ হয়ে পড়েছিল যে, বালাকোট ও নারকেলবাড়িয়ায় ভারতের মুসলমানরা যখন ইংরেজের হাতে জীবন দিচ্ছে, তখন তারা বলছে, "আমাদের যদি বলা হয় ব্রিটিশ কিংবা কার শাসন তোমরা চাও? উত্তরে আমরা এক বাক্যেই বলব– ব্রিটিশ শাসন। এমনকি হিন্দু শাসনও নয়।' (Daily 'reference' of the Hon'ble Prosonno Kumar Tagore, July, 1881)। ১৮৫৭ সালে যখন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ইংরেজের কামানের গোলায় জীবন দিচ্ছিল, তখন হিন্দু পত্রিকা লিখেছে, "আমরা পরমেশ্বরের সমীপে সর্বদা প্রার্থনা করি, পুরুষানুক্রমে যেন ইংরেজাধিকারে থাকিতে পারি; ভারত ভূমি কত পুণ্য করিয়াছিলেন এই কারণ ইংরেজ স্বামী পাইয়াছেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত যেন ইংরেজ ভুপালদিগের মুখের পান হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করেন।' (সংবাদ ভাস্কর, ২০ জুন, ১৮৫৭)। স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে হিন্দু পত্রিকাগুলো কি দৃষ্টিতে দেখেছে, বন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি কি নিষ্ঠুর মনোভাব প্রকাশ করেছে, তার অনেক দৃষ্টান্তের একটা এখানে তুলে ধরছি। ১৮৫৭ সালের ১৮ ও ২০ জুনের 'সংবাদ ভাস্কর' লিখে, "আগ্রা, দিল্লী, কানপুর, অযোধ্যা, লাহোর প্রদেশীয় ভাস্কর পাঠক মহাশয়েরা এই বিষয়ে মনোযোগ করিবেন এবং পাঠ করিয়া বিদ্রোহীদের আড্ডায় আড্ডায় ইহা রাষ্ট্র করিয়া দিবেন, সিপাহীরা জানুক ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সিপাহী ধরা আরম্ভ করিয়াছেন, আর বিদ্রোহী সিপাহী সকল শোন্ শোন্, তোদের সর্বনাশ উপস্থিত হইল, যদি কল্যাণ চাহিস তবে এখনও ব্রিটিশ পদানত হইয়া প্রার্থনা কর– ক্ষমা করুন।..... গত বুধবার বেলা দুই প্রহর দুই ঘণ্টাকালে সৈন্য পরিপূর্ণ এক জাহাজ উত্তর দিক হইতে আসিয়া কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণাংশে লাগিল। সে সময় উক্ত জাহাজ অতি সুদৃশ্য দৃষ্ট হইল, গোরা সৈন্যরা পাঁচশ সিপাহীকে হাতে হাতকড়ী পায়ে বেড়ী দিয়া লইয়া আসিয়াছে, গবর্নমেন্ট হয় সিপাহীদিগের প্রতি যে প্রকার ক্রোধ করিয়া রহিয়াছেন, তাহাতে বলিদান দিবেন ইহাই জ্ঞানগ্রাহ্য হইতেছে। কালিঘাটে বহুকাল নরবলি হয় নাই। আমাদিগের রাজেশ্বর যদি হিন্দু হইতেন, তবে এই সকল নরবলি দ্বারা জগদম্বার তৃপ্তি করিতেন।' বস্তুত হিন্দুদের পলাশী-উত্তর রাজনীতিই ছিল ইংরেজ তোষণ ও মুসলমানদের বিরোধিতা। ইংরেজদের নিকট এর পুরস্কারও তারা লাভ করে। পলাশী যুদ্ধের একশ বছরের মধ্যে সহায়-সম্পদে সমৃদ্ধ মুসলমানরা কাঠুরে ও ভিস্তিওঁয়ালার জাতিতে পরিণত হয়। আর তাদের হস্তচ্যুত সম্পদের বৃহত্তর অংশই প্রতিবেশী হিন্দুদের হাতে গিয়ে জমা হয়। এই সম্পদ ভোগের চৌহদ্দিতেই হিন্দু বাবু শ্রেণীর জন্ম এবং তাদের জাতীয়তাবাদী উত্থানের মূলে আরেকটি উপসর্গ কাজ করেছে।

www.nagorikpathagar.org

১৮৫৮ সালে ব্রিটিশরাজ ভারতের শাসনভার হাতে নেয়ার পর ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে ভারতের শাসনকার্যে সংশ্লিষ্ট করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। শাসন কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষিত ভারতবাসীকে ধীরে ধীরে সুযোগ দেয়ার কাজও শুরু করা হয়। হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিল বলেই এই সুযোগ ষোল আনা তাদেরই ভাগ্যে জুটতে থাকে। এভাবে ইংরেজি শিক্ষিত এক হিন্দু বাবু শ্রেণীর বিকাশ ঘটে যাদের রাজভক্তি ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু সে সাথে তাদের মধ্যে জাতীয় অধিকার চেতনারও বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৮৫৭ সালের পূর্বে যেখানে হিন্দুরা ইংরেজদের স্তব ও বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া স্বার্থ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল সেখানে ১৮৫৭ সালের পর ইংরেজদের স্তব গাথা থাকল, কিন্তু আগের সে বিচ্ছিন্ন স্বার্থ চিন্তাটা জাতীয় স্বার্থ চিন্তায় রূপ পরিগ্রহ করল। ব্রিটিশ প্রশাসনে অংশ ও মর্যাদা নিয়েই এই চিন্তার শুরু। ১৮৫৮ সালের রাষ্ট্রীয় ঘোষণায় সরকারি চাকরিতে ভারতীয়দেরকে যে সমান সুযোগ-সুবিধা দেয়ার কথা বলা হয়, তা ১৮৬১ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস এ্যাক্টে পরিণত হয়। কিন্তু ইংরেজরা এই এ্যাক্ট অনুসারে ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধা দিত না। বিশেষ করে সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগ তারা এড়িয়ে চলত। এ সময়ের একটা ঘটনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আন্দোলনের রূপ নেয়। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হন। কিন্তু তাঁকে তালিকা থেকে বাদ দেবার চেষ্টা করা হয়। পরে মহারাণীর খাস বিচারালয়ের হস্তক্ষেপে তাঁর চাকরি দেয়া হয়। কিন্তু স্যার সুরেন্দ্রনাথকে চাকরি দিয়েও বরখাস্ত করা হয়। চাকরি বঞ্চিত স্যার সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয়দের পক্ষ থেকে আন্দোলনে নামেন এবং 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়েন। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ-ভারতে হিন্দুদের এটাই প্রথম প্রতিবাদমূলক একটি গণ-প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তারও জন্ম আবার অনুগত প্রজা হিসেবে চাকরির অধিকার আদায়ের জন্যই। উত্তরকালে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'আর্মস এ্যাক্ট', 'ভার্নেকুলার প্রেস এ্যাক্ট' প্রভৃতির মত বিভিন্ন ধরনের শাসনতান্ত্রিক অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয়। এই আন্দোলনেরই এক পর্যায়ে ১৮৮৫ সালে এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম নামে একজন প্রাক্তন ইংরেজ সিভিল সার্ভেন্ট-এর উদ্যোগে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল, রাজানুগত ভারতবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করে বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলা থেকে দেশকে রক্ষা করা। পরে গভর্নর জেনারেল ডাফরিনের পরামর্শক্রমেই কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয় কংগ্রেস মুখ্যত ব্রিটিশ আগ্রহেই দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। কংগ্রেস মহলে ব্রিটিশ পদ, পদবী ও খেতাবের ছড়াছড়ি পড়ে যায়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, যাকে সিভিল সার্ভিস থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল তাঁকেও 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইতিহাস এ ব্যাপারে একমত যে, রাজানুগত ইংরেজি শিক্ষিত এই বাবু শ্রেণীই জনগণের উত্থান চেতনার বাগডোরা হাতে রেখে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নাম করে ভারতীয়দের অসন্তোষ উত্তেজনা দুই যুগেরও বেশি কাল ঠেকিয়ে রাখে এবং এভাবে এই সংস্থা, ঐতিহাসিকদের ভাষায় "বিদেশী প্রভুদের স্বার্থে একটি ঘা-চোষক গদি"র কাজ করে যায়। বিশ শতকের শুরুর দিকে কংগ্রেস গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের নেতৃত্বে মধ্যপন্থী এবং

www.nagorikpathagar.org

বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখের নেতৃত্বে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী– এই দুই উপধারায় বিভক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। বলা যায়, এই পর্যায়ে এসেই বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস তথা হিন্দু রাজনীতি নতুন এক মোড় পরিবর্তন করে, যা ১৮৫৭ সাল-উত্তর মুসলিম রাজনীতিকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে।

১৮৫৭ সাল-উত্তর মুসলিম রাজনীতির যে শিরোনাম আমরা দিয়েছি তা হলো, মুসলিম সংগ্রামী শক্তির ধ্বংসস্তূপ থেকে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম আপসকামী শক্তির উত্থান। পলাশীর প্রান্তরে মুসলিম রাজশক্তির ভাগ্যবিপর্যয়ের পর মুসলিম সমাজনেতা তথা আলেম সমাজ স্বাধীনতা সংগ্রামের যে আপসহীন পতাকা উত্তোলন করেন, ১৮৫৭ সালে ইংরেজরা তাকেই সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেয়ার চেষ্টা করে। ১৮৭১ সালে ভারতীয় রাজনীতির পর্যালোচনা করতে গিয়ে স্যার উইলিয়াম হান্টার লিখেন, "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারত গভর্নমেন্ট যদি পূর্ব থেকেই ষড়যন্ত্র আইনের ৩ নং ধারা অনুযায়ী ভারতের আলেমদের কঠোর হস্তে শাসন করতো, তাহলে ভারত গভর্নমেন্টকে মুজাহিদ আলেমদের আক্রমণের ফলে এত দুঃখ ভোগ করতে হতো না। কতিপয় আলেমকে গ্রেফতার করা হলে আম্বালা ঘাঁটিতে আমাদের এক সহস্র সৈন্য হতাহত হতো না এবং লক্ষ লক্ষ পাউন্ড অর্থ বেঁচে যেত। এমনকি উক্ত লড়াই-এর পরও যদি কঠোর হস্তে আলেমদেরক দমন করা হতো, তবে অন্ততঃপক্ষে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে কালাপাহাড় অভিযান থেতে রক্ষা পাওয়ার আশা ছিল।' উইলিয়াম হান্টার এখানে আলেমদের কঠোর হস্তে দমন না করায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, ইংরেজরা তাদের সাধ্য অনুসারে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে কোন কঠোরতাই বাদ রাখেনি। ফকির বিদ্রোহকে তারা কঠোর হাতেই দমন করেছে। তিতুমীর ও হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র সংগ্রামকেও দমন করার জন্য হেন নির্মমতা নেই যা ইংরেজরা অবলম্বন করেনি। সমগ্র ভারতবর্ষ বিস্তৃত সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর স্বাধীনতা সংগ্রামকেও শত রকম নির্যাতনের মাধ্যমে নাস্তানাবুদ করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এত করেও আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করা যায়নি।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হবার পর যে হত্যালীলা শুরু হয় তারও বড় শিকার হয়ে দাঁড়ায় আলেম সমাজ। বিপ্লব পরবর্তীকালে শত শত আলেম শাহাদাত বরণ করেন। শুধু ফাঁসিতেই শাহাদাত বরণ করেন প্রায় সাতশ আলেম। মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী, মওলানা ইয়াহইয়া আলী, মওলানা আবু জাফর থানেশ্বরী, মাওলানা মুফতি এনায়েত আলী প্রমুখ শত শত আলেমকে আন্দমানে নির্বাসন দেয়া হয়। এক কথায় মুসলিম সংগ্রামী শক্তিকে সেদিন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা চলে। সেদিনের দিল্লীর বিবরণ দিতে গিয়ে কবি গালিব লিখেছেন, "মুসলমানদের অবস্থা দেখে কাঁদবে এমন একজন মুলসমানও দিল্লীতে অবশিষ্ট ছিল না।" আর মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী তাঁর আত্মকথায় লেখেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে প্রমাণ হলেই কোন হিন্দুকে ধরা হোত কিন্তু পালাতে পারেনি এমন কোন মুসলমান সেদিন বাঁচেনি।"

ভারতবর্ষ ব্যাপী এ গণহত্যার পরও মুসলমানদের সংগ্রামী শক্তির অস্তিত্ব টিকে থাকে। সিপাহী বিপ্লবোত্তর রাজনীতিতে এদের ভূমিকা একেবারে গৌণ নয়। ১৮৫৭

www.nagorikpathagar.org

সালের আযাদী সংগ্রামের সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্গম ইয়াগিস্তানের বালাকোটের ধ্বংসাবশিষ্ট বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সংগ্রামের অগ্নিপুরুষ মওলানা বেলায়েত আলীর ভাই মওলানা এনায়েত আলী। আর ভারতের অভ্যন্তরে এ আন্দোলন সংগঠনের কঠিন দায়িত্ব পালন করছিলেন মওলানা ইয়াহইয়া আলী, যিনি সিপাহী বিদ্রোহ সংগঠনের কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পলন করেন। বিপ্লব পরবর্তী কঠিন নির্মূল অভিযানের পরও সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর বিপ্লবী আন্দোলনের কাজ মাওলানা আবদুল্লাহ, মওলানা আবদুল করিম ও মওলানা নেয়ামতুল্লাহ প্রমুখের মত সংগ্রামী আলেমের নেতৃত্বে সামনে এগিয়ে চলে, যা ছিল মানুষের কাছে সংগ্রাম ও প্রতিবাদী চিন্তার প্রতীক হিসেবে অনুপ্রেরণার উৎস। এরই পাশাপাশি ১৮৫৭ সালের পর সংগ্রামী আলেমদের আরেকটি দল দেশের বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা ও দীনী প্রতিষ্ঠান গড়ে মুসলমানদের অন্তরে বিপ্লবের স্ফুলিংগ অনির্বাণ রাখার কাজে ব্রতী হন। সিপাহী বিপ্লবের দিল্লী ফ্রন্টের অন্যতম সংগঠক হাজী এমদাদুল্লাহ গ্রেফতারের কঠিন পরওয়ানা এড়িয়ে মক্কায় হিজরত করেন এবং সেখান থেকেই তিনি আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। দিল্লী যুদ্ধে আহত মওলানা কাশেম নানতুবীর মাথার উপরও গ্রেফতারি পরওয়ানা ঝুলছিল। তিনিও বেরিয়ে এলেন দিল্লী থেকে। মওলানা কাশেম নানতুবীই ১৮৬৬ সালে দিল্লীস্থ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীর রহিমিয়া মাদ্রাসার অনুকরণে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। উল্লেখ্য, মওলানা কাশেম নানতুবীর নিকট মওলানা মামলুকুল আলী ছিলেন বালাকোট-পরবর্তী বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা শাহ ইসহাকের কেন্দ্রীয় বিপ্লবী পরিষদের সদস্য। আরো উল্লেখ্য, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রথম প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব যিনি নেন তিনি এই মওলানা মামলুকুল আলীর পুত্র মওলানা ইয়াকুব। এভাবে দেওবন্দ মাদ্রাসা দিল্লীর রহিমিয়া মাদ্রাসার মতই বিপ্লবী মুজাহিদ তৈরির আরেক কারখানায় পরিণত হয়। উত্তরকালে এই মাদ্রাসা থেকে যারা বেরিয়ে আসেন তারা মুসলমানদের আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সব রকমের তৎপরতাসহ দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'অসহযোগ আন্দোলন', 'খিলাফত আন্দোলন' এবং 'দেশ বিভাগের আন্দোলন'-এ অমূল্য ভূমিকা পালন করেন।

কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, সিপাহী বিপ্লবোত্তর মুসলিম রাজনীতিতে আপোষহীন মুজাহীদদের এই সংগ্রামী কাফেলা সামনের কাতার থেকে ধীরে ধীরে পেছনের কাতারে সরে যায়। সামনে এসে দাঁড়ায় মুসলিম রাজনীতির আপোষকামী এক ধারা। এই আপোষকামী ধারার অগ্রপথিক ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রশাসনের সাবেক ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারপতি নওয়াব আবদুল লতিফ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাবেক মুন্সেফ স্যার খেতাবপ্রাপ্ত সৈয়দ আহমদ খান এবং ব্রিটিশ বিচার বিভাগের কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলী। তাঁরা মুসলিম সমাজের সমস্যাকে ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গিতে অবলোকন করেন। তদানীন্তন পরিস্থিতি বিবেচনায় তাঁরা মনে করেন, সহযোগিতার মাধ্যমেই মুসলিম জাতিকে তাদের স্বাধিকার আদায় করতে হবে। সহযোগিতার মাধ্যমেই ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে জাতীয় স্বার্থ হাসিলের ক্ষেত্রে হিন্দুরা বহুদূর এগিয়ে গেছে, এটা লক্ষ্য করেই তাঁরা জাতির জন্য এই চিন্তা করেন। নওয়াব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং সৈয়দ আমীর আলী তিনজনই এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে,

www.nagorikpathagar.org

ভারতে আত্মমর্যাদা নিয়ে টিকে থাকতে হলে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের আধুনিকীকরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। বস্তুত ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত নওয়াব আবদুল লতিফের 'ক্যালকাটা মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি', ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত স্যার সৈয়দ আহমদ খানের 'গাজীপুর ট্রানশ্লেশন সোসাইটি' যা পরে 'আলিগড় সায়েন্টিফিক সোসাইটি' নাম পরিগ্রহ করে এবং '১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সৈয়দ আমির আলীর' সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসেসিয়েশন' মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের একই লক্ষ্য কাজ করেছে। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের 'আলীগড় সায়েন্টিফিক সোসাইটিই' ১৮৭৫ সালে 'আলিগড় মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজে' রূপ লাভ করে। সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তার সাথে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও নওয়াব আবদুল লতিফের চিন্তার কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সৈয়দ আমীর আলীর চেষ্টা ছিল, নৈতিক পুনর্গঠন ও অবিরাম রাজনৈতিক চেষ্টার মাধ্যমেই ভারতীয় মুসলমানদের যথার্থ ও ন্যায়সংগত দাবী-দাওয়ার প্রতি সরকারের স্বীকৃতি আদায় করা। কিন্তু নওয়াব আবুদল লতিফ ও সৈয়দ আহমদ খান চাইতেন, মুসলমানদের সংঘাতের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করে সামাজিকভাবে তাদের যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠা করা। যাহোক, তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় মুসলমানদের বৈষয়িক উপকার অবশ্যই হলো। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আহমদ খান ও সৈয়দ আমীর আলী কোলকাতায় মিলিত হন এবং একই কর্মপন্থা অনুসরণ করতে একমত হন। ১৮৮৫ সালে তাঁদের অব্যাহত দাবীদাওয়ার অধিকাংশই ব্রিটিশ সরকার মেনে নেয়। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয় এবং চাকরি ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত হয়। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে অগ্রগতি অর্জনের ১৮৫৭ সাল-উত্তর এই চিন্তা ১৮৫৭ সাল-পূর্ব এক শ'বছরের মুসলিম রাজনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তবু সময়ের প্রেক্ষাপটে এবং হিন্দুদের উন্নতি- উত্থানের পটভূমিতে এই চিন্তাই ক্রমশ: প্রসার লাভ করতে থাকে। এর ফলে ইংরেজি শিক্ষিত রাজানুগত নতুন এক মুসলিম শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। একমাত্র জাতীয় চেতনার ক্ষেত্রে পার্থক্য ছাড়া নব উত্থিত হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীর সাথে এদের তেমন পার্থক্য ছিল না। মূলত এদের হাতেই হিন্দুদের উগ্র জাতীয়তাবাদী ও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সময়ের অপরিহার্য প্রয়োজনকে সামনে রেখে ১৯০৬ সালে মুসলমানদের জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। স্যার সুরেন্দ্রনাথের হিন্দু জাতীয় চেতনা যেমন ছিল, নওয়াব সলিমুল্লাহও তেমনি জাতীয় চেতনা নিয়ে মুসলিম লীগের পত্তন করেন। এভাবে ১৮৫৭ সালের পর মুসলিম রাজনীতিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণগত পরিবর্তন ঘটে। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ইসলামী জিন্দেগীর পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ মুসলমানদের স্বাধীনতা অর্জন ছিল এর মূল কথা। কিন্তু ব্রিটিশের সাথে আপোষকামিতার পথ ধরে পরে যে জাতীয় আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল মুসলিম লীগের মাধ্যমে, তার মূল কথা ছিল জাতীয় স্বার্থের নিশ্চয়তা বিধান। ব্রিটিশ রাজের অনুগত প্রজা হিসেবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতির জন্য ন্যায্য অধিকার আদায়ই ছিল এর লক্ষ্য। অবশ্য এই একই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুদের জাতীয় কংগ্রেস যেমন পরে স্বাধীনতা আন্দোলনের

www.nagorikpathagar.org

প্লাটফর্মে পরিণত হয়, তেমনি মুসলিম লীগও ভারতীয় মুসলমানদের আজাদী সংগ্রামের প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।

আমরা আগেই বলেছি, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমানদের রাজনীতিতে একটা বড় ধরনের মোড় পরিবর্তন ঘটে, যেমনিভাবে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ উনিশ শতকের রাজনীতিতে একটা মাইলস্টোন প্রমাণিত হয়। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ব্রিটিশ সরকার তাদের শাষন কার্যের সুবিধার জন্যই ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে আলাদা প্রদেশ গঠন করে। এতে মুসলিমপ্রধান পূর্ববঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই লাভবান হয়। পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের এই লাভ হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষের আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। মুসলিমবিদ্বেষী হিন্দু রাজনীতি যেখানে মুসলমানদের এদেশে বাস করার অধিকারই স্বীকার করতে চায় না, সেখানে মুসলমানদের জন্য এই লাভটা তারা বরদাশত করতে পারবে কেমন করে? এখানে স্মর্তব্য, উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সংকীর্ণ পরিসরে হিন্দুত্বের পুনরুত্থান আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। স্বামী দয়ানন্দের 'আর্য সমাজ' ছিল এই আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দু। 'ভারত শুধু ভারতীয়দের জন্য"—এটা ছিল তাদের প্রধান শ্লোগান। তারা ভারতীয় বলতে কেবল হিন্দুদেরকেই বুঝাত। স্বামী দয়ানন্দ ভারতবর্ষের কোটি কোটি মুসলমানকে এদেশের সন্তান হিসেবে গন্য করতেও অস্বীকার করেন। তাঁর শুদ্ধি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারত বর্ষের অহিন্দুদেরকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করা। ১৮৮৩ সালে দয়ানন্দ মারা যান। কিন্তু বালগংগাধর তিলক, লালাহংসরাজ, লালা লাজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ কংগ্রেস নেতা দয়ানন্দের আন্দোলন আরো দক্ষতার সাথে সামনে এগিয়ে নেন। এরই পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দও রামকৃষ্ণ মিশনকে এক চরমপন্থী হিন্দু সংস্কার সংস্থায় রূপান্তরিত করেন। এভাবে হিন্দু স্বার্থ কংগ্রেসেরও স্বার্থ হয়ে দাঁড়ায়। এমন একটা পরিবেশেই বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেয়া হয়। কলিকাতাকে কেন্দ্র করে হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। কংগ্রেস নেতা স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোভাগে। সকল হিন্দু নেতাই এর সাথে যোগ দিলেন। এমনকি উদারপন্থী গোপালকৃষ্ণ গোখলেও বাদ থাকলেন না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের শুভেচ্ছাপুষ্ট 'অনুশীলন সমিতি' বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ১৯০৬ সালের দিকে পুরোপুরি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের রূপ নেয়। কংগ্রেস সাংগঠনিকভাবে এর সাথে জড়িত হয়ে পড়ায় সমগ্র দেশের পরিস্থিতি মুসলমানদের জন্য অগ্নিগর্ভ হয়ে দাঁড়ায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের সার্বিক মারমুখো এই পরিস্থিতিতেই মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার উপায় হিসেবে নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে আয়োজিত নওয়াব ভিখারুল মূলকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের ঢাকা বৈঠকের মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু স্যার সলিমুল্লাহর ব্যাকুলতা এবং মুসলিম লীগের চেষ্টা কোনই কাজে এলো না। ব্রিটিশরাজ হিন্দুদের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করল এবং ১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর ব্রিটিশরাজ স্বয়ং দিল্লী এসে বঙ্গভঙ্গ রহিত করার ঘোষণা দিলেন। এ সাথে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভগ্নহৃদয় স্যার সলিমুল্লাহকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করা হলো। যা হোক এই ঘটনা হিন্দু-মুসলিম দুই জাতিকে পরস্পর থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং কংগ্রেস সম্পর্কে কংগ্রেসপ্রেমিক মুসলমানদেরও মোহ ভঙ্গ ঘটায়। এ সময় সৈয়দ

www.nagorikpathagar.org

আমির আলীর আহ্বানে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নহ কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। একটা ক্ষেত্রে মুসলমানরা এই সময় একটি বিজয় লাভ করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী হিন্দু আন্দোলন যখন আকাশ-বাতাস বিষিয়ে তুলছিল, সেই সময় বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের পক্ষ থেকে সৈয়দ আমির আলীর নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন ভারত সচিব লর্ড মর্লের সাথে দেখা করে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা আদায় করেন। মুসলমানদের পৃথক জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি-সত্তার স্বীকৃতি হিসেবে পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম রাজনীতির আধুনিক পর্বে এই যে দুই স্বতন্ত্র যাত্রা শুরু হলো, তা-ই ১৯৪৭ সালে দুই জাতির জন্য দুইটি স্বতন্ত্র আবাস ভূমি সৃষ্টি করে। মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে ইংরেজি শিক্ষা সৃষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রধান ভূমিকায় থাকেন বটে, কিন্তু তাঁরা যে শক্তি ও ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে কাজ করেন, তার ষোলআনা নির্মাতাই ছিলেন ১৮৫৭ সালের পর রাজনীতির ক্ষেত্রে পেছনের সারিতে গিয়ে দাঁড়ানো মুসলিম জননেতা আলেম সমাজ। এই উপমহাদেশে লক্ষ লক্ষ আলেম নীরবে যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন, তা যদি সংগৃহীত হয় তাহলে জানা যাবে তাঁদের অবদান কত বড়, কত মহৎ। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই মুসলিম সমাজকে এবং সেই সাথে আপষকামী মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদেরকে হিন্দু ষড়যন্ত্রের গ্রাসে পরিণত হবার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তবে একথা ঠিক, সিপাহী বিপ্লব-উত্তর রাজনীতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিন্দু জাতিসত্তার মারমুখো পুনরুত্থান। মুসলমানদের আপষহীন সংগ্রামী শক্তির পেছনে সরে যাওয়া এবং নব উত্থিত মুসলিম আপসকামী শক্তির সহজাত দুর্বলতার অনুকূল ভূমিতেই এই হিন্দু পুনরুত্থান শক্তির চারা গাছ গজিয়েছিল। সে চারা গাছ পরিণত হয় মহীরুহে। ১৮৫৭ সালের পর আমাদের আপসকামীদের সেই যে অনুগ্রহ ভিক্ষা শুরু হয়েছিল, বলা যায়, তা পরে এক জাতীয় রূপ পায়। এতদসত্ত্বেও পরবর্তী ৯০ বছরের মুসলিম রাজনীতি একটা ফল দিয়েছে, কিন্তু তা স্মৃতিকে বেদনার্তই করে। ১৯০ বছরের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা জীবন দিয়েছেন, তাঁদের চাওয়া আমাদের এই পাওয়ার মধ্যে মিলে না। পুরো সেই পাওয়ার তৃপ্তি অতৃপ্তই রয়ে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ও তৎকালীন সমাজ

ইংরেজরা মুসলিমদের হাত থেকে এদেশের রাজশক্তি ছিনিয়ে নেয়। তাই যুক্তিসংগত কারণেই মুসলিমরা ইংরেজের সংগে হাত মিলাতে পারেনি, পারেনি তাদের সুনজরে দেখতে। ইংরেজরা নানা দিক থেকে তাদের পর্যুদস্ত করে 'বশংবদ' করে রাখার ষড়যন্ত্রে কামিয়াব হয়। একথা ঠিক যে, কোন শাসনশক্তিই দেশের সাধাণর মানুষের সমর্থন ছাড়া বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। একথা ইংরেজরা বুঝেও তাদের হাত করতে পারেনি বরং উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ, সংশয় ও সন্দেহ দিন দিন বেড়েছে। এদেশের ইংরেজ শাসন পাকা করার অন্যতম পন্থা হিসেবেই প্রতিবেশী হিন্দু সমাজকে মুসলিম বিরোধী প্রচারণায় উত্তেজিত করা, মুসলিমরা যে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, হিন্দুর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে– এসব প্রচার করে মাতিয়ে তোলা এবং তাদের ব্যবসায় বাণিজ্যে, শিক্ষা সংস্কৃতি সবদিক থেকে উর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা নগ্নভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। মুসলিমরা রাজশক্তি হারিয়ে নানাভাবে ইংরেজদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে, নানা স্থানে ব্যর্থ হয়ে ক্রমেই শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। ক্ষুব্ধ অভিমানে আহত সিংহ নিজ আবাসভূমিতে প্রবাসী হয়ে পড়ল। অপ্রিয় হলেও বলতে দ্বিধা নেই, একথাটি অনেক ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে যে, মুসলিমরা এদেশে শাসনভার নিয়েছিলেন 'কলোনী' হিসেবে নয়; এদেশে তাঁরা বসবাস করে এদেশের মাটিকে ভালবেসে নিজের দেশ করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা ধনসম্পদ লুট করে 'স্বদেশে' নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেনি। অথচ ইংরেজ তার 'হোমের' আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রথমেই যে ক'টি বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করলো, তার সব ক'টিই এদেশের 'লুটপাট' এবং স্বদেশের সমৃদ্ধি সাধনের পক্ষে গেল, আর সব ক'টিই হলো মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমি মুসলিমের হাত থেকে হিন্দুর হাতে গেল। নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্তির পর মুসলিমরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলো। সাধারণ মুসলিম ও মুসলিম ভূম্যধিকারীর মাঝামাঝি তহশিলদার, নায়েব, মুহুরী ও গোমস্তা প্রভৃতি হিন্দু কর্মচারীরাই ইংরেজের অনুগ্রহে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ভূস্বামী হয়ে উঠলো। তার উপর রাজভাষা ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজি প্রবর্তন করায় চাকরিনির্ভর অসংখ্য মুসলিমের জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। বাংলাদেশের আর্থিক জীবনের প্রধান ভিত্তি জমি ও আনুসংগিক অবলম্বন চাকরি এবং সংগে সংগে ব্যবসায়-বাণিজ্য— এসব থেকে বঞ্চিত হয়ে মুসলিমের আর্থিক দুর্গতি চরমে পৌঁছলো।

১৮০১ সালে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এদেশে রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত করার জন্য এবং এদেশের ভাষা বাংলা শিক্ষা দেবার জন্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়, আর ১৮১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ (এখনকার প্রেসিডেন্সী কলেজ)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকতা এবং বাংলা পদ্য প্রবর্তনের কর্মব্যপদেশে এদেশের হিন্দুদেরই কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ইংরেজের সংস্পর্শে আসে। হিন্দু কলেজেও হিন্দুদেরই

www.nagorikpathagar.org

লেখাপড়া করতে দেখা যায়। এভাবে ঘটনা পরম্পরায় দেখা যায়, উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই ইংরেজদের সংগে হিন্দুরা সহযোগিতা করেছে। রাজস্ব সংস্কারের ফলে এদেশের কাঁচা টাকা গড়ে তুলল বিলেতের সৌধমালা আর এদেশের কাঁচামাল শ্রীবৃদ্ধি সাধন করল ডাণ্ডি, বার্মিংহাম, মানচেষ্টার প্রভৃতি বাণিজ্য ও শিল্প নগরী।

শাসনের সুবিধার জন্য গড়ে ওঠে কলকাতা। মুর্শিদাবাদ ক্রমেই বিরান হয়। ইংরেজের স্নেহপুষ্ট জমিদার ও আমলারা এবং শিল্প ও ব্যবসায়ী মহলও সুযোগ মতই কলকাতায় ভীড় জমায়। সেখানে গড়ে ওঠে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি। যে সভ্যতার মূল ছিল আরবী-ফারসী সাহিত্যপুষ্ট মুসলিম ঐতিহ্য, সে সভ্যতা ক্রমেই হয়ে পড়লো অপাংক্তেয়, সুতরাং অনাগরিক। কলকাতাকেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে মুসলিমের প্রভাব হয়ে গেল গৌণ। পলাশী যুদ্ধের পর থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত এ একশ বছরের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থায় ইংরেজদের সংগে মুসলিমের মনকষাকষি তীব্রতর ও অসহযোগ অনমনীয় হয়ে উঠে।

পলাশীর যুদ্ধের পরে আঠার শতকের শেষভাগে বৃহত্তর বাংলায় মীরকাসেম এবং দক্ষিণ ভারতের মহীশূরের পুরুষ-সিংহ হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের স্বাধীনতা রক্ষা প্রচেষ্টা সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে। আযাদী রক্ষার শেষ চেষ্টায় পরাজিত এ বীর পুরুষদের শাহাদাতের পর এদেশের মুসলিমরা হতভম্ব ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। এরপরও দানা বেঁধে উঠে সংগ্রামী যোশ, যার পরিণতি 'সিপাহী সংগ্রাম' এর (১৮৫৭) রূপ নেয়। সংগঠনের পারদর্শিতার অভাবে এ সংগ্রাম বানচাল হয়ে যায় এবং এদেশবাসীকে স্তব্ধ করে দেয় বহুদিনের জন্য।

এ মানসিকতা মুসলিম সমাজে ধর্মবোধের রেনেসাঁ সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হয়। দীনকে যথাযথভাবে আঁকড়ে না ধরা এবং দীনের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণেই তাদের উপর এ গজব নাযেল হয়েছে– এ ধারণা এদেশীয় মুসলিমের মনে দৃঢ় আসন গেড়ে বসে।

এদেশের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এ যাবত শক, হুন, গ্রীক যারাই এদেশে এসেছে, ভারতীয় সংস্কৃতি তাদের গ্রাস করেছে নিজের কালচারে হযম করে নিয়েছে। ইসলামই একমাত্র ব্যতিক্রম, যা এদেশে এসে ভারতীয় হিন্দু জাতিত্বে বা সংস্কৃতিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি। বরং নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে আপন মহিমা অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। এর কারণ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের দেশ-কাল ও পাত্র অনুপরিবর্তনশীল বলিষ্ঠতা, সমাজ কাঠামোয় মানুষের ব্যবহারিক জীবনের বিবেক-বুদ্ধির স্বীকৃতি, আর সাম্য-মৈত্রীভিত্তিক সহজ মানবতাবাদের উপর এর প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় ঐতিহ্য তথা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি ইসলামকে হযম করতে না পারলেও এ অঞ্চলের মুসলিমদের উপর এর প্রভাব বিস্তার করতে কসুর করেনি। কিন্তু ভারতীয় লোক সংস্কৃতিতে ও সমাজ ক্ষেত্রে ইসলামী প্রভাবের স্বরূপ আরো ব্যাপক ও গভীর। এ ব্যাপারে আলোচনার স্থল এখানে নয়।

মুসলিমের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে গেলে শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারে ব্যাপারে অব্যবস্থার ফলে এ অঞ্চলের লোক-জীবনে নানা কুসংস্কার ও নিম্ন মানসিকতা অনুপ্রবিষ্ট হয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ, বহু মাদ্রাসা নষ্ট করে দিয়ে এবং মাদ্রাসা

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষকদের নির্বিচারে হত্যা করে ইসলাম ও মুসলিমদের দুর্বল করে দেয়া হয়েছিল। এ ধরনের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য করেই স্যার মহম্মদ ইকবাল বলেছেন : Surely we have out-Hindued the Hindu himself; We are suffering from a double caste system, sectarianism and the social caste system which we have either cearned or inherited from the Hindus.[১]

এ ধরনের অনৈসলামী প্রভাব থেকে মুক্তি না পেলে মুসলিম প্রকৃত মুসলিম হবে না, আর তা না হলে তাদের ভাগ্যও অপরিবর্তিতই থেকে যাবে। তাদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে বিদ'আত ও শিরকমুক্ত আদি অকৃত্রিম ইসলাম পুনঃ প্রবর্তনের দরকার। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকেই ধর্ম তথা সমাজ সংস্কারে মন দেন। এ ব্যাপারে সর্বভারতীয় ওহাবী আন্দোলন ও বাংলায় ফারায়েজী আন্দোলনের ফলশ্রুতি স্মরণীয়। সিপাহী সংগ্রাম (১৮৫৭) বা আযাদী সংগ্রামের আগে শরীয়তুল্লাহ্, সৈয়দ নিসার আলী (তীতুমীর), সৈয়দ আহমদ শহীদ প্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন এদেশের জনমনে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁরা 'দেশ স্বাধীন না করা পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছি। সুতরাং আমরা দারুল হরবে বাস করি'- এ বিশ্বাস নিয়ে আন্তরিকতার সংগে সমাজ সংস্কারের সাথে সাথে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে চেষ্টা চালিয়ে যান। এর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে সিপাহী সংগ্রামে।

ইংরেজরা এদেশে শাসন কায়েম করে সাংস্কৃতিক বিজয়ের অভিযান চালিয়েছে কয়েকদিক থেকে। প্রথমত ভাষা ও সাহিত্য শিখিয়ে আমাদের 'শিক্ষিত' করে তুলতে চেয়েছে, চারদিকে স্কুল ও কলেজ স্থাপন করে আরবী-ফারসী অর্থাৎ মুসলিম শিক্ষার উৎখাত সাধন করে, মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংস্কার করে তা থেকে জিহাদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপনামূলক অধ্যায় তুলে দিয়ে, কেবল তাহারাত সালাত সিয়াম ফিৎরার মাসআলায় এ শিক্ষাকে সীমিত করে দিয়েছে। অপরদিকে মিশনারীদের দিয়ে বিভিন্ন স্থানে 'তবলীগী' মতলব হাসিলের প্রয়াস পায়। মিশনারীরা কতটা আন্তকিরতার সহিত তাঁদের প্রচার চালিয়েছিলেন তার পরিচয় পাই, শ্রীরামপুর মিশনারীদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় এমনকি পূর্ব বাংলাভাষার প্রথম ব্যাকরণ "ম্যানুয়্যাল দ্য আমুমবা সাঁও" পুবাইলের পাদরী সাহেবই রচনা করেন।

কয়েক পুরুষের ব্যবধানে বাঙালি মুসলিম সমাজ হারিয়েছে তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি, হারিয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রাধান্য। ফলে তাদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে অন্ধ আবেগ ও অজ্ঞতা। বারবার ইংরেজদের মুকাবিলা করেছে তারা বেশির ভাগই এ আবেগে চালিত হয়ে। ইংরেজ ও মুসলিমের পারস্পরিক সংশয় ও সন্দেহের ভেতর দিয়ে শাসক ইংরেজ ও শাসিত মুসলিমের মধ্যে ক্রমেই সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছে। এ সুযোগে ভেদবুদ্ধির প্রবর্তক ইংরেজ হিন্দুকে করেছে কৃপা ও অনুগ্রহ বিতরণ। বলাবাহুল্য রাজ্য হারিয়ে মুসলিম নানাভাবে নির্যাতিত হয়েও স্বাধীনতার চিন্তা পরিত্যাগ করেনি, বরং কৃচ্ছতা বরণ করেও তার জিহাদী মনোভাব টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। এ পর্যন্ত যত আন্দোলন হয়েছে প্রায় সবগুলোই সংগঠিত হয়েছে মুসলিমের দ্বারা। হিন্দুরা ইংরেজের

www.nagorikpathagar.org

বিরুদ্ধে তেমন প্রতিরোধ গড়ে তোলার গরজ অনুভব করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র যবন তাড়ানোর কথা বলেছেন: সে যবন মুসলিম, ইংরেজ নয়। তাঁর বন্দেমাতরম হিন্দু-মুসলিম মিলিত বাংলা নয়। হিন্দুরা ইংরেজের সংগে সহযোগিতা করে এসেছে পলাশীর পর থেকেই। আর মুসলিমরা নানা চাপে পড়ে বুঝল যে, ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া আর উপায় নেই, কিন্তু তা অনেক বিলম্বে, অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথম দিকে। এর পূর্বে দীর্ঘদিন ধরে বিজিত মুসলিমের প্রতি ইংরেজরা যে অবিচার করেছিল, ১৯০৯ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত পর পর কতকগুলো আইন প্রণয়ন করে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের মাধ্যমে তারা যখন তার কিছুটা প্রতিকার করতে চাইল, তখন হিন্দুরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নতুন করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মুসলিমদের মধ্যে সামান্য ইংরেজি শিক্ষার ফলে চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দুদের কিছু অসুবিধা হওয়ায় বাংলার হিন্দু-মুসলিমের রেষারেষি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই হিন্দু ও মুসলিমের চিন্তাধারা ও স্বাধীনতা সংগ্রাম-পদ্ধতি ভিন্নখাতে প্রবাহিত ও পরিচালিত হতে দেখেছি, যার ফলশ্রুতি পাকিস্তান আন্দোলন ও সৃজন। কিন্তু এসব অনেক পরের কথা।

উনিশ শতকে দেখা গেল, ইংরেজি প্রভাবে এদেশে লোক 'শিক্ষিত' হয়েছে যেমন, তেমনি খ্রিস্টধর্মেও দীক্ষিত হয়েছে। হালছাড়া নৌকার মতো ক্ষতবিক্ষত অর্ধনগ্ন উপবাসী অশিক্ষিত জনগণের কেউ কেউ উপযুক্ত মুসলিম নেতৃত্বের অভাবে 'যীশুতে বিশ্বাস করে পরিত্রাণ পাওয়ার' চেষ্টাও করেছে অনেক জায়গায়।

একদিকে দীন বা জীবন বিধান ব্যবহারিক জীবনে অনুপস্থিত, অপর দিকে অত্যাচার উৎপীড়নে নিগৃহিত অশিক্ষিত মুসলিম কী করবে বুঝতে পারছিল না। এ সময় যে ক'জন চিন্তাশীল মনীষী ধর্ম-শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে সবল হাতে হাল তুলে নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে খোন্দকার মুহম্মদ শামসুদ্দীন সিদ্দিকী (১৮০৮–১৮৭০), গোলাম হোসেন, শেখ আজীমুদ্দীন, মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭–১৯১২), মোজাম্মেল হক (১৮৬০–১৯৩৩), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০–১৯৩১), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২–১৯২৬), শেখ ফজলুল করীম (১৮৮২–১৯৩৬), মুন্সী মেহেরুল্লাহ (১৮৬১–১৯০৭), মুন্সী জমীরুদ্দীন (১৮৭০–১৯৩০), শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯–১৯০১), মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫–১৯৫০), মুন্সী রিয়াজউদ্দীন, পণ্ডিত রিয়াজউদ্দীন মাশহাদী প্রমুখের নাম সবার আগে স্মরণ করতে হয়। এই মনীষীদের হাতে তাঁদের চেষ্টায় প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামী রেনেসাঁর গোড়াপত্তন হয় এবং ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির ও জীবনভিত্তিক প্রত্যক্ষের প্রথম সাক্ষাৎ মেলে। ওহাবী আন্দোলনের প্রভাব উনিশ শতকের শেষ দুই দশকের ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে মুনশী মেহেরুল্লাহ, শেখ ফজলুল করীম প্রমুখ মুসলিম সাহিত্যিকদের প্রভাবও ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখের সাহিত্যকর্মে বিধৃত। এঁরাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আমাদের পথিকৃৎ। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাঁদের দান সম্বন্ধে এতটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বঙ্কিম চন্দ্র ও মদুসূদনকে বাদ দিলে সে যুগের অন্যান্য হিন্দু সাহিত্যিকদের তুলনায় এঁদের সাহিত্যিক অবদান উৎকৃষ্ট বই নিকৃষ্ট নয়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সে বছরই জন্মগ্রহণ করেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মুন্সী মেহেরুল্লাহর বয়স যখন দু'বছর তখন তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম চিন্তাবিদ

www.nagorikpathagar.org

নবাব আবদুল লতিফের চেষ্টায় ও আমীর আলী প্রমুখ মনীষীর সহায়তায় মুসলিমদের তমদ্দুন সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে কলকাতায় Mohammedan Literary Society নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এরপরে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিও গঠিত হয়। এরপরে আসে 'সুধাকর'-এর কথা। এরও আগে 'ইসলাম তত্ত্ব' প্রকাশিত হয়েছিল। এরও একটু পূর্বকথন রয়েছে।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, উনিশ শতকের ছ'সাত দশকে ইংরেজরা ফারায়েজী ও ওহাবী প্রভৃতি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করে। এরপর বিশ-পঁচিশ বছর মুসলিম রাজনৈতিক ও তামদ্দুনিক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার পর উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত হিন্দু সমাজ যে বিষ সংক্রামিত হয়, উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলিম সমাজেও তার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। এ সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কিছু মুসলমান খ্রিষ্টান হয়ে যায়। অশিক্ষা, আপন ধর্মে বিশ্বাসের শিথিলতা এবং আর্থিক ও সাংসারিক মোহই স্বধর্ম ত্যাগে মুসলিমদেরও প্ররোচিত করে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। হিন্দুরা যখন দলে দলে মিশনারীদের খপ্পরে পড়ে খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছিল, তখন তাদের হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য যে সব মনীষী নানা সমিতি ও সাহিত্য সেবার মাধ্যমে এগিয়ে আসেন, তাদের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ ও রামমোহন রায়, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এঁদের আগে স্মরণ করতে হয়। মুসলিম সমাজেও যখন এ ঢেউ লাগে তখন যাঁরা ইসলাম ও মুসলিমকে রক্ষার জন্য নানাভাবে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র নাম সবার আগে। তিনি ও তাঁর অন্যতম সহকর্মী মুন্‌শী মোহাম্মদ জমীরউদ্দীন গ্রামে- গঞ্জে, জেলায় জেলায় বক্তৃতা দিয়ে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে খ্রিস্টধর্মের খপ্পর থেকে আমাদের তরুণদের রক্ষা করেছিলেন। একাজে সবচাইতে বেশি সহায়ক হিয়েছিল 'সুধাকর' দল। এদলের প্রধান ছিলেন খুলনা জেলার সাতক্ষীরার বাঁশদহ নিবাসী ও কলকাতা ডভটন ও সেন্ট ডেভিয়ার্স কলেজের আরবী-ফারসীর অধ্যাপক মৌলবী মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ, টাঙ্গাইলের চাড়ানের অধিবাসী এবং কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার বাংলা ও সংস্কৃতির অধ্যাপক পণ্ডিত রিয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, বাসির হাটের মুহম্মদপুর নিবাসী মুন্‌শী শেখ আবদুর রহীম এবং কুমিল্লার রূপসার অধিবাসী মুন্‌শী রিয়াজউদ্দীন আহমেদ প্রমুখ।

আর্থিক ও সাংসারিক প্রলোভনে পড়ে যেদিন বাঙালি মুসলমানরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করছিল, সেদিন তার হাত থেকে তাদের বাঁচানোর একমাত্র পথ ছিল তাদের ইসলামের ঐতিহ্য ও মুসলিমের জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। এতে কৃতকার্য হওয়ার জন্য বাংলায় নিজস্ব তাহযীব ও তমদ্দুন সম্বলিত নিজস্ব জীবনবোধে উজ্জীবিত সাহিত্য সৃষ্টি এবং সাধারণ্যে তার প্রচার মাধ্যমে তবলীগের কাজ পরিচালিত হয়। সংবাদপত্র এবং বক্তৃতাও এর অন্যতম মোক্ষম উপায় হিসেবে গৃহীত হয়। 'সুধাকর'-দল ও মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌ প্রমুখ মনীষী এ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলিম তাহযীব ও ইসলামের তত্ত্বকথা সংক্রান্ত কতকগুলো বইয়ের বাংলায় অনুবাদ করে খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ করতে থাকেন। এগুলো 'ইসলাম তত্ত্ব' বা 'মুসলমান ধর্মের সার সংগ্রহ' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭-১৮৮৮ সালে এর কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বলে একে অনেকেই মাসিক পত্রিকা বলে ধরে নিয়েছিলেন। এটি বেশি দিন চলেনি। তবে এর অনুসরণেই 'সুধাকর' প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৮৯)। সুধাকর নানা বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে বেশ কিছু দিন চলেছিল। এর মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বাঙালি মুসলিমের তাদের ধর্মের মহিমা, তত্ত্ব, তথ্য-জাতীয় তাহযীব-তমদ্দুন, নিজস্ব ঐতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে অবহিত ও সচেতন করে তোলা হয়েছিল। সেকালের দিগদর্শন, বঙ্গদর্শন, হিতকরী, তত্ত্ববোধিনী– এসব পত্রিকায় যেসব ইসলামবিরোধী ও মুসলিমদের প্রতি অবজ্ঞামূলক লেখা বের হতো, সুধাকর ও তৎসংশ্লিষ্ট মুসলিম মনীষীরা তার যোগ্য জবাব দিতে কসুর করতেন না।

'সুধাকর' দলের হাতে কিছু কিছু ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তবে সুধাকর ধারা অনুসৃত সাহিত্যই প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম চেতনা সৃষ্টিতে সর্বাধিক কার্যকর একথা ইতিহাস স্বীকার করেছে। তাঁদের সাহিত্যকর্মে একদিকে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যবোধ, অন্যদিকে স্বজাতি-স্বদেশ চেতনা ফুটে উঠেছে, অনুপ্রাণিত করেছে সদ্য ইংরেজি শিক্ষায় প্রবিষ্ট তরুণদের। তাঁরা আরবী, ফারসী থেকে অনুবাদ করেছেন। হযরত মুহম্মদ (সা.) ও সাহাবাদের জীবনী ও আদর্শ, ওলী-দরবেশদের জীবনালেখ্য, ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরেছেন। একটি জাতির আশাআকাঙ্ক্ষা, তার মনোজীবনের স্পন্দন এবং অন্তর এবং বহির্জীবনের প্রকাশ যে তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক—এঁদের এ বোধ ছিল তীক্ষ্ণ তীব্র। বাঙালি মুসলিম জীবনের ঘোর দুর্দিনে এঁরাই জাতিকে নিজেদের চিনতে ও জাতিকে ঘরমুখো করতে সাহায্য করেছিলেন। এক কথায় এঁরা যেভাবে জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেছিলেন সে পথেই অর্ধ শতাব্দীব্যাপী সাধনায় বাঙলি মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছে। মুসলিম বাংলা-সাহিত্য এঁদের ভূমিকা এবং দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিচার করতে হবে। পরবর্তী মুসলিম চিন্তানায়ক, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিকদের জন্য এঁরা পথ তৈরি করে গেছেন। সে কারণেই বলছি, এঁরা আমাদের জাতীয় জীবনে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছেন আর বাঙালি মুসলিমের মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে নবগৌরবে পথ চলার জাগরণী গান গেয়েছেন। এঁদের রচিত সাহিত্যের মূল্য যেমনি হোক না কেন, স্থান-কাল-পাত্র বিচারে বাংলা সাহিত্যে এঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত তাঁদের প্রদর্শিত পথে যে সাহিত্য বাংলায় রচিত হয়েছে—তার মূল্যায়ণের প্রেক্ষাপটেই রচিত পরবর্তী সাহিত্যসম্ভার। জাতির জীবনে রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতির ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পরবর্তীকালে সূচিত হয়ে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়েছে, লালিত হয়ে কর্মে প্রযুক্ত হয়েছে, তার স্বীকৃতিই শতাব্দী রচিত বন্ধন থেকে মুক্তি লাভে সহায়ক হয়েছে, পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে এবং পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ এ সংস্কৃতি চেতনাই যে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌমত্বে প্রতিষ্ঠা করায় সহায়ক হয়েছে একথা আজ ইতিহাস স্বীকৃত।

ইসলামী সাহিত্য সৃজনে যেসব মনীষী অক্লান্ত সাধনায় ব্রতী হন, মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর নাম তাঁদের সবার আগে স্মরণীয়। বাহ্যত তিনি ছিলেন সাধারণ 'মোল্লা' মানুষ। খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের সাথে সংঘর্ষে তাঁর সুপ্ত প্রতিভা জেগে ওঠে। সংঘর্ষই মানুষের শক্তি ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটায় এবং দ্বন্দ্বই যে সাহিত্য রচনায় সহায়ক হয়, একথা মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনে

www.nagorikpathagar.org

যেমন সত্য হয়েছে, তেমনটি অন্য কারো সম্বন্ধে বলা যায় না। তিনি খ্রিস্টান পাদরীদের সংগে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন। ১৮৯২ সালের কথা। তখন তাঁর বয়স ৩১। জমিরউদ্দীন (১৭৮০–১৯৩০) নামে এক মুসলিম যুবক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং জ্ঞানে ও গুণে পাদ্রী পদে উন্নীত হন। তিনি 'আসল কোরান কোথায়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে 'খ্রিস্টিয় বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। প্রবন্ধে পাদ্রী জন্ জমিরউদ্দীন দুটি প্রশ্ন করেন। সুধাকর পত্রিকায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ 'ঈসায়ী বা খ্রিস্টানী ধোকা জ্ঞান' নামে একটি প্রবন্ধে জমিরউদ্দীনের প্রশ্নগুলোর যথোচিত জবাব দেন। মেহেরুল্লাহ্র অকাট্য যুক্তির কাছে পরাজিত হয়ে জন্ জমিরউদ্দীন তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রধান সহায়ক হন।

প্রবন্ধটি প্রথমে প্রকাশিত হয় সুধাকর ১২৯৯ ও ১৩০০ সালের চৈত্র-বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। এটি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী পুরুষ। তিনি একদিকে বই লিখেছেন, অন্যদিকে অসংখ্য মজলিসে ওয়াজ করেছেন। তাঁর গ্রন্থাগারে প্রকাশিত পুস্তক ও রচনাবলী :

১. খ্রিস্টিয় ধর্মের অসারতা (১৮৮৬);
২. মেহেরুল ইসলাম
৩. বিধবা গঞ্জনা;
৪. পান্দে নামা;
৫. হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা–১৯০৮;
৬. খ্রিস্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ–১৮৯৪;
৭. রদ্দে খ্রিস্টান ও দলিলুল ইসলাম–১৮৯৫;
৮. বাবু ইশান চন্দ্র মণ্ডল ও চার্লস ফ্রাঙ্কের ইসলাম গ্রহণ (সংগ্রহ);
৯. উপদেশমালা (সংগ্রহ)–১৯০৯;
১০. নবরত্নমালা বা বাংলা গজল (সংগ্রহ)–১৯১১;
১১. ইসলামী বক্তৃতামালা–১৯০৮।

এসব পুস্তক-পুস্তিকায় মুন্শী মেহেরুল্লাহ্র প্রগাঢ় ধর্মজ্ঞান ও বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত জীবনে সাধারণ দর্জিগিরি করে নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাধনার বলে তিনি বাংলা সাহিত্যে এবং বাঙালি মুসলমানকে জীবন ও ধর্মবোধে আশু গৌরব ও ঐতিহ্যবোধে উজ্জীবিত করতে যে কর্ম প্রচেষ্টায় ব্রতী ও সফল হয়েছিলেন, সে দুর্দিনে যে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, অনেকের কীর্তির মতই তারও যথাযথ মূল্যায়ণ আজো হয়নি। আমরা কি নিশ্চেষ্ট বসে থাকব? তাঁর জীবনী ও অবদান তুলে ধরার কর্তব্য পালনের অবহেলার অপরাধ অপনোদনের সময় কি আমাদের জীবনে এখনও আসেনি?

www.nagorikpathagar.org

অধ্যাপক এ কে এম ইদ্রিস আলী

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও সমসাময়িক রাজনীতি

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫–১৯১১) আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ব্রিটিশ প্রশাসন মূলত প্রশাসনিক সুবিধার্থে বঙ্গ প্রেসিডেন্সী দ্বিধাবিভক্ত করেছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহত্তম অংশ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাগ্রসর শ্রেণী বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। বিশ শতকের প্রথম দশকে বঙ্গ সরকার, হিন্দু ও মুসলমান–এই তিন পক্ষের সংঘর্ষ ও সংঘাতের ইতিহাসই হল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।

ব্রিটিশ-শাসনের প্রারম্ভে উত্তর ভারতের ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল বাংলার গভর্নরের প্রত্যক্ষ শাসনের অধীন ছিল। অবশিষ্ট বিজিত বা অধিকৃত অঞ্চল মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সীর অধীনে ছিল। ১৮৫৩ সনে অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয়। উত্তর ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চল একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর কলিকাতা হতে শাসন করতেন। বিশাল আয়তনের এই প্রদেশ একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে শাসন করা কষ্টসাধ্য কাজ ছিল। সংগত কারণেই এর বিপুল কলেবর হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

১৮৫৪ সনে গর্ভনর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী এবং ১৮৬৬ সনে ভাইসরয়ের কাউন্সিলর স্যার উইলিয়াম গ্রে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু কোন কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ১৮৬৮ সনে ভারত সচিব নর্থকোর্ট প্রসংগটি পুনরায় উত্থাপন করেন। উচ্চ পর্যায়ের দীর্ঘ তদন্ত শেষে ১৮৭৪ সনে আসাম ও বঙ্গের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের কয়েকটি জেলা একজন চীফ কমিশনারের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। ১৮৯২ সনে সামরিক স্ট্র্যাটেজির দিক বিবেচনা করে লুসাই পর্বতমালা আসামের সংগে যুক্ত করা হয়। ১৮৯৬ সনে আসামের চীফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড পুরো চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সংগে যুক্ত করার প্রস্তাব করেন। জমিদার, ব্যবসায়ী ও ইউরোপীয় প্লান্টারদের পক্ষ হতে এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। ত্রিপুরার মহারাজা ও চট্টগ্রামের হিতসাধনী সভার সভাপতি মৌলভী সিরাজুল ইসলামও বিরোধিতা করেন। অনগ্রসর আসামের সংগে যুক্ত হওয়ার ব্যাপরে অনীহাই ছিল প্রাগ্রসর অঞ্চলের অধিবাসীদের বিরোধিতার মূল কারণ। কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বেই প্রস্তাবটির আলোচনা মূলতবী হয়ে যায়। বিষয়টি ১৯০১ সনে পুনরুত্থাপিত হয় যখন প্রশাসন মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত উড়িয়া ভাষাভাষী সম্বলপুর জেলাটির সমস্যা তীব্রভাবে অনুভব করে। মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার এন্ড্রুফ্রেজার সম্বলপুরকে উড়িষ্যার সংগে যুক্ত করে বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত করার অথবা পুরো উড়িষ্যাকে মধ্য প্রদেশের সংগে যুক্ত করে মধ্য প্রদেশের প্রশাসনের আওতায় আনার প্রস্তাব করেন। ব্রিটিশ-ভারতের আমলারা বিষয়টি নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে এবং ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও ভাষাগত প্রেক্ষাপটে ভারতের মানচিত্র পুনর্গঠনে সচেষ্ট হয়। ১৮৯৬ সনে উইলিয়াম ওয়ার্ডের প্রস্তাবটি নতুন আংগিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

সংশোধিত প্রস্তাবে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা দুটো এবং পুরো চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের চীফ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করার ইচ্ছা ব্যক্ত হয়। জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব ১৯০৩ সনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। ১৮৯৬ সনের মত ১৯০৩ সনেও বিরোধিতার মূলে ছিল অনগ্রসর এলাকার সংগে সংযুক্তির প্রশ্নে প্রাগ্রসর এলাকার অধিবাসীদের অনীহা এবং লে. গভর্নরের আওতা থেকে চীফ কমিশনারের আওতায় যাওয়ার ব্যাপারে অনিচ্ছা।

১৯০৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ভাইসরয় কার্জন (১৮৯৮–১৯০৫) চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহে এক ঝটিকা সফরে আসেন এবং বিভিন্ন সুধী সমাবেশে বক্তৃতাকালে এক আকর্ষণীয় পরিকল্পনার ইংগিত দেন। ঐ পরিকল্পনায় এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একটি পূর্ণাংগ প্রদেশ গঠনের আভাস ছিল। এটা একজন লে. গভর্নর ও তাঁর আইন পরিষদ দ্বারা শাসিত হবে এবং সেখানে একটি রাজস্ব বোর্ডও থাকবে। চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগত্রয় আসাম, পার্বত্য ত্রিপুরা এবং মালদহ জেলা সমন্বয়ে এই নতুন প্রদেশ গঠিত হবে। ঢাকা হবে এর রাজধানী এবং চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর। ১০৬,৫৪০ বর্গমাইল ব্যাপী এই প্রদেশের লোকসংখ্যা হবে প্রায় তিন কোটি দশ লক্ষ। এরমধ্যে মুসলমান জনসংখ্যার পরিমাণ হবে এক কোটি আশি লক্ষ। এই পরিকল্পনায় মধ্য প্রদেশ ও মাদ্রাজের উড়িয়া অধ্যুষিত অঞ্চল বঙ্গ প্রদেশের সংগে এবং হিন্দী ভাষাভাষী ছোট নাগপুর মধ্য প্রদেশের সংগে যুক্ত করার প্রস্তাব ছিল। এভাবে পুনর্গঠিত বঙ্গ প্রদেশের আয়তন হবে ১৪১,৫৮০ বর্গমাইল, নব্বই লক্ষ মুসলমানসহ মোট জনসংখ্যা হবে পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ। তবে উভয় প্রদেশই কলিকাতা হাইকোর্টের আওতায় থাকবে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট সামনে রেখে এভাবে প্রশাসনের আঞ্চলিক পুর্নগঠনের চূড়ান্ত প্রস্তাব রাখা হয়। নীতি নির্ধারক কর্মকর্তারা আশাবাদী ছিলেন যে, এই ব্যবস্থায় অবহেলিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমুখী তৎপরতায় প্রশাসন অধিকতর মনোযোগী হতে সক্ষম হবে। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে আইন-শৃঙ্খলা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। পাট ও চা শিল্পের উন্নতি ঘটবে। চট্টগ্রাম বন্দর স্বাভাবিক অথচ উর্বর পশ্চাদভূমি লাভ করবে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হবে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এই এলাকাকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারলে প্রশাসনের পক্ষ হতে কিছুটা ন্যায় বিচার করা হবে বলে মনে করা হয়। কারণ এ যাবত এই অঞ্চলের রাজস্ব ও এই এলাকার পাট-চা প্রভৃতি রপ্তানি পণ্যের অর্থে কলিকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং কলিকাতাবাসীরা মনের আনন্দে এর হিস্সা ভোগ করেছে। প্রাগ্রসর কলিকাতাবাসীদের প্রতিযোগিতার কবল থেকে মুক্ত করে এই অবহেলিত অঞ্চলের অধিবাসীদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সার্থক অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া প্রশাসনের বহু কর্মকর্তা পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করে। এসব উৎসাহী কর্মকর্তারা কার্জনের অনুপস্থিতিতেই বঙ্গ বিভক্তকরণের প্রাথমিক ক্রিয়া-কর্ম সমাধা করেন। এঁদের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে ফ্রেজার ও রিজলীর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯০৪ সনের ডিসেম্বর মাসে কার্জন 'হোম' থেকে ফিরে আসেন, পরবর্তী ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য লন্ডন প্রেরিত হয়। ভারতসচিব সেন্ট জনব্রোডিক খইজনু তা অনুমোদন করেন এবং ১৯ জুলাই ভারত সরকারের এক রেজুলেশনে তা প্রচারিত হয়। ১৯০৫ সনের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ বাস্তবায়িত হয়।

উপরের আলোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রশাসনিক সুবিধা ও গণমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ হয়: এবং সেই সঙ্গে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, প্রসংগটি দীর্ঘদিনের এবং কার্জনের কর্মকালের পূর্বেও এর অস্তিত্ব ছিল। কাজেই 'আকস্মিকভাবে বঙ্গভঙ্গ করা হইয়াছে'– রমেশচন্দ্র মজুমদারের এ মন্তব্য সঠিক বলে স্বীকার করা মুশকিল। তবুও হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী কার্জনকেই মূল আসামী হিসেবে চিহ্নিত করে। বাঙালি জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে দুর্বল রাখার লক্ষ্যেই তা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। তারা বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন শুরু করে এবং ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ঠেলে দেয়।

কারা এই ভদ্রলোক শ্রেণী? সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতব্দীতে বর্ণ হিন্দুদের একটি অংশ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের অধঃস্তন অংশীদার (Junior Partner) হিসেবে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য পরিচালনায় সাহায্য-সহযোগিতা করে প্রচুর অর্থ ও বিত্তের মালিক হয়। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো, বিচার বিভাগ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্রিটিশ শাসনামলে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয়। এ পরিবর্তনে পুরাতন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে এবং পুরাতন অভিজাত শ্রেণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কোম্পানির অধঃস্তন অংশীদার "বেনিয়াগণ" সেই শূন্য স্থান দখলে তৎপর হয়। পুরোনোদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিল, কিন্তু উঠতি শ্রেণীটি মূলত বর্ণ হিন্দুদের (ব্রাহ্মণ, কায়েত, বৈদ্য) দ্বারা গঠিত ছিল। অনেক ঐতিহাসিক নবগঠিত এই শ্রেণীটিকে বাবু বা ভদ্রলোক শ্রেণী বলে অভিহিত করেন। তারা ঊনবিংশ শতাব্দীতে জমিদার, তালুকদার, সুদে মহাজন, শিক্ষক, উকিল, বিচারক, ডাক্তার, সাংবাদিক ও প্রশাসনিক আমলা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুধু বঙ্গে নয়, তাদের বিচরণ ক্ষেত্র উত্তর-পশ্চিম ভারতেও বিস্তৃত ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের কল্যাণে তারা একটি জীবন দর্শন পায়। এই জীবন দর্শন তাদেরকে ব্রিটিশ শাসনের অনুগত থেকে একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

ইউরোপের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ও শিল্প বিপ্লবের গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের ফলে ১৮৬০-এর দশক থেকে তাদের আনুগত্য নীতি পরিবর্তিত হতে থাকে। তাদের ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক রাজনৈতিক সংগঠনটি তাদের ধ্যান-ধারণার সংগে সংগতি রেখে চলতে ব্যর্থ হয়। ১৮৭৭ সনে তারা ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠন করে। ১৮৮৫ সনে সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূলে তাদের মুখ্য ভূমিকা না থাকলেও ১৮৮৭ সনে কলিকাতা সম্মেলনের পর এই প্রতিষ্ঠানটির উপরও তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সর্বভারতীয় রাজনীতির সংগে বাংলার রাজনীতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৮৬৭

www.nagorikpathagar.org

সনে নব গোপাল মিত্র প্রবর্তিত 'হিন্দু মেলা' তাদেরকে শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রেরণা যোগায়। উনিশ শতকের শেষ দশকে মারাঠা নেতা মাধব গোবিন্দ রানাদের বক্তৃতামালা এ আন্দোলনকে সর্ব ভারতীয় আন্দোলন রূপে আরো এগিয়ে নিয়ে যায়।

বিশ দশকের শুরুতে ভদ্রলোক শ্রেণী ছিল বিশ্বাসে বলীয়ান ও সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য উদগ্রীব। বিগত বছরগুলোতে "আবেদন-নিবেদনের" রাজনীতির মাধ্যমে তারা সরকারের নিকট হতে বেশ কিছু সুযোগ-সবিধা আদায় করলেও তাদের কতকগুলো মৌল দাবী তখন পর্যন্ত পূরণ হয়নি। এ দাবীগুলো ছিল—প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, আই. সি. এস. ভারতীয়করণ, গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্য মোচনের লক্ষ্যে 'অর্থনৈতিক ড্রেন' সমস্যার সমাধান, ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণ, বিজ্ঞান ও যুক্তিগত শিক্ষার বিস্তার ঘটানো, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি। "ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী" কার্জন এসব দাবী মেনে তো নিলেনই না, উপরন্তু তাঁর প্রবর্তিত কতকগুলো "কালাকানুন" ভদ্রলোক শ্রেণীর "পবিত্র" অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। ১৮৯৯ সনের কলিকাতা কর্পোরেশন আইন ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব হ্রাস করে এবং ইউরোপীয় প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করে। ১৯০৪ সনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন উচ্চ শিক্ষার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ও উচ্চ শিক্ষার দ্বার সঙ্কুচিত করে। ১৯০৪ সনের অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করে। কার্জনের যদিও যুক্তি ছিল, উত্তম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যেই এ ধরনের আইন-কানুনের প্রয়োজন, কিন্তু ভদ্রলোক শ্রেণীর দৃষ্টিতে এগুলো ছিল সাম্রাজ্যবাদী নীতির নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ। এ ধরনের কর্মতৎপরতা এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেসের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শনের জন্য মধ্যপন্থী কংগ্রেস নেতা ওয়াসা ১৯০২ সনে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, কার্জনকে লর্ড লিটনের চেয়েও অধিকতর বিক্ষুব্ধ ভারত প্রত্যক্ষ করতে হবে।

ভদ্রলোক শ্রেণীর নিজস্ব কিছু আর্থ-সামাজিক সমস্যাও পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় এবং আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। "বংগীয় রেনেসাঁর" জন্মদাতা রামমোহন রায়ের সমর্থনপুষ্ট হিন্দু শাস্ত্রের দায়ভাগ নীতি বঙ্গে অনুসরণের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিত্তশালী জমিদার ও তালুকদারদের অনেক পরিবারই অগণিত উত্তরাধিকারের চাপে বিশ শতকের শুরুতে দরিদ্র হয়ে পড়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগ হতে উত্তর ভারতের অবাঙালি অঞ্চলে আঞ্চলিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় এবং সরকারও চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে ঐসব এলাকার লোকদের অগ্রাধিকার দেয়। বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণীর চাকরির বিশাল ক্ষেত্র এভাবে সঙ্কুচিত হয়ে বঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সরকারের অনুসৃত নীতি এখানেও তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন করে। তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়। তদুপরি উনিশ শতকের উর্ধ্বগতি ভদ্রলোক শ্রেণীর অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে কলিকাতায় বসবাসকারী উকিল, লেখক ও সাংবাদিকরা নবগঠিত প্রদেশে তাদের পেশাভিত্তিক বাজার হারানোর ভয়ে ভীত ছিল। চট্টগ্রাম বন্দরের প্রস্তাবিত কর্মতৎপরতা কলিকাতা ভিত্তিক ব্যবসায়ি সম্প্রদায়কে আতংকিত করেছিল। কলিকাতা প্রবাসী পূর্ববঙ্গের "অনুপস্থিত" জমিদার ও তালুকদারগণের ভিন্ন ধরনের সমস্যা ছিল। নতুন প্রদেশে সরকারের "অবাঞ্ছিত" পদক্ষেপ প্রজা-জমিদার সম্পর্কের অবনতি

www.nagorikpathagar.org

ঘটাতে পারে বলে তারা আশংকা করছিল। বঙ্গভঙ্গ ছিল জমিদার ও পেশাভিত্তিক ভদ্রলোক শ্রেণীর জন্য অশনি সংকেত।

বহির্বিশ্বের কিছু ঘটনাবলীও ভদ্রলোক শ্রেণীকে বিপ্লবের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। ১৮৯৯ সনের বোয়ার যুদ্ধ, ১৯০৪–০৫ সনের রুশ-জাপান যুদ্ধ, ইটালীর অ্যাডোয়া সমস্যা প্রভৃতি ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, সাদা চামড়ার লোকেরা অপরাজেয় নয়। ভগ্নী নিবেদিতার ভারতে উপস্থিতি ও কর্মতৎপরতা বহু ভদ্রলোককে বিপ্লবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গ্রহণের পূর্বেই ভদ্রলোক শ্রেণী রাজশক্তিকে আধুনিক পন্থায় একটা চ্যালেঞ্জ দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। বারুদ প্রস্তুত ছিল, বঙ্গভঙ্গরূপী দিয়াশলাই এতে অগ্নিসংযোগ করে মাত্র।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী বিক্ষোভ আধুনিক ভারতের ইতিহাসে বহুল আলোচিত অধ্যায়। এখানে সংক্ষেপে এর প্রকৃতি ও বিক্ষোভকারীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আলোচনা করা হবে। পরস্পরের সংগে সংযুক্ত কিন্তু সুস্পষ্ট চারটি পর্যায়ে এই বিক্ষোভ কাল বিভক্ত ছিল।

প্রথম পর্যায়ে ১৯০৩ সনের ডিসেম্বর মাসে তা শুরু হয়, যখন বঙ্গ বিভক্তির পরিকল্পনা প্রথমবারের মত জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়। বিখ্যাত মধ্যপন্থী কংগ্রেস নেতা ও ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে এই পর্যায়ের তৎপরতা শুরু হয়। ব্যানার্জী ১৮৯৯ সনে কলিকাতা কর্পোরেশন বিলের প্রতিবাদে কর্পোরেশন হতে বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যতদিন না বেসরকারী নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, ততদিন তিনি কর্পোরেশনে প্রত্যাবর্তন করবেন না। কার্জনের অন্যান্য সংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যানার্জী বিভিন্ন পন্থায় ইতিপূর্বে প্রতিবাদ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী বিক্ষোভেও তিনি ঐসব পন্থা অবলম্বন করেন। সংবাদপত্রে প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় লিখে, জনসভা করে এবং কর্তৃপক্ষের সমীপে স্মারকলিপি পেশ করে ও প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে তিনি প্রতিবাদ করেন।

উপরোক্ত পদ্ধতি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। ১৯০৫ সনের জুলাই মাস হতে বিক্ষোভের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। মৌখিক প্রতিবাদ নয়, প্রচণ্ড অভিযানের মাধ্যমে এই পর্যায়ের কর্মতৎপরতা চলে। সরকারী কর্মচারীদের চাকরি হতে ইস্তফা দেয়া, বিলাতী দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার এবং জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচির মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ। ব্যানার্জী ও তাঁর ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন এসব তরুণ নেতার উদ্যোগ সমর্থন করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি ও অন্যান্য মধ্যপন্থী নেতা আন্দোলনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারান। তাঁদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পন্থা-পদ্ধতি চরমপন্থীরা বর্জন করে।

চরমপন্থীদের নেতৃত্বে আন্দোলন ১৯০৬ সনে তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে এবং ভয়ালরূপ পরিগ্রহ করে। বহুসংখ্যক "ভদ্রলোক" স্বেচ্ছাসেবী লাঠিয়াল বাহিনী, সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন এবং আখড়ার (ব্যায়ামাগার) সদস্য হয় এবং সহিংস আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। মধ্যপন্থীদের উদার ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ব্রিটিশ জাতি ন্যায়বিচার ও যুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল–মধ্যপন্থীদের এ বিশ্বাসে চরমপন্থীদের সায় ছিল

www.nagorikpathagar.org

না। সব ধরনের ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের অনাস্থা প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষের লেখনী ভদ্রলোক শ্রেণীকে আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানায়। তাঁরা দেশজ প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনরুজ্জীবন ঘটানো ও হিন্দু প্রতীকসমূহ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই ধ্যান-ধারণা ও সরকারের দমন নীতি বিক্ষোভকে চতুর্থ পর্যায়ে ঠেলে দেয়। এ পর্যায়ে প্রকাশ্যে "ভায়োলেন্সের" প্রচার ও অনুশীলন চলে। সন্ত্রাসবাদের অন্যতম প্রবক্তা বারীন ঘোষ ও অরবিন্দ ঘোষের প্রচারপত্র ও সংবাদপত্রসমূহে ১৯০৭ সনে বিপ্লব ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে ঘোষিত হয়। অসুর দমনকারিণী কালী দেবীর আবির্ভাব ও কার্যাবলীর কথা তাঁরা ভদ্রলোক শ্রেণীকে স্মরণ করিয়ে দেন। অসুররূপী ব্রিটিশদেরকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তাঁরা এই শ্রেণীকে কালী দেবীর প্রসন্নতা অর্জন করে আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার পরামর্শ দেন। এই প্রচারণার ফলে তরুণ ভদ্রলোকেরা দলে দলে কালী দেবীর বিগ্রহের সামনে শপথ গ্রহণ করে এবং সন্ত্রাসবাদী সমিতির সদস্য হয়ে যায়। তারা ও তাদের-সহযোগিরা রাজনৈতিক ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যায় লিপ্ত হয়। এসব সমিতির মধ্যে কলিকাতার যুগান্তর ও ঢাকার অনুশীলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চরমপন্থীদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে মধ্যপন্থী নেতৃবৃন্দ অসহায় বোধ করতে থাকেন। তাদের অনেকেই আন্দোলন হতে সরে দাঁড়ান। যেমন বর্ধমানের মহারাজা। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়ে ভাইসরয় মিন্টোর সমীপে হাজির হন এবং আশু সরকারি হস্তক্ষেপ কামনা করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনবিরোধী কয়েকজন "সাম্প্রদায়িক" মুসলমান নেতাও এই প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের বিলাতী দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার এবং জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচি সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ঝড় তোলে। শুধু বাঙলায় নয়, বাঙলার বাইরেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ভদ্রলোক শ্রেণী বর্জন আন্দোলনের ধারণা কোথা হতে পেল? অনেকে মনে করেন, ১৯০৪ সনে চীনাদের আমেরিকার পণ্য বর্জন নীতি ভদ্রলোক শ্রেণীকে প্রভাবিত করেছিল। অনেকে অবশ্য দাবী করেন, বিষয়টি একান্তই ভারত-জাত এবং শিল্পোন্নত ব্রিটিশদেরকে মুক্কাবিলার জন্য নিরস্ত্র ভারতবাসী এই উত্তম ব্যবস্থা বেছে নিয়েছিল। মিস্টার ও মিসেস মুখার্জীর মতে, জাতীয় আত্মসম্মান রক্ষায় নিয়োজিত একটি নিরস্ত্র জাতির নিকট বর্জন নীতি হল শেষ বৈধ অবলম্বন। ব্রিটিশ শিল্পপতি সম্প্রদায়ের উপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্জন নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ভদ্রলোক শ্রেণীর ধারণা ছিল, স্বীয় স্বার্থরক্ষার খাতিরে এই ব্রিটিশ সরকারের উপর বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য চাপ সৃষ্টি করবে। বিলাতী সূতি বস্ত্র, চিনি, লবণ, তামাক, চামড়াজাত দ্রব্য ছিল বর্জন আন্দোলনের মুখ্য লক্ষ্য বস্তু। প্রথম পর্যায়ে সংবাদপত্র, প্রচারপত্র ও জনসভার মাধ্যমে বর্জন আন্দোলন সফল করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। পরে অবশ্য স্বেচ্ছাসেবীরা গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, মেলায় আন্দোলন সফল করার দায়িত্বে লিপ্ত ছিল। স্কুল-কলেজের ছাত্ররা এ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রথম দিকে স্বেচ্ছাসেবীরা "অনুরোধের

www.nagorikpathagar.org

উপরোধের" মধ্যে তাদের কর্তব্য সীমাবদ্ধ রাখলেও পরবর্তী পর্যায়ে তারা শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। তারা দোকানদার ও খরিদ্দার উভয়কেই বল প্রয়োগে বর্জন নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য করে। সিরাজগঞ্জের ছাত্র-আন্দোলন ও পরিণতিতে ব্যামফিল্ড ফুলারের পদত্যাগের মূলে এ ধরনের একটা "পিকেটিঙের" ঘটনা ছিল। জমিদার ও উকিলরা নিজেদের পরিধির মধ্যে সামাজিক নির্যাতনের আশ্রয় নিয়ে বর্জন আন্দোলন সফল করার চেষ্টা করে। প্রতিপক্ষকে তারা একঘরে করত এবং ধোপা-নাপিত ও পুরোহিত বন্ধ করে দিত। এ আন্দোলন মাড়োয়ারী, নমশুদ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় ও সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে। বিলাতী পণ্যের সস্তা দর ও দেশী পণ্যের কাহাত ও চড়া দর পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। অনেক মুসলিম নেতা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিদেশী কর্মসূচি গ্রহণ করলেও বর্জন নীতির সমালোচনা করেন। তাদের মতে, অন্য জাতির নিকট থেকে শিক্ষার অনেক কিছু আছে, বর্জননীতি অনুসরণের ফলে স্বদেশী পণ্যের মান উন্নত হবে না।

বর্জন আন্দোলনের সংগে স্বদেশী (স্বদেশজাত পণ্য ব্যবহারের) আন্দোলন ওতপ্রোত জড়িত। স্বদেশী ধারণা নিঃসন্দেহে বর্জন ধারণার পূর্ববর্তী। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, ভারতীয় কুটির শিল্প বাঁচানোর লক্ষ্যে ১৮৬৭ সনে হিন্দু মেলার জন্ম হয়। উনিশ শতকের শেষার্ধে অনেক উদ্যমশীল ব্যক্তি বাংলা ও পাঞ্জাবে ইস্পাত ও রসায়ন কারখানা, ব্যাংক প্রভৃতি স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। জাতীয় কংগ্রেসও স্বদেশী আদর্শের প্রতি সমর্থন জানায়। ১৯০১ সন হতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের রাজনৈতিক কর্মসূচির সংগে শিল্প প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা রাখা হয়। তবু বঙ্গভঙ্গোত্তর স্বদেশী একটি আন্দোলন হিসেবে গণমনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ভদ্রলোক শ্রেণী স্বদেশী আন্দোলনকে বিলাতী বর্জন আন্দোলনের অপরিহার্য পরিপূরক হিসেবে মনে করে। কাপড়ের কল, দিয়াশলাই ও সাবানের কারখানা প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বঙ্গ লক্ষ্মী কটন মিল, কলিকাতা উইভিং কোম্পানি, বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংক, ন্যাশনাল কোম্পানি, বেঙ্গল ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী প্রভৃতি স্থাপিত হয়।

বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি ভদ্রলোক শ্রেণী জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গের পূর্বেই ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় মানবিক শাখা ও ইংরেজি ভাষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিদ্যাচর্চা ও ভারতীয় ভাষাসমূহের অধ্যয়নের উপর তেমন গুরুত্ব ছিল না। ১৮৯৩ সনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে "এলিট" সৃষ্টির কারখানা বলে আখ্যায়িত করেন। ১৯০৩ সনে তিনি স্বদেশী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদান এই কর্মসূচির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তবু বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের যুগেই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন "জনপ্রিয়" আন্দোলনে পরিণত হয়। ড. রাসবিহারী ঘোষ এই আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯০৬ সনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদ জাতীয় ইতিহাস চর্চা, মানবিক শাখার অধ্যয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা অনুশীলনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে। বেঙ্গল জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলা পর্যায়ে জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় অথবা অমঞ্জুরিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় স্কুলে রূপান্তর করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

চরমপন্থীদের অনুসৃত নীতি কলিকাতা ও মফস্বলের ভদ্রলোকদের মধ্যে সেতু বন্ধন রচনা করে। কিন্তু এই নীতির কিছু দুর্বল দিকও ছিল। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ভদ্রলোক শ্রেণীর ছিল না। তারা "ভদ্রলোক" বহির্ভূত বিশাল জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। মাড়োয়ারী, নমশুদ্র ও মুসলমানরা তাদের বিরোধিতা করে। উড়িষ্যা ও বিহারে আন্দোলন হয়নি। আসামে আন্দোলনের অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। বাংলাতেও শুধু সেসব অঞ্চলে আন্দোলন তীব্র হয়েছিল, যেখানে ভদ্রলোক শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মজবুত ছিল। মোহিনীপুরে আন্দোলন হয়নি, প্রভাবশালী রহিস্যা সম্প্রদায় ভদ্রলোকদের আহ্বানে সাড়া দেয়নি। কুচবিহারেও কোচরা আন্দোলনে যোগ দেয়নি। সিরাজগঞ্জ ছাড়া সমস্ত উত্তর বঙ্গে আন্দোলনের গতি মন্থর ছিল। উত্তর বঙ্গের শক্তিশালী মুসলমান জোতদাররা আন্দোলনের অনুকূলে সাড়া দেয়নি।

মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ ও বিভক্তি সর্বভারতীয় কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যেও বিস্তৃত ছিল। মারাঠা নেতা বালগংগাধর তিলক ও পাঞ্জাবী নেতা লালা লাজপৎ রায় মনে-প্রাণে চরমপন্থী ছিলেন। তারা স্বদেশী ও বর্জন আন্দোলনের গোড়া সমর্থক ও একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ১৯০৩ ও ১৯০৪ সনে চরমপন্থীদের চাপের মুখে কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের নিন্দা করতে বাধ্য হয়। ১৯০৫ সনের কংগ্রেস অধিবেশনে একটা আপোষরফা হয় এবং শুধু বঙ্গে আন্দোলন পরিচালনার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ১৯০৬ সনে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে তিলকের অদম্য প্রচেষ্টায় স্বরাজ, স্বদেশী, বর্জন ও জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচির অনুকূলে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এমনকি দাদাভাই নওরোজীর মত কঠোর মধ্যপন্থী নেতাও ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। বঙ্গের আন্দোলন এভাবে সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

তিলক, লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ও বারীন সংবাদপত্র ও জনসভার মাধ্যমে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার অভিযান চালান। মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল বলে দাবী করা হয়। এ সম্পর্কে The English Man পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে রজনী পাম দত্ত দেখিয়েছেন যে, বিলাতী দ্রব্য অবিক্রিত অবস্থায় পড়েছিল এবং ভারতীয় শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে মিছিল, হরতাল প্রভতি কর্মসূচিও অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছিল।

১৯০৭ সনে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের সংঘাত তুংগে ওঠে। প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা ও হৈ চৈ হয়, অবশেষে অধিবেশন ভেঙে যায়। মধ্যপন্থীরা একটা কনভেনশন গঠন করে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সাংবিধানিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে স্বায়ত্তশাসন অর্জন করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। কংগ্রেস হতে বহিস্কৃত হওয়ার পরপরই চরমপন্থীদের উপর সরকারের কঠোর নির্যাতন নেমে আসে।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, ভদ্রলোক শ্রেণী বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের সমর্থন পায়নি। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের অসম বিকাশই এর মূল কারণ ছিল। যে কারণে ১৮৫৭-৫৮ সনের "বিদ্রোহের" সময় ভদ্রলোক শ্রেণী

www.nagorikpathagar.org

ব্রিটিশদের সহযোগিতা করেছিল, সেই একই কারণে ১৯০৫-১১ সনে বিকাশমুখী সম্প্রদায় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আরো বিকশিত হতে চেয়েছিল।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভদ্রলোক শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের মূলে যেসব কারণ সক্রিয় ছিল সেসবই পরোক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিকাশে বাধার সৃষ্টি করেছিল।

মুসলমানদের আত্মোপলব্ধি ও বিকাশ কিছুটা ভিন্নপথে শুরু হয়েছিল। ১৮৫৯ সনের ভূমিকর আইন ও ১৮৮৫ সনের প্রজাস্বত্ব আইন কৃষক জোতদার শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল। জোতদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুসলমান পরিবার ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফারায়েজী ও ওহাবী আন্দোলন রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ হলেও তা মুসলমানদের সমাজ জীবনে গতি সঞ্চার করেছিল। সনাতনপন্থী ও সংস্কারপন্থী ওলামাদের "বাহাস", ওয়াজ-নসিহত স্থবির সমাজ ব্যবস্থাকে সচল করেছিল। এক্ষেত্রে ওহাবীবিরোধী মওলানা কারামত আলী ও খ্রিস্টান মিশনারী বিরোধী মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী এবং তাঁদের মোহামেডান লিটেরারী সোসাইটি ও সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের তৎপরতায় মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ শুরু হয়। "উচ্চাভিলাষী" হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতিপক্ষ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৮৭০-এর দশকে ব্রিটিশ সরকারের নীতি পরিবর্তিত হয়। মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষা-দীক্ষা ও চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে থাকে। মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে এই পদক্ষেপ খুবই সহায়ক ছিল। কিন্তু এই প্রক্রিয়া পূর্ণতা লাভের পূর্বেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়।

বিশ শতকের প্রথম দশকে (হিন্দু) ভদ্রলোক শ্রেণী ছিল সুসংগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সরকারকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে অগ্রসর হওয়ার মত সাংগঠনিক শক্তি তারা অর্জন করেছিল। অপরদিকে মুসলমান সম্প্রদায় ছিল সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিকাশমুখী। ঘুমন্ত মুসলমানরা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার মুখাপেক্ষী ছিল। শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে নয়, বাধ্যানুগত আচরণের দ্বারাই ঐ পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করা সম্ভব বলে তাদের নেতা নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ্‌ বিশ্বাস করতেন।

সিপাহী বিদ্রোহে সক্রিয় সহযোগিতার পুরস্কার হিসেবে ঢাকার নওয়াব পরিবার ব্রিটিশদের কৃপাদৃষ্টি ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে আসছিল। হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর মুকাবিলায় বাংলাতে শক্তিশালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনের জন্য এই পরিবারের নেতৃত্বের উপর ব্রিটিশরা বরাবরই আশাবাদী ছিল। নওয়াব আবদুল গণী ও নওয়াব আহসানউল্লাহ ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সময় নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ এই পরিবারের নেতা ছিলেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নীতি অনুসরণ করেছিলেন মাত্র অর্থাৎ ব্রিটিশরাজের অনুগত থেকে মুসলিম স্বার্থ ত্বরান্বিত করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, সহজ শর্তে ঋণের বিনিময়ে সলিমুল্লাহ সরকারের পক্ষে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অভিযোগটি সত্য বলে স্বীকার করে নিলেও নওয়াবের চরিত্রের উপর কলঙ্ক আরোপিত হয় না। কারণ হিন্দু মহাজনদের দেয়া ঋণ পরিশোধের জন্যই অভাবগ্রস্ত নওয়াব সরকারের ঋণ গ্রহণ করেছিলেন এবং নওয়াব তা করেছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থেই। ১৯০৩ সনের বিভক্তি প্রস্তাবে তিনি আপত্তি

www.nagorikpathagar.org

জানিয়েছিলেন, কিন্তু ১৯০৫ সনের প্রস্তাব তিনি সাদরে গ্রহণ করেন। কেননা শেষোক্ত প্রস্তাবটিতে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠনের প্রতিশ্রুতি ছিল। তিনি বিশ্বাস করেন, নবগঠিত প্রদেশে ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি না হয়ে অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায় শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা ও চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে উন্নতি করার অবাধ সুযোগ পাবে। তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন সত্য, তবে একটি শক্তিশালী আগ্রাসী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর মুকাবিলায় অবহেলিত এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থে তিনি সাম্প্রদায়িক হয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদী ভদ্রলোকদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে সাম্প্রদায়িক নেতা হতে বাধ্য করেছিল।

দল-মত নির্বিশেষে মুসলমান নেতৃবৃন্দ ১৯০৩ সনে বঙ্গ বিভক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি করেছিলেন। হিন্দু "ভদ্রলোক" শ্রেণীর অনুকরণে তারা জনসভা করে, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় লিখে এবং স্মারকলিপি পাঠিয়ে প্রতিবাদ করেন। ১৯০৫ সনে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হলে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভেদ পরিলক্ষিত হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর নেতৃত্বে এবং আলেম সমাজের তৎপরতায় অধিকাংশ মুসলমান বঙ্গভঙ্গের পক্ষে থাকে।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রভাবশালী মুসলমানরা ১৯০৫ সনের ১৬ অক্টোবর নর্থব্রুক হলে মিলিত হয়ে মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন গঠন করেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ সর্বসম্মতিক্রমে ঐ সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক মনোনীত হন। তিনি বক্তৃতাকালে লর্ড কার্জনকে এই মর্মে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে মুসলমানরা সার্বিক উন্নয়নের সুযোগ পাবে। নওয়াবের আশাবাদ অমূলক ছিল না। বহু যুগের অবহেলার পর সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের দাবী অগ্রাধিকার পায়। ঐ সম্প্রদায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয় এবং শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। সুযোগ-সুবিধা বিলি-বণ্টনের জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ সরকারের এজেন্ট ও বেসরকারী উপদেষ্টার মর্যাদা পান।

ভদ্রলোক শ্রেণী সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন করেন। কিছু সংখ্যক বিপ্লবী ভদ্রলোক মুসলমানদের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে কতগুলো বাস্তব পদক্ষেপ নেন। মুসলিম রাজরাজড়া ও বীরদের নিয়ে নাটক-উপন্যাস লেখার কাজ শুরু হয়। শাহজাহান, মীর কাসিম প্রভৃতি নাটক ঐ সময়েরই লেখা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোরা' উপন্যাস এ সময়েই লিখেছিলেন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী মুসলমান নেতৃবৃন্দের কর্মতৎপরতা হিন্দু সংবাদপত্রসমূহে মাত্রাতিরিক্ত ফলাও করে প্রচার করা হয়। কিন্তু এতসব করেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তার রোধ করা গেল না। চরমপন্থী ভদ্রলোক শ্রেণীর ধর্মাশ্রিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সংগে মুসলমানরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। হিন্দু জমিদার ও কুসীদজীবী মহাজনদের অত্যাচার মুসলমান কৃষকেরা ভুলতে পারেনি। এসব "ভদ্রলোক" যখন বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলন জোর করে মুসলমান দোকানদার ও মুসলমান কৃষকদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে, তখন আন্দোলন মারাত্মক সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করে।

www.nagorikpathagar.org

১৯০৫ সনের ৬ এপ্রিল যশোরের মাগুরাতে সাম্প্রদায়িক তিক্ততার প্রথম সূত্রপাত হয়। ধীরে ধীরে অন্য এলাকাতেও তা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৭ সনের ৪ মার্চ নওয়াব সলিমুল্লাহর কুমিল্লা সফরের সময় স্বদেশী বাহিনী মুসলমানদের মিছিলের উপর আক্রমণ চালায়। নওয়াবের সেক্রেটারী আহত এবং অন্য একজন মুসলমান নিহত হন। গুণ্ডামির জবাব শান্তিপ্রিয় উপায়ে দেয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। নওয়াবের নেতৃত্বে মুসলমানরা হাতে লাঠি তুলে নেয়। স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবী ও মুসলমান স্বেচ্ছাসেবীরা গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-মাঠে, মেলায় পরস্পরের মুখোমুখি হয়। মসজিদ ও মন্দিরও তাদের আক্রমণ হতে রেহাই পায়নি। পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র ও পাল্টা প্রচারপত্র ছাপা ও বিলি হতে থাকে। সভা, পাল্টা সভায় একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার ছড়াতে থাকে। কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও বরিশাল এই সাম্প্রদায়িক দাংগার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়।

মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি অংশ ভদ্রলোক শ্রেণীর সংগে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়। তাঁদের মধ্যে সাংবাদিক মুজিবর রহমান, ফরিদপুরের আলিমুজ্জামান চৌধুরী, দেলদুয়ারের আবদুল হালিম গজনবী, বর্ধমানের আবুল কাসেম, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, খাজা আতিকুল্লাহ্, লিয়াকত হোসেন, ব্যারিস্টার এ. রসুল, খান বাহাদুর মুহম্মদ ইউসুফ, আবদুল গফুর ও দীন মুহম্মদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রচেষ্টায় ১৯০৬ সনের নভেম্বরে বেঙ্গল মোহামেডান এসোসিয়েশন এবং ঐ বছরের ডিসেম্বরে ইন্ডিয়ান মোহামেডান এসোসিয়েশন গঠিত হয়। বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য, বিশেষ আদর্শের প্রতি আনুগত্য, ব্যক্তিস্বার্থ বা অন্যান্য বিবিধ কারণে এসব ব্যক্তি সলিমুল্লাহর নেতৃত্বের বিরোধিতা করেন। আবদুল হালিম গজনবী, আবুল কাসেম, আলিমুজ্জামান প্রমুখ কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। কংগ্রেসের নীতি তাঁরা অনুসরণ করতে বাধ্য ছিলেন। সিরাজী একজন প্যান-ইসলামী নেতা ছিলেন। ব্রিটিশবিরোধিতা ছিল প্যান-ইসলামী নীতির অপরিহার্য অংগ। সলিমুল্লাহর সংগে খাজা আতিকুল্লাহ্‌র পারিবারিক বিরোধ ছিল। দীন মুহম্মদ ও আবদুল গফুর পয়সার বিনিময়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এসব নেতা আলেম সমাজ ও বৃহত্তর মুসলমান কৃষক সমাজের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হন। সলিমুল্লাহর সর্বগ্রাসী রাজনীতির মুকাবিলায় তাঁদের প্রচেষ্টা অকিঞ্চিৎকর প্রমাণিত হয়।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও আমলাদের মধ্যে উদার ও অনুদার উভয়বিধ ব্যক্তিই দৃষ্টিগোচর হয়। ওয়েলেসলী, লর্ড ডালহৌসী ও লিটনের মত অনুদার ব্যক্তি যেমন ছিলেন, তেমনি ম্যাকলে ও রিপনের মত উদার ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। বিভিন্ন বিষয়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও একটি বিষয়ে তাঁদের মতৈক্য ছিল, তাঁদের কেউই ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁরা সবাই ব্রিটেনের স্বার্থেই ভারতবাসীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে মূল বিরোধ ছিল প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির। ব্রিটিশ-ভারতের ইংরেজ কর্মচারীরা নিজেদেরকে দুর্বলের রক্ষক, অত্যাচারীর যম, অসহায় ভারতবাসীর অভিভাবক মনে করত। উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে ভদ্রলোক শ্রেণীর উচ্চাভিলাষে তারা বিরক্ত ছিল। শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত ভদ্রলোকদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এদেরকে কঠোর মনোভাব পোষণে বাধ্য করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তারা ভদ্রলোক শ্রেণীর একগুয়েমি ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির

www.nagorikpathagar.org

নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করে। এ আন্দোলনে নতি স্বীকার না করে তারা বরঞ্চ বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তকে অর্থবহ ও সফল করার লক্ষ্যে সতর্কতার সংগে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে থাকে।

'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা আসামের সাবেক চীফ কমিশনার ব্যামফিল্ড ফুলার নতুন প্রদেশের লে. গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি ইতিপূর্বে সরকারের দেয়া আশ্বাসবাণী কার্যে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন। মুসলমানদের উন্নয়ন তৎপরতায় তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ঢাকাকে প্রাদেশিক রাজধানী এবং চট্টগ্রামকে আন্তর্জাতিক বন্দরের মর্যাদায় উন্নীত করার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য উন্নয়নের কর্মসূচি গৃহীত হয় এবং শান্তি-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসামের মুসলমান নেতৃবৃন্দের তিনি ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। কিন্তু ফুলারের এসব নীতি ভদ্রলোক শ্রেণীকে বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ করে। ভাইসরয় মিন্টোও তাঁকে অপরিণামদর্শী ও অনভিজ্ঞ বলে আখ্যায়িত করেন। বরিশালের বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স ভেঙে দেয়ার ব্যাপারে ফুলারের ভূমিকা ভাইসরয় পছন্দ করেননি। সিরাজগঞ্জের ছাত্র আন্দোলনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফুলার যখন স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র দাখিল করেন ভাইসরয় তা সানন্দে গ্রহণ করেন।

ফুলারের উত্তরাধিকারী ল্যান্সলোট হেয়ার যথেষ্ট সতর্কতার সংগে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে ব্যর্থ হন। সমগ্র দেশ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার শিকার হয়। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও ডাকাতি ব্যাপক প্রসার লাভ করে। শামসুল আলম নামক একজন পুলিশ অফিসার কলিকাতা হাইকোর্ট চত্বরে প্রকাশ্যে খুন হন। তাঁর অপরাধ—তিনি গুপ্ত-হত্যা তদন্ত কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট এ্যালেন গুলিবিদ্ধ হন ও গুরুতর আহত হন। ছোট লাট এন্ড্রু ফ্রেজারেরও প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। চরমপন্থী ভদ্রলোকদের তৎপরতায় অরাজকতা ও বোমাবাজী মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবেও বিস্তার লাভ করে।

চরমপন্থীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধের লক্ষ্যে সরকার কঠোর নীতি অনুসরণে বাধ্য হয়। ১৯০৭ সনের "রাজদ্রোহাত্মক সভা আইনের" সাহায্যে রাজনৈতিক সভা ও মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ১৯০৮ সনের অক্টোবরে "বিস্ফোরক পদার্থ আইন" বোমা তৈরি ও ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করে। এ বছরেই ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশোধন করে দমননীতি জোরদার করা হয়। ১৯১০ সনের ভারতীয় সংবাদপত্র আইন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে। বঙ্গে সন্ধ্যা, যুগান্তর, বন্দে মাতরম প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। মহারাষ্ট্রে তিলকের 'কেশরী' ও 'মারাঠা' সংবাদপত্র দুটো বন্ধ করে দেয়া হয়। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হন এবং বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডলাভ করেন। এঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ, তিলক, লাজপৎ রায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দমন নীতি চালিয়ে চরমপন্থী আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়ার পর সরকার মধ্যপন্থী নেতৃবৃন্দকে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও তাঁদের নেতৃত্ব সুসংহত করার লক্ষ্যে সাংবিধানিক সংস্কার প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯০৯ সনের মর্লিমিন্টো সংস্কার এরই

www.nagorikpathagar.org

ফলশ্রুতি। এই সংস্কারে আইন পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানো হয়। উক্ত সংস্কারে মুসলমানদের "স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী" সংরক্ষণের দাবী স্বীকার করা হয় এবং "অনুগত" মুসলমান নেতৃবৃন্দেরও সন্তুষ্টি বিধান করা হয়। মধ্যপন্থী নেতৃবৃন্দ "স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী" ধারাটি অপছন্দ করলেও ১৯০৯ সনের সংস্কারে স্বস্তিবোধ করে এবং একে স্বাগত জানায়। ব্রিটেনের নতুন রাজা পঞ্চম জর্জ বিশ্বাস করেন যে, বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ফলে বাঙলার হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সত্যি অবিচার করা হয়েছে, কেননা তারা উভয় প্রদেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। তিনি এর প্রতিকারের নির্দেশ দেন।

উত্তর ভারতের প্রশাসনিক মানচিত্র পুনর্গঠনের কাজ আবার পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়। এই পরিকল্পনায় উভয় বাঙলা যুক্ত করে বঙ্গ প্রেসিডেন্সী গঠন করা হয় এবং একজন স-পরিষদ গভর্নরের উপর এর শাসনভার ন্যস্ত হয়। কলিকাতা এর রাজধানী ও ঢাকা দ্বিতীয় রাজধানীর মর্যাদা পাবে। উড়িষ্যা ও বিহার স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয় এবং একজন লে. গভর্নর পাটনা হতে এর শাসনকার্য পরচালনা করবে। আসাম পুনরায় চীফ কমিশনারের দায়িত্বে ন্যস্ত হয়। গোলযোগপূর্ণ বঙ্গ হতে অপেক্ষাকৃত শান্ত অঞ্চল অর্থাৎ উত্তর প্রদেশে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। পরিকল্পনাটি খুবই গোপনে সম্পন্ন করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল রাজা ভারতবাসীকে সদিচ্ছার উপহার হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে তা প্রদান করবেন। ভারতের নুতন রাজধানী দিল্লীতে এক জমকালো দরবারে ১৯১১ সনের ডিসেম্বরে রাজা ঐ ঘোষণা প্রদান করেন। এভাবে অর্ধযুগের গোলাযোগপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে এবং বঙ্গভঙ্গ রদ হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায় তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সলিমুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলিকাতা টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় আতিকুল্লাহ্, আবুল কাসেম প্রমুখ বঙ্গভঙ্গবিরোধী নেতাও উপস্থিত ছিলেন। বাংলার বাইরেও বিভিন্ন মুসলিম প্রতিষ্ঠান ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ সরকারের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে। ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ তড়িঘড়ি ঢাকা সফরে যান। তিনি স্বীকার করেন যে, বঙ্গভঙ্গ যুগে মুসলমান সম্প্রদায় উন্নতি করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল। তিনি মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস দেন যে, এই উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সরকার চালিয়ে যাবে। ঢাকাতে অনতিবিলম্বে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, হাইকোর্ট ও যাদুঘর স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। কিন্তু সরকারের এসব আশ্বাস বাণী তরুণ মুসলমান নেতৃবৃন্দকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তারা বিপ্লবাত্মক কর্মসূচি গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু নওয়াব সলিমুল্লাহ সরকারের বিরাগভাজন হওয়া মুসলমানদের জন্য হিতকর নয় বলে মনে করেন। তিনি একটা ভারসাম্য নীতি বজায় রাখার চেষ্টা করেন।

নওয়াবের অনুসৃত নীতি তরুণ মুসলমান নেতৃবৃন্দকে যে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি তার প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে পাওয়া গেল ১৯১৩ সনে বংগীয় ব্যবস্থাপক সভার বাজেট বক্তৃতা চলাকালে। উদীয়মান মুসলিম নেতা এ. কে. ফজলুল হক বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য সরাসরি সরকারকে দোষারোপ করেন। "সেটেল্ড ফ্যাক্ট" পরিবর্তনের জন্য সরকারকে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযুক্ত করা হয়। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে এর জন্য ক্ষতিপূরণ

www.nagorikpathagar.org

দাবী করেন। এসব তরুণ নেতা মুসলিম লীগের আনুগত্যের রাজনীতি পরিহার করে কংগ্রেস অনুসৃত সমালোচনামূলক রাজনীতির পথ অনুসরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বঙ্গভঙ্গ রদ পরোক্ষে মুসলিম লীগের চালিকাশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন সাধন করে। সরকারের "পদলেহী" অভিজাতদের কব্জা হতে লীগের নেতৃত্ব আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তদের হাতে চলে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। মুসলিম রাজনীত গতিশীল ও প্রাণবন্ত হয়। বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের ঘটনাবলীর বিশেষ অবদান হল : এই ঘটনাসমূহ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে মুসলমানদের একটা শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পায়। কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় আন্দোলন সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হলে যে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে তারা বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তবে এ আন্দোলন তাদেরকে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতি অর্জনের সুযোগও এনে দিয়েছিল। অদূর ভবিষ্যতের সব খ্যাতনামা "ভদ্রলোক" রাজনীতিকের হাতেখড়ি এ আন্দোলনেই হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে কি ভদ্রলোক শ্রেণী একচেটিয়া বিজয় লাভ করেছিল? না। বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রহিতকরণের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার, হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী ও মুসলমান সম্প্রদায়–এই তিন পক্ষের মধ্যেই লাভ-ক্ষতির মিশ্রণ ঘটেছিল। বঙ্গভঙ্গ রহিতকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আপোষ-রফার ব্যবস্থা ছিল।

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

Sufia Ahmed, Muslim Community in Bengal 1884–1912 (Oxford Press, Bangladesh, 1974).

Sumit Sarkar, The Swadeshi Movement in Bengal 1903–1908 (New Delhi, 1973).

M.K.U. Molla, The New Province of Eastern Bengal and Assam (The Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1981).

J.H. Broomfield, Elite Conflict in a Plural Society : Twentith Century Bengal (Baukeley, 1964).

Haridas and Uma Mukherjee, Sri Aurobindo and New Thought in Indian Politics (Calcutta, 1968).

D.R. Gadgil, The Industrial Evolution of India in Recent Times 1860-1939. 5th edition (Calcutta, 1971).

Rafiuddin Ahmed, The Bengal Muslims. a Dust for Indentity (Delhi, 1981).

S.N. Mukherjee. The Social Implications of the Political Thought of Raja Rammohan Ray in R.S. Sharma (ed.), Indian Society : Historical Probings in Memory of D.D. Kosambi (New delhi, 1974).

www.nagorikpathagar.org

Rafiq Jakaria, Rise of Muslims in Indian Politics (Bombay, 1970).

Rajani Palme Dutto, India To-day, 2nd edition, (Bombay, 1947).

Kamruddin Ahmed, A Socio Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh, 4th edition (Dacca, 1975).

S.R. Wasti, Lord Minto and the Indian Nationalist Movement, 1905-1910 (Oxford, 1964).

Amales Tripathi. The Extremist Challenge : India Between 1890 and 1910 (Orient Longmans, 1967).

B.B. Misra, The Indian Middle Classes : Their Growth in Modern Times (London, 1961).

A.R. Desai, Social Background of Indian Nationalism, 5th edition (Bombay, 1976).

R. Suntralingam, Indian Nationalism, A Historical Analysis (New Delhi, 1983).

Sirajul Islam, Fazlul Huq Speaks in Council 1913-1966 (Dacca, 1976).

Rokeya Rahman Kabeer, Administrative Policy of the Government of Bengal 1870-1890 (Dacca, 1965).

Bipin Chandra, The Rise and Growth of Economic Nationalism in India (New Delhi, 1960).

শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৭৫)।

আবদুল মওদুদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর (ঢাকা, ১৯৬৯)।

শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল : হিন্দুমেলা (কলিকাতা, ১৯৬৫)

www.nagorikpathagar.org

শামসুল আলম

বিপ্লবী আন্দোলনে মুসলিম-বাংলা : বেনজীর আহমদের ভূমিকা

বেনজীর আহমদকে আমরা খ্যাতিমান কবি হিসেবেই জানি, কিন্তু তাঁর আর একটি বড় পরিচয় আমাদের অজ্ঞাতেই থেকে গেছে। প্রথম দিকে কবি বেনজীর ছিলেন একজন একনিষ্ঠ বিপ্লবী, একটি বিপ্লবী গুপ্ত সংস্থার নেতা। তাঁর দলের নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক মরহুম ফজলুল হক সেলবর্ষী।

বেনজীর আহমদ জীবনে মোট ২০/২২ বার গ্রেফতার হন। দু'বার প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করার পূর্বে, তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছিলো। কিশোর বেনজীর লেখাপড়া ছেড়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দিন কয়েকের মধ্যে গ্রেফতার হলেন। বিচার হলো খুব দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রাষ্ট্রদ্রোহিতার। সাক্ষী-প্রমাণের দরকার হলো না। আদালতে বালক বেনজীর সদর্পে ঘোষণা করলেন, ব্রিটিশ সরকার মানি না। ব্রিটিশ আইন মানি না, ব্রিটিশ সরকার উৎখাত করব। এদেশ হতে ব্রিটিশ বিতাড়নের সংগ্রামে লিপ্ত আছি এবং থাকব ইত্যাদি।

বিচারে বালক বেনজীর আট বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কয়েকদিন পর অসহযোগ আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠল, হাজার হাজার লোক প্রতিদিন স্বইচ্ছায় কারাবরণ করতে লাগলো। জেল প্রশাসন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ল। কয়েক দিনের মধ্যে থাকা-খাওয়ার সমস্যা তো দূরের কথা, জেলের ভেতর হাঁটা-চলাফেরাও হয়ে উঠলো দুষ্কর।

ভিড় কমাবার জন্যে একদিন বেশ কিছু কয়েদীকে গলা ধাক্কা দিয়ে গেটের বাইরে বের করে দেয়া হয়। বেনজীর গেটের কাছেই ছিলেন। ধাক্কা খেয়ে এভাবে তিনি আট বছরের কারাদণ্ড হতে মুক্তি পেয়ে গেলেন। কয়েকদিন পর বেনজীর আবার গ্রেফতার হলেন। এবারও বিচার হলো। শাস্তি হলো। তবে জেলের ভেতর যেতে হলো না। কয়েদীদের সংখ্যা এতো বেশি যে, জেলে জায়গা হলো না। তারের বেড়া দিয়ে এক জায়গায় কয়েকশ কয়েদীকে রাখা হলো। চেকিং বা পাহারা বিশেষ ছিল না। শুধু দিনে দু'বার নাম ডাকা হত। রোল কলে 'হাজির' চিৎকার করলেই দেখা যায়- চলে। বেনজীরের সংগে জনকয়েক কয়েদী তারের বেড়ার জেল হতে বের হয়ে আসলেন। মাথাগুণতি ঠিক রাখা এবং কলের সময় হাজিরা (প্রক্সি) দেয়ার জন্যে সমান সংখ্যক বন্ধুকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। কয়েকদিন বাইরে সভা-সমিতিতে হৈ চৈ চিৎকার করে আবার তারের বেড়ার জেলে ফিরে গেলেন এবং বন্ধুদেরকে রিলিজ করে দিলেন।

চৌরিচেরা হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধিজী হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। হতাশ ও বিক্ষুব্ধ বালক বেনজীর বই নাড়াচাড়া শুরু করলেন। ১৯২২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন এবং উত্তীর্ণ হলেন।

কিশোর বেনজীর প্রথম হতেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যুগান্তর পার্টিতে যোগ দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরম আন্তরিকতার সংগে কাজ করেও দলের ভেতরে ঢুকতে পারলেন না। খবর সরবরাহ করা প্রভৃতি ছোটখাটো ফাইফরমাশ খাটার

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে তাঁর ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিলো। অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন তিনি। সেখানেও সেই অবস্থা। বেনজীর আহমদ প্রথম সারির "বিপ্লবী" হতে পারলেন না। চরম নিষ্ঠার সংগে কাজ করেও দলের নেতার বিশ্বাসভাজন হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। এতে তরুণ বেনজীরের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হলো। আসলে এসব সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব করতেন এক ধরনের সংকীর্ণচেতা হিন্দু, যারা মুসলিম ছেলেদের সন্ত্রাসবাদী দল হতে দূরে রাখতে সচেষ্ট থাকতেন। কালীমন্দিরের সামনে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে হাত দিয়ে সদস্য হতে হতো। মুসলমানদের ছেলেদের ভেতরের কোটারিতে নেয়া তো দূরের কথা, বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজেও নিয়োগ করা হতো না।

অগত্যা বেনজীর প্রবর্তক সংঘে প্রবেশের চেষ্টা করলেন। অন্য দুটির তুলনায় এটি আরও বেশি হিন্দুঘেঁষা মনে হলো। এরা প্রকাশ্যভাবেই হিন্দু জাগরণবাদের কথা বলে বেড়াতেন। সুতরাং মুসলিম বেনজীরের এখানেও স্থান হলো না।

পরবর্তীকালে এসব সন্ত্রাসবাদী দলের যেসব ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে, তাতে পরিষ্কার জানা যায়, বিপ্লবী দলে দীক্ষা নেয়ার সময় মা কালীকে সাক্ষী রেখে, ধর্মগ্রন্থে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করতে হতো। মুসলিম ছেলেরা এতে স্বাভাবিকভাবেই আপত্তি করবে ভেবে হয়ত তাদেরকে দলের বিশ্বস্ত স্থানে নেয়া কষ্টকর ছিল। যুগান্তর দল যদিও বাহ্যত ধর্ম-উদাসীনতার ভাব দেখাতো, তবুও এ দলেরও উচ্চ স্তরের সকলকেই পৈতা ধারণ করতে হতো।

যাহোক তৎকালীন তিনটি বিপ্লবী দলের সংগে কাজ করতে ব্যর্থ এবং হতাশ হয়ে নিজেই এক বিপ্লবী সংঘ গঠনের চেষ্টা করতে লাগলেন বেনজীর আহমদ। তাঁর সংগে একত্রিত হলেন ফজলুল হক সেলবর্শী। ১৯২৫ সনে তারা গঠন করলেন "আজাদ পার্টি" নামে একটি সন্ত্রাসবাদী দল। নওরোজ পত্রিকা পরিচালনার ভার ছিল দলের কর্মীদের উপর।

কবি নজরুল ইসলাম এবং "দি মুসলমান" পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী মজিবুর রহমান দলের কার্যাবলী সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। মওলানা আকরম খাঁর জামাতা মৌলভী আবদুর রাজ্জাক পরে দলে যোগদান করেন (তিনি পরবর্তীকালে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন)। যশোরের কংগ্রেস নেতা জালালউদ্দিন হাশেমীও গোপনে এ দলের সংগে যুক্ত ছিলেন।

"আজাদ পার্টি" নামক এ সন্ত্রাসবাদী দলের সংগে "দৈনিক আজাদ" পত্রিকার কোন সম্পর্ক ছিল না। আজাদ প্রকাশিত হওয়ার বহুপূর্বে ১৯২৫ সনে এ সন্ত্রাসবাদী দলের কাজ শুরু হয়। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কাজ করার পূর্বে দরিদ্রের মধ্যে অর্থ বিতরণ দলের আশু নীতি হিসেবে গৃহীত হয়। অত্যাচারী জমিদারদের থেকে লুণ্ঠিত অর্থ দরিদ্র মজলুম প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করার মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে দলের কর্মসূচি মোটামুটি সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯২৭ সাল। বেনজীর আহমদ কলিকাতা থেকে একটি ছোট গ্রুপ নিয়ে নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। রামগঞ্জ থানায় একটি অপারেশনে যেতে হবে। বিপ্লবীদের ৫/৬ জনের আর একটি দল ৪টি রাইফেল এবং প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ নিয়ে চাঁদপুরের অদূরে তাদের সংগে মিলিত হন। নৌকায় যেতে হবে। লোক দশ-এগার জন। সকলেই যুবক। ৫/৬ জনের বেশি এক নৌকায় যাওয়া ঠিক হবে না ভেবে পাঁচজনকে পাঠিয়ে দিলেন পদব্রজে। মিলিত হতে হবে এক বাজারে। সন্ধ্যার পর নৌকায় যাবেন অকুস্থলে। বাজারে তারা ভিন্ন ভিন্ন দোকানে চা-পানি খেলেন আলাদাভাবে। উদ্দেশ্য

www.nagorikpathagar.org

সন্দেহ এড়ানো। কিন্তু এটাই তাদের জন্যে কাল হলো। গন্তব্যস্থল বিভিন্ন জায়গায় বলতে হবে তাই ঠিক ছিল। আসছেনও ভিন্ন ভিন্ন স্থান হতে। গ্রামের বাজার। ৬/৭ জন অপরিচিত যুবকের উপস্থিতি বিচক্ষণ নায়েব মশায়ের দৃষ্টি এড়াল না। কয়েক দিন আগেই এ এলাকায় একটি ডাকাতিও হয়েছে। নায়েব বাবুর লোক অলক্ষ্যে যুবকদেরকে অনুসরণ করে। বাজারের অদূরে নৌকা বাঁধা ছিল। ভিন্নমুখী যাত্রীদের একই নৌকায় আরোহণ নায়েব বাবুর সন্দেহ আরও ঘনীভূত করলো। নায়েব বাবু সংগে সংগে নিকটস্থ লক্ষ্মীপুর থানায় লোক পাঠালেন আর গ্রামে ডাকাত এসেছে বলে গুজব ছড়িয়ে দিলেন।

কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হাজারের বেশি লোক জড় হয়ে গেল। নৌকা দ্রুত বেগে চলছে। থানার পুলিশ আসার পর উৎসাহী লোকজন আরও দ্রুতবেগে দৌড়ে নৌকা ঘেরাও করে ফেললো। নৌকা চলছে খালের মাঝখান দিয়ে। হাজার লোক এবং পুলিশ চলছে খালের তীর ধরে। নৌকা কূলে ভিড়াবার জন্যে পুলিশের নামে এবং জমিদারের নামে বার বার নির্দেশ জারি হতে লাগল। এভাবে চললো বহুক্ষণ। নৌকায় আছে বেশ কিছু সংখ্যক রাইফেল এবং গোলাবারুদ। নৌকা কূলে ভিড়ান সম্ভব নয়। উৎসাহী জনতা জোর করে নৌকায় আরোহণ করতে চায়। এভাবে আরও কতক্ষণ চললো। অবশেষে নৌকা পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং নৌকা কূলে ভিড়ল। এক দিকে মারমুখো হাজার হাজার লোক, পিছনে পুলিশ। অপর দিকে ১০/১১ জন যুবক। জনতার ব্যূহ ভেদ করার জন্যে গুলির আওয়াজ করতে হয়। শুরু হলো ছোট-খাট খণ্ড যুদ্ধ। পুলিশ অবশ্য সামনে আসেনি।

গোলাগুলিতে বেশ কিছু লোক আহত হলো। আহতদের মধ্যে দু'তিন জন পরে মারাও যায়। বিপ্লবীরা গোলাবারুদ এবং রাইফেল নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু রাতের অন্ধকারে একজন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় পরে জনগণের হাতে ধৃত হয়।

অন্য সকলে কয়েক মাইল দূরে এক পরিচিত বাড়ির অন্দর মহলে আশ্রয় নিলেন। উদ্দেশ্য পরের দিন রাতের বেলা চলে যাবেন। এর মধ্যে দিনের বেলা গত রাতের কাহিনী কথিত বর্ণিত হয়ে প্রচারিত হয়ে গেছে সব এলাকায়, দূর-দূরান্ত পর্যন্ত।

গ্রামের বাড়িতে থাকার ঘরে পায়খানা তখন থাকত না। পায়খানা পেশাবের জন্যে বের হওয়ায় দু'একজন উপস্থিত ব্যক্তিকে ঐ বাড়ির কেউ কেউ দেখে ফেলে। এরা অন্দর মহল হতে আর বের হচ্ছে না কেন? এ প্রশ্ন কারো কারো মনে জাগে।

কানাঘুষা শুরু হয়ে গেছে এরি মধ্যে। গৃহকর্তা তার বাড়িতে কোন পুরুষ মেহমান এসেছেন এ কথা অস্বীকার করলেন। তাতে সন্দেহ পাকা হলো। বিপ্লবীরা সন্ধ্যার অন্ধকারের অপেক্ষায় রইলো। হাজার হাজার লোক লাঠি সরকী নিয়ে ডাকাত ধরার জন্যে পুলিশের প্রতীক্ষায় রইলো। থানার পুলিশ আসতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। বাগানের মধ্যে দিয়ে একজন একজন করে সকলেই সরে পড়লো। কিন্তু সবাই রেহাই পেলো না। পলায়মান ডাকাত ধরার জন্যে সমস্ত এলাকায় লোকজন বেশ সচেতন। বিশেষত গত রাতে 'ডাকাতে'র হাতে অনেকেই আহত হয়েছে। অকুস্থল হতে বহুদূর পার হয়েও বিপ্লবীদলের তিনজন ধরা পড়লো। ধরা পড়া তিন জনের একজন অসহনীয় নিপীড়নে মুখ না খোলার ব্রতে আটল থাকতে পারলো না। কবি বেনজীর আহমদের নাম প্রকাশিত হয়ে পড়লো।

www.nagorikpathagar.org

গোয়েন্দা বিভাগের কাছে তিনি অতি পরিচিত ব্যক্তি। এ দলটিকে অংকুরেই নির্মূল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। পুলিশেরও চেষ্টার ত্রুটি রইলো না।

ডাকাতি, ষড়যন্ত্র এবং খুনের মামলা রুজু করা হল। বিপ্লবীদের আজাদ পার্টির এমন অনেকেই অভিযুক্ত হলেন, যারা এ অভিযানের সংগে বিন্দুমাত্র অভিযুক্ত ছিলেন না। প্রধান আসামী বেনজীর আহমদ। কবি বেনজীর আহমদ ইতিপূর্বে অসংখ্য বার গ্রেফতার হয়েছেন। এবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ডাকাতির। পুলিশের পক্ষে শত চেষ্টায় তাঁকে ধরা সম্ভব হলো না। বেনজীর আহমদকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করার জন্য মোটা পুরস্কার ঘোষিত হলো। পুরস্কারের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা। ১৯২৭ সালে দশ হাজার টাকার মূল্য বর্তমানের মুদ্রায় কয়েক লক্ষ টাকা। আদর্শবাদী মহৎপ্রাণ ভালো লোক হিসেবে নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজার থানার বেনজীর আহমদের সুনাম ব্যাপক। পরিচিত জন সকলেই শুভেচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু লোভ সম্বরণ করতে পারলো না স্বগ্রামের এবং পাশের বাড়ির দরিদ্র আবদুল হাই। তারই সহায়তায় ১৯২৭ সালে বেনজীর আহমদ কলিকাতায় গ্রেফতার হলেন।

কলিকাতা থেকে বেনজীর আহমদকে মামলার স্থান নোয়াখালীতে আনা হলো। এ যাত্রায় তার কারাবাস দীর্ঘ সময়ের। প্রায় তিন বছর।

ঢাকায় দায়েরকৃত অন্য একটি মামলার আসামী হওয়ায় কবি বেনজীর আহমদকে ঢাকা আনা হয়। প্রয়োজন শেষে তাঁকে আবার নারায়ণগঞ্জ এবং চাঁদপুর হয়ে নোয়াখালীতে পাঠাবার বন্দোবস্ত হলো। নারায়ণগঞ্জ হতে চাঁদপুর যাওয়ার পথে তিনি একটা দুঃসাহসী কাজ করে বসলেন। ভরা বর্ষা। নদী তীর ভাসিয়ে মহানদীর আকার ধারণ করেছে। পদ্মা ও মেঘনার সংগমস্থল অনেকটা সমুদ্রের মতো। বেনজীর আহমদকে পাহারা দেয়ার জন্য নিয়োজিত রয়েছে সাতজন প্রহরী। একজন বাঙালি পুলিশ, ছয়জন গুর্খা সৈন্য। বিডিআর জাতীয় প্যারা মিলিটারী তখনও পুলিশকে সহায়তা করতো। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেয়া, জেল থেকে পালাবার পূর্ব ইতিহাস তাঁর রয়েছে। তাই তাঁকে মধ্যখানে রেখে গুর্খা সিপাইরা ভরা বর্ষায় নদীতে ঢেউ-এর খেলা দেখছে। ঐখান থেকে কয়েদী পালাবার কোন সম্ভাবনা নেই। তদুপরি দু'হাতেই হ্যান্ডকাপ।

পায়খানায় যাবেন বলে বেনজীর উঠে এলেন। সাথে দু'জন সেপাই। পায়খানার গোড়ায় সামান্য অনুরোধে একজন গুর্খা এক হাতের হ্যান্ডকাপ খুলে দিল। আর যায় কোথায়। সৈন্য দু'জন এবং কয়েকজন যাত্রী প্রচণ্ড ধাক্কায় কুপোকাত। স্টিমারের চাকার নিচে পড়ে যাতে টুকরো টুকরো না হয়ে যান, তাই একটু এগিয়ে যেতে হলো। চাকা অতিক্রম করেই দিলেন নদীতে ঝাঁপ। স্থানটি ছিল পদ্মা-মেঘনার সংগমস্থল, এখানে নদীর ঘূর্ণির মধ্যে পড়লে মানুষ কি ছার, বিরাট বিরাট নৌকা, এমন কি লঞ্চও কখনো কখনো তলিয়ে যায়। স্টিমারের পেছন দিকে একবার বেনজীর ভেসে উঠলেন আবার স্রোতের টানে তলিয়ে গেলেন, হতে পারতো শেষ বারের মতো, কিন্তু আল্লাহ্‌র কি মহিমা ..... হায়াত ছিল। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে স্রোতের সাথে লড়লেন। ১৫-২০ মিনিট পর আবার ভেসে উঠলেন। জুতা জোড়া তখনও পায়ে লেগে আছে। কোট ইতিমধ্যেই গা থেকে খসে গেছে। চেষ্টা করে এবার জামাটিও খুলে ফেললেন। এখন প্রায় শক্তিহীন।

www.nagorikpathagar.org

সাঁতরাবার শক্তি তেমন নেই। তাই শুধু ভেসে থাকতে চেষ্টা করলেন। বহুদূরে স্টিমারটি তখন দাঁড়িয়ে চারদিকে আলো ফেলছে।

ছোট নৌকায় করে কয়েকজন পুলিশ এবং গুর্খা সিপাহীকে তীরে নামিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছিল। পুলিশ এবং গুর্খা সৈন্য তীরে নেমে লোকজনকে জাগাতে লাগলো– একজন দুর্দান্ত ডাকাত, দাগী আসামী স্টিমার হতে লাফ দিয়ে পালিয়েছে। কোন চর বা তীরে যদি কোন মৃতদেহ পাওয়া যায় তবে যেন নিকটবর্তী পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেয়া হয় এবং কবর দেয়া না হয়। আর যদি জীবন্ত ধরে দেয়া যায় তাহলে বিরাট পুরস্কার দেয়া হবে।

কবি বেনজীরকে ধরে দেয়ার জন্যে পূর্বেই যে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল এবং গ্রেফতারের সহায়তাকারীকে যে দশ হাজার টাকা এনাম ইতিমধ্যেই দেয়া হয়েছে, তাও পুলিশ গোপন রাখল না। বড় রকম পুরস্কারের আশায় লাঠি, চেরাগ, হারিকেন হাতে নদী তীরে বহুলোক বের হলো। যাদের নৌকা ছিল তারা নৌকা নিয়ে নেমে পড়ল। এক রাতে দশ হাজার টাকা পাওয়ার লোভে অনেকের রাতের আরাম হারাম হয়ে গেল।

এদিকে বেনজীর আহমদ স্রোতের টানে একটানা ভেসেই যাচ্ছেন। তিন-চার ঘণ্টা ভেসে চলছেন। হঠাৎ মনে হলো পায়ে কি যেন লাগছে। দ্রুত এদিক ওদিক সাঁতরাতে লাগলেন। সে কি প্রাণান্তকর সাঁতার! ভাবলেন, বোধ হয় কুমীর পায়ে ঠোকর দিয়েছে। দশ-পনর মিনিট পর আবার পায়ে ঠোকর। শরীরের সমস্ত শক্তিটুকু যোগাড় করে কুমীরের হাত থেকে বাঁচতে চেষ্টা করলেন। আর যেন পারছেন না। ক্লান্তিতে এবং শীতে হাত-পা অবশ প্রায়। মনে হয় ডুবে যাচ্ছেন। আর সাঁতরাতেও পারছেন না।

ডুবতে গিয়েও ডুবতে পারলেন না। পায়ে মাটি লাগল, মনে হলো দাঁড়াতে পারলেন। বুক পানি নিচেই চরের মাটি। ভালো করে দাঁড়ালেন। এতক্ষণ যে কুমীরের ভয়ে প্রাণান্তকর সাঁতার দিচ্ছিলেন তা কিন্তু কুমীর ছিল না, ছিল চরের মাটি–যাতে পা লাগতেই মনে হয়েছিল কুমীরের ঠোকর। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরেও তাঁর মুখে হাসি এলো। কি অহেতুক বোকামী।

বিশ্রাম নিলেন খানিকক্ষণ। আবার চরে হাঁটতে লাগলেন। নতুন চর জনবসতি বিশেষ নেই। গাছ-পালাও তেমন বড় হয়নি। তীরে উঠেই হাত কড়াটা খুলে ফেলার চেষ্টা করলেন। তিন চার ঘণ্টা পানিতে থেকে হাতও নরম হয়েছিল। প্রবল চেষ্টাতে হাতকড়াও খুলে ফেলতে সক্ষম হলেন। খানিকটা বিশ্রাম প্রয়োজন তাঁর। কি তৃপ্তি এবং আরামের সে বিশ্রাম। ক্ষুধাও লেগেছে খুব। লোকালয়ের সন্ধানে চললেন। পরিধানে আছে শুধু গেঞ্জি আর লুংগি।

বহুদূরে এক বাড়িতে পৌঁছলেন। গৃহকর্তা এক বৃদ্ধ। তার কাছে পৌঁছে জানালেন যে, শীতলক্ষ্মা এবং মেঘনার মিলনস্থলের ঘূর্ণিতে পড়ে নৌকাডুবি হয়েছে। অন্যদের সন্ধান জানেন না। তিনি ভাসতে ভাসতে এই চরে এসে পৌঁছেছেন। রাতেই বাড়ি ফিরতে চাইলেন। বৃদ্ধ আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করলেন। ঐ স্থানে বহু নৌকা ডুবি হয়েছে। তবে এর পূর্বে ঘূর্ণিতে পড়ে কেউ বেঁচেছে বলে তিনি জানেন না। আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর দীর্ঘ হায়াতের মোনাজাত করলেন। বৃদ্ধ আদর-আপ্যায়ন করে বিছানা পেতে দিলেন এবং নৌকার সন্ধানে বের হলেন।

www.nagorikpathagar.org

হাটবার থাকায় ভাড়া যাওয়ার জন্য কোন নৌকাই পেলেন না। অগত্যা ঠিক হলো, সকাল বেলা পর্যন্ত অপেক্ষাই করবেন। হেঁটে চলে যাওয়ার মতো শারীরিক শক্তিও তখন আর অবশিষ্ট নেই। আগের রাতেই হাটে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল ঘূর্ণির নিকটে দুঃসাহসী ডাকাত নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়েছে। ধরিয়ে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা ইনাম। এ খবর চরের যারা হাটে গিয়েছিল তারা বয়ে এনেছে।

বৃদ্ধের বাড়িতে নৌকা ডোবা লোক আশ্রয় নিয়েছে—অনেকে তা জেনে ফেলেছেন। কারণ, তিনি তাকে পাঠাবার জন্য রাতে নৌকা খোঁজ করেছিলেন বিভিন্ন বাড়িতে। নৌকাডোবা আশ্রয় প্রার্থীর খবর নিয়ে রাতের বেলাই লোক চলে গিয়েছিল থানায়। দুঃসাহসিক কাণ্ড করেও বিপ্লবী বেনজীর আহমদ পালাতে পারলেন না। সকাল বেলাই তিনি ঐ বৃদ্ধের বাড়িতে পুনরায় গ্রেফতার হন। শরণার্থীর করুণ পরিণতিতে বৃদ্ধের আঁখি ছল ছল করে উঠেছিল।

মুন্সীগঞ্জ থানায় যাদের প্রহরাধীন হতে বেনজীর আহমদ মুক্তি পেয়েছিলেন তাদের সকলের সংগেই দেখা হল। পলায়িত আসামীর প্রতি রূঢ় কঠোর নয় তারা মোটেই। বরং আকুতি মিনতি তাদের কণ্ঠে। তাঁর জবান-বন্দিতে প্রহরীদের অবহেলার সুযোগে তিনি পালাতে পেরেছেন এমন কিছু যেন তিনি না বলেন। তাহলে বেচারাদের চাকরি থাকবে না। বেনজীর আহমদ আশ্বাস দিলেন তাদের অসুবিধা হতে পারে এমন কিছু তিনি বলবেন না।

মুন্সীগঞ্জ থানায় তাঁর হাত এবং পা দুইই বাঁধা হলো। কোন প্রকার ঝুঁকিই পুলিশ আর নিতে রাজী নয়। হাতে-পায়ে উত্তমরূপে বন্ধনী এবং শিকল দিয়ে বেঁধে অতিরিক্ত পুলিশ পাহারায় তাঁকে ঢাকা জেলে পাঠান হয়। কয়েকদিন পর তিনি পুনরায় নোয়াখালী জেলে প্রেরিত হন।

নোয়াখালী জেল হাজতে থাকাকালে অবসর সময়ে তিনি কবিতা রচনা করতেন। প্রথম প্রথম কাগজ পাওয়া কষ্টকর হতো। কয়েক দিনের মধ্যে জেল প্রশাসনের অনেকেই তাঁর কবিতার ভক্ত হয়ে উঠলেন। কাগজ-কলম পেতে অসুবিধা হলো না। মাননীয় বিচারক তাঁর কাব্য খ্যাতি শুনে অনেকগুলো কবিতা চেয়ে পাঠালেন এবং পড়ে খুশি হয়েছেন বলেই মনে হলো।

বেনজীরের "বন্দীর বাঁশী" কাব্যগ্রন্থের সবগুলো কবিতাই নোয়াখালী জেল হাজতে থাকাকালে রচিত। কাব্যখ্যাতি, নওরোজ পত্রিকার সংগে তাঁর সম্পর্ক এবং বিপ্লবী সংস্থার নেতা প্রভৃতি কারণে বিনা আয়েসে কয়েকদিনেই তিনি জেলে ক্লাস পেয়ে গেলেন। থাকা এবং খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা হলো বটে, কিন্তু পায়ের শিকল মুক্ত হলেন না। জেল পালাবার সম্ভাবনা থাকায় কেউ তাঁর পায়ের শিকল খোলার হুকুম দেয়ার দায়িত্ব নিতে রাজী হননি।

পৌনে তিন বছর পর্যন্ত তদন্ত সাক্ষী-সাবুদ গ্রহণ করা হলো। মামলা প্রায় শেষ পর্যায়ে। ঘটনার দিন বাজারে তাঁকে যারা দেখেছেন এবং অন্যান্য দিন ঘটনাস্থলে যারা দেখেছেন তারা তাঁকে টি.আই প্যারেডে পূর্বেই সনাক্ত করলেন।

চাক্ষুষ সাক্ষী পাওয়া দুষ্কর। রাতের বেলার ঘটনা। তবুও চাক্ষুষ সাক্ষী তৈরি হলো। শুধু তাঁর বিরুদ্ধে নয়, দলের অন্য সকলের বিরুদ্ধেও। খুনের মামলা। একটি খুন নয়,

www.nagorikpathagar.org

কয়েকটি। সাক্ষী-প্রমাণ গ্রহণ করা, জেরা সবই শেষ। ধারণা হলো, বিচারে তাঁর ফাঁসি হবে এবং অন্যদের ফাঁসি এবং যাবজ্জীবনও হতে পারে। বিবাদী পক্ষের উকিলও অনেকটা সংশয়হীন যে, এ মামলার আসামীদের শাস্তি হবে।

বেনজীর আহমদ বিপ্লবী জীবনের শুরুতে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদির প্রতি এতটুকু অনুরক্ত ছিলেন না। কিন্তু এ সময় কয়েকটা ঘটনা তাঁর জীবন এবং বিশ্বাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এগুলো এত নিবিড় এবং বাস্তব যে, তিনি অবিশ্বাস করতে বা উড়িয়ে দিতে চাইলেও তা করা সম্ভব ছিল না। ঘটনাগুলো তাঁর মন এবং মানসকে এমন গভীর এবং নিবিড়ভাবে নাড়া দিল যে, তাঁর জীবন এক নবচেতনা ও উপলব্ধিতে সিক্ত হয়ে উঠল।

প্রথম ঘটনা একটি স্বপ্ন। স্বপ্নে বেনজীর আহমদ এক রাতে তাঁর পুণ্যশীলা মাকে দেখেন। তিনি তাঁকে স্বপ্নে দুটি শব্দ বার বার পড়তে নির্দেশ দেন। আল-কুরআনের এ শব্দ দুটি এত পরিচিত যে, এগুলো মুখস্থ করার বা লিখে নেয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা বেনজীর আহমদ একটুও অনুভব করলেন না। স্বপ্ন ভংগের পরই এ শব্দ দুটো তিনি বার বার আওড়াতে লাগলেন। সকাল বেলার দিকে ঘুমে তাঁর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসে। সূর্যোদয়ের পর ঘুম থেকে উঠে কত চেষ্টা করলেন শব্দ দুটো স্মরণ করতে। কিন্তু শব্দ দুটো চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেলো। কিছুতেই তা তিনি স্মরণ করতে পারলেন না।

জেলখানায় তিনি আর এক রাতে আর একটি স্বপ্ন দেখলেন। চারজন লোক বিছানার চারদিকে চারটি খুঁটি গেড়ে একটি রশি দিয়ে খুঁটি চারটি যোগ করে দিল। যারা শুনল, তাদের কেউ কেউ বললো, এ চারজন চার খলীফা।

মামলার শাস্তি সম্বন্ধে বেনজীর আহমদ অনেকটা নিশ্চিত হলেন। তাঁর পক্ষীয় উকিলের কাছ থেকেও কোন আশার বাণী তিনি শুনতে পাননি। সতর্ক উকিল সাহেবরা কোন আশ্বাসই দিলেন না। এ দুটো স্বপ্ন দেখার পর বেনজীর আহমদের আশাহত হৃদয়ও নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠলো।

এ সম্পর্কে আর একটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। বেনজীর সাহেবের আব্বা মৌলভী ছজুদের রহমান একদিন নোয়াখালী হতে ফেরার পথে চাঁদপুরে স্টিমারে ওঠেন। সংগে ওঠেন ঘরছাড়া ফকির জব্বার পাগলা। বেনজীর আহমদের কথা চিন্তা করে পাগলা তাঁর পিতাকে বলল, "চিন্তা করবেন না, এ মামলায় আপনার পুত্রের কোনই শাস্তি হবে না। ও বেকসুর খালাস পাবে।"

সিংগারপুর গাঁয়ের এ জব্বার পাগলার খানিকটা ইতিহাস আছে। সে ছিল নিতান্ত দরিদ্র, দিন মজুর। ধান কাটার মওসুমে নৌকার মহাজন মালিক নৌকা আর ধান কাটার কামলা নিয়ে বরিশাল যেত ধান কাটতে এবং আনতে। কামলারাও মজুরি বাবদ নিজের পাওনা ধান নিজেরা নিয়ে আসত। যাওয়া-আসার ভাড়া বাবদও কিছু ধান তারা নৌকাওয়ালাকে দিত। পাগলাও ছিল এমন ধানের কামলা।

বরিশালে তারা এক মুন্সী সাহেবের খামারের ধান কাটতো। একদিন মুন্সী সাহেব তাকে ডেকে বললেন, "তুমি বাড়ি যাও।" কয়েকদিন পর আবার বললেন, "তুমি বাড়ি যাও। তোমার ছেলে-মেয়েকে দেখে এস।" লোকটি অনিচ্ছা প্রকাশ করল। বেশি দিন

www.nagorikpathagar.org

কাজ হয়নি। তাতে আসা-যাওয়ার ভাড়াই হয়নি। তদুপরি তখন বাড়ি গিয়ে ফিরে আসতে যে কয়দিন দেরি হবে ঐ দিনগুলোর ধান কাটার মজুরিও সে পাবে না। অগত্যা মুন্সী সাহেব তাকে বললেন, "তুমি যাও, ভাড়ার টাকা আমি দিচ্ছি। আমার নির্দেশে তুমি বাড়ি যাচ্ছ, তাই ফিরে না আসা পর্যন্ত এ কয়দিনের মজুরিও তুমি পাবে।" লোকটি সেদিনই বাড়ি রওয়ানা হলো।

বাড়ি পৌঁছে সে পেল নির্মমতম আঘাত। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। কলেরা মহামারী লেগে হঠাৎ তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সংসারের সকলেই মৃত্যুবরণ করেছে। ভিটিতে বাতি দেয়ার মত তার আর কেউ রইল না।

কিছুকাল পর আবার সে বরিশালে ফিরে গেল। এবার কিন্তু ধান কাটার জন্য বা মজুরি আদায়ের জন্য নয়। ঘর-বাড়ি, আত্মীয়স্বজন এবং জীবনের সব কিছুর প্রতি সে নিস্পৃহ। মুন্সী সাহেবের সান্নিধ্যে থাকার জন্য সে এলো। মুন্সী সাহেবও তাকে আশ্রয় দিলেন। তার জীবনধারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হতে লাগলো মুন্সী সাহেবের সেবায় থেকে। মাঝে মাঝে এদিক সেদিক চলে যায়। আবার ফিরে আসে। এভাবে চলে গেল জীবনের এক যুগের বেশি।

মুন্সী সাহেবের মৃত্যুর পর সে দেশে ফিরে এলো, ঘরে এসেও সে গৃহহারা। সংসার তাকে আর বাঁধতে পারলো না। যখন যে দিকে মন চায়, চলে যায়। জীবনের প্রতি কোন মায়া, মোহ বা আকর্ষণ তার নেই।

বেনজীর আহমদের মামলার সাওয়াল-জওয়াব শেষ হয়ে গেছে। শুনানির তারিখও ধার্য হল। কলকাতা হতে এলেন কয়েকজন রাজনৈতিক আইনজীবী। তাঁরা কোর্টে তেজোদীপ্ত ভাষায় বক্তৃতা করলেন, যুক্তি প্রমাণ দেখালেন। কিন্তু নিশ্চয়তার সংগে কিছু বলতে পারলেন না। সকলেরই ধারণা মামলার অবস্থা খারাপ। হাবিবুল্লাহ বাহার সাহেবের চাচা তৎকালীন এসেম্বলীর মেম্বার জনাব ফজলুল্লাহ ওরফে চুন্নু মিয়া এ মামলার ব্যাপারে রাতদিন পরিশ্রম করেন।

শুনানি শেষ। আসামী পক্ষের শেষ দিন। নিয়মিত কৌসুলী রাজেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী তাঁর উপসংহারমূলক বক্তব্য রাখছেন। তিনি কোন একটি বিষয়ে পড়ে শুনাবার জন্য সত্যায়িত কপিটি কাগজ-পত্রের মধ্যে হাতরাচ্ছিলেন, কিন্তু পাচ্ছিলেন না। সময় বাঁচাবার জন্য জজ সাহেব মূল নথিটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা থেকে দেখে বলুন।' মূল নথিটির পাতা উল্টাবার সময় হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো নথির একটা ছোট স্লিপের প্রতি। কোর্ট ইন্সপেক্টর কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে হাকিম কোন বিশেষ দিনে আসামী বেনজীর আহমদকে কোর্টে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঐদিনটি মামলার তারিখ ছিল না, ছিল জেলের ভিতরে টি আই, প্যারেডের তারিখ। জেল রেজিস্টার তলব করা হলো, দেখা গেল সকাল ১০টার সময় তাঁকে জেল থেকে বের করে আনা হয় এবং ১টা ৩০ মিনিটে জেলে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। ২টার সময় ছিল টি. আই. প্যারেড। অনধিক ৫০ জন ব্যক্তির মধ্য হতে সাক্ষীরা বেনজীর আহমদকে বেছে সনাক্ত করেন। কোর্টে কোন তারিখ না থাকা সত্ত্বেও কেন ঐ বিশেষ তারিখে আসামীকে

www.nagorikpathagar.org

জেলের বাইরে নেওয়া হল, এ এক সূক্ষ্ম প্রশ্ন। এটা কি সাক্ষীগণ যাতে সনাক্ত করতে ভুল না করেন, সে জন্য নয়?

বেনজীর আহমদ প্রধান আসামী। তাঁর সনাক্ত ব্যাপারে কোন প্রকার ভুল হয় এরূপ কোন রিস্ক নিতে সরকার পক্ষ প্রস্তুত ছিলো না। তাই এই বিশেষ ব্যবস্থা। কৌশুলী রাজেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী নিমজ্জমান তরীকে নদীতটে তোলার উপায় পেলেন। সাক্ষীগণ কর্তৃক প্রধান আসামীকে সনাক্ত করার বিষয়টি সন্দেহ করে জোরালো যুক্তি পেশ করলেন এবং দাবী করেন যে, শুধু এ কারণেই আসামী সন্দেহের সুবিধা (benefit of doubt) পেতে পারেন।

যাহোক, শুনানি শেষ হলো। কয়েকদিন পর রায় দিবেন ঘোষণা করে জজ সাহেব আদালত কক্ষ ত্যাগ করেন। ৭/৮ দিন পর নারায়ণগঞ্জ শহর হতে ফেরত যাওয়া গাঁয়ের লোক থেকে পিতা ছজুদের রহমান সাহেব খবর পেলেন যে, মামলার রায় বের হয়েছে। বেনজীর আহমদের ফাঁসির হুকুম হয়েছে ও অন্যদের হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। উকিল মোক্তারেরা যা অনুমান করেছিলেন তাই হয়েছে।

এই খবরে মর্মাহত হয়ে বেনজীর আহমদের পিতা ছজুদের রহমান পাগলের মত ছুটলেন, সিংগারপুর গ্রামের পাগলা জব্বারের সন্ধানে। পাগলা বাড়িতে ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে পেলেন এক বাজারে। এক কোণে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তুইতো বলেছিলি কোন শাস্তি হবে না, আমার ছেলে বেকসুর খালাস পাবে। কিন্তু খবর এসেছে তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে।'

কোন জবাব না দিয়ে জব্বার পাগলা স্তব্ধ হয়ে কি যেন চিন্তা করলো, কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে মাটির উপর কি হিবিজিবি আঁকলো। তারপর রহমান সাহবের সজল করুণ চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'যদি খোদা থাকে সাজা হবে না, যদি সাজা হয় খোদা নাই। কোরান মিথ্যা। কোরান মিথ্যা না হলে আপনার ছেলে তিন দিনের মধ্যে বাড়ি আসবে।'

পাগলার পাগলামী পিতার অবুঝ মনকে প্রবোধ দিতে পারলো না। তিনি সে রাতে বাড়ি ফিরে এলেন। পরদিনের স্টিমারেই চাঁদপুর হয়ে নেয়াখালী যাবেন। নারায়ণগঞ্জে চাঁদপুরের স্টিমার ভিড়ছে। লোকজন নামছে। এই স্টিমার আবার চাঁদপুর যাবে। ছজুদের রহমান সাহেব স্টিমারে উঠছেন এমন সময় দেখলেন হ্যান্ডকাপ লাগানো অবস্থায় স্টিমার থেকে নামানো হচ্ছে বেনজীরকে। দৌড়ে কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'মামলার কি রায় হয়েছে?' বেনজীর জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, রায় হয়েছে। আমি খালাস পেয়েছি।'

মামলায় খালাস পাওয়ার পরই তাঁকে কোর্ট প্রাঙ্গণেই আবার গ্রেফতার করা হয়। এবারের অভিযোগ– পুলিশের কাস্টডি হতে মেঘনা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পলায়ন। নোয়াখালী হতে গ্রেফতার করে বেনজীর আহমদকে হাজির করা হলো– ঢাকার ২য় হাকিম উজির আলী সাহেবের কোর্টে।

শেরে বাংলা ফজলুল হকের ভাগিনা উজির আলী ছিলেন একজন জাঁদরেল এবং কড়া মেজাজের হাকিম। অনেকের নিকট পগলা হাকিম নামেই পরিচিত ছিলেন। ছজুদের রহমান সাহেব জামিনের আবদেন করলেন হাকিম উজির আলী সাহেবের কোর্টে। কোর্ট ইন্সপেক্টর জামিনের বিরোধিতা করলেন।

www.nagorikpathagar.org

যে আসামী সাতজন গুর্খা সেপাই এবং পুলিশের তত্ত্বাবধান হতে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পলায়ন করতে পারে, এরূপ সাংঘাতিক আসামীকে কিছুতেই জামিন দেয়া যায় না। দুই পক্ষের শুনানি হল। উজির আলী সাহেব নিজেই আসামীর জেরা করলেন। শুধু আসামীই নয়, আসামীর পিতাকেও। গরম গরম কথা শুনালেন বাপ-বেটাকে। কিন্তু সরকার পক্ষের আপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করলেন।

হাকিম মঞ্জুর করলে কি হবে, পুলিশ তো আর অত সহজে ছেড়ে দেবে না! সিউরিটি হিসেবে যাকে হাজির করা হয় তাকেই অনুপযুক্ত বিবেচনা করে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। কোর্টের উকিল সিউরিটিও দেয়া হল, তাও উপযুক্ত বলে বিবেচিত হল না। পুত্রের জামিন লাভে ব্যর্থ হয়ে ছজুদের রহমান সাহেব হতাশ হয়ে কোর্টের সামনে পায়চারি করছেন।

বিকেল তখন সাড়ে ৫টা। উজির আলী সাহেব তখনও কোর্টে। ছজুদের রহমান সাহেবকে বারান্দায় দেখে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘোরাঘুরি করছেন কেন? আপনার ছেলে কোথায়? বাড়ি যাচ্ছেন না?' দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছজুদের রহমান সাহেব বললেন, 'আপনি জামিন দিয়েছেন বটে তবে ছেলেকে পেলাম না। পুলিশ কাউকেই সিউরিটির উপযুক্ত মনে করছে না, এমনকি কোর্টের কোন উকিলকেও নয়।'

একথা শুনে উজির আলী সাহেব রেগে অগ্নিশর্মা, কোর্ট ইন্সপেক্টরকে ডেকে আচ্ছাতর বকাবকি করলেন। বললেন, 'চোরের উপর বাটপাড়ি করে শখ মেটে না, হাকিমের উপর বাটপাড়ি শুরু করেছ! তোমাদের বাটপাড়ি আমি দেখাচ্ছি। আমি ব্যক্তিগত এবং পিতার সিউরিটির উপরে বেনজীর আহমদকে জামিন দেব'– এই বলে তিনি নথি তলব করলেন।

কোর্ট ইন্সপেক্টরের কাজের উপর বিরূপ মন্তব্য নথিতে লিখবেন ভয়ে বেচারা অস্থির। উজির আলী সাহেবের কলম চলে বলগাহারা। কোর্ট ইন্সপেক্টর অনেক অনুনয়-বিনয় করে মাফ চাইলেন এবং বললেন, 'এখনই আমি আসামীকে জামিন রেখে রিলিজ করে দিচ্ছি।'

নতুন করে সিউরিটি আবার আনতে বেশ কিছুটা দেরি হয়ে গেল। কোর্ট ইন্সপেক্টর সন্ধ্যার পর কোর্টে বসে আছেন সিউরিটির অপেক্ষায়। অবশেষে নতুন জামিনদার পাওয়া গেল। কোর্ট ইন্সপেক্টরের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বেনজীর আহমদ সে রাতেই জেল থেকে বের হয়ে আসলেন। পরে ঐ মামলায় উজির আলী সাহেব বেনজীর আহমদকে মাত্র দুইশত টাকা জরিমানা করেছিলেন।

পরদিন সকালে ছজুদের রহমান পুত্রসহ বাড়িতে ফিরলেন। প্রসংগত ওটা ছিল জব্বার পাগলার দেওয়া তিন দিনের তৃতীয় দিন।

www.nagorikpathagar.org

সানাউল্লাহ্ নূরী

স্বাধীনতা সংগ্রাম : শেরে বাংলা ও লাহোর প্রস্তাব

শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের জন্ম এবং বিশাল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে উনিশ ও বিশ শতকের ক্রান্তিকালে তাঁর আবির্ভাব আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। স্মরণযোগ্য, ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা বিপ্লবের ষোল বছরের ব্যবধানে অর্থাৎ ১৮৭৩ সালে বাখরগঞ্জের একটি আইনজীবী পরিবারে ফজলুল হকের জন্ম। বলার অপেক্ষা রাখে না, সাতান্নর বিপ্লব ব্যর্থ হলেও তার ছাই-চাপা আগুন তখনও প্রচুর উত্তাপ সঞ্চার করে রেখেছিলো বাংলাদেশের অধিকার বঞ্চিত মুসলিম গণমানসে। কেননা, স্বাধীনতা যুদ্ধে এই সমাজের মানুষই পালন করেছিলো মুখ্য ভূমিকা। আর এর জন্যে ব্রিটিশ রাজশক্তির সমস্ত রোষ এঁদের উপর আপতিত হয়েছিলো। বিপ্লবে অংশগ্রহণের দায়ে অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যবর্গকে ঝুলতে হয়েছিলো ফাঁসির কাষ্ঠে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিলো হাজার হাজার পরিবারের সম্পত্তি। বিপ্লবীদের পরিবারের সাথে সামান্যতম সম্পর্ক ছিলো এমন অনেক লোককে পর্যন্ত হারাতে হয়েছিলো সরকারি চাকরী এবং সুযোগ-সুবিধা। এসব কারণে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মনে ঘৃণা থাকাটাই ছিলো স্বাভাবিক। তাছাড়া, স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি তখন অনেকখানি প্রজ্বলন্ত ছিলো আমাদের গোটা সমাজ-চৈতন্যে।

মনে রাখা দরকার, সাতান্নর বিপ্লব- উত্তর এই পরিবেশেই জন্ম শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর মানস গঠনে এই পরিবেশ গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলো। ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গ শাসক এবং দেশীয় জমিদার মহাজনদের সম্মিলিত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজা শ্রেণীকে সংগঠিত করে মুক্তির লড়াইতে যে অগ্রণী ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন, তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে অতীতের এই সুদীর্ঘ সংগ্রামী উত্তরাধিকারের প্রভাব। গোটা উপমহাদেশে শেরে বাংলা ফজলুল হকই উপনিবেশবাদী এবং বেনিয়া শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম সর্বাত্মক কৃষক আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেছিলেন। এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ারে পরিণত করার ক্ষেত্রেও তাঁর সাফল্য ছিলো অসামান্য। এদিক থেকে বিচার করলে শুধু বাংলাদেশ কিংবা উপমহাদেশেই নয়- গোটা আফ্রো-এশিয়ায়ও তাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

একথা সত্য, শেরে বাংলা নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের পথেই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করতে চেয়েছিলেন। সংগ্রামের এই কৌশলে কতোটা সাফল্য তিনি অর্জন করেছিলেন তার বড়ো প্রমাণ হলো মধ্যস্বত্ত্ব বিলোপ তথা জমিদারি উচ্ছেদ, নিজস্ব ভূমির উপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, মহাজনী শোষনের অবসান, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, সরকারী চাকরিতে কম সুযোগপ্রাপ্ত মুসলমান সমাজের তরুনদের জন্যে আসন সংরক্ষন প্রভৃতি আইনগত পদক্ষেপ। আইন সভায় এবং আইন সভার বাইরে ঝড় সৃষ্টি করে ব্রিটিশ ও দেশীয় কায়েমী স্বার্থবাদীদের ষংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র নির্মূল করে দিয়ে এ অধিকার

www.nagorikpathagar.org

তিনি আদায় করে নিয়েছিলেন। সশস্ত্র কোনো আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করলেও প্রয়োজনের মুহূর্তে বিক্ষুব্ধ জনগণের মিছিলে শরীক হয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মুকাবিলা করতেও তাঁকে আমরা দেখি। ইংরেজ ধর্মযাজক পরিচালিত 'এপিফেনি' পত্রিকায় প্রকাশিত মহানবী (স.)-এর নিন্দা-জ্ঞাপন পূর্ণ একটি নিবন্ধকে কেন্দ্র করে ১৯১৭ সালে কলিকাতায় মুসলমানদের বিক্ষোভ মিছিলে ব্রিটিশ সৈন্যগণের ব্রাশ ফায়ারের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়, সমাজের স্বার্থে যে কোনো ঝুঁকি নিতে তিনি কখনও পিছপা হননি। রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে সেদিন পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিলো ব্রিটিশ শাসকদের। ওই একই বছর অর্থাৎ ১৯১৭ সালে প্রবর্তিত ভারতীয় প্রেস অ্যাক্ট তথা সংবাদপত্র দলন আইনের বিরদ্ধে তিনি প্রতিবাদী স্বর উচ্চকিত করেছিলেন, তার থেকে বুঝতে পারা যাবেবাক-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মূল্য ছিলো তাঁর কাছে কতোটা! এক রাজনৈতিক সমাবেশে বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেছিলেন: 'নির্যাতন, অবিচার এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মানুষের একটি জন্মগত অধিকার। সংবাদপত্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা এই অধিকারেরই অন্তর্গত। ব্রিটিশ সরকার এই অধিকার কেড়ে নিলে অবরুদ্ধ আবেগ ফেটে পড়ে ভাসিয়ে নেবে নির্যাতনের সব লৌহ প্রাচীর।' একথা গুলো থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রশ্নে কতখানি নিরাপোষ ছিলেন তিনি।

শেরে বাংলাকে বলা হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম চিন্তানায়ক এবং স্বপ্নদ্রষ্টা। ১৯৪০ সলে মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে উত্থাপিত তাঁর ঐতিহাসিক প্রস্তাবটিই এর স্মরণীয় নিদর্শন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সংগে রয়েছে এর এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্র। এখন আমরা শেরে বাংলার আবির্ভাব এবং তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমির সংগে যুক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের এই ইতিহাসটির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরছি।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তিনটি সুস্পষ্ট অধ্যায়ে চিহ্নিত। প্রথমটির ব্যাপ্তিকাল ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল। অর্থাৎ পূর্ণ একটি শতাব্দী এই বিশাল অধ্যায়টির পরিধি। দ্বিতীয়টির ব্যাপ্তিকাল ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭। এর বিস্তৃতি নব্বই বছর। তৃতীয় অধ্যায়টি প্রলম্বিত ১৯৪৭ সাল এবং ১৯৭১-এর শেষ প্রান্তরেখা পর্যন্ত। চব্বিশ বছরের অর্থাৎ পূর্ণ দু'টি যুগের ঘটনা প্রবাহের উত্তাপ সঞ্চারিত এই সর্বশেষ অধ্যায়টিতে। সময়ের হিসেবে এই তিন অধ্যায়ের পরিধি দু'শ চৌদ্দ বছর হলেও গোটা তিনটি শতাব্দীর ক্রান্তিকালেরই সাক্ষাৎ পাই আমরা জাতীয় এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতায়। এর পটভূমি এবং নিরবচ্ছিন্ন অগ্রযাত্রার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে আঠারো, উনিশ ও বিশ শতকের বহুমুখী ঘাত-প্রতিঘাতের স্রোতধারা। আঞ্চলিক, উপমহাদেশীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ছাপও স্পষ্ট লক্ষ্যগোচর হয় এই বিশাল ইতিহাসের চারপাশে।

পলাশীর প্রতিরোধ যুদ্ধ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। ১৭৫৭ সালে তেইশ জুন। এই দিন পলাশী রণাঙ্গনে যবনিকাপাত ঘটলো বাংলার স্বাধীনতার। আর রাতারাতি রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে বসলো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকরা। এরা ছিলে কাপড়, লবণ, পাট, তুঁত আর নীল

www.nagorikpathagar.org

ব্যবসায়ী। ইংলিশ চ্যানেল পারের এই শ্বেতাঙ্গ বণিকদের সাথে হাত মিলিয়েছিলো গংগা-যমুনা তীরের বণিক এবং ভূস্বামীর দল। গায়ের চামড়ার পার্থক্য থাকলেও শোষক হিসেবে এদের স্বার্থ ছিলো প্রায় অভিন্ন। ইংরেজের কুঠি আর জগৎশেঠ-উমিচাঁদ প্রমুখ মাড়োয়ারী গদিতে এই দুই শোষক গোষ্ঠীর স্বার্থের আঁতাতের মধ্যে দিয়েই জাল বিস্তার করলো মুর্শিদাবাদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। ক্ষমতার রুটির হিস্যা পাওয়ার লোভে এদেরই পাতা ফাঁদে পা রেখেছিলো নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌলার প্রধান সেনাপতি মীরজাফর। ইংরেজ বণিক, দেশীয় বনিক-জমিদার এবং প্রাসাদের ছত্রছায়ায় লালিত রাজনীতিক, সমর নায়ক এ ত্রিমুখী যোগসাজসেরই ফলশ্রুতি হলো পলাশীর নিষ্ঠুর প্রহসন।

ইতিহাসের গভীরে দৃষ্টিপাত করলে আমরা লক্ষ্য করবো, পলাশীর এই ভাগ্য বিপর্যয়ের দিন থেকেই শুরু হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ। নিঃসন্দেহের নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌলা ছিলেন মুক্তির এই সংগ্রামের প্রথম মহানায়ক এবং মহিমান্বিত শহীদ। চব্বিশ বছরের অমিত সাহসী এই যুবক প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় সংগ্রাম করেছেন দেশী-বিদেশী উভয় চক্রের ষড়যন্ত্রে বিরুদ্ধে। বাংলায় মারাঠা-বর্গীদের অনুপ্রবেশ রোধ করেছিলেন তিনি সামান্য দৃঢ়তার সঙ্গে কাসিম বাজার কুঠি এবং কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম ছিলো ইংরেজ বণিকের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি। সিরাজ জানতেন স্বাধীনতাকে বিপদমুক্ত রাখতে হলে প্রথমেই নস্যাৎ করতে হবে বহিরাগত চক্রান্তের জটাজাল। প্রথম সুযোগেই তাই প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন তিনি শ্বেতাঙ্গ ঘাঁটিগুলিতে। ফোর্ট উইলিয়াম অভিযানে স্বয়ং তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁর অনুগত বাহিনীর। উপনিবেশিক সমর শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর এ বিজয় ছিলো আমাদের ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। বিজয়ের নায়ক হিসেবে সিরাজ সেদিন অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছিলেন দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, সেই দৃঢ়চেতা এবং সাহসী যোদ্ধাকেই পরাজয় বরণ করতে হলো পলাশীতে।

কেন এত বড় একটি বিপর্যয় সেদিন ঘটলো, তার কারণটি অবশ্যই খতিয়ে দেখা দরকার। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ত্রিপক্ষীয় ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন নিঃসঙ্গ তরুণ শাসনকর্তা সিরাজ-উদ্‌দৌলা। হাতে গোণা কয়েকজন দেশপ্রেমিক এবং সাধারণ সেনাদল ছাড়া সিরাজের পক্ষে মুর্শিদাবাদে বলতে গেলে তেমন আর কেউ-ই ছিলো না। নবাবের মন্ত্রী, সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন ডিভিশনের অধ্যক্ষ, রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা এবং দরবারে উচ্চপদস্থ আমলাদের প্রায় সকলেই ক্লাইভ-জগৎশেঠ-মীরজাফর চক্রের বশংবদে পরিণত হয়েছিলো। এদের দলে ভিড়ানো হয়েছিল একই সংগে উৎকোচ দিয়ে এবং পদোন্নতির লোভ দেখিয়ে। প্রাসাদের এই কুটিল ষড়যন্ত্র আর ক্ষমতা দ্বন্দ্বের কিছুই আঁচ করার সাধ্য ছিল না দেশের সাধারণ মানুষের। ফলে, তাদের প্রায় অগোচরেই অভিনীত হলো পলাশীর যুদ্ধ-নাটক। সেকালের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার পটভূমিতে দরবারের আমলা পরিষদ আর সেনা নায়কদের উপর নির্ভর করা ছাড়া সিরাজের উপায় ছিলো না। অর্থাৎ বাধ্য হয়েই তাঁকে বিশ্বাসঘাতক এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিলো। যুদ্ধের আগে মীরজাফরের সাথে তাঁর যে সমঝোতা হয়েছিলো, তার ওপর তিনি ভরসা রাখেন। তিনি আশা করেছিলেন, অন্তত দেশের স্বার্থে

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতালোলুপ ইংরেজ এবং দেশীয় বেনিয়াদের মসনদের শরীক করবেন না মীরজাফর আলী খাঁ। ঐক্যের প্রয়োজন শেষ মুহূর্তে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের সাথে অমন একটা সুদূর প্রসারী পরিণামদর্শী সমঝোতায়া আসতে হলো তাঁকে। কিন্তু এই সমঝোতাই কাল হলো তাঁর পক্ষে। মীরজাফর অবধারিত বিজয়ে মুহূর্তেই বিশ্বাসঘাতকতা করলো। প্রশ্ন উঠবে, সিরাজ কেন সবকিছু বুঝেও বিশ্বাসঘাতকদের ফাঁদে পা রাখতে গেলেন? তিনি কেন প্রথমেই তাদের শায়েস্তা করলেন না? এবং তাঁর অনুগত মীরমদন কিংবা অন্য কাউকে কেন প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন না? এ রকম দূরদর্শিতার পরিচয় দিলে নিশ্চয়ই পলাশীতে ভরাডুবি হতো ইংরেজ এবং তাদের এদেশীয় ক্রীড়নক চক্রের এবং তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া। প্রশ্ন উঠবে, তাহলে কি সিরাজ অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন? মারাত্মক একটি ঐতিহাসিক ভুল করেছিলেন?

পলাশী যুদ্ধ-পরবর্তী যুগ

কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে সে সময়ের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, ১৭৫৭ সালে ভিন্ন সামরিক কৌশল নিয়ে যুদ্ধে বিজয় সম্ভব হলেও তা হতো ক্ষনস্থায়ী। কেননা, ১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজের মৃত্যুর পর দিল্লীতে মুঘল শাসনের ভিত নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার ফলে উপমহাদেশের সর্বত্র ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের উপর প্রকৃত অর্থে দিল্লীর কোনো কর্তৃত্বই ছিলো না। এই প্রেক্ষাপটেই ১৭৪০ সালে নবাব আলীবর্দী খাঁ বাংলা এবং বিহারের সুবাদার হলেন। কিছুকাল পর উড়িষ্যাও এলো তাঁর শাসনের আওতায়। যুদ্ধবিশারদ এবং রাজনীতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো দিল্লীর নিয়ন্ত্রণের বাইরের সব ষড়যন্ত্র, বহিরাগত হামলা এবং উৎক্ষেপ প্রতিহত করে আঞ্চলিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা। কিন্তু ১৭৫৬ সালে মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো চারপাশে আগ্রাসী ঝড়ের সব আলামত। ইংরেজদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি, বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুবাদে তাদের নির্বিচার শোষণ-লুণ্ঠন এবং দেশীয় বেনিয়াদের ষড়যন্ত্র তিনি প্রতিহত করে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্নধারার এই স্বার্থচক্র আরও প্রবল হয়ে উঠলো। সিরাজ-উদ্‌দৌলা কেন অন্য কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না বহুমুখী এই প্রতিঘাতের মোকাবিলা করা। পলাশীর পরবর্তী ঘটনাবলী এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সিরাজ-উদ্‌দৌলা সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো সত্য হলো আপোষকামিতার দুর্বল মনোভাব তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে তিনি ক্ষুণ্ন হতে দিতে চাননি দেশী-বিদেশী চক্রান্তের চাপের মুখে। এ কারণেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মুহূর্তেই তিনি আঘাত হেনেছিলেন শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশিক শক্তির ঘাঁটিতে। দেশের সাধারণ মানুষের রক্ত শোষণকারী বেনিয়া এবং মহাজনদের বিরুদ্ধে একই সংগে অভিযান চালিয়েছিলেন তিনি। এই শোষক গোষ্ঠীর প্রতিভূ জগৎশেঠ-রায়দুর্লভ- রাজবল্লভ-উমিচাঁদ চক্র এ কারণেই তাঁকে উৎখাত করার জন্যে একযোগে নেমে পড়ে। সুতরাং, পলাশীর প্রতিরোধ যুদ্ধে পরাজিত হলেও রাজনৈতিক আধিপত্য এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের এক স্থায়ী দিক

www.nagorikpathagar.org

নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিলেন সিরাজ-উদ্দৌলা। শহীদের মৃত্যুবরণ করে তিনিই আমাদের শিখিয়ে গিয়েছেন কেমন করে স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করতে হয়, প্রাণ দিতে হয় এবং স্বাধীনতার ঝাণ্ডাকে উঁচু রাখতে হয়।

পলাশীর রক্ত সড়ক ধরেই যাত্রা শুরু হলো স্বাধীনতার সংগ্রামী কাফেলার। ১৭৬০ সালে অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করলেন মীর কাসিম। এক সময়ে তিনি সিরাজের বিরোধিতা করে ছিলেন। কিন্তু ক্ষমতাসীন হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন ইংরেজ এবং দেশীয় বণিক গোমস্তাদের ক্রীড়নক ছাড়া তিনি আর কিছুই নন। মোহমুক্তি ঘটতে তাঁর বিলম্ব হলো না। ইংরেজের কুঠি থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবার জন্যে সিরাজের পথ ধরেই তাঁকে লড়তে হলো উদয়নালায় এবং বক্সারে। কূটচক্রের কাছে একইভাবে তাঁকেও পরাজিত হতে হলো। কিন্তু থেমে থাকলো না মুক্তির লড়াই। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এই প্রথম বারের মতো বুঝতে পারলো, পরাধীনতার গ্লানি কতখানি মর্মান্তিক। ইংরেজ এবং তাদের তাঁবেদার দেশীয় বণিক-মহাজন আর ভুস্বামীদের শোষণ-শাসনে জর্জরিত হয়ে ১৭৬০-এর দশকেই বিদ্রোহ করলো দেশের কৃষক সমাজ। দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনে এদের ঐক্যবদ্ধ করলেন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী দরবেশ মজনু শাহ। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে তিনি গড়ে তুললেন মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য ঘাঁটি। আমাদের এই ভূখণ্ডে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী সংঘবদ্ধ সশস্ত্র কৃষক-গেরিলাদের তিনিই ছিলেন প্রথম বিপ্লবী নায়ক। প্রায় একই সময়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন উপকূল অঞ্চলের বীর কৃষক নেতা নওয়াব আলী।

সংগ্রামের এই ধারাটি ১৭৯৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস-এর কুখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা জমিদারী প্রথা প্রচলনবিরোধী উৎক্ষেপ এবং ১৭৯৯ সালে মহিশূরের মুক্তিনায়ক ফতেহ আলী টিপুর প্রতিরোধ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলে। ১৮২০-এর দশকে ইংরেজ এবং শিখ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে একযোগে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন মহান চিন্তা নায়ক শাহ ওয়ালীউল্লাহর ভাবশিষ্য সৈয়দ আহমেদ বেরেলভী, মওলানা ইসমাইল এবং নোয়াখালীর হাজী ইমামউদ্দীনসহ বাংলাদেশের অসংখ্য সংগ্রামী পুরুষ। এই মুজাহিদ আন্দোলন গণজাগরনের এক দাবানল সৃষ্টি করলো বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে।

মুজাহিদ আন্দোলন

মুজাহিদ আন্দোলনই প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতার এক উদ্দীপ্ত চেতনা সঞ্চার করে। আর এই চেতনাই বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত বারুদকণা আত্মস্থ করে নিয়ে মহাবিস্ফোরণে ফেটে পড়ে আঠারো শ'সাতান্নর স্বাধীনতা যুদ্ধে।

মুজাহিদ আন্দোলনের পেছনে উপাদান যুগিয়েছে যে-সব ঘটনা প্রবাহ, এ-প্রসংগে তার ওপর কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। আমরা লক্ষ্য করি, ১৭৫৭ সালে পরাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ্‌দৌলার পতনের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনি গোটা উপমহাদেশে

www.nagorikpathagar.org

এবং দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে কলিকাতা, হুগলী, দক্ষিন ভারতের মাদ্রাজ এবং বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কয়েকটি উপকূলীয় বন্দরে ছিলো ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি। দেখা যায়, মুর্শিদাবাদে ক্রীড়নক মীরজাফরকে গদিতে বসানোর বছর দুয়েকের মধ্যেই তারা সমগ্র বাংলাদেশে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে। এর পর পরই তারা হাত বাড়ায় বিহার, উড়িষ্যা, অযোধ্যা, রোহিলা খণ্ড এবং মহিশূরের দিকে। কুখ্যাত উপনিবেশবাদী ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন তখন কোম্পানির গভর্নর জেনারেল। আর ইংল্যাণ্ডে ব্রিটিশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উইলিয়াম পিট। ১৭৮৪ সালে পিটের উদ্যোগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত শাসন আইন' নামক বিলটি পাশ হওয়ার পর উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসন পাকাপোক্ত হয়। এ সময় দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ এবং মারাঠাদের প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে আবির্ভাব ঘটে দুই স্বাধীনতা যোদ্ধার। এঁরা হলেন মহীশূর সিংহ হায়দার আলী আর তাঁর পুত্র টিপু সুলতান। এই বীর পিতা-পুত্রের হাতে ইংরেজরা বার বার পর্যুদস্ত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মারাঠা, পেশোয়া এবং হায়দারাবাদের নিজামকে দলে ভিড়িয়ে ঠিক সিরাজ-উদ্‌দৌলার মতোই টিপুকে খতম করার ষড়যন্ত্র আঁটা হলো। ১৭৯৯ সালে শ্রীরঙ্গ পত্তমের প্রতিরোধ-যুদ্ধে শহীদের মৃত্যুবরণ করে পরবর্তীকালের এক প্রজ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন এই মহান মুক্তি-সৈনিক।

এর ছয় বছর আগে ১৭৯৩ সালে বাংলাদেশে কৃষক সমাজকে সামন্ত-নির্যাতনের যুপকাষ্ঠে নিক্ষেপ করলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। কুখ্যাত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে জমির মালিকানা কৃষকদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো। জমিদাররা হলো ভূমির একচ্ছত্র অধিকারী এবং কৃষক-প্রজার দণ্ডমুণ্ডের বিধায়ক। ইংরেজরা প্রতিবেশী সমাজের নব্য বণিক শ্রেণী এবং তাদের কুঠির গোমস্তাদের চির বশংবদ করে রাখার জন্যে বড় বড় চাকলার জমিদারি ভেট হিসেবে বরাদ্দ করলো। এরা রাতারাতি 'দেশীয় লর্ড' বনে গেলো এবং 'রাজা-মহারাজা' খেতাব পেয়ে শ্বেতকায় প্রভুদের মতোই আচরণ করতে লাগলো। কৃষকরা হলো এদের ভূমিদাস। বাংলাদেশে কৃষক সমাজের বৃহত্তর অংশই ছিলো মুসলমান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তনের ফলে এদের সর্বনাশ হলো। জমিদারদের শোষণ-ত্রাসন এবং নির্যাতনের মূল শিকার হলো এরাই।

উইলিয়াম হান্টার তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স্' গ্রন্থে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার প্রতিক্রিয়া মুসলমানদের অর্থনৈতিক জীবনকে কতখানি পর্যুদস্ত করেছে তার আভাস দিতে গিয়ে বলেছেন: 'এই সময়কার অবস্থা দেখে মনে হয়, বাংলার মুসলিম পরিবারগুলো যেন পৃথিবীর বুক থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। অথবা তারা ইংরেজদের গড়ে তোলা নব্য ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর জৌলুসের আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছে চিরকালের জন্যে।'

পরবর্তীকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো: ইংরেজদের সিন্ধু বিজয়, পাঞ্জাবে শিখনেতা রঞ্জিৎ সিংয়ের অভ্যুদয়, মুসলিমপ্রধান পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে শিখ আধিপত্য, আফগানিস্থানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ষড়যন্ত্র এবং লর্ড ম্যাকোলের সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা পরিকল্পনা। এসব ঘটনা মুসলমান সমাজকে ঘোর ইংরেজ বিরোধী করে তুললো। আঠারো শ'ত্রিশের দশকের সূচনাকাল পর্যন্ত মুঘল আমলের রাষ্ট্রভাষা ফার্সী ছিলো শিক্ষার

www.nagorikpathagar.org

মাধ্যম এবং অফিস-আদালতের ভাষা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকারী কাজকর্ম ফার্সীর মাধ্যমেই চলতো। ম্যাকোলে'র পরিকল্পনা অনুসারে ফার্সীর স্থলাভিষিক্ত হলো ইংরেজি। ফলে, উচ্চশিক্ষিত মুসলিম বিচারক-মণ্ডলী, রাজস্ব কর্মচারী এবং বিভিন্ন উচ্চপদে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ রাতারাতি অপাংতেয় পয়ে পড়লেন। ইংরেজ, ইংরেজের ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি স্বাভাবিক কারণেই ক্ষমতাচ্যুত মুসলমানদের মনে গভীর বিতৃষ্ণা ছিলো। ইংরেজরাও বিদ্রোহের ভয়ে মুসলমানদের দাবিয়ে রাখার জন্যে সব রকম অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলো। ভাষা পরিবর্তনের দ্বারা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানদের উপর শেষ মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করলো ইংরেজ। এতে গোটা সমাজে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠলো। ইংরেজি ভাষা বর্জনকে তার নীতি হিসেবে গ্রহণ করলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে গেলো এবং তার স্থান দখল করলো নব প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও কলেজসমূহ। এসব শিক্ষাকে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শাসনের নাটবল্টু হিসেবে সৃষ্টি করতে লাগলো বশংবদ দেশীয় আমলাতান্ত্রিক তথা একশ্রেণীর নকল ইংরেজ। বলাবাহুল্য, এদের প্রায় সবাই ছিলো প্রতিবেশী সমাজের অন্তর্গত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সমস্ত অফিস-আদালত চলে গেলো এদের নিয়ন্ত্রণে।

এভাবে একদিকে শোষণসর্বস্ব জামিদারী ব্যবস্থার দ্বারা যেমন পথে বসানো হলো আমাদের কৃষক শ্রেণীকে, অন্যদিকে তেমনি মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ভাষা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরকারী চাকরি থেকে বহিষ্কার করে ছিন্নমূলে পরিণত করা হলো। পাশাপাশি মারাঠা ও শিখ সম্প্রদায়ের সাথে ষড়যন্ত্র করে একের পর এক দখল করে নেয়া হলো মহীশূর, অযোধ্যা, রোহিলাভূমি, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশসহ মুসলিমশাসিত অঞ্চলগুলো। এসব ঘটনা রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং চিন্তানায়কদের আতংকিত করে তুললো। যুগ-মনীষী শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৭০৩-৬৩খ্রি.) সময়েই সংঘটিত হয়েছিলো পলাশী যুদ্ধ। তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের কূট-কৌশলগুলো গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলোতে তিনি স্পষ্ট-ভাষায় উল্লেখ করেন জিহাদ তথা বিপ্লবের মাধ্যমে ইংরেজ এবং বিভেদাত্মক শক্তিগুলোর উচ্ছেদের মধ্যেই রয়েছে উপমহাদেশের রাজনৈতিক মুক্তি। তাঁর এ চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী মওলানা শাহ আবদুল আযীয, সৈয়দ আহ্‌মদ বেরেলভী, মওলানা ইসমাইল শহীদ প্রমুখ বিপ্লবী সাধকগণ। শাহ্ আবদুল আযীয ইংরেজশাসিত ভারতকে দারুল-হরব তথা বিধর্মী কবলিত রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম মুসলমানদের একটি আইনসংগত অধিকার– একথাও তিনি উচ্চারণ করেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

তাঁর এই রাজনৈতিক তত্ত্বই আঠারোশ' বিশের দশকে বাংলাদেশ, বিহার, উত্তর ভারত এবং উত্তর পশ্চিম সিমান্ত প্রদেশে মুজাহিদ আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বে অভিষিক্ত হলেন সৈয়দ আহ্‌মদ বেরেলভী। তিনি একদল মুজাহিদ নিয়ে সীমান্ত প্রদেশে যান। তাঁর সাথে ছিলেন হাজী ইমামউদ্দীন বাংগালিসহ নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর, কলিকাতা এবং চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জেলার বহু মুজাহিদ। সৈয়দ আহমদ একাধিক যুদ্ধে শিখ ফৌজ ও ব্রিটিশ তাবেদার বাহিনীকে পরাজিত করে সীমান্ত প্রদেশকে স্বাধীন করেন।

www.nagorikpathagar.org

সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন গণপ্রজাতান্ত্রিক খিলাফত সরকার। তাঁর সরকারের ইসলামী সমতার আদর্শ, ন্যায়-বিচারভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমদর্শিতার নীতি সাধারণ মানুষের মনে গভীর আশাবাদ সৃষ্টি করে। কিন্তু স্থানীয় উপজাতীয় সর্দার, ভূস্বামী ও কায়েমী স্বার্থচক্রী এই বিপ্লবাত্মক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাস্তবায়ন লক্ষ্য করে আতংকিত হয়ে পড়ে। সৈয়দ আহ্মদকে উৎখাত করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলোৎপাটনের জন্যে এই চক্র দেশী-বিদেশী শত্রুর সাথে হাত মিলায়। শিখ ও ইংরেজদের এরা গোপনে মদদ যোগায় সৈয়দ আহ্মদ এবং তাঁর মুজাহিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা চালাতে। বিশ্বাসঘাতকের প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে হত্যা করে বিপুল সংখ্যক মুজাহিদকে। ইংরেজদের সাথে ছিলো শিখ নেতা রণজিৎ সিংহের মৈত্রী চুক্তি। এই উভয় শক্তি সীমান্তের চারদিক থেকে চাপ সৃষ্টি করে বালাকোট উপত্যাকায় ঘিরে ফেলে সৈয়দ আহ্মদকে। মুজাহিদরা মরণপণ লড়াই করে একযোগে শহীদ হলেন। তাঁদের একজনও শত্রুসেনার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন না। সৈয়দ আহমদের মৃতদেহ লুকিয়ে ফেললো শিখেরা। তাদের ভয় ছিলো তাঁর লাশ কবরস্থ করা হলে তাঁর সমাধিকে ঘিরে নতুন করে দানা বেঁধে উঠবে মুজাহিদ আন্দোলন।

হাজী শরিয়ত উল্লাহ, তিতুমীর ও দুদুমিয়ার সংগ্রাম

লক্ষ্য করবার বিষয়, সীমান্ত প্রদেশে মুজাহিদ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও বাংলাদেশে তার ধারা প্রবাহ দেশীয় জমিদার এবং শ্বেতকায় নীলকরদের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে এক প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানের রূপ লাভ করলো। হাজী শরিয়ত উল্লাহ্, তাঁর পুত্র দুদুমিয়া এবং তিতুমীর ছিলেন এই গণঅভ্যুত্থানের অগ্রনায়ক। এই তিন নেতা ছিলেন একাধারে কৃষক আন্দোলন, মুজাহিদ আন্দোলন, ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন এবং ব্রিটিশ-বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা ও দিশারী। এঁরাই প্রথম কৃষক আন্দোলনকে বৈপ্লবিক এবং গণতান্ত্রিক রূপ দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের বিক্ষিপ্ত ধারাটিকে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিচালিত করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই তিন নেতার অবদান সুদূরপ্রসারী তৎপর্যে উজ্জ্বল এবং স্বমহিমায় মণ্ডিত। গণজাগরণ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের এই কালক্রমটি ১৮২০ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। মোটামুটি চারদশক ধরে এর জোয়ার পদ্মা-মেঘনা এবং গংগা-যমুনাকে প্রচণ্ড বেগে উদ্বেলিত করে তুলেছিলো। এখানে বলা দরকার, গণজাগরণ এবং রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের পটভূমি এ-যুগের আগে থেকেও নির্মিত না হলে বাংলাদেশে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা বিপ্লব আদৌ সংঘটিত হতো কিনা সন্দেহ। এবং এটা অস্বীকার কারার উপায় নেই, হাজী শরিয়ত উল্লাহ্র ফারায়েজী আন্দোলন ও জমিদার নীলকরদের শোষণবিরোধী কৃষক আন্দোলন, দুদুমিয়ার পরিচালিত কৃষক বিদ্রোহ ও গ্রামভিত্তিক সাংগঠিত-রাজনৈতিক আন্দোলন এবং নিসার আলী তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধই প্রকৃতপক্ষে সাতান্ন'র স্বাধীনতা বিপ্লবে অগ্নিস্ফুলিংগ সঞ্চার করে। এ দিক থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায়, আঠারো শ' পঞ্চাশের দশকের পূর্ববর্তী গণঅভ্যুত্থানের এ-যুগটি ছিল সাতান্ন'র মহাবিপ্লবের সাক্ষাৎ পূর্বসূরী এবং তার ঘনঘটাময় প্রথম অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

উনিশ শতকের প্রথম পর্বে বাংলাদেশে সংগঠিত গণ-আন্দোলনের এই অবিস্মরণীয় অধ্যায়টির উদ্‌গাতা হলেন বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ও যুগমনীষী আল্লামা হাজী মুহম্মদ শরিয়ত উল্লাহ্‌। পলাশী যুদ্ধের সাত বছর পর, ১৭৬৪ সালে, সাবেক বাখেরগঞ্জের অন্তর্গত তদানীন্তন মাদারীপুর মহকুমার এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন এই বিপ্লবী জননায়ক। মাদারীপুর পরবর্তীকারে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। বছর কয়েক আগে এটি শরিয়ত উল্লাহ্‌র নামে শরিয়তপুর জেলা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ১৮২৮ সালে বৃহত্তর বরিশাল ও বৃহত্তর ফরিদপুরের এই প্রতিবেশে জন্মলাভ করেন আরেকজন যুগমনীষী। ইনি হলেন উনিশ শতকের মধ্যপর্বের নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন, মুসলিম শিক্ষা আন্দোলন এবং নীলকর উচ্ছেদ আন্দোলনের অগ্রনায়ক নওয়াব মুহম্মদ আবদুল লতিফ। প্রণিধানযোগ্য, জাতিয় গণমুক্তি আন্দোলনের অপর দুই পুরোধা মুহসীনউদ্দিন দুদুমিয়া এবং শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হকও জন্মগ্রহণ করেন দক্ষিণ বাংলার নদীবহুল এই উর্বর কৃষি অঞ্চলে।

হাজী শরিয়ত উল্লাহ্‌র শৈশব অতিবাহিত হয় বাংলার স্বাধীন মুসলিম শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন শুরু হওয়ার ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালটিতে। ফলে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনির গভর্ণর ও মুর্শিদাবাদের ক্রীড়নক নবাবের দ্বৈতশাসনের কুফল, দিল্লীর সম্রাট শাহ্‌ আলমের কাছ থেকে মাত্র কয়েক লাখ মুদ্রার বিনিময়ে কোম্পানির দেওয়ানী লাভের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া, কোম্পানির কর্মচারীদের বিনাশুল্কে প্রাইভেট ব্যবসায় করার সুযোগ লাভের দরুন দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যে মারাত্মক অচলাবস্থা সৃষ্টি, প্রশাসন ক্ষেত্রে কোম্পানির অনুসৃত 'ডিভাইড্‌ অ্যান্ড রুল পলিসি'র দরুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ধানের দরুন মুসলিম জনমানসের নৈরাশ্যের পরিণাম প্রভৃতি ঘটনা ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলেন তিনি। পরিস্থিতির প্রচণ্ড অভিঘাতে এ সময় মুসলিম উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজে এক নিদারুণ ভাঙন শুরু হয়। কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ি শ্রেণী প্রায় নিঃশেষ হয়ে পড়ে।

এ সময়কার একটি চরম পরিণামসূচক ঘটনা হলো: সমাজে দু'টি নব্য উৎপীড়ক শ্রেণীর আবির্ভাব। এদের একটি ছিলো কোম্পানির স্থানীয় চাটুকার গোষ্ঠী। এদের অধিকাংশই কোম্পানির লাঠিয়াল সর্দার, কেরানী-মুৎসদ্দি কিংবা গোমস্তা হিসেবে কাজ করতো। শ্বেতাঙ্গ তোষনের বদৌলতে এরা বিরাট বিরাট চাকলার জমিদার হয়ে বসে এবং রাতরাতি 'রাজা-মহারাজা' বনে যায়। এমন কি, দস্যুদলপতিরাও এই সুযোগে জমিদার হয়ে 'মহারাজা' খেতাবে ভূষিত হয়। এর একটি বড়ো দৃষ্টান্ত হলো, দস্যুদলপতি দেবী সিং। কোম্পানির শাসন আমলের শুরুতেই দেবী সিং কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের ইজারাদারী লাভ করে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় দেবী সিংয়ের অত্যাচার উত্তর বংগের হাজার হাজার গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়েছিলো। ধনে-প্রাণে নিঃশেষ হয়ে পড়ে কৃষক শ্রেণী। দেবী সিংয়ের দস্যু এবং বরকন্দাজদের ভয়ে তারা পাহাড় এবং বনে জংগলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীকালে এই লোকটি ডাকসাইটে জমিদার হয়ে 'রাজা উপাধিদারী' একটি কুলীন ভূস্বামীর বংশ প্রতিষ্ঠা করে।

www.nagorikpathagar.org

একই সময়ে শ্বেতাঙ্গদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হয় আরেকটি ভূস্বামী গোষ্ঠী। এরা 'নীলকর' নামে আমাদের ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছে। এদেশের নীল চাষের একচেটিয়া কর্তৃত্ব পেয়ে যায় এই বহিরাগত রাজার দল। গ্রামে গ্রামে নীলকুঠি নির্মাণ করে এরা কৃষকদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হয়ে দাঁড়ায়। নীরকরদের অনেকে আবার ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাও ভোগ করতো। ইউরোপে তখন নীলের খুব চাহিদা ছিলো। অগ্রিম দাদন বা পুঁজি দিয়ে এঁরা ধান এবং পাটের চাষ বন্ধ করে নীল চাষে বাধ্য করতো কৃষকদের। হাড়ভাঙা শ্রমের বিনিময়ে চাষীদের পানির দাম দিয়ে কোটি কোটি টাকা আয় করতো এরা ইউরোপের বাজারে নীল রফতানি করে। নীলচাষে অনিচ্ছুক কৃষকদের উপর এদের অত্যাচারের সীমা-পরিসীমা ছিলো না। সামান্য দোষ পেলেই কুঠির কয়েদখানায় হতভাগ্য নীলচাষীদের এরা আটক করে রাখতো। বন্দীদশায় অমানুষিক নির্যাতন চলতো চাষীদের ওপর। বহু কৃষক মৃত্যুবরণ করেছে নীলকুঠির ফাটকে। ফরিদপুর, পাবনা, ঢাকা, খুলনা, কুষ্টিয়া, এবং চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে ছিলো নীলকরদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। এ কারণেই বার বার নীলবিদ্রোহ হয়েছিলো এসব জেলায়।

তৃতীয় শোষক শ্রেণী মহাজনদের অস্তিত্ব আগে থেকেই ছিলো সমাজে। তবে ইংরেজ আমলেই বল্‌গাহীন হয়ে ওঠে এদের শোষণ এবং নির্যাতন। তার কারণ, এদের বিচারের ভার যাদের ওপর ছিলো সেই শ্বেতাঙ্গ শাসকরাই ছিলো এদের মুরুব্বী। উপরওয়ালা হিসেবে এই তিন স্তরের শোষক শ্রেণীকে অর্থাৎ জমিদার, মহাজন এবং স্বজাতের নীলকর গোষ্ঠীকে নির্বিচারে মদদ যোগায় ঔপনিবেশিক শাসকরা। বাংলাদেশের কৃষক এবং কৃষি অর্থনীতি ছিলো এদের শোষণ আর লুটপাটের মৃগয়াক্ষেত্র। ভাগাড়ের শকুনের মতো এরা কুরে কুরে খেতে শুরু করলো কৃষকের কঙ্কালসার দেহের মাংস পিণ্ড। ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার মাত্র এক যুগের ব্যবধানে জেরবার হয়ে পড়লো দেশের তাবৎ কৃষক সমাজ। জমিদারের চৌদ্দ রকমের খাজনার আঘাতে, নীলকরদের অমানুষিক নির্যাতনে, মহাজনের দেনার চাপে এবং এরও পর ইংরেজ শাসকদের জুলুমে ছিন্নমূল হলো লাখ লাখ কৃষক। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের বিভীষিকাময় মন্বন্তর (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর- বাংলা ১১৭৬ সন) ইংরেজ এবং তাদের এই ক্রীড়নক গোষ্ঠীর সর্বাগ্রাসী শোষণেরই নিষ্ঠুর ফলশ্রুতি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিলো তখন তিন কোটি। এর মধ্যে দুর্ভিক্ষে মরলো এক কোটি লোক। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে কিংবা মুঘল শাসন যুগে এ রকম অরাজক অবস্থার কথা কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতো না।

হাজী শরিয়ত উল্লাহ্‌র শৈশবে ঘটে ছিয়াত্তরের এই ভয়াবহ মন্বন্তর। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর মন বিষিয়ে ওঠে শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। তিনি বুঝতে পারলেন, এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ ছাড়া দেশ-সমাজ এবং জাতির মুক্তি নেই। উচ্চ শিক্ষা উপলক্ষে কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং মক্কায় অবস্থানকালে ইসলামের বিপ্লবী চিন্তানায়কদের সংস্পর্শে আসেন তিনি। ওহাবী সংস্কারকদের সাথেও ঘটে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। ১৮২০ সালে দেশে ফিরে আসার পর ফরায়েজী আন্দোলনের (পীরপূজা-কবরপূজাবিরোধী ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন) পাশাপাশি তিনি শুরু করলেন জমিদার মহাজন এবং নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক কৃষক বিদ্রোহ।

www.nagorikpathagar.org

ক্রমান্বয়ে তাঁর এ আন্দোলন এবং বিদ্রোহ ব্রিটিশবিরোধী মুক্তি সংগ্রামের রূপ নিতে লাগলো। কেননা, তিনি ফতোয়া দিয়ে ঘোষণা করলেন: 'এদেশ শত্রু কবলিত রাষ্ট্র। ইংরেজ ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অবৈধভাবে দেশ শাসন করছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে দেশকে স্বাধীন করা জনগণের একটি বৈধ অধিকার এবং এটি দেশবাসীর একটি পবিত্র দায়িত্ব।'

অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়েও ফতোয়া দিলেন শরিয়ত উল্লাহ্। বললেন: 'সমস্ত সম্পদ এবং জমির মালিক একমাত্র আল্লাহ্র। মানুষ কেবল তার জীবিকার প্রয়োজনে সুষমহারে ও অস্থায়ীভাবে ভূমি ব্যবহার করতে পারে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি বংশ পরম্পরায় ভোগ দখলের অধিকার কারও নেই। মালিক সেজে জমির উপর কর ধার্য করাও সম্পূর্ণ অবৈধ।'

তাঁর ঘোষণা থেকেই প্রথম সূত্রপাত হয়েছিলো জমিদারী উচ্ছেদ আন্দোলনের। স্মরণ রাখা দরকার, ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা বলবৎ হওয়ার দরুন রাতারাতি এদেশের ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। নতুন এই ভূমি ব্যবস্থায় ইংরেজরা ছিলো সর্বোচ্চ স্তরের প্রভু আর জমিদার শ্রেণী ছিলো মধ্যস্তরের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। সর্বনিম্ন স্তরে ছিলো দরিদ্র কৃষক সাধারণ। তাদের কাছে থেকে জমি কেড়ে নিয়ে চিরস্থায়ী মালিকে পরিণত করা হয়েছিলো মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারদের। উপমহাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম আমাদের কৃষক সমাজ মধ্যযুগীয় ইউরোপের 'ভূমিদাস' শ্রেণীর পর্যায়ে নেমে এলো।

শরিয়ত উল্লাহর সময়ে মুসলমান কৃষক সমাজ ইসলামের একত্ববাদী আদর্শের পরিপন্থী কবরপূজা, পীরপূজা এবং নানারকম কুসংস্কারের আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। তিনি এসব গর্হিত কাজ-ত্যাগ করে ইসলামের অবশ্য পালনীয় নীতি তথা 'ফরযসমূহ' প্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার শুরু করেন। এ কারণেই তাঁর আন্দোলন 'ফারায়েজী আন্দোলন' নামে পরিচিত। একই সংগে তিনি ইংরেজ শাসিত এদেশকে শত্রু কবলিত রাষ্ট্র তথা 'দারুল হরব' বলে ঘোষণা করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ বা সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনও একটি 'ফরয'। তাঁর ঘোষিত নীতিসমূহের এটি ছিলো অন্যতম।

শরিয়ত উল্লাহ্ গ্রামে গ্রামে ঘুরে, সারাদেশে সভা-সমিতির আয়োজন করে সংগঠিত করলেন ফরায়েজী আন্দোলন। অল্পকালের মধ্যেই এ আন্দোলন সেকালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের এক সর্বব্যাপী গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিলো। ইংরেজ ঐতিহাসিক জেম্স ওয়াইজ-এর ভাষায় : 'হাজী শরিয়তউল্লাহ্ ছিলেন দরিদ্র কৃষকদের বিশ্বস্ত বন্ধু নেতা ও পথপ্রদর্শক। কৃষকদের যে-কোনো বিপদে তিনি তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। এই দরিদ্র জনগণ তাঁকে তাদের পিতার মতো সম্মান করতো।'

শরিয়ত উল্লাহর নেতৃত্বে মুসলমান কৃষক সমাজ একদিকে যেমন কায়েমী স্বার্থবাদী ধর্মব্যবসায়িদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলো, অন্যদিকে তেমনি সংঘবদ্ধ হয়েছিলো জমিদার-মহাজন এবং নীলকরদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। ফলে, এসব ক'টি দলই একযোগে তাঁকে উৎখাত করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠে। 'ওয়াহাবী ধর্মদ্রোহী'

www.nagorikpathagar.org

আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয় গোঁড়াপন্থীদের। ঢাকার নয়াবাড়ির হিন্দু জমিদার এবং মুসলমান জোতদাররাও এই এলাকার জমিদার-জোতদারদের জোট গড়ে তুলেছিলো। শেষ পর্যন্ত এদের চক্রান্ত নয়া বাড়ি থেকে তাঁকে বিতাড়িত হতে হয়। এরপর ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর এবং বগুড়ায় শুরু হয় তাঁর আন্দোলন। একইভাবে উপনিবেশবাদী শাসকদের সহায়তায় কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র তাঁকে বহিষ্কার করে বিভিন্ন স্থান থেকে । তাঁকে 'বিপজ্জনক ব্যক্তি' বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু প্রতি পক্ষের প্রবল বাধার মুখেও শরিয়ত উল্লাহ্ ছিলেন পর্বতের মতো অটল। এদেশ থেকে শোষণ, উৎপীড়ণ এবং সমস্ত সামাজিক অসাম্য অনাচারের মুলোৎপাটন করে 'দারুল ইসলাম' কয়েম তথা ইসলামের বিশ্বাস, সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে বিরামহীনভাবে তিনি আন্দোলন চালিয়ে যান। ১৮৪০ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এ সংগ্রামে মুহূর্তের জন্যেও ভাটা পড়েনি। ১৮১৮ থেকে ১৮৪০ এই বাইশ বছর শরিয়ত উল্লাহ্ পলাশী যুদ্ধের গ্লানি মোচনের জন্যে লড়াই করেন ব্রিটিশরাজ এবং তাদের এ দেশীয় তাবেদার শিখদের বিরুদ্ধে। তাঁর এ প্রতিরোধ যুদ্ধে দরিদ্র মুসলিম জনগনের সাথে নিম্নবর্ণের নির্যাতিত হিন্দু কৃষক, তাঁতী, কলু এবং জেলে সম্প্রদায়ও যোগ দিয়েছিলো।

শরিয়ত উল্লাহ্র পর তাঁর পুত্র মুহসীনউদ্দিন দুদুমিয়া আরও শক্তহাতে তুলে নিলেন সংগ্রামের পতাকা। তিনি ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, খুলনা, পাবনা, চব্বিশ পরগণাসহ বিভিন্ন জেলার অত্যাচারী জমিদার ও শ্বেতাঙ্গ নীলকর শাসিত অঞ্চলে গড়ে তুললেন সুসংহত কৃষক সংগঠনের পাশাপাশি এক স্বাধীন গণশাসন ব্যবস্থা। এসব সংগঠনের প্রতিটি ইউনিটের দায়িত্বে থাকতেন তাঁর একজন প্রতিনিধি বা খলীফা। এই প্রতিনিধিদের কাজ ছিলো সর্বস্তরের জনশ্রেণীর মধ্যে 'দারুল ইসলামে'র আদর্শ প্রচার এবং জমিদার-মহাজন ও নীলকরদের অত্যাচার থেকে অসহায় মানুষকে রক্ষা করা। এই স্বাধীন সরকারের নিজস্ব বাহিনী এবং অর্থ- তহবিল ছিলো। গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা রাখা হতো। প্রয়োজনের সময় সংগৃহীত অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হতো জমিদারদের দ্বারা উৎপীড়িত কৃষক এবং অসহায় দুঃস্থদের। এছাড়া, জমিদার- মহাজনদের বিরুদ্ধে ইংরেজ আদালতে মামলার খরচও যোগানো হতো এই তহবিল থেকে। কৃষকদের মধ্য থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাঠিয়ালদের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল প্রতিটি অঞ্চলে দুদুমিয়ার স্বাধীন গণসরকারের বাহিনী। জমিদার, নীলকরদের লাঠিয়াল এবং পাইক-বরকন্দাজ বাহিনী যখন অন্যায় কর আদায়ের জন্যে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের ওপর চড়াও হতো, এই গণ-ফৌজ তখন তাদের মুকাবিলা করতো। প্রায় সর্বত্র এই কৃষক বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়েছে জমিদার-নীলকরদের লাঠিয়াল বাহিনী।

দুদুমিয়ার নির্দেশে মুসলমান কৃষকগণ হিন্দু জমিদারদের আরোপিত দুর্গাপূজার কর, দোল উৎসব কর এবং আরও দশ-বারো রকমের অবৈধ কর দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিলো। জমিদারদের খাজনা দেয়াও তারা বন্ধ করে দেয়। দুদুমিয়া এক বৈপ্লবিক ভূমি নীতি ঘোষণা করেন। এতে বলা হয় : 'পৃথিবীর সমস্ত ভূমি এবং সম্পদের মালিক একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্। আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে সকল মানুষই ভূমি থেকে সমান ফায়দা পাবে। অন্যকে বঞ্চিত করে ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বংশ পরম্পরায় ভূমি দখল করে রাখবার অধিকার কারও নেই।'

www.nagorikpathagar.org

এ ঘোষণার ফলে কৃষকদের মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি হয়। মহাজনদের ঋণের টাকা পরিশোধও তারা বন্ধ করে দেয়। বন্ধ হয় জমিদারের খাজনা। ফরিদপুরের নানা স্থানে ঘটে কৃষক অভ্যুত্থান। ১৮৩৮ সালে ফরিদপুরের বিদ্রোহী কৃষকদের দমনের জন্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার ঢাকা থেকে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলো। ১৮৪৬ সালে দুদুমিয়ার কৃষক ফৌজ পাঁচ চরের নীল কুঠি ধূলিস্যাৎ করে দেয়। এই কুঠির ইংরেজ ম্যানেজার ডানলপ স্থানীয় কৃষকদের ওপর বছরের পর বছর ধরে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যায়। কুঠি ধ্বংস করে এরই প্রতিশোধ নেয় কৃষক বাহিনী। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেনাদল পাঠিয়ে গোটা এলাকায় বিভীষিকা সৃষ্টি করে। ১৮৪৭ সালে বাষট্টি জন নেতৃস্থানীয় সহচরসহ দুদুমিয়াকে গ্রেফতার করা হয় এবং দীর্ঘকাল ধরে চলে তার বিরুদ্ধে মামলা। নীলকর ডানলপের বিরুদ্ধে কৃষক হত্যা, কৃষকের সম্পত্তি জবরদখল, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি জঘন্য অপরাদের প্রামাণ্য দলিল আদালতে উপস্থাপন করলেও ইংরেজ বিচারকগণ সেসব অগ্রাহ্য করে দুদুমিয়া এবং তাঁর অনুগামীদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ড দান করে। অবশ্য, উচ্চতর আদালতে তাঁরা সবাই মুক্তিলাভ করেন। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা বিপ্লবের সময় তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত ইংরেজ শাসকরা তাঁকে কলিকাতায় কারারুদ্ধ করে রাখে। ১৮৬২ সালে ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কৃষক বিপ্লবের অগ্রনায়ক স্বাধীনতা যুদ্ধের এই মহান সেনানী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিলো মাত্র তেতাল্লিশ বছর।

'বাঁশের কেল্লা'র স্বাধীনতা যোদ্ধা নিসার আলী তিতুমীর ছিলেন শরিয়তউল্লাহ্‌র সমসাময়িক। এঁরা দু'জনই আরবের ধর্মসংস্কারক মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বালাকোটের স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী এঁদের দু'জনের উপরই ফেলেছিলেন সমান প্রভাব। হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় অবস্থান কালে সৈয়দ আহ্‌মদের সাথে তিতুমীরের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। ১৮২১ সালে দ্বিতীয়বার তাঁদের দু'জনের দেখা হয় কলিকাতায়। সৈয়দ আহমদ এ সময় ব্যাপকভাবে বাংলাদেশ সফর করে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের বাণী প্রচার করেন। বাংলাদেশে মুজাহিদ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এখান থেকেই। তিতুমীর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে হাজী শরিয়ত উল্লাহ্‌র মতোই শুরু করেন ধর্মসংস্কার আন্দোলন। চব্বিশ পরগণা জেলা ছিলো তাঁর আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। এই জেলায় কৃষকদের পর বিশেষ করে দরিদ্র মুসলমান প্রজাদের উপর জমিদার কৃষ্ণদের রায়ের অত্যাচার মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। এই উৎপীড়ক জমিদার তিতুমীরের অনুসারী মুসলমান প্রজাদের দাড়ির উপর আড়াই টাকা হারে ট্যাক্স ধার্য করেন। নারিকেলবাড়িয়ার নিকটবর্তী একটি গ্রামের মুসলমানদের কাছ থেকে যথারীতি এই ট্যাক্স আদায়ও করা হয়। অন্য একটি গ্রাম থেকে এই 'দাড়ির খাজনা' আদায় করার জন্যে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তিন-চারশ' লাঠিয়ালের একটি বাহিনী নিয়ে চড়াও হলে তিতুমীরের অনুগামী কৃষকগণ তাদের প্রবলভাবে বাধা দেয়। জামিদার পালিয়ে গিয়ে তিতুমীরের বিরুদ্ধে আশে-পাশের জমিদার ও নীলকরদের একটি শক্তিশালী সংঘ গড়ে তোলে। ইংরেজ শাসকরাও এদের মদদ দিতে এগিয়ে আসে। কেননা, তিতু সুদ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং জমিদারদের

www.nagorikpathagar.org

খাজনা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশের সাথে সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। তিতু ইংরেজশাসিত এদেশকে 'শত্রুকবলিত রাষ্ট্র' (দারুল হরব্) বলে ঘোষণা করেন এবং এই উপনিবেশবাদী শক্তিকে উৎখাত করে ইসলামী ন্যায়বিচার ভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে গড়ে তোলেন একটি গণফৌজ।

তিতুমীরের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত এই গণফৌজে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা ছিলো প্রায় এক হাজার । এরা লাঠি চালনা, তীর-সড়কি ও বল্লম বর্ষণ এবং তরবারি চালনায় সুদক্ষ ছিলো। এছাড়া কুস্তি এবং মল্লযুদ্ধেও এরা ছিলো নিপুণ। রাইফেল কিংবা তখনকার দিনের অন্য কোনো আধুনিক হাতিয়ার এদের ছিলো না। সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত দেশীয় অস্ত্র নিয়েই এই ফৌজ জমিদার-নীলকরদের সম্মিলিত বাহিনী এবং আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত ব্রিটিশ সেনাদের মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলো। দেশীয় অস্ত্র গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধের জন্যেই ছিলো মোটামুটি কার্যকর। যেমন মজনু শাহ্'র ফকির সেনাদল এসব অস্ত্রের সাহায্যে দীর্ঘকাল গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে বগুড়া, রংপুর এবং ময়মনসিংহ-শেরপুরের পার্বত্য অঞ্চলে ব্রিটিশ ফৌজকে কোণঠাসা করে রেখেছিলো। তিতুমীর কেন দেশীয় অস্ত্রসজ্জিত তাঁর ক্ষুদ্র সেনাদল নিয়ে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ ফৌজের সাথে সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা ঐতিহাসিকদের কাছে অভাবনীয় ঘটনা বলে মনে হয়েছে। তবে অনেকের মতে, তিনি একটি ব্যাপক যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর এই প্রস্তুতির কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁকে গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে বসে ইংরেজরা। বাঁশের কেল্লায় তিতুর গণফৌজের পরাজয়ের কারণ ইংরেজদের এই অতর্কিত আক্রমণ।

ইংরেজদের সাথে সাথে সরাসরি যুদ্ধের আগে তিতুমীর একটি স্বাধীন সরকার গঠন করেছিলেন। একটি মন্ত্রিসভার তত্ত্বাবধানে তাঁর এই সরকার পরিচালিত হচ্ছিলো। প্রতিরক্ষা, রাজস্ব, কৃষি, যোগাযোগ প্রভৃতি দফতরের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো একেকজন মন্ত্রীর ওপর। মঈনুদ্দিন নামক স্থানীয় তাঁতী সম্প্রদায়ের একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন এই স্বাধীন সরকারের প্রধান মন্ত্রী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং গণফৌজের প্রধান সেনাপতি ছিলেন সৈয়দ গোলাম মাসুম। এছাড়া বিভিন্ন দফতর ও বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন আরও কিছু মন্ত্রী এবং কর্মচারী। তিতুমীর হলেন এই স্বাধীন সরকারের প্রধান তথা খলীফা। বারাসত, চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে স্বাধীন বাদশাহ্ বলতো। এই অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান কৃষকদের প্রায় সকলে তাঁকে তাদের অবিসংবাদী নেতা হিসেব মেনে নেয় এবং স্বাধীন শাসক হিসেবে তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করেন।

এক ফরমানের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে কর প্রদান এবং জমিদারদের খাজনা দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন তিতু। এই ঘোষণায় বলা হয়: চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা ক্ষমতাদখলকারী বহিরাগত ইংরেজদের এদেশ শাসনের আইনসংগত অধিকার নেই। তাদের শাসন সম্পূর্ণ অবৈধ। সুতরাং তাদের কর প্রদান একটি গর্হিত কাজ। তাঁর স্বাধীন সরকারকে রাজস্ব প্রদানের জন্যে তিনি স্থানীয় জমিদারদের নির্দেশ দেন। জমিদাররা এই নির্দেশ পালনের ভয়ে আত্মগোপন করে। তবে কৃষক ও সাধারণ জনমানুষ স্বাধীন সরকারের তহবিলে খাজনা জমা দিতে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

সামন্তবাদবিরোধী সংগ্রাম

তিতুমীরের গণফৌজ প্রথমে মুসলমানদের দাড়ির ওপর ট্যাক্স ধার্যের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়। কুখ্যাত প্রজাপীড়ক জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের সংগে একত্র হয়ে আরও কয়েকজন হিন্দু জমিদারও মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের লাঠিয়াল বাহিনীর সাহায্যে জোরপূর্বক 'দাড়ির খাজনা' আদায় করেছিলো। ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা খর্নটন-এর ভাষায়: 'মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে দাড়ির খাজনা আদায়ের এই অপকৌশল সাধারণভাবে মুসলিম জনগণকে বহুগুণে ক্রুদ্ধ এবং বিক্ষুব্ধ করে তোলে। কেননা, এটা ছিলো তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং ধর্মীয় অঙ্গীকার ও অনুশাসনের উপর এক ন্যাক্কারজনক হস্তক্ষেপ।' অত্যাচারী এই জমিদার গোষ্ঠী স্থানীয় মুসলমানদের মসজিদ এবং বাড়িঘরেও অগ্নিসংযোগ করেছিলো। আদালতে অভিযোগ দায়ের করেও এর বিচার পাওয়া যায়নি।

তিতুমীর এবং তাঁর অনুগামীদের ধ্বংস করার জন্যে কৃষ্ণদেবের সাথে একত্র হন গোবরডাংগার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতার পরাক্রশমালী জমিদার লাটবাবু, গোবর-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় ও মোল্লাহাটির নীলকুঠির ম্যানেজার ডেভিস সাহেব। ১৮৩০ সালের প্রথম দিকে শ্বেতাঙ্গ নীলকর ও জমিদারদের এক বিরাট বাহিনী বন্দুক ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তিতুমীরের গণবাহিনীকে আক্রমণ করে। কিন্তু এরা গণফৌজের হাতে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নীলকর ও জমিদারগণ তিতুমীরকে দমনের জন্যে সামরিক সাহায্য চেয়ে বাংলার গভর্ণরের কাছে দরখাস্ত করেন।

গভর্নরের নির্দেশে কলিকাতা থেকে একটি সেনাদল পাঠানো হয় যশোরে। এদের সাথে রাইফেলধারী স্থানীয় পুলিশ এবং বিপুল সংখ্যক বরকন্দাজ যোগ দেয়। এই বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হলো যশোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. আলেকজান্ডারকে। তিতুমীর আগেই ইংরেজদের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ পেয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ১৮৩০ সালের ১৫ নভেম্বর ইংরেজ সেনাদল নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে ঢুকতেই তিতুমীরের গণফৌজ তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। যুদ্ধে বহু ইংরেজ সৈন্য হতাহত হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. আলেকজান্ডার দ্রুত ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে গিয়ে কোনোমতে প্রাণ রক্ষা করেন। পরপর দু'টি যুদ্ধে জয়লাভের ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আস্থা এবং মনোবল বেড়ে যায়। গ্রামের হাজার হাজার লোক তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং তাঁর মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করে।

তিতুমীর আরবের মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের মতাদর্শ অনুসারে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। হাজী শরিয়ত উল্লাহ্‌র মতো তিনিও পীর পূজা, কবর পূজা ইত্যাদির ঘোরবিরোধী ছিলেন। মুসলমানরা তখন লুংগি পায়জামা ছেড়ে ধুতি পরতে শুরু করেছিলো। তিনি পুনরায় সমাজে লুংগি পায়জামা চালু করেন। প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে সংক্রান্তি এবং দোল পূজার মতো বেশ কিছু পূজা-পার্বনের রেওয়াজও প্রচলিত হয়ে পড়েছিল। তিনি এসব বন্ধ করে ব্যাপক পর্যায়ে সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ কারণে ইংরেজ, জমিদারগোষ্ঠী এবং ধনী মুসলমানগণ তাঁর

www.nagorikpathagar.org

অনুগামীদের 'ওয়াহাবী সম্প্রদায়' বলে অভিহিত করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলারও চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে, তিতুর অনুগামিগণ ছিলেন সর্বপ্রকারের কুসংস্কার ও সামাজিক, অর্থনৈতিক শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে। তাঁরা জিহাদ তথা সংগ্রামের মাধ্যমে ইংরেজের দাসত্বের শৃঙ্খল মোচন করে দেশ এবং দেশের গণমানুষকে মানসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পরিপূর্ণ স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। তিতুমীরের নীতি ও কর্মসূচি থেকেই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। কেননা, তিনি উৎপীড়ক মুসলমান ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধেও একইভাবে সংগ্রাম করেছিলেন। ইংরেজ, তাদের তাবেদার জমিদার-মহাজন শ্রেণী, অত্যাচারী নীলকর এবং সর্বস্তরের স্বার্থবাদীচক্র এ কারণেই তিতুর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছিলো। তাদের ভয় ছিলো, মুজাহিদদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকলে কৃষক শ্রেণীসহ সমস্ত শোষিত-বঞ্চিত জনগোষ্ঠী তিতুমীরের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং এর ফলে সামজে শুরু হবে এক সর্বাত্মক বিপ্লব। তিতুর গণফৌজ ইতিমধ্যেই যশোর, খুলনা, চব্বিশ পরগণা এবং নদীয়া থেকে নীলকরদের উৎখাত করে তাদের অনেকগুলো কুঠি দখল করে নিয়েছিলো। জমিদারদেরও অনেকে গণফৌজের ভয়ে কলিকাতায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। এ অবস্থায় ইংরেজ শাসকগণ রীতিমতো আতংকিত হয়ে পড়ে।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিংক নারিকেলবাড়িয়ায় তিতুমীরের স্বাধীন সরকারের সদর দফতর আক্রমণ করে মুজাহিদদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে নদীয়ার কালেক্টর ও জেলা জজকে নির্দেশ দিলেন। তাঁদের সাহায্যে কলিকাতা থেকে একটি শক্তিশালী সেনাদলও পাঠানো হলো নদীয়া এবং কলিকাতার জমিদারগণ তাদের লাঠিয়াল দল ও কয়েকটি হাতি দিয়ে সরকারি ফৌজের শক্তি বৃদ্ধি করলেন। বাঘারিয়ার পরিত্যক্ত নীলকুঠিতে ঘাঁটি স্থাপন করলো ইংরেজ ফৌজ। রাইফেলের বেপরোয়া গুলি বর্ষণের মুখেও মুজাহিদ বাহিনী চারদিক থেকে ইংরেজ ফৌজকে আক্রমণ করে কাবু করে ফেলে। এ যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের বহু সেনা হতহত হলো। একটি হাতি এবং বেশ কিছু রাইফেল মুজাহিদদের হাতে আসে। ইংরেজের সাথে মুজাহিদদের একটানা বিজয় কৃষক শ্রেণী এবং সমাজের উচ্চস্তরেও এ সময় ব্যাপক অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। স্থানীয় গ্রামগুলোর প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং ভূষণার তরুণ জমিদার মনোহর রায় তিতুর দলে যোগদান করেন। এঁদের বিশ্বাস ছিলো ব্রিটিশকে উৎখাত করে মুজাহিদ বাহিনী দেশকে দ্রুত স্বাধীন করতে পারবে।

বাঁশের কেল্লার যুদ্ধ : সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়

কিন্তু ইংরেজরা তার আগেই মুজাহিদদের ধ্বংস করবার জন্যে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়। বাঘারিয়ার যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর সর্বশেষ পরাজয়ের পর তিতুমীর যাতে আরেকটি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ না পান, সেদিকে নজর রেখে গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিংক তড়িঘড়ি একজন কর্নেলের নেতৃত্বে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে গোলন্দাজ সৈন্যসহ বিশাল একটি বাহিনী পাঠালেন নারিকেলবাড়িয়ায়। এদের সাথে ছিলো দু'টি ভারি কামান। এই ফৌজে গোরা সৈন্যর সাংখ্যা ছিলো বিপুল। এছাড়া ছিলো কয়েক প্লাটুন দেশীয় সৈন্য। সন্ধ্যার দিকে অতর্কিত এসে ইংরেজ বাহিনী গোটা নারিকেলবাড়িয়া গ্রামটি ঘিরে ফেলে। তিতুমীর আগের থেকেই তাঁর ফৌজের ছাউনি

www.nagorikpathagar.org

হিসেবে বাঁশের প্রাচীর দিয়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করে রেখেছিলেন। এখানে মওজুদ থাকতো মুজাহিদদের রসদ, অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। স্বাধীন সরকারে প্রতিরক্ষা বিষয়ক আলোচনা সভাও বসতো এখানে। ইতিহাসে এটি 'তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা' নামে খ্যাত। আশ-পাশের গ্রাম থেকে বাঁশের ঝাড় কেটে অত্যন্ত নিপুণ হাতে তৈরি করা হয়েছিলো দুর্গটি।

মুজাহিদ বাহিনী বাঁশের কেল্লার অভ্যন্তরে অবস্থান নিয়ে রাতের অন্ধকারে ইংরেজ ফৌজের ওপর ইট, বেল এবং তীর বর্ষণ করতে শুরু করে। আক্রমণে বহু সৈন্য আহত হওয়ায় ইংরেজ বাহিনী পিছু হটে যায়। ১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর ভোরবেলা ব্রিটিশ সেনাপতি স্বয়ং ঘোড়ায় চেপে দুর্গের ফটকের সামনে এলেন এবং গভর্নর জেনারেল-এর নামে তিতুমীরকে তাঁর কাছে সদলবলে আত্মসমর্পণ করতে বললেন। দু'বার তিনি উচ্চকণ্ঠে গভর্ণর জেনারেলের পরোয়ানা পাঠ বললেন। দুর্গের ভেতর থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি তার সেনাদলের কাছে ফিরে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ চারদিক থেকে দুর্গ ঘেরাও করে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। ইংরেজ ফৌজ সামনে অগ্রসর হওয়া মাত্রই মুজাহিদ বাহিনী দুর্গের ভেতর থেকে বৃষ্টিধারার মতো তীর বর্ষণ করে তাদের ঘায়েল করতে লাগলো। রাইফেল থেকে একটানা গুলিবর্ষণ করেও তারা সুবিধা করতে পারলো না। তীরের আঘাতে আহত হলো বহু সৈন্য। ইংরেজ সেনাপতি ক্ষিপ্ত হয়ে কামানের গোলা বর্ষণের নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ ইংরেজরা তীরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলো কামান। এমন অসম যুদ্ধের নজির ইতিহাসে বোধকরি বিরল।

ভারি কামানের গোলার মুখে বাঁশের কেল্লার প্রতিরোধ স্বাভাবিক কারণেই বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না। কামানের একটানা গোলার আঘাতে ভূমিস্যাৎ হয়ে গেলো কেল্লা। একটি গোলায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে শহীদ হলেন স্বাধীনতার মহান সেনানী নিসার আলী তিতুমীর। তাঁর একজন অনুগামীও কিন্তু বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলেন না।

এই ঘটনাটি থেকেই বুঝাতে পারা যায়, এই মুক্তিযোদ্ধাগণ কতখানি অনুগত ছিলেন তাঁদের নেতার প্রতি এবং কতটা নিবেদিত ছিলেন তাঁদের আদর্শে। বাঁশের কেল্লার পতনের পর ইংরেজরা এই বিধ্বস্ত দুর্গের সামনেই ফাঁসী দেয় তিতুমীরের সেনাপতি সৈয়দ গোলাম মাসুমকে। এছাড়া, মুক্তিবাহিনীর একচল্লিশ জন নেতা ও সৈনিককে দ্বীপান্তরসহ বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিলো। বালাকোট যুদ্ধের শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর লাশের মতো তিতুমীরের লাশটিকেও গুম করে ফেলেছিলো ইংরেজরা। তাদের ভয় ছিলো, তাঁকে সমাধিস্ত করা হলে তাঁর কবরকে ঘিরে নতুন করে জ্বলে উঠতে পারে বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের আগুন।

১৮৩১ সালে বারাসত বিদ্রোহের অবসান এবং তিতুমীরের পতন ঘটলেও স্বাধীনতা যুদ্ধের মশাল কিন্তু নির্বাপিত হয়নি। মুজাহিদগণ নতুন করে সংঘবদ্ধ হলেন ফরায়েজী আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামের নেতা মুহসীনউদ্দীন দুদুমিয়ার নেতৃত্বে। ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি জ্বালিয়ে রাখেন সংগ্রামের মশাল। এই নেতাকেও জমিদার, নীলকর এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিলো

www.nagorikpathagar.org

একাধিকবার। ১৮৪৬ সালে ফরিদপুরের পাঁচচরের যুদ্ধে দুদুমিয়ার কৃষক বাহিনীর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় প্রতিপক্ষের সম্মিলিত ফৌজ। ১৮৩৮ এবং ১৮৪৪ সালে আরও দুটি যুদ্ধে সশস্ত্র কৃষক বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয় জমিদার ও নীলকরদের সাহায্যে ঢাকা থেকে প্রেরিত ব্রিটিশ সেনাদল। ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা বিপ্লবের সময় দুদুমিয়াকে কারারুদ্ধ করে কৃষক বিদ্রোহকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে ইংরেজ শসকগণ।

আঠারশ' সাতান্নর স্বাধীনতা বিপ্লব

পলাশী যুদ্ধের ঠিক এক শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে সংঘটিত হয় আঠারোশ' সাতান্নর মহাবিপ্লব তথা সিপাহী-জনতার স্বাধীনতা যুদ্ধ। এখানে প্রণিধানযোগ্য, ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রহসন যুদ্ধে সিরাজউদ্‌দৌলার পতনের পর বাংলাদেশেই প্রথম অস্তমিত হয় স্বাধীনতার সূর্য এবং ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সূচনাও হয় এই ভূখণ্ডে। আবার এক শতাব্দী পর, ১৮৫৭ সালে, বাংলাদেশ থেকেই উপনিবেশবাদ-বিরোধী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে শুরু হয় স্বাধীনতার মহাসংগ্রাম। অর্থাৎ বাংলাদেশই সারা উপমহাদেশে জ্বালিয়ে দেয় বিপ্লবের দাবানল। এর সাক্ষাৎ কারণ হলো, ইংরেজ এবং তাদের পদলেহনকারী জমিদার-মহাজনদের শোষণ-নির্যাতনে সব থেকে বেশি নিষ্পেষিত হয়েছিল বাংলাদেশের জনসাধারণ। তাছাড়া, এ অঞ্চলের কৃষক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনশ্রেণী স্বাধীনতা হারানোর পর প্রায় পাইকারীভাবে নির্যাতিত হয়েছিলো ব্রিটিশ শাসক ও তাদের কৃপাপুষ্ট নব্য রাজা-মহারাজা আর ধনপতিদের হাতে। আমরা লক্ষ্য করবো, পলাশী যুদ্ধ-পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্ন ছিলো ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহ, সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতা-বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছর বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও ইংরেজদের মুকাবিলা করতে হয়েছে, তাদের শাসন এবং শোষণে জর্জরিত বিদ্রোহীদের সাথে। ঐতিহাসিক কারণেই এখানকার রক্তরঞ্জিত বিক্ষুব্ধ এবং উত্তপ্ত মাটি একটি মহাবিপ্লবের সূতিকাগার হওয়ার জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলো। এখানে আরো স্মরণ রাখা দরকার, সাতান্নর স্বাধীনতা বিপ্লবের শক্তির উৎসমূল ছিলো উৎপীড়িত কৃষক সমাজ এবং সাধারণ জনশ্রেণী। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সিপাহীদের আগে কৃষকরা শুরু করেছিলো বিদ্রোহ।

স্যার সৈয়দের বিশ্লেষণ

স্বাধীনতা বিপ্লবের অন্তর্নিহিত কার্যকারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমকালীন যুগের মনীষী স্যার সৈয়দ আহমদ একটি বাস্তব সত্য উদ্‌ঘাটিত করেন। তিনি তাঁর একটি গ্রন্থে লিখেছেন : 'যারা শাসিত এবং শোষিত, যাদের হারাবার মতো কিছুই ছিলো না, সেই দরিদ্র জনশ্রেণীই বিদ্রোহ করেছিলো দেশীয় রাজারা নয়।'

ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল আউট রামও প্রায় এই অভিমতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক লিখিত বিবরণে তিনি উল্লেখ করেন : "অযোধ্যার প্রভাবশালী জমিদার শ্রেণী, ধনপতি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রায় সকলেই আমাদের অর্থাৎ ইংরেজদের শাসন কামনা করে।'

www.nagorikpathagar.org

ইংরেজ শাসন ও 'ঈশ্বরের আশীর্বাদ'

বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিপ্লবের সময় প্রতিবেশী সমাজের রাজা-মহারাজা গোষ্ঠী, ধনিক ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজদের সমর্থনের জন্যে রীতিমত প্রতিযোগিতার ধুম পড়ে যায়। এরা ইংরেজ শাসনকে 'ঈশ্বরের আশীর্বাদ' বলে ঘোষণা করে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তাদের প্রভুপ্রীতির চরম পরাকাষ্ঠা দেখায়। সাহিত্য-সম্রাট বলে খ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ইংরেজদের মনোরঞ্জনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। 'আনন্দমঠ' এবং 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে তিনি কৃষক বিদ্রোহের বিকৃত রূপ তুলে ধরেন এবং ইংরেজ শাসনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। সিরাজগঞ্জ কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিতে লিখিত মীর মশাররফ হোসেনের নাটক 'জমিদার দর্পণ'-এর প্রচার বন্ধ করার জন্যে তিনি ইংরেজদের কাছে ধর্ণা পর্যন্ত দিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কবি ঈশ্বরগুপ্ত –এমন কি ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত স্বাধীনতা বিপ্লবের সময় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন। এই সমাজের উপরতলার প্রায় কোনো লোকই বিপ্লবকে সমর্থন করেননি। বাংলাদেশে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন জনসাধারণ, কৃষক শ্রেণী, মুসলমান সমাজের শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে অধিকাংশ লোক এবং দেশীয় সিপাহীরা। ভারতের উত্তরাঞ্চলের দেশীয় রাজারা তাদের নিজস্ব স্বার্থেই বিপ্লবকে সমর্থন করেছিলেন।

একথা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য, পলাশী যুদ্ধের পর বাংলাদেশে এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী যেসব বিদ্রোহ, বিপ্লব, মুক্তিযুদ্ধ এবং কৃষক ও গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিলো তার অধিকাংশেরই নেতৃত্ব আসে মুসলিম সমাজের কাছ থেকে। এর সাথে অবশ্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষক, বিভিন্ন দরিদ্র পেশাজীবী শ্রেণী এবং ফকির– সন্ন্যাসী-বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিলো। এটি নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য দিক।

পূর্ববর্তী শতক : মজনু শাহ্‌র সংগ্রাম

এ প্রসংগে পূর্ববর্তী শতক তথা আঠারো শতক এবং সাতান্নর বিপ্লব-উত্তর যুগের ঘটনা প্রবাহ থেকে নজির তুলে ধরা যেতে পারে। আমরা জানি, পলাশী যুদ্ধের ছয় বছরের ব্যবধানে গোটা বাংলাদেশ এবং বিহারে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিলো 'ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের আখ্যায়িত এক সর্বাত্মক বিপ্লব। উনিশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত অনির্বাণ ছিলো ঐ বিপ্লবের (১৭৬৩-১৮০০) দাবানল। প্রায় চল্লিশ বছর স্থায়ী এ বিপ্লব ছিলো আসলে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শক্তি এবং তাদের ক্রীড়ানকদের বিরুদ্ধে আমাদের কৃষক সমাজ ও জনগণের এক ধারাবাহিক মুক্তিসংগ্রাম। এ সংগ্রামে মীরজাফরের প্রতি বিক্ষুব্ধ সিরাজউদ্‌দৌলার সেনাবাহিনীর বিতাড়িত সৈন্যরাও অংশগ্রহণ করেছিলো। সুদীর্ঘ এই মুক্তিসংগ্রামের শীর্ষ নেতা এবং প্রধান পরিচালক ছিলেন ফকির মজনু শাহ। তাঁর 'মাদারী সম্প্রদায়ভুক্ত' ফকিরগণই প্রথম বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। এই বিদ্রোহের নায়কদের মধ্যে শীর্ষস্থনীয় ছিলেন মজনু শাহ্‌র ভাই মুসা শাহ্, মজনুর প্রধান শিষ্য পরাগল শাহ্, চেরাগআলী শাহ্, রমজানী শাহ্, জহুরী শাহ্, আহ্‌মদ শাহ্ প্রমুখ। এছাড়া, বিশিষ্ট নেতাদর মধ্যে ছিলেন নিয়াজ শাহ্, বুদ্ধু শাহ্, সোবহান আলী, মতিউল্লাহ্ এবং আরও অনেকে।

www.nagorikpathagar.org

এই ফকির নেতাগণ কৃষক সমাজ এবং সমাজের নিম্নস্তরের হিন্দু-মুসলমান জনশ্রেণীকে সংগঠিত করে স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্যে বাংলাদেশ ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ সেনাদলের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝে তাঁরা গেরিলা যুদ্ধ-কৌশলেরও আশ্রয় নিয়েছিলেন। বেশিরভাগ যুদ্ধেই ফকির নেতৃবৃন্দ পরিচালিত মুক্তিবাহিনীর হাতে সম্পূর্ণ উৎখাত হয়ে যায় হামলাবাজ ব্রিটিশ ফৌজ। প্রাণ হারাতে হয় বহু ব্রিটিশ সমর সেনানায়ককে। মজনু শাহ্‌র বাহিনী ইংরেজ সমর্থক জমিদার শ্রেণী এবং জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি এলাকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠিয়ালদের কাছ থেকেও কর আদায় করেছিলো। তারা ইংরেজদের কর প্রদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে, উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো থেকে খাজনা আদায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কালেক্টরদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

এই গণবাহিনী যুদ্ধে তীর-ধনুক, তরবারি, বর্শা-বল্লমসহ নানা ধরনের দেশীয় অস্ত্রের পাশাপাশি বন্দুক ব্যবহার করতো। কোনো কোনো যুদ্ধে তারা কামানও ব্যবহার করেছে। গেরিলা যুদ্ধে এরা ছিলো সুদক্ষ। বিহারের বাংলাদেশ সংলগ্ন রাজমহল পর্বত, শেরপুর-ময়মনসিংহের গারো পাহাড় এলাকা, রংপুর- আসাম সীমান্তের গভীর অরণ্য, ঢাকার ভাওয়াল গড় এবং মধুপুরের জংগলে ছিলো এদের অসংখ্য ঘাঁটি। বগুড়ার মহাস্থান ছিলো মজনু শাহ্‌র সদর দফতর। ইংরেজদের বিভ্রান্ত করার জন্যে প্রায়ই তিনি আস্তানা পরিবর্তন করতেন এবং দুর্গম বিল-হাওর কিংবা অরণ্যপথে যাতায়াত করতেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং সংগঠন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন মজনু শাহ্। ইংরেজদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে একটি দুর্ভেদ্য সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন তিনি। দেশের দূরতম অঞ্চলের বিপ্লবী ঘাঁটিগুলোর সাথে ছিলো তাঁর নিবিড় সংযোগ। আশ্চর্যের বিষয়, ব্রিটিশ গুপ্তচর এবং এজেন্টরা বছরের পর পছর ধরে চেষ্টা করেও মজনু শাহ্‌র সন্ধান খুঁজে পায়নি। তাঁর আস্তানার সন্ধানেও তারা আগাগোড়া ব্যর্থ হয়েছে। মজনু শাহ্‌কে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস বহু হাজার মুদ্রার ইনাম ঘোষণা করেছিলেন। কৃষকদেরও নানাভাবে প্রলোভন দেখানো হয়েছিল তাঁকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে। কিন্তু এ ব্যাপারে টু-শব্দটি পর্যন্ত করেনি কৃষকগণ। এমন কি, স্থানীয় জমিদাররা পর্যন্ত মজনু শাহ্‌র গতিবিধির কথা প্রকাশ করতে সাহস পেতো না। তাদের ভয় ছিলো, মজনুর সেনাদল এ ব্যাপারে আভাস পেলে আর বাঁচোয়া থাকবে না। কৃষক শ্রেণী মজনুকে তাদের ত্রাণকর্তা বলে মনে করতো। তিনি সবরকম সাহায্য এবং সমর্থন পেয়েছিলেন এদের কাছ থেকে।

মজনু শাহ্‌র প্রতি তাঁর শিষ্য, অনুগামী এবং সমর্থকদের ছিলো অগাধ বিশ্বাস। তাঁর বেঁচে থাকাকালে তাঁর দলে কখনও বিরোধ দেখা দেয়নি। রামানন্দ গোঁসাই-এর নেতৃত্বে শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীরাও মজনু শাহ্‌র দলে যোগ দিয়েছিলো। তিনি ইংরেজ ও অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে এদের উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে টেনে এনেছিলেন। সন্ন্যাসীরা তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রথম দিকে ফকিরদের সাথে অনেকগুলো যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ঢাকার মসলিন-শিল্প কারিগরদের প্রতি ঢাকার কুঠিয়াল ও শ্বেতাঙ্গ বস্ত্র ব্যবসায়ীদের অকথ্য শোষণ এবং নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ১৭৬৩ সালে প্রথম

www.nagorikpathagar.org

ফকির সেনাদল ঢাকার সদরঘাটস্থ ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করেন। এখান থেকেই শুরু হয় মজনু শাহ্‌র দেশব্যাপী মুক্তি অভিযান। ঢাকায় ব্রিটিশবিরোধী অভিযানে ফকির বাহিনীর সাথে মুসলিম কারিগর এবং সন্ন্যাসী সেনারাও যোগ দিয়েছিলেন।

ফকির বাহিনীর আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে ঢাকার কুঠির শ্বেতাঙ্গ বণিকরা রাতের অন্ধকারে বুড়িগঙ্গা দিয়ে নৌকাযোগে পালিয়ে যায়। ফকির বাহিনী দীর্ঘদিন পর্যন্ত কুঠিটি দখল করে রাখে। তখন ক্লাইভ ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান পরিচালক। কুঠি থেকে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে তিনি ঢাকার কুঠিয়ালকে বরখাস্ত করেন। ১৭৬৬ সালে কোচবিহার সংলগ্ন দিনহাটায় ফকির সন্ন্যাসীদের একটি মিলিত বাহিনীর আক্রমণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায় ইংরেজ সেনাদল। ১৭৬৭ সালে বিহারের সারেংসি জেলায় দুটি যুদ্ধে ফকির বাহিনীর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় ব্রিটিশ ফৌজ। প্রথম যুদ্ধে আশিটি লাশ ফেলে পালিয়ে যায় ইংরেজরা। বিদ্রোহী ফকির বাহিনী স্থানীয় দুর্গটি দখল করে নেয়। জলপাইগুড়ি জেলায় ছিলো ফকির বাহিনীর একটি সুরক্ষিত মাটির দুর্গ। এখান থেকে অভিযান চালিয়ে ১৭৬৬ সালে তারা ইংরেজদের কয়েকটি ফৌজকে বিধ্বস্ত করে। ১৭৬৯ সালে নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন মোরাং অঞ্চলে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ইংরেজদের একটি বিরাট বাহিনীকে ধ্বংস করে দেয় ফকির বাহিনী। ইংরেজ সেনানায়ক লে. কেনেথ নিহত হন এ যুদ্ধে।

১৭৬৯-৭০ সালে শুরু হয় ছিয়াত্তরের সর্বনাশা মন্বন্তর। খাদ্যশস্য গুদামজাত করে এবং খাদ্যের ফটকাবাজারি করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকরা এ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিলো। এটা ইংরেজ ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেছেন। এ সময় নাটোরে ছিলো মজনু শাহ্‌র প্রধান কর্মকেন্দ্র। তাঁর ফকির সৈন্যরা ইংরেজদের কুঠি, গুদাম এবং জমিদারদের শস্যাগার লুট করে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত চাষীদের প্রাণরক্ষার চেষ্ট করে। ক্ষুধার্ত কৃষকরা দলে দলে মজনুর সেনাদলে যোগ দিতে শুরু করে। ১৭৭৩ সালে রংপুর জেলায় শুরু হয় ফকির বিদ্রোহীদের ব্যাপক তৎপরতা। ফকির বাহিনী গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে এখানকার এক জংগলে ইংরেজদের বিরাট একটি বাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়। এ জঙ্গল যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি টমাস নিহত হন গেরিলাদের হাতে।

উত্তরাঞ্চলে ফকির বাহিনীর হাতে বার বার মার খাওয়ার পর গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস্ বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংল্যান্ড থেকে নতুন সৈন্য এবং অস্ত্র আনতে বাধ্য হলেন। ময়মনসিংহের শেরপুর এবং জামালপুরের জাফর শাহী অঞ্চলে এ সময় মজনু শাহ্‌র বাহিনী ইংরেজ ফৌজকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। বিদ্রোহিরা তাদের কাছে স্থানীয় জমিদারদের খাজনা দিতে বাধ্য করে। একই সময় ভাওয়াল পরগণার অরণ্য এবং মধুপুর জংগলে ঘাঁটি স্থাপন করে ঢাকা জেলায় তৎপরতা শুরু করে মজনুর বাহিনী। ১৭৭৩ সালের মার্চ মাসে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড-এর নেতৃত্বে একটি ইংরেজ ফৌজ মজনুর বাহিনীকে অনুসরণ করে ভাওয়ালগড়ের দিকে অগ্রসর হলে ফকির সেনাদের অতর্কিত আক্রমণের মুখে পড়ে যায়। এই অরণ্য যুদ্ধে নিহত হন ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড। তাঁর সেনাদলের মাত্র বারোজন সৈন্য প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। এরপর খুলনা, যশোর এবং চব্বিশ পরগণায় ফকির বাহিনীর অভিযান শুরু হয়। এক কথায় বলা যায়: গোটা

www.nagorikpathagar.org

উত্তর বঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, ভাটি অঞ্চল, দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের এক সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ফকির সেনারা ইংরেজদের উৎখাতের জন্যে ব্যাপক মুক্তি অভিযান চালিয়েছিলো। তাঁরা হিমালয়, নেপাল ও ভুটানের অরণ্য অঞ্চলকে তাদের প্রাকৃতিক দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করে।

১৭৮৬ সাল পর্যন্ত ফকির ও গণবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মজনু শাহ্ অসাধারণ সাফল্যের সাথে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। ঐ বছর ময়মনসিংহ ও ঢাকায় কয়েকটি সফল অভিযানের পর তিনি বগুড়ায় ফিরে যান। তাঁর সাথে ছিলো পঁচিশ মুক্তি সেনা। এদিকে একদল ইংরেজ ফৌজ তাঁকে অনুসরণ করে অগ্রসর হচ্ছিলো। কালেশ্বর নামক এক গ্রামে ইংরেজ বাহিনী চারদিক থেকে মজনু শাহ্র সেনাদলকে ঘেরাও করে ফেললে দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মজনু তাঁর সেনাদল নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ইংরেজ ব্যূহ ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। জীবনে এই প্রথম তিনি শত্রুর অতর্কিত হামলার সম্মুখীন হলেন। কালেশ্বরের যুদ্ধে ইংরেজদের গুলির আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন মজনু। তাঁর সহযোদ্ধারা আহত অবস্থায় তাঁকে বিহারে ফকিরদের আস্তানায় নিয়ে যান। সেখানে মাখনপুর নামক একটি গ্রামে ১৭৮৬ সালের ডিসেম্বরে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের এই অমিততেজা অগ্নিপুরুষ।

মজনু শাহের সময়েই ফকির ও সন্ন্যাসীদের মধ্য ভুল বুঝাবুঝির দরুন একবার রক্তক্ষয়ী সংঘাত হয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিলো ১৭৭৭ সালে বগুড়ায়। নেতৃত্বের কোন্দল এবং ধর্মীয় বিরোধই ছিলো এ সংঘাতের মূল কারণ। প্রায় তিন বছর ধরে ফকির ও সন্ন্যাসীদের আস্তানায় আস্তানায় ঘুরে মজনু তাদের নতুন করে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত উভয় দলের মধ্যে জোড়াতালি দিয়ে ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হলেও তাঁর মৃত্যুর পর সন্ন্যাসীরা অর্থলোভে জমিদারদের স্বার্থরক্ষার কাজে নিয়োজিত হতে থাকে। কিছু দিনের মধ্যেই তারা সম্পূর্ণভাবে সংগ্রাম ও বিদ্রোহের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন রামানন্দ গোঁসাই, ভবানী পাঠক, কৃপানাথ, হাজারী সিং, যগুলগীর, ফটিক বড়ুয়া প্রমুখ। এঁদের মধ্যে দেবী চৌধুরাণী নামে একজন বিদ্রোহী নেত্রী ছিলেন। তিনি মজনু শাহ্র সহযোগী ভবানী পাঠকের শিষ্যা ছিলেন বলে জানা যায়। রংপুরের বৈকুণ্ঠের জংগলে ছিলো কৃপানাথের আস্তানা। ভবানী পাঠক ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষে নিহত হন। ১৭৮৯ সালের মধ্যেই সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহ ত্যাগ করে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

কিন্তু মুসা শাহ, চেরাগ আলী, সোবহান আলী, নিয়াজ শাহ্ প্রমুখ প্রভাবশালী ফকির নেতারা খ্রিষ্টীয় ১৮০০ সাল পর্যন্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে অব্যাহত রাখেন গণবিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ। ফকির সেনাদলকে কখনও নীতিভ্রষ্ট হতে কিংবা লোভের বশীভূত হতে দেখা যায়নি। স্বাধীনতাই ছিলো এঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এর জন্যই এদের সংগ্রাম ছিলো এতখানি তীব্র।

মজনু শাহ্র পরে পলাশী যুদ্ধ-পরবর্তী কৃষক বিদ্রোহ ও গণমুক্তি সংগ্রামের আর যেসব বীর নায়কের নাম প্রথমেই উচ্চারণ করতে হয়, তাঁরা হলেন ত্রিপুরায় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা শমশের গাজী, সন্দ্বীপের বিদ্রোহী আবু তোরাব, লক্ষ্মীপুর নোয়াখালীর লবণ চাষীদের নেতা নওয়াব আলী, রংপুর বিদ্রোহের নায়ক নূরুদ্দীন এবং ভোলা-শাহবাজপুরের সুবান্দিয়া বিদ্রোহের সংগঠক ফকির বোলাকি শাহ। বোলাকি শাহ ছিলেন একজন স্থানীয় দরবেশ।

www.nagorikpathagar.org

শমশের গাজীর স্বাধীন রাষ্ট্র এবং অন্যান্য বিদ্রোহ

শমশের গাজী ছিলেন ত্রিপুরার রওশনাবাদ তথা রোশনাবাদ পরগণার এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। কুস্তি এবং লাঠি খেলায় তাঁর জুড়ি ছিলো না। তাছাড়া অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন তিনি। স্থানীয় জমিদার নাসির মুহাম্মদের অধীনে কিছুকাল তিনি তহ্শীলদার হিসেবে কাজ করেন। জমিদার তাঁকে ছোট বোলায় তাঁর দরিদ্র পিতার কাছ থেকে ক্রীতদাস হিসেবে কিনে নিয়েছিলেন। ১৭৬১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ত্রিপুরার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। সিরাজ-উদ্দৌলার আমলে রোশনাবাদ চাকলার ভূমি রাজস্ব ছিলো মাত্র তেত্রিশ হাজার টাকা। বাংলার দেওয়ানি পাওয়ার পর কোম্পানি এক লাখ টাকা রাজস্ব ধার্য করে । এই বাড়তি রাজস্বের টাকা আদায়ের জন্যে স্থানীয় জমিদার ও তালুকদারগণ কৃষকদের ওপর শুরু করে অমানুষিক নির্যাতন। জমিদারের লাঠিয়াল সর্দার এবং বরকন্দাজদের অত্যাচারে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যেতে থাকে। কৃষকরা ভিটা-মাটি ছেড়ে ত্রিপুরার গভীর জংগলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ত্রিপুরার রাজা কৃষ্ণ মানিকের কর্মচারীদের উৎপীড়নও এ সময় চরমে উঠেছিল।

এই সমস্ত নির্যাতন নির্মূল করার লক্ষ্যে কৃষকদের নিয়ে এক বিরাট সেনাদল গঠন করেন শমশের গাজী। ত্রিপুরার জংগলে ঘাঁটি স্থাপন করে তিনি এদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি সুদক্ষ বাহিনীতে পরিণত করেন। ত্রিপুরার রাজের সেনাবাহিনী শমশের গাজীর এই কৃষক ফৌজের হাতে একাধিকবার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। শমশের ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর দখল করেন এবং গোটা পার্বত্য এলাকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেন। স্থানীয় জনগণের সাথে পার্বত্য উপজাতীয়রাও তাঁকে রাজা বলে স্বীকার করে নেয়। শমশের দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি বণ্টন করেন এবং তাদের খাজনা মওকুফ করে দেন। তিনি অসাধু ব্যবসায় দুর্নীতি এবং চোরা কারবার কঠোর হস্তে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করে তার তালিকা হাটে বাজারে টাঙিয়ে রাখারও ব্যবস্থা করেছিলেন এই স্বাধীন গণশাসক। তাঁর স্বাধীন রাষ্ট্রে চালের মন ছিলো চল্লিশ পয়সা। ডালের সের ছিলো দুপয়সা। তেল পাওয়া যেতো তিন আনা সেরে।

শমশের গাজী ইংরেজদের বিরুদ্ধেও দু'বছর ধরে একটানা সংগ্রাম করেছিলেন। ১৭৬৮ সালে ইংরেজদের একটি বিরাট ফৌজ কামান ও ভারি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শমশের গাজীর রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করে। কামানের গোলার মুখে টিকতে না পেরে শমশেরের কৃষক ফৌজ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শমশেরকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এই বীর কৃষক যোদ্ধা এবং মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীকে নবাব মীর কাসিমের নির্দেশে তোপের মুখে উড়িয়ে দেয়া হয় বলে জানা যায়। শমশের গাজীর পরাজয়ের পরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কুমিল্লা-নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামে পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। স্থানীয় গ্রাম্যকবিদের রচিত গাজীর লড়াই, গাজীর পুঁথি এবং গাজীর পালায় শমশের কিংবদন্তীর নায়ক হিসেবে অমর হয়ে আছেন। শমশের গাজীর বিদ্রোহের কালক্রমটি ছিলো ১৭৬৭-৬৮।

www.nagorikpathagar.org

১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইজারাদারি-শোষন এবং উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন সন্দ্বীপের হৃতসর্বস্ব' জমিদার আবু তোরাব। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইজারাদার গোকুল ঘোষের অত্যাচারে এই সময় সন্দ্বীপে বিভীষিকা সৃষ্টি হয়েছিলো। কোম্পানির কর্মচারীদের হাত করে দুর্নীতি এবং জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে গোকুল ঘোষ গোটা সন্দ্বীপে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। স্থানীয় জমিদার ও কৃষকরা তার অত্যাচারে সর্বস্ব হারিয়ে পথে এসে দাঁড়ায়। এই কুখ্যাত ইজারাদারের ফাটকখানায় প্রাণ দিতে হয় শত শত নিরীহ চাষীকে। সন্দ্বীপের লবণ শিল্পের ওপরও একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই জালিম ইজারাদার। আবু তোরাব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে স্থানীয় কৃষকদের সংগঠিত করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন। ১৭৭৬ সালে ইংরেজ ফৌজের মুকাবিলা করলেন তিনি। যুদ্ধে আবু তোরাবের বাহিনী ধ্বংস হয় এবং তিনি নিহত হন। কিন্তু সন্দ্বীপে বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত করা সম্ভব হয়নি ইংরেজদের পক্ষে। ১৭৬৯ সালে সন্দ্বীপের হাজার হাজার নির্যাতিত কৃষক মুহম্মদ ফাহিমের নেতৃত্ব সংগঠিত হয়ে ইংজেরদ ফৌজকে বাধা দেয়। ইংরেজদের উন্নত অস্ত্রের কাছে তীর-ধনুক এবং লাঠিধারী কৃষক বাহিনী পরাজিত হলেও আরও কয়েক যুগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে সন্দ্বীপ বিদ্রোহ।

১৭৬৩-৬৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নোয়াখালী লক্ষ্মীপুরের কৃষক নেতা নওয়াব আলী। এ সময় লক্ষ্মীপুরে ইংরেজ বণিকরা জাঁকিয়ে লবণের ব্যবসায়ী করছিলো। দরিদ্র চাষীদের দাদন দিয়ে তারা বাধ্য করতো লবণ উ ৎপাদনে। কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে চাষীরা তাদের কাছ থেকে পেতো সামান্য পয়সা। উৎপাদনে কোনো ব্যত্যয় ঘটলে চাষীদের ওপর চলতো অমানুষিক নির্যাতন। কোম্পানির লবণ ব্যবসায়িদের অত্যাচারে স্থানীয় লবণ চাষীরা বিক্ষুব্ধ হতে থাকে। লক্ষ্মীপুরে নওয়াব আলীর জমিতে ছিলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লবণ-গোলা। মুর্শিদাবাদের ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ার পর কোম্পানির স্থানীয় কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য বেড়ে যায়। তারা লবণ-গোলার ভাড়া বন্ধ করে দেয়। নবাব মীর কাসিমের কাছে এর বিচার চেয়ে ব্যর্থ হন নওয়াব আলী। তিনি বুঝলেন, শক্তিবলে ইংরেজদের উৎখাত করা না হলে অত্যাচার আরও বাড়তে থাকবে। দ্রুত বিক্ষুব্ধ লবণ চাষীদের সংগঠিত করলেন তিনি। এই বিদ্রোহী বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়ে ইংরেজ বণিকরা লক্ষ্মীপুর ছাড়লো। কিছুকাল পরেই এক বিরাট ইংরেজ ফৌজ এসে আক্রমণ করলো নওয়াব আলীর বিদ্রোহী বাহিনীকে। তিনি বন্দী হলেন এবং কুমিল্লার কারাগারে মৃত্যুবরণ করলেন।

ঢাকার মসলিন বিদ্রোহ চলছিলো ১৭৭০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত। এই বিদ্রোহের মূল নায়ক ছিলেন মজনু শাহ্ এবং তাঁর অনুগামী ফকির বিদ্রোহীগণ। ১৭৭৬-৮৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত চট্টগ্রামের পার্বত্য বিদ্রোহের নেতা ছিলেন জান বখ্শ খাঁ। ১৭৭৮ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত নীল চাষীদের প্রথম পর্বের সংগ্রামের প্রধান নায়ক ছিলেন মুসলিম কৃষক দলপতিগণ। উপকূল অঞ্চলের লবণ চাষীরা মুঘল আমলে মালংগী নামে পরিচিত ছিলো। বস্ত্র শিল্পের মতো লবণ শিল্পও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম এবং মেদিনীপুরের উপকূল এলাকায় তখন ব্যাপক

www.nagorikpathagar.org

হারে লবণ চাষ হতো। কোম্পানির বণিকগণ এই গোটা লবণ উৎপাদন ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করে নিয়ে দরিদ্র লবণ চাষীদের ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করতে থাকে। এর বিরুদ্ধে ১৭৮০ সাল থেকে ১৮০৪ সাল পর্যন্ত চলে ধারাবাহিক সংগ্রাম। লবণ চাষীদের অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র মুসলমান কৃষক। এর পরেই শুরু হয় ১৭৮০-১৮০০ সালের রেশম বিদ্রোহ। ১৭৮৩ সালে কোম্পানির ভূমি রাজস্বের ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন রংপুরের কৃষক নেতা নুরুদ্দীন। তিনি কৃষকদের কাছে 'নূরুল-উদ্দীন' নামে পরিচিত ছিলেন। নূরুদ্দীন গোটা উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের সংগঠিত করে একটি স্বাধীন সরকার কায়েম করেন। এক হুকুমনামার মাধ্যমে ইংরেজদের খাজনা না দেয়ার জন্যে তিনি ঘোষণা জারি করেন। এই বিদ্রোহী বাহিনী উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে দেবী সিংহের তহশীলদার, পাইক-বরকন্দাজ ও গোমস্তাদের বিতাড়িত করে। মুঘল হাট ও পাটগ্রামে ইংরেজ ফৌজের সাথে বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড লড়াই হয়। একটি যুদ্ধে আহত হয়ে মারা যান নুরুদ্দীন। রংপুর বিদ্রোহের পর দেবী সিংহের অত্যাচারের কাহিনী উদ্‌ঘাটিতে হয় কোম্পানির ডাইরেক্টরদের কাছে। দেবী সিংহকে আদালতে অভিযুক্ত করা হলেও ঘুষ দিয়ে কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সে বশীভূত করে। দুর্নীতিবাজ হেস্টিংস তার পক্ষ অবলম্বন করে। দেবী সিংহকে কোম্পানি আর কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত না করলেও তার সেবার পুরস্কার স্বরূপ তাকে মহারাজা খেতাবে ভূষিত করা হলো। উত্তরাঞ্চলের লুণ্ঠিত অপরিমেয় সম্পদের সাহায্যে মুর্শিদাবাদে এক বিশাল জমিদারি কিনে 'নসিপুর রাজপরিবার'-এর গোড়াপত্তন করে এই কুখ্যাত লুটেরা।

উনিশ শতকের মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়

উপমহাদেশে স্বাধীনতা বিপ্লব সূচিত হওয়ার প্রাক্কালে ১৮৫৫-৫৬ সালে সংঘটিত হয়েছিলো প্রথম বলকান যুদ্ধ। ইউরোপে তুর্কী খিলাফতের অন্তর্গত কৃষ্ণসাগর উপকূলীয় ক্রিমিয়া ভূখণ্ড ছিলো ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, জার শাসিত দেশীয় সম্প্রসারণবাদ এবং তুরস্কের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কেন্দ্রস্থল। এ যুদ্ধের ফলে তুরস্ককে পূর্ব ইউরোপে তার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড হারাতে হলো। ঘটনাটি তাবৎ মুসলিম বিশ্বকে ক্ষুব্ধ এবং আলোড়িত করে তোলে। তুরস্ক ছিলো তখন পর্যন্ত এশিয়া ও ইউরোপের অন্যতম সুপার-পাওয়ার। দরিদ্র মুসলিম দেশগুলো বিশেষ করে বিভিন্ন দেশের অবহেলিত মুসলিম সংখ্যালঘু সমাজ তুরস্কের ক্ষমতাকে স্বাভাবিক কারণেই তাদের অনুপ্রেরণার উৎস বলে মনে করতো। ভারতের মেধাবী দরিদ্র মুসলমান ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষার জন্যে তুর্কী সরকারের বৃত্তি পেতো। সম্ভ্রান্ত বংশীয় দরিদ্র মুসলমানেরাও ভাতা পেতেন তুরস্কের খলীফার বিশেষ তহবিল থেকে। এ অবস্থায় বলকান যুদ্ধের কারণে অনেকগুলো ভূখণ্ড তুরস্কের হাতছাড়া হওয়ায় উপমহাদেশীয় মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারা বুঝতে পারে, মুসলমানদের শক্তি বিচূর্ণ করে দেয়ার জন্যে মধ্যযুগে (খ্রিস্টীয় নবম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত) ক্রুসেড যুদ্ধ তথা খ্রিস্টীয় জেহাদ-এর ধূয়া তুলে ইউরোপীয় শক্তিগুলো যেভাবে সম্মিলিত হয়ে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড ও পবিত্র নগরী জেরুজালেমসহ গোটা আরব

www.nagorikpathagar.org

দুনিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, ঠিক তেমনি মুসলিম খিলাফত-শাসিত তুরস্ককে ধ্বংস করার জন্যে উনিশ শতকে এসে খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী শক্তিগুলো আবার একত্র হয়েছে। ইংরেজদের প্রতি তাদের ঘৃণা এবং ক্ষোভ ছিলো তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। কেননা, ঈংরেজরা বাংলাদেশ ও ভারতে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম শাসকদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যেও একই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে তারা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে কুক্ষিগত করার মতলবে। সাতান্নর স্বাধীনতা বিপ্লব ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের সর্বাত্মক উত্থানের এটি ছিলো অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক কারণ।

বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানদের মধ্যে যে নিদারুণ নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয় তার গ্রাস থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে অনিবার্য হয়ে পড়ে তাদের আত্মশক্তির নব উদ্বোধনের। এ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে সমকালীন মুসলিম চিন্তানায়ক, লেখক-সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং সমাজ সংস্কারগণ সামনে এগিয়ে আসতে কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। বিপ্লব-উত্তরকালে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং তাদের গোরা সৈন্যদের জিঘাংসার নিষ্ঠুর শিকার অযোধ্যা ও দিল্লীর মুসলমানদের মধ্যে নব আশাবাদ সঞ্চারে বন্ধু, দার্শনিক আর পথ-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন নওয়াব আবদুল লতিফ স্যার সৈয়দ আহমদ খান, খোদা বখ্শ, নবাব ভিখারুল মূলক, নবাব শেফাউল মূলক, হাকিম আজমল খাঁন প্রমুখ অগ্রসাধকগণ। ১৮৫৮ সালে পার্লামেন্টশাসিত ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে এবং একটি রাষ্ট্রীয় ঘোষণা তথা প্রোক্লারেশন-এর মাধ্যমে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক উপমহাদেশীয় শাসন কর্তৃত্ব কোম্পানির হাত থেকে স্বহস্তে গ্রহণের পর শুরু হয় একটি ক্রমবিবর্তনশীল রাজনৈতিক-প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার যুগ। ব্রিটিশ সরকার এদেশে পর্যায়ক্রমে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার কথা চিন্তা করলেন। এর প্রেক্ষাপটেই স্বাধীনতা বিপ্লবের চার বছর পর, ১৮৬১ সালে, 'স্থানীয় সংস্থা আইন' বলবৎ হয় এবং বিভিন্ন শহরে দেশীয় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পৌরসভা গঠিত হতে থাকে। স্যার সৈয়দ এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সংগতি রেখে রাজনৈতিক উপায়ে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্যে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করলেন। স্থানীয় সংস্থাসমূহে মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা তাঁর কল্যাণেই সম্ভব হয়েছিলো। 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' ও 'মোহামেডান এডুকেশন সোসাইটি' গঠনের মাধ্যমে মুসলমান শিক্ষাবিদ ও লেখক-সাহিত্যিকদের ঐক্যবদ্ধ করলেন তিনি। এভাবেই সূচনা হলো আলীগড় শিক্ষা-আন্দোলনের।

শিক্ষা ও সাহিত্যের এই দু'টি ফোরামই ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সংগঠনের অবয়ব লাভ করলো। এটি ছিলো একটি ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রা। কারণ, এখান থেকেই মুসলমানরা বৃহত্তর ঐক্য ও আন্দোলনের অনুপ্রেরণা খুঁজে পেলো। কবি মীর্জা গালিব এবং দাগ তাঁদের রচিত উদ্দীপনামূলক কবিতা ও গজলের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবনের চেতনা সৃষ্টি করলেন হতাশা-ক্লিষ্ট মুসলমান সমাজে।

বাংলাদেশের অবস্থা ছিলো তখন সবচেয়ে শোচনীয়। কারণ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুঃশাসন, শোষণ-দুর্নীতি, লুটপাট এবং অরাজকতা এখানে গোটা এক শতাব্দীকাল স্থায়ী

www.nagorikpathagar.org

ছিলো। আর এর মূল ঝড়টাই বয়ে গেছে বাঙালি মুসলমান সমাজের উপর দিয়ে। ফলে এরা নিরালম্ব হয়ে খাবি-খাওয়া মাছের মতো ভাসছিলো এক পারাপারহীন অন্ধকার সমুদ্রে। এই মৃত সমাজকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন ছিলো পথপ্রদর্শকের। প্রয়োজন ছিলো আত্মগৌরবে তাদের উদ্বুদ্ধ করবার মতো লেখক, মনীষী এবং চিন্তানায়কের। বাংলাদেশে এই বিরাট কাজটাই করেছিলেন নওবাব আব্দুল লতিফ, নবাব ফয়জুন্নেসা, সৈয়দ আমীল আলী, মীর মুশাররফ হোসেন, মুনশী মেহেরুল্লাহ মুন্সী রিয়াজউদ্দীন, রিয়াজউদ্দীন মাশহাদী, নবাব শামসুল হুদা, কবি মুজাম্মেল হক প্রমুখ। নবাব আবদুল লতিফের ভূমিকা সম্পর্কে আগে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। স্বাধীনতা বিপ্লবোত্তর যুগে বাংলার মুসলামন সমাজের তিনি ছিলেন দুর্দিনের দিশারী এবং ত্রাণকর্তা। এ অঞ্চলে শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গোড়াপত্তন সম্ভব হয়েছে তাঁর ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার উদ্যোগের কল্যাণে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সরকারি চাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, স্থানীয় সংস্থাসমূহে প্রতিনিধিত্ব এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হলে বাঙালি মুসলমানদের অবশ্যই ব্রিটিশ প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তা না হলে তাদের যেমন চাকরি জুটবে না তেমনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা অপাংতেয় হয়ে থাকবে। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় উচ্চ শিক্ষার দিকে ঝুঁকলো সম্ভ্রান্ত ও স্বচ্ছল মুসলমান পরিবারগুলো। দরিদ্ররাও ইংরেজি শিক্ষাকে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার উপায় বলে মনে করলো। শিক্ষার প্রতি আমাদের সমাজের এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভংগীর ফলশ্রুতি হিসেবে যেখানে এককালে হাজারের মধ্যে একজনও ইংরেজি শিক্ষিত খুঁজে পাওয়া যেতো না, সেখানে তাদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগলো। অল্পসময়ের ব্যবধানে কোর্ট-কাছারিতে বাড়লো মুসলমান উকিল-মোক্তারের সংখ্যা। কেরানির চাকরি পাওয়া কঠিন হলেও দু-একজন করে সেখানেও ঢুকতে লাগলো। উচ্চ শিক্ষিতরা পেলেন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট এবং পদস্থ আমলা হওয়ার সুযোগ। এভাবে উনিশ শতকের শেষদিকে দ্রুত গড়ে উঠতে লাগলো বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী। অফিস-আদালতে এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহে অনুন্নত মুসলমান সমাজের জন্যে আসন সংরক্ষণের দাবি-আদায়ের ব্যাপারে আবদুল লতিফের ভূমিকা ছিলো ঐতিহাসিক। তাঁর উদ্যোগের ফলেই ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়েছিলেন এসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রাধিকার দিতে। অনুন্নতদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ন্যায্য অধিকারের দাবি ব্রিটিশ শাসকদের কাছে তুলে ধরেছিলেন আবদুল লতিফ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মোহামেডান এডুকেশন সোসাইটি'কে কেন্দ্র করেই উনিশ শতকের বাংলার মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক অধিকার চেতনা, আত্মমর্যাদাবোধ এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছিলো।

এ প্রসংগে উনিশ শতকের বাংলার বিশিষ্ট মুসলিম মহিলা নেত্রী ফয়জুন্নেসার কথা অবশ্যই শ্রদ্ধার সংগে আমাদের স্মরণ করতে হবে। কুমিল্লার দৌলতপুরের জমিদার ছিলেন তিনি। শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে ভূষিত করেছিলেন 'নবাব' উপাধিতে। বাঙালি মুসলমানদের সেই অন্ধকার যুগে কুমিল্লায় তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, নারী শিক্ষালয়, এতিমখানাসহ বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। মুসলমান সামাজের প্রথম স্কুল-পাঠ্যপুস্তক

www.nagorikpathagar.org

প্রণেতা পণ্ডিত রিয়াজউদ্দীন ছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন পণ্ডিত রিয়াজউদ্দীনের বাংলা ব্যাকরণ ও ভাষাজ্ঞানের। বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বোধোদয়' নামক বাংলা পাঠ্যপুস্তকটির একটি ভুল সংশোধন করে দিয়েছিলেন তিনি। রিয়াজউদ্দীনের ভ্রম সংশোধনীটি 'বোধোদয়'-এর পরিশিষ্টে মুদ্রিত করে বিদ্যাসাগর তাঁকে সম্মানিত করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক নবাব ফয়জুন্নেসাও ছিলেন সুসাহিত্যিক এবং সুপণ্ডিত। তাঁর রচিত 'রূপ-জালাল' উপন্যাসটি সে যুগে সাহিত্যিক-সমাজে প্রশংসিত হয়েছিলো। স্থানীয় কৃষকদের দুর্নীতি মোচনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন এই মহীয়সী মহিলা। তাঁর সম্পর্কে তখন বলা হলো: ইংল্যান্ডে আছেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া আর বাংলায় আছেন নবাব ফয়জুন্নেসা।' জমিদার হয়েও এই বিদূষী মহিলা ছিলেন একান্তভাবে প্রজাবৎসল। তাঁর জমিদারিতে কৃষকদের মধ্যে কোনো অসন্তোষ সৃষ্টি হতে শোনা যায়নি।

সৈয়দ আমীর আলীর স্মরণীয় অবদান

সাতান্নর স্বাধীনতা-বিপ্লব পরবর্তী যুগে পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা, ইতিহাস-গবেষণা এবং আইন শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের জন্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেন বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলী। ইউরোপীয় পণ্ডিত, লেখক এবং আইনশাস্ত্র বেত্তারাও বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছেন মুক্তকণ্ঠে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত প্রিভি কাউন্সিল-এর বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠি হয়েছিলেন তিনি। বাংলার মুসলমান সমাজের শিক্ষা বিস্তারে অন্যতম অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেন আমীর আলী। আত্মবিস্মৃতির অন্ধকার থেকে এই সমাজকে টেনে তুলে তাদের মধ্যে আত্মগৌরববোধ সংস্কারের জন্যে তিনি ধারণ করেছিলেন তাঁর শক্তিশালী লেখনী। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক বিরলদৃষ্ট কলমযোদ্ধা। অতীত ইতিহাস উন্মোচন করে তিনি তাঁর সমাজকে দেখিয়েছেন পথের সংকেত। তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইতিহাস গ্রন্থ 'হিস্ট্রি অব সারাসেন্‌স'-এর আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর ইসলামী সভ্যতার প্রভাব কতখানি সুদূরপ্রসারী তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার প্রমাণ তুলে ধরেন তিনি। ঘটনাপঞ্জী তুলে ধরে তিনি দেখালেন: যখন বাগদাদ, নিশাপুর, ইস্পাহান, দামেস্ক, কায়রো, আন্দালুসিয়ার কর্দোভা প্রভৃতি শহরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুসংবদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতিতে উচ্চস্তরের গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি পড়ানো হতো–ইউরোপে তখন মাধ্যমিক স্তরেরও কোনো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঐতিহাসিক সত্য উন্মোচন করে তিনি বলেন: ইবনে সীনা, ইবনে খলদুন, আবু রুশদ, ইবনে তোফায়েল, আল ইদ্‌রিসী, আল-ফারাবী, আল-কিন্দী, আল বেরুনী, আল-গায্‌যালী, ফিরদৌসী, উমর খৈয়াম, রুমী-সাদী প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের আবির্ভাব না ঘটলে ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক জাগরণ তথা রেনেসাঁর অভ্যুদয় আদৌ ঘটতো না। রাষ্ট্র পরিচালনায় মুসলিম রাজনীতিকদের অসামান্য কৃতিত্বের সুপ্রচুর দৃষ্টান্তও তিনি তুলে ধরনে তাঁর এই গ্রন্থে। স্থাপত্য শিল্পকলায়, সংগীতে, গ্রন্থপ্রকাশনা ও মুদ্রণশিল্পে মুসলমানদের অবদানের কথাও তিনি তাঁর লেখায় বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

www.nagorikpathagar.org

সৈয়দ আমীর আলীর এ ইতিহাস গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলমানদের সম্পর্কে ইংরেজ শাসক এবং বুদ্ধিজীবীদের ধারণা পাল্টাতে শুরু করলো। অন্যদিকে উপমহাদেশের শিক্ষিত মুসলমান সমাজ নিজেদের অতীত গৌরব সম্পর্কে প্রকৃষ্ট ধারণা লাভ করে আত্মসচেতন হয়ে উঠতে লাগলো। 'স্পিরিট অব ইসলাম' আমীর আলীর আরেকটি অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক জাগরণ সৃষ্টিতে এই বইটিও বিশেষ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। ইউরোপেও আমীর আলীর লিখিত গ্রন্থগুলির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৯ সালে লন্ডনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় তাঁর 'হিস্ট্রি অব সারাসেন্‌স'-এর প্রথম সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

মীর মশাররফ হোসেন

উনিশ শতকের মুসলিম সমাজের আরেকজন প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ হলেন প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার মীর মশাররফ হোসেন। কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার পটভূমিতে রচিত তাঁর 'বিষাদ সিন্ধু' উপন্যাসটি ছিলো বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলমান পরিবারের সাহিত্য রস-পিপাসার প্রধানতম অবলম্বন। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ঘরে ঘরে এটি পঠিত হয়ে এসেছে। 'বিষাদ সিন্ধুর' মতো উচ্চাংগের জনপ্রিয় উপন্যাস তাবৎ বাংলা সাহিত্যেও বিরল। 'বিষাদ সিন্ধু'র মুখ্য চরিত্র কারবালার শহীদ ইমাম হোসেন। ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে অকুতোভয়ে আত্মদান করেছিলেন ইমাম। এক বিন্দু পানির জন্যে যখন ছটফট করছিলো শিশুপুত্র এবং যখন ফোরাতের কূলে সেই মাসুম বাচ্চাকেও শত্রুর শরাঘাতে রুধিরাক্ত হয়ে প্রাণবিসর্জন দিতে হলো, তখনও সন্তানবৎসল এই মহান পিতাকে দুর্বলতায় ভেঙ্গে পড়তে দেখা যায়নি। শত্রুর বিশাল বাহিনীর আক্রমণের মুখে ক্ষুদ্র অনুচরদলের ধ্বংস এবং মৃত্যু অবধারিত জেনেও তিনি ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করতে পারেননি আত্মসমর্পণের কথা। তাঁর অনুচরদের সকলে একে একে শাহাদাত বরণ করে স্থাপন করে গেছেন সত্যপ্রতিষ্ঠার চির অমলিন দৃষ্টান্ত।

কারবালার বীরদের এই আত্মত্যাগের কাহিনী বাঙালি মুসলমান নর-নারীকে সেই নৈরাশ্য ও অবক্ষয়ের যুগে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলো আত্মশ্লাঘাবোধে। তাঁরা বিশ্বাস করতে শুরু করলো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারলে পতনের হাত থেকে উদ্ধার তাদের ঘটবেই এবং একদিন বিজয় অবশ্যই দ্বারপ্রান্তে এসে ঘন্টাধ্বনি তুলবে। এতদিন হীনমন্যতার গ্লানি তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। তারা অভাব বোধ করছিলো তাদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মতো একজন সমাজ সংস্কারক এবং শিক্ষাবিদের আবির্ভাবের। অভাব বোধ করছিলো রাজা রামমোহন রায়ের মতো একজন সংগঠকের, বঙ্কিমের মতো একজন ঔপন্যাসিকের। বিদ্যাসাগর আর রামমোহনের সমান্তরালে দাঁড়িয়ে সেই বিরাট শূন্যতা পূরণ করলেন মনীষী আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী। ঔপন্যাসিক-নাট্যকার মীর মশাররফ হোসেন সমান মর্যাদায় অবস্থান নিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের পাশে। মুসলমান সমাজে জাতীয় চেতনা এবং আত্মগৌরব সঞ্চারে এই অগ্রনায়কের অবদানের কোনো তুলনা নেই।

আত্মচেতনার এই পথ ধরেই বাঙালি মুসলমান ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যায় উনিশ-বিশ শতকের রাজনৈতিক ক্রান্তিকালের দিকে।

www.nagorikpathagar.org

সংবাদপত্রের যুগ : ১৮৬০-৭০ দশকের ঘটনা প্রবাহ

১৮৬০-৭০-এর দশকের স্মরণীয় ঘটনা হলো : সংবাদপত্র প্রকাশের নব উদ্যোগ এবং সংবাদপত্রে রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও দাবি-দাওয়ার প্রতিফলন। এ প্রসংগে উল্লেখ্য, ১৮১৮ সালে 'বেংগল গেজেট' এবং 'সমাচার দর্পণ'-এর আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছিলো বাংলাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের আদি যুগ। এর তেরো বছর পরে ১৮৩১ সালে মুসলমানদের উদ্যোগে প্রথম প্রকাশিত হলো সাপ্তাহিক 'সমাচার সভারাজেন্দ্র'। এ সময় সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সাময়িক পত্রের ব্যাপক আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 'প্রেস অ্যাক্ট'-এর দরুণ সংবাদপত্রের রাজনীতি বিষয়ক সংবাদ প্রকাশ কিংবা আলোচনা নিষিদ্ধ ছিলো। ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা হস্তান্তর এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সরকার কর্তৃক উপমহাদেশে শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণের পর শুরু হয় নিয়মতান্ত্রিক শাসন-প্রক্রিয়ার যুগ। এই আবহাওয়ায় সংবাদপত্রসমূহে রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের দাবি-দাওয়ার প্রতিফলন ঘটতে থাকে। মুসলমানরাও তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করার তাগিদে নব পর্যায়ে সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হন। ১৮৬০-৭০ দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ সময়কার সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যের দাবি রাখে।

১৮৬১ সালে ভারতীয় কাউন্সিল আইন (প্রথম কাউন্সিল আইন) বলবৎ হওয়ার পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্র একটা সীমিত স্বাধীনতার সুযোগ লাভ করে। কাউন্সিল আইনের আওতায় শাসন-পরিচালনার জন্যে পাঁচজন শ্বেতাঙ্গ সদস্য নিয়ে গঠিত হলো গভর্নর-জেনারেলের শাসন পরিষদ। একই সংগে গঠিত হলো ৬ সদস্যের একটি লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল। পরে এই আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে ১২-তে উন্নীত করা হয়। এঁদের অর্ধেক ছিলো বেসরকারী সদস্য। গভর্নর-জেনারেল 'নেটিভ'দের মধ্য থেকে বেসরকারী সদস্য মনোনীত করতেন। ব্যবস্থাপক পরিষদের এই বেসরকারি সদস্যদের প্রায় সকলেই ছিলেন দেশীয় জমিদার, ধনাঢ্য ব্যবসায়ি কিংবা অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ আমলা শ্রেণীর অন্তর্গত। এঁদের কাছ থেকে বৃহত্তর সমস্যাসমূহের সমাধান আশা করা সম্ভব ছিলো না।

কাউন্সিল আইনের একটি প্রত্যক্ষ দিক হলো : এর মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে ব্যবস্থাপক পরিষদ, পৌরসভা, জেলাবোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থাসমূহের বিকাশ। এই নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূচনাকালেই উত্তর ভারতে সৈয়দ আহমদ খান এবং বাংলাদেশে নবাব আবদুল লতিফ অনগ্রসর মুসলমান সমাজের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা উভয়েই ব্যবস্থাপক পরিষদে ও স্থানীয় সংস্থাসমূহে মুসলমানদের জন্যে সংখ্যানুপাতে আসন বরাদ্দের দাবি জানালেন। আবদুল লতিফই প্রথম মাতৃভাষা বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার গুরুত্ব অনুধাবন করেন। তিনি বুঝতে পারলেন, সমাজ থেকে অশিক্ষার অন্ধকার দূর করতে হলে বাংলাভাষার সর্বাত্মক বিকাশ প্রয়োজন। 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' গঠনের মাধ্যমে তিনি এক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন।

www.nagorikpathagar.org

এ সময় ফোরাম ধরনের সমিতি গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যা এবং রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রেও প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন স্যার সৈয়দ আহমদ। ১৮৬৬ সালে তিনি 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন' নামে এ ধরনের একটি সমিতি গঠন করেন। এসোসিয়েশনের বৈঠকে ইংরেজ সিভিলিয়ানদেরও মাঝে-মধ্যে আমন্ত্রণ জানানো হতা। মুসলমানদের দাবি-দাওয়া আদায়ের একটি কৌশল হিসেবে স্যার সৈয়দ ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। তাছাড়া, স্বাধীনতা বিপ্লবোত্তর যুগে পরিস্থিতি এমন ছিলো যে, ইংরেজদের চটিয়ে কিংবা তাদের না জানিয়ে সাধারণ দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত কোনো বিষয়েও কোনো রকম আন্দোলনে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। স্বাধীনতা বিপ্লবে বিপুল সংখ্যায় মুসলমানরা অংশগ্রহণ করায় এবং তাদের আক্রমণে দিল্লী, কানপুর, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ ও ঢাকায় ইংরেজ সৈন্যদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ায় উপমহাদেশে ব্রিটিশ-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি নিম্নতম মাত্রায় নেমে এসেছিল।

বিপ্লবের পর ব্রিটিশ সরকার উপমহাদেশের শাসনভার সরাসরি হাতে তুলে নিলেও প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ইংরেজ শাসকরা বাংলাদেশ ও ভারতের মুসলমানদের সন্দেহের চোখেই কেবল দেখেনি– তাদের 'শত্রুপক্ষ' হিসেবেও গণ্য করেছে। আর এই শত্রুতার নীতি তারা পরোক্ষভাবে অনুসরণ করে এসেছে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ইংরেজদের এই বিদ্বেষ ও বৈরিতাকে সীমিত রাখার উপায় হিসেবেই বাংলাদেশে আবদুল লতিফ এবং দিল্লীতে সৈয়দ আহমদ তাদের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলেন। এই উভয় নেতা ইংরেজের ক্রীড়নক ছিলেন বলে যখন এ যুগেও কোনো কোনো সমালোচক অভিযোগ তোলেন তখন তাঁরা সেই ক্রান্তিকালের দুঃসহ পরিস্থিতির কথা বোধকরি বেমালুম ভুলে যান। অথবা সমকালীন ইতিহাসের গভীরে যাওয়ার কিছুমাত্র চেষ্টা করেন না।

এখানে দেওবন্দ আন্দোলন এবং ব্রিটিশ সরকারের কোপানল থেকে আন্দোলনের বিপ্লবী নেতাদের রক্ষার ব্যাপারে সৈয়দ আহমদের ভূমিকা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা দরকার। সাতান্নর স্বাধীনতা বিপ্লবে অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বদানের অপরাধে দেওবন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রখ্যাত মনীষীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং অনেককে সারা জীবনের জন্যে নির্বাসন দেয়া হয়েছিলো আন্দামান দ্বীপে। ব্রিটিশ সরকারের সাথে দেন-দরবার করে এঁদের বেশির ভাগেরই দণ্ড মওকুফ করিয়ে নিয়েছিলেন সৈয়দ আহমদ। দেওবন্দে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান নেতা ছিলেন প্রখ্যাত ইসলামী মনীষী মাওলানা ফজলে-হক খয়রাবাদী। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিলো। তাঁর বয়স ছিলো তখন সত্তরের বেশি। বার্ধক্যের কারণে মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে তাঁকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দেয়া হলো আন্দামানে।

সৈয়দ আহমদ খানের আপ্রাণ চেষ্টার ফলেই খয়রাবাদীর মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে তাঁকে 'কালাপানি' (আন্দামানে নির্বাসন দণ্ড) দেয়া হয়েছিলো। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের প্রায় সকলেই এটা স্বীকার করেছেন। সাতান্নর বিপ্লবীদের প্রতি সৈয়দ আহমদের সহানুভূতির আরও অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ সেকালের দলিলপত্রে দেখতে পাওয়া যায়। বিপ্লবের পর

www.nagorikpathagar.org

ইংরেজদের ক্রোধের আগুন থেকে বহু বিপন্ন পরিবারকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। তখন এমন এক দুঃসময় ছিলো যখন ইংরেজদের বর্বরোচিত প্রতিশোধ অভিযানের মুখে দিল্লীর ভীতসন্ত্রস্ত অধিবাসীদের পক্ষে সাহস নিয়ে দাঁড়ানোর মতো কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেই দুর্দিনে একমাত্র সৈয়দ আহমদই ঝুঁকি নিয়ে অসহায় মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। বিপ্লবের সময় তিনি দিল্লীতে অবরুদ্ধ অনেক ইংরেজ নারী ও শিশুকে রক্ষা করেছিলেন। এই ইংরেজ পরিবারগুলো ছিলো তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। এসব কারণে ইংরেজরা তাঁকে সাধারণভাবে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। তাঁর প্রতি ইংরেজদের এই ভালো ধারণাকে তিনি সুযোগমতো যথাসম্ভব কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁর সুপারিশের দরুন যেমন অনেক অভিযুক্ত বিদ্রোহীর দণ্ড শিথিল করা হয়েছিলো, তেমনি সন্দেহকৃতভাবে সাজাপ্রাপ্তরাও খালাস পেয়েছিলেন। আন্দামানে নির্বাসিত ফজ্‌লে হক খয়রাবাদীকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে সৈয়দ আহমদ উচ্চ পর্যায়ে দেন-দরবার করেন। এই বৃদ্ধ জ্ঞানতাপস যাতে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো আপন পরিজনের সান্নিধ্যে থেকে কাটাতে পারেন সৈয়দ আহমদ তাঁর পক্ষে এই আবেদনটিই বিশেষভাবে রেখেছিলেন ইংরেজদের কাছে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার এতে সাড়া দিলেন। খয়রাবাদীর দণ্ড সম্পূর্ণ মওকুফ করে তাঁকে আন্দামান কারাগার থেকে মুক্তির নির্দেশ দেয়া হলো।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই নির্দেশ নিয়ে যে জাহাজটি তাঁকে ফিরিয়ে আনতে আন্দামান গিয়েছিলো সেই জাহাজে এলো তাঁর লাশ। জাহাজিদের নোঙর করার মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগে আন্দামানের কারাগারে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন স্বাধীনতার এই মহান বিপ্লব সাধক, যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। তাঁর মৃত্যু সংবাদে শুধু দেওবন্দেই শোকের কালো ছায়া নেমে আসেনি– উপমহাদেশের গোটা আলিম সমাজকেও হতচকিত করে তুলেছিলো এই মৃত্যু। কেননা, ফজলে হক খয়রাবাদী ছিলেন এই সমাজের সর্বশেষ বিপ্লবী চিন্তানায়ক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ জীবিত মুজাহিদ। কারাগারে থেকেও যিনি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন তাঁর লাখ লাখ ভক্ত-অনুরাগীকে।

কাফনে-লেখা ইতিহাস

আন্দামানে কারাকক্ষে জীবনের অন্তিম অধ্যায়ে যে কাজটি করে গিয়েছিলেন ফজ্‌লে হক খয়রাবাদী, পৃথিবীর কোনো স্বাধীনতা বিপ্লবের ইতিহাসেই তার নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারাগারে কোনো রাজবন্দী কলমযোদ্ধার ভূমিকা নিয়ে নতুন করে বিরাট এক বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছেন, এ দৃষ্টান্তও বিরল। এটা বোধকরি তাঁর মত একজন অগ্নিপুরুষের পক্ষেই সম্ভব ছিলো। কারাগারে মরণান্তিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ফজ্‌লে হক খয়রাবাদী তাঁর দাফনের জন্যে কারা-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন এক খণ্ড কাফনের কাপড়। বাড়তি নিয়েছিলেন বেশ কয়েক গজ। এই কাফনের কাপড়ের ভাঁজে দাঁত-মাজার কয়লা দিয়ে তিনি গোপনে লিখে রাখলেন সাতান্নর স্বাধীনতা-বিপ্লবের অগ্নিক্ষরা ইতিহাস। যার আরবি নাম 'আস্‌সাওরাতুল হিন্দিয়া' অর্থাৎ 'বিদ্রোহী ভারত'। উপমহাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের (১৮৫৭) এটি প্রথম লিখিত দলিল। আন্দামানের ইংরেজ কারাধ্যক্ষ ফার্সী ভাষা বুঝতেন বলে গোটা বইটি তিনি লিখেছেন আরবি ভাষায়। কারাগারে

www.nagorikpathagar.org

গভীর রাতে বন্দীদের সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়তো তখন একা নীরবে বসে তিনি পড়াশোনা করতেন। এটা ছিলো তাঁর একটা নিয়মিত অভ্যাস। জেলর এবং কারারক্ষীরা তাঁর এ অভ্যাসের কথা জানতেন। এই সুযোগ নিয়ে গোপনে তিনি কাফনের কাপড়ে লিখতে শুরু করেন সাতান্নর স্বাধীনতা বিপ্লবের কাহিনী। রাজবন্দীদের কাগজ-কলম দেয়া নিষিদ্ধ ছিলো বলে তাঁকে কাফন এবং কয়লা ব্যবহার করতে হয়েছিলো। কাফনের পাণ্ডুলিপি কেমন করে ইংরেজদের সতর্ক দৃষ্টির আড়ালে পাচার করে ভারতে পাঠাতে হবে সেই ব্যবস্থাও মৃত্যুর আগে তিনি করে গিয়েছিলেন।

কাফনের কাপড়ের ওপরের দিকটা তিনি সাদা রেখেছিলেন। তাঁর লেখা ছিলো কাপড়ের ভেতরের পিঠে। সাদা দিকটা ভাঁজ করে এমনভাবে রেখেছিলেন যাতে জেল কর্মচারীরা মনে করলেন এটি স্রেফ একখণ্ড কাফনের কাপড় মাত্র। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর জেলখানার সেবককে বিশেষভাবে বলে গিয়েছিলেন কাফন খণ্ডটি তাঁর লাশ গ্রহণকারীদের হাতে সতর্কতার সাথে তুলে দেয়ার জন্যে। খয়রাবাদী জানতেন, তাঁর লাশ নেয়ার জন্যে তাঁর ছেলে এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুরা অবশ্যই আন্দামানে আসবেন। মাদ্রাজ বন্দর থেকে জাহাজ যোগে তাঁরা যথাসময়েই এসেছিলেন তাঁর মুক্তির নির্দেশপত্র সাথে করে নিয়ে। কিন্তু এসে দেখলেন নিঃসঙ্গ কারাজীবন থেকে চির মুক্তি নিয়ে তিনি ততক্ষণে চলে গেছেন আরেক জগতে।

ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখে ধূলো দিয়ে কাফনের কাপড়ের সেই ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপিখানি তাঁরা ভারত থেকে সংগোপনে পাঠালেন কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে কিছু দিনের মধ্যেই মুদ্রিত হয়ে বেরুলো সিপাহী বিপ্লব তথা আঠারোশ সাতান্নর স্বাধীনতা বিপ্লবের প্রথম-লেখা ইতিহাস 'আস্‌সাওরাতুল হিন্দিয়া'। বইটি বেরুবার সাথে সাথেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো গোটা আরবজগতে। আরবদের সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামে গভীর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে ফজ্‌লে-হক খয়রাবাদীর কাফনে লেখা এই বিদ্রোহের কাহিনী। আল-আযহার এবং অন্যান্য আরব-বিশ্ববিদ্যালয়ে বইটি দীর্ঘকাল যাবত পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিলো। উচ্চশিক্ষিত আরবদের কাছে ফজ্‌লে- হক একালেও একজন বিপ্লবী চিন্তানায়ক হিসেবে সুপরিচিত। ব্রিটিশ সরকার বইটির ভারতে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলো। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর সুদীর্ঘ প্রায় নব্বই বছর স্থায়ী এই বিধি নিষেধের অবসান ঘটে। ফজলে হক খয়রাবাদী তাঁর কর্মে, চিন্তায় বিবেকীবোধে এবং স্বাধীনতার প্রত্যয়ে কতখানি সৎ আর অটল-অবিচল ছিলেন, বন্দীদশায় প্রতিমুহূর্তে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বিদ্রোহের এই আগ্নেয়গিরি তুল্য ইতিহাসের গ্রন্থনা তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। মৃত্যুর প্রাক্কালে এত বড়ো একটি কাজ পৃথিবীর কম বিপ্লব-সাধকই করতে পেরেছেন।

নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পটভূমি এবং ক্রমবিবর্তনের ধারা

১৮৬৬ সালে সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বে গঠিত 'দি ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন' সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত আগেই করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশীয় সমস্যা বিষয়ক এই আলোচনা ফোরামটির মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ক্রমশ বুদ্ধিজীবীদের মনে দানা বাঁধতে থাকে এবং এক সময় ঘরোয়া রাজনীতির সীমানা ছাড়িয়ে

www.nagorikpathagar.org

এই চিন্তা সদর রাস্তার দিকে মুখ ফেরাতে শুরু করে। বিপ্লব-পরবর্তী এই যুগঢাতেই উপমহাদেশে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশনার যাত্রা শুরু হলো। ব্রিটিশদের উদ্যোগে প্রথমে দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো 'দি ফ্রেন্ডস্ অব ইন্ডিয়া' নামক কাগজটি। পরবর্তীকালে এটি 'দি স্টেট্সম্যান'-এ রূপান্তরিত হয়। এর পরে পরেই বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক 'অমৃত বাজার' পত্রিকা প্রকাশিত হলো। কিছুকাল পর ভাষান্তর ঘটিয়ে এটি 'ইংলিশ ডেইলি'তে রূপলাভ করলো। 'আনন্দবাজার' 'বসুমতী' প্রভৃতি বাংলা কাগজও দৈনিক হলো উনিশ শতকের শেষ দিকে। ১৮৭১-এর দশকের দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশীয় মুসলমানদের ধূমায়িত বিক্ষোভের মুখে আত্মপ্রকাশ করলো 'মুহম্মদী আখ্বার' নামক প্রথম মুসলিম অর্থ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

এসব দৈনিক সংবাদপত্র এবং সাপ্তাহিক, অর্ধসাপ্তাহিক কাগজগুলোতে আঠারো শ' সত্তরের দশক থেকে রাজনৈতিক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হতে দেখা যায়। উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক নেতাগণ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে বেসরকারি সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে দাবি জানাতে থাকেন। ১৮৭৫ সালে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত হলো 'দি ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। স্যার সৈয়দ আহমদ খান ১৮৬৬ সালে 'দি ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন' গঠনের মাধ্যমে ফোরামভিত্তিক যে রাজনৈতিক ধারা প্রবাহের সৃষ্টি করেন, সুরেন্দ্রনাথ নয় বছর পরে তদানীন্তন বাংলায় সেই ধারাটিকে অনুসরণ করে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রক্রিয়াকে বেশ কিছুটা সামনে এগিয়ে নিয়ে যান। এদিকে সংবাদপত্রসমূহে রাজনীতি-বিষয়ক লেখালেখির হার বাড়তে থাকায় ব্রিটিশ শাসকগণ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এই পরিস্থিতিতে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের উপর সেন্সরশীপ আরোপের উদ্দেশ্যে ১৮৭৮ সালে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' প্রবর্তন করা হলো। এই ভার্নাকুলার প্রেস আইনটি ছিলো গণতন্ত্রের উন্মেষের যুগে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-বিরোধী প্রথম কালাকানুন। এর বিরুদ্ধে সেকালের সাংবাদিক সমাজ এবং রাজনীতিকগণ সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছিলেন। এই আইনের আওতায় সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনামূলক বিষয়বস্তু সংবাদপত্রে প্রকাশের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কাগজগুলো বিপন্ন হয়ে পড়ে। ইংরেজ আমলাগণ বাংলা বুঝতেন না বলে বাংলা ভাষার সংবাদপত্রসমূহের বিষয়বস্তু গোয়েন্দা বিভাগের বাঙালি কর্মচারীদের দ্বারা অনুবাদ করিয়ে নিয়ে পড়তেন। এসব অনুবাদে মারাত্মক ধরনের ভুল থাকতো এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভুল অনুবাদের কল্যাণে বিনা কারণে দোষী সাব্যস্ত হয়ে বাংলা কাগজের সম্পাদকদের আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হতো। যখন-তখন বাজেয়াপ্ত করা হতো পত্রিকার জামানত। ফলে, অনেক বাংলা কাগজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। 'অমৃত বাজার' পত্রিকাটি তখন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতো। 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট'-এর ঝামেলা এড়ানোর জন্যে খোল-নৈচা পাল্টিয়ে কাগজটি রাতারাতি ইংরেজি পত্রিকার অবয়ব ধারণ করলো। এসব ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, উনিশ শতকের শেষ পর্বে বিকাশমুখী বাংলা সংবাদপত্রকে কি ধরনের সংকটের মধ্য দিয়ে পথ কেটে অগ্রসর হতে হয়েছে!

www.nagorikpathagar.org

১৮৮০-র দশকে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ধারা বেশ কিছুটা সংহত হয়ে উঠতে শুরু করে। এই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, একজন ইংরেজ সিভিলিয়ানের উদ্যোগে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'-এর প্রতিষ্ঠা। অবসরপ্রাপ্ত এই ইংরেজ আমলাটির নাম এলান অক্টেভিয়ান হিউম। ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৮৫ সালে তিনি বোম্বাইতে ন্যাশনাল কংগ্রেসের গোড়াপত্তন করলেন। বাঙালি নেতা উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ছিলেন এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি। শুরুতে মোট ৭২ জন সদস্য নিয়ে এটি গঠিত হয়। ১৮৮৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। দাদাভাই নওরোজী নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেসের তৃতীয় সভাপতি হলেন বদরুদ্দীন তায়েবজী। কংগ্রেস ছিলো তখন পুরাদস্তুর একটি ব্রিটিশঘেঁষা আধা রাজনৈতিক এবং আধা আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে যতটা সম্ভব দাবি-দাওয়া আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো এর তাবৎ কর্মকাণ্ড।

এ সময় স্যার সৈয়দের 'মোহামেডান এডুকেশন সোসাইটি', 'ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন' এবং বাংলাদেশে আবদুল লতিফের 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' কংগ্রেসের সমান্তরালে অনেকখানি একই ধারায় অগ্রসর হচ্ছিলো। ১৮৯০-এর দশকে কংগ্রেসে স্বাধীনতাকামী কিছুসংখ্যক তরুণের সমাবেশ ঘটে। এর ফলে এই সংগঠনটিতে রূপান্তরের লক্ষণ সূচিত হলো। সে সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত আয়ারল্যান্ডে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোর হাওয়া বইতে শুরু করেছিলো। উপমহাদেশের ইংরেজি শিক্ষিত তরুণদের একটা অংশ এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। ১৮৯৭ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বর্ষিক অধিবেশনে এই তরুণেরা স্বায়ত্তশাসন অর্জনের কর্মসূচি গ্রহণের জন্যে প্রবীণ নেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। এদিকে বাংলাদেশ, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে প্রায় একই সময় শুরু হয় বিপ্লবাত্মক উপায়ে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম। বাংলায় বিপিন পাল, মহারাষ্ট্রে বালগংগাধর তিলক এবং পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায় ছিলেন সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রবক্তা। এঁদের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী দল সংগঠিত হয়েছিলো।

নব্য শিবাজীবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা

এ যুগে রাজনীতিতে আরেকটি বিপরীত ধারাও প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এটি হলো, নব্য হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ। মহারাষ্ট্রে উগ্রহিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদিগণ শিবাজীর আদর্শে ভারতবর্ষকে একটি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে সেখানে হিন্দু-মুসলমান হানাহানির সূত্রপাত হলো। বাংলা, মধ্যভারত, পাঞ্জাব এবং অন্যান্য স্থানেও সাম্প্রদায়িক বিভেদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও ঘটে এই বিষবাষ্পের অনুপ্রবেশ। এর আগে উপমহাদেশের মুসলমান সমাজ কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছিলেন। সে যুগের বিখ্যাত মুসলমান নেতাদের অনেকেই কংগ্রেসের সদস্য হয়েছিলেন। কেউ কেউ এই সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের আশা ছিলো, কংগ্রেস উভয় সম্প্রদায়েরই স্বার্থ রক্ষা করবে এবং এর অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রশ্রয় পাবে না।

www.nagorikpathagar.org

মুসলমান নেতাদের প্রথম মোহভঙ্গ

এক সময় স্যার সৈয়দ আহমদ হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এবং সম্প্রীতির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। এই লক্ষ্য নিয়েই তিনি গঠন করেছিলেন 'ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন'। সে সময় এক নিবন্ধে তিনি হিন্দু এবং মুসলমানকে 'ভারতের এক দেহের দুই চোখ' বলে অভিহিত করেছিলেন। বাংলার মুসলমান সমাজের সেকালের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন সৈয়দ আবদুল লতিফ, আমীর আলী, নবাব শামসুল হুদা প্রমুখ। এঁরাও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উগ্র সাম্প্রদায়িকতার কাছে পদে পদে এঁদের ঠোকর খেতে হলো। এই সাম্প্রদায়িকতার কারণেই উচ্চ শিক্ষা এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমান যুবকদের প্রবেশাধিকার প্রায় নিষিদ্ধ ছিলো। আবদুল লতিফ অনেক দেনদরবার করে কলিকাতায় তদানীন্তন হিন্দু কলেজের নাম পাল্টিয়ে একে প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং এই শিক্ষায়তনে মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রথম উন্মোচন করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন তখন মুসলমান ছাত্রদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিলো। এ অধিকার আদায় করতেও বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিলো। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ই প্রথম মুসলমান ছাত্র যিনি এ অচলায়তন ভেদ করে সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিলাভ করেছিলেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনের সুদীর্ঘকাল পরেও মুসলমান ছাত্রদের জন্যে পৃথক ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা হয়নি। মুসলমান নেতাদের বিশেষ করে সেকালের তরুণ মুসলিম জননেতা শেরে-বাংলা ফজলুল হকের আপ্রাণ চেষ্টায় ১৯১৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় স্থাপিত হয়েছিলো মুসলিম ছাত্রাবাস কারমাইকেল হোস্টেল ও টেইলর হোস্টেল।

এদিকে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার সুযোগটিকে সুকৌশলে প্রতিবেশী সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ নিজস্ব সাম্প্রদায়িক স্বার্থে ক্রমাগত ব্যবহার করতে থাকায় আইনসভা, পৌরসভা এবং অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় মুসলমানদের জন্যে আসন লাভ প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। এসব কারণেই সৈয়দ আহমদ খানসহ বিশিষ্ট মুসলমান নেতাগণ পৃথক নির্বাচনের দাবি তোলে। কংগ্রেসও বিভিন্ন সংস্থায় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে এই এক-চোখা সাম্প্রদায়িক নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করে। কংগ্রেসের প্রতি মুসলমান সমাজ ও নেতৃবৃন্দের মোহভংগ হতে থাকে এসব তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে। উনিশ এবং বিশ শতকের ক্রান্তিকালে এসে তাঁরা অনুভব করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা করতে হলে তাঁদের নিজেদের আলাদা রাজনৈতিক সংগঠন প্রয়োজন। তাঁরা বুঝলেন এছাড়া মুসলমান সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার বিকল্প কোনো উপায় নেই।

সলিমুল্লাহ্ এবং শেরে বাংলা

এ যুগে প্রায় একই সময়ে বাংলার মুসলমান সমাজে কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার আবির্ভাব ঘটে। এঁরা হলেন : নবাব সলিমুল্লাহ্, স্যার আবদুর রহিম, আবুল কাশেম ফজলুল হক, করটিয়ার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, মাওলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলবী মুজীবুর রহমান, ব্যারিস্টার

www.nagorikpathagar.org

আবদুর রসূল, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ। ঢাকার নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও অধঃপতিত মুসলমান সমাজের দুর্গতি মোচনের জন্যে অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন সলিমুল্লাহ্। এই সমাজের প্রকৃত ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করেন তিনি। সলিমুল্লাহ্ বুঝতে পেরেছিলেন, ইংরেজদের সাথে সংঘাতের নীতি অনুসরণ করে স্বসমাজের মুক্তি অর্জন অসম্ভব। তিনি লক্ষ্য করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, কেশব চন্দ্র, বঙ্কিম চন্দ্র প্রমুখ ইংরেজদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে সরকারি চাকরি এবং শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁদের প্রচেষ্টায় ১৮৬০-এর দশকের মধ্যে অর্থাৎ সাতান্নর বিপ্লবোত্তরকালের এক যুগের ব্যবধানে বাংলার হিন্দু সমাজ একটি সুসংহত মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলো। অন্যদিকে এককালের শিক্ষিত ও সম্পন্ন মুসলমান সমাজ তখন ইংরেজ বিরোধী নীতির দরুন প্রায় সর্বাংশে একটা দুর্গত, ভাসমান জনশ্রেণীর পর্যায়ে নেমে আসে। মুসলমানদের তুলনায় প্রতিবেশী সমাজ তখন শিক্ষাক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠায় প্রায় একশ বছর সামনে এগিয়ে যায়। উমেশচন্দ্র প্রমুখ আদি যুগের কংগ্রেস নেতারাও একই ইংরেজ-ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করে স্বসমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সলিমুল্লাহ্ অনুভব করলেন উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই বিরাট বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হলে মুসলমান সমাজে যেমন দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন, তেমনি সরকারি চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রেও সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, মুসলমান সমাজে একটি সংহত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত এই সমাজ কিছুতেই রজনীতিতেও সমান তালে অগ্রসর হতে পারবে না। এ কারণেই তিনি আপন সমাজের প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন বোধ করলেন। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি সামনে তুলে ধরেছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গ ছিলো তখন সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত। অবিভক্ত বাঙলার রাজধানী কলিকাতায় শিল্প-বাণিজ্য এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কেন্দ্রীভূত থাকায় পূর্ববঙ্গের অনুন্নত অধিবাসীদের পক্ষে তার সংগে পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হওয়া ছিলো রীতিমতো দুঃসাধ্য। এ বাস্তব কারণেই বঙ্গ-ভঙ্গের মাধ্যমে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অপরিহার্যতা তিনি অনুভব করেছিলেন। ১৯০৫ সালে বাংলা বিভাগ হলো এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে গঠিত হলো নতুন প্রদেশ। ঢাকা হলো এই নতুন প্রশাসন অঞ্চলের রাজধানী। বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধের জন্যে তখন এক প্রচণ্ড আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিলো। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী দলগুলোও এই প্রচেষ্টাকে তীব্রভাবে বাধা দিয়েছিলো। ফলে ১৯১১ সালের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসকরা বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হলেন।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক রূপরেখা

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই ঘটনার ছত্রিশ বছর পর, ১৯৪৭ সালে নতুন করে বাংলা এবং আসাম ভাগ হয়ে যখন পাকিস্তানের 'পূর্ববঙ্গ' প্রদেশ গঠিত হলো, তার বিরুদ্ধে তখন কোনো হৈচৈ হলো না। স্বদেশিকতার যে আবেগে বারুদ সঞ্চার করে বঙ্গভঙ্গ রদের জন্যে দাবানল সৃষ্টি করা হয়েছিলো, ১৯৪৭ সালে তার ছাইচাপা ভস্মটিরও কোনো সাক্ষাৎ পাওয়া

www.nagorikpathagar.org

গেলো না। সেকালের জীবিত বিপ্লবী এবং স্বদেশী কংগ্রেস নেতারা পর্যন্ত আন্দোলনের নাম আর মুখে আনলেন না। এর কারণটি খতিয়ে দেখলে একটি বিশেষ সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির পরিচয়ই বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যায় স্বরূপ ধরা পড়েছিলো ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা-বিপ্লবকালে। উনিশশ সাতচল্লিশ সালে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ নেতাগণ বাংলা এবং আসামসহ বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলোকে নিয়ে 'গ্রেটার বেঙ্গল' তথা বৃহত্তর বাংলা গঠনের জন্যে আন্দোলন করেছিলেন। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে একমাত্র শরৎচন্দ্র বসুই এর পক্ষে কথা বলেছিলেন। অন্য সকলে এর তীব্র বিরোধিতা করেন। পণ্ডিত নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেলসহ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের পক্ষেই রায় দিলেন। প্রথম দিকে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ও বৃহত্তর বাংলার পক্ষে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতাদের চাপে এবং পাকিস্তানের স্বার্থে তিনি বঙ্গভঙ্গ মেনে নেন। এভাবে ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে এক আশ্চর্য অবলীলায় নব পর্যায়ে বাস্তবায়িত হলো সলিমুল্লাহ্র পৃথক প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা। পাকিস্তানের প্রশাসন কাঠামোয় যার নামকরণ করা হয়েছিলো 'প্রভিন্স অব ইস্টবেঙ্গল' তথা পূর্ববঙ্গ প্রদেশ। চব্বিশ বছর পর ১৯৭১ সালে এই ভৌগোলিক ভূখণ্ড নিয়েই উপমহাদেশের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। এর থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার মধ্যেই নিহিত ছিলো স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা।

সলিমুল্লাহ্র এই অগ্রগামী চিন্তার প্রধান সহযোগী ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং সমকালীন যুগের প্রতিভাবান তরুণ জননায়ক আবুল কাসেম ফজলুল হক। এই দুই নেতার চিন্তায়, লক্ষ্যে এবং কর্মে অনেক মিল আমরা লক্ষ্য করি। প্রথম জীবনে তাঁরা দু'জনই ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। স্বসমাজের বৃহত্তর স্বার্থে পরবর্তী সময়ে উভয়েই বর্জন করেন ব্রিটিশের তাবেদারি। সলিমুল্লাহ্ দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তিপ্রদান, দুঃস্থ পুনর্বাসন প্রভৃতি সমাজ হিতকর লক্ষ্যে বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। এসব কাজে অর্থব্যয়ের প্রয়োজনে তাঁকে তাঁর বিরাট জমিদারি পর্যন্ত মহাজনদের কাছে বন্ধক দিতে হয়েছিলো। ১৯০৫ সালে ঢাকায় পূর্ববঙ্গ প্রদেশের রাজধানী স্থাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত জমি তিনি বিনামূল্যে সরকারকে দান করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ রদের পর তদানীন্তন ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল পূর্ববঙ্গের অবহেলিত মুসলমানদের শিক্ষার দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ করে বিক্ষুব্ধ সলিমুল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। বহু আগেই সলিমুল্লাহ্ এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে ছিলেন। সলিমুল্লাহ্ প্রদত্ত কয়েকশ বিঘা জমির উপরই ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯১৬ সালে প্রায় অকালে লোকান্তরিত হওয়ায় সলিমুল্লাহ্ তাঁর এই বিশাল কীর্তির রূপায়ন দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তাঁর এ অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁর একনিষ্ঠ সহযোগী আবুল কাশেম ফজলুল হক। মুসলমানদের জন্যে অসংখ্য প্রাথমিক; মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বিশেষ করে অবৈতনিক

www.nagorikpathagar.org

প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্যে আইন প্রণয়ন করে ফজলুল হক এই সমাজকে শিক্ষাক্ষেত্রে বহুদূর সামনে এগিয়ে দিয়েছিলেন। এটি ছিলো একটি বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ। স্মরণ রাখা দরকার, আমাদের সমাজের আজকের দ্রুতায়িত অগ্রগতির পেছনে সলিমুল্লাহ্ এবং ফজলুল হকের শিক্ষা বিস্তার নীতি যুগিয়েছে মূল উপজীব্য। এর সঠিক মূল্যায়ণ করা না হলে ইতিহাসের প্রতি আমরা অবিশ্বস্ত থাকবো। এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণেই বিভাগ-পূর্ব যুগে আমাদের এই অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটেছিলো। আমাদের প্রতিভাধর রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ এবং আইনবেত্তাদের অধিকাংশই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। এ শতাব্দীর ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের ঘনঘটাময় রাজনীতিতে এঁরাই দিয়েছিলেন অগ্রগামী নেতৃত্ব। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নেতাদের অবদান আমাদের রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠায় কতখানি তাৎপর্যবহ তা বোধকরি ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না।

মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন

১৯০৬ সালে ঢাকার শাহ্বাগে নিখিত ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ্। বঙ্গবিভাগ এবং প্রদেশিক রাজধানী হিসেবে ঢাকার নব প্রতিষ্ঠালাভের (মুঘল যুগে প্রথম পূর্বাঞ্চলীয় রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছিলো এই শহর) পরের বছর অনুষ্ঠিত হয় এই ঐতিহাসিক শিক্ষা-সমাবেশ। এর থেকে বুঝতে পারা যায়, তখনকার মুসলিম নেতৃবৃন্দ শিক্ষার উপর কতটা গুরুত্ব আরোপ করতেন। নবাব ভিকারুল-মূলকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই শিক্ষা সমাবেশে নবাব-জমিদারদের স্তর থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত স্তর পর্যন্ত তদানীন্তন বিশিষ্ট উপমহাদেশীয় মুসলমান নেতাদের প্রায় সকলেই যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনের কার্যক্রমে এবং প্রস্তাবসমূহের খসড়া রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ফজলুল হক। তাঁর বয়স তখন তেত্রিশ। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পরীক্ষায় অংক শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণী পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের অংক পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৯৭ সালে তিনি ডিস্টিংশন নিয়ে আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। একটি বেসরকারি কলেজে কিছু কাল অধ্যাপনার পর কলিকাতায় তিনি আইন ব্যবসায় শুরু করেন। রাজনীতির প্রতি তাঁর আকর্ষণের সূচনা এখান থেকেই। ১৯০৬ সালে নানা কারণে আইন ব্যবসায় ছেড়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করলেও শিক্ষার উন্নয়ন, জনসেবা এবং রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহে কিছুমাত্র ভাটা পড়তে দেখা যায়নি। কারণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিয়েও তিনি ঢাকায় আয়োজিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এই শিক্ষা সম্মেলনেই মুসলমানদের জন্যে সর্বভারতীয় পর্যায়ের একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন নেতৃবৃন্দ। তাঁদের বক্তব্য ছিলো, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত অধিকারসমূহ পরিপূরণের কোনো সম্ভাবনা নেই। আইনসভাসমূহে এবং স্থানীয় সংস্থায় মুসলমানদের সংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নেও কংগ্রেস তাদের

www.nagorikpathagar.org

পুরামাত্রায় হতাশ করেছে। সুতরাং নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমেই মুসলমান সমাজকে আপন অধিকারসমূহ আদায়ের জন্যে সংগ্রাম করতে হবে। সমকালীন এই রাজনৈতিক বাস্তবতাকে সামনে রেখেই ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লাহ্ ঢাকার শিক্ষা সম্মেলনে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' গঠনের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর লীগের গোড়াপত্তনের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে সূচিত হলো এক নবস্রোতধারা। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জন লীগের মৌল লক্ষ্য হলেও উপমহাদেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থে কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতার নীতি অনুসরণের কথাও এই নতুন জাতীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিলো। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে ১৯১৬, ১৯১৮, ১৯১৯ এবং ১৯২০ সালের সম্মেলনসহ লীগ-কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমাবেশ, বৈঠক ও অধিবেশন অনুষ্ঠানের আয়োজনে। এমন কি ১৯১৬ সালে একই প্যান্ডেলে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় উভয় রাজনৈতিক দলের সর্বভারতীয় সম্মেলন। এই যৌথ সম্মেলনেই উপমহাদেশের প্রতিটি আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্যে তেত্রিশ শতাংশ আসন নির্ধারণের অধিকারের স্বীকৃতিসহ চৌদ্দ দফা দাবিসম্বলিত 'ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌচুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছিলো লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে। কিন্তু ১৯২৪ সালে মতিলাল নেহেরু প্রণীত রিপোর্ট (নেহেরু রিপোর্ট নামে অভিহিত) প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায়, কংগ্রেস 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' থেকে বহুদূর সরে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের এই প্রতিশ্রুতি লংঘন ও বিশ্বাসঘাতকতা উপমহাদেশের মুসলমান সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই প্রেক্ষাপটেই উভয় সংগঠনের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান সূচিত হয়। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্, ফজলুল হক, মওলানা আকরম খাঁ, স্যার আবদুর রহিম সহ বিশিষ্ট মুসলমান নেতারা এই সময় কংগ্রেস বর্জন করেন। কংগ্রেসের প্রতি এরপর মুসলমানদের আর তেমন কোনো মোহই থাকলো না।

১৯০৬ সালে ঢাকার শাহবাগ সম্মেলনে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছিলো, ফজলুল হক সারা জীবন তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। একটি ঐতিহ্যবাহী আইনজীবী পরিবারে জন্মলাভের সুবাদে আপন ইতিহাস ও উত্তরাধিকার চেতনা শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে ছিলো ক্রিয়াশীল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অরাজক শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিলো তাঁর পিতা এবং পিতামহের। সাতান্নর স্বাধীনতা বিপ্লবের চেতনায় তাঁরা যেমন উজ্জীবিত ছিলেন তেমনি পরবর্তীকালে এর ব্যর্থতার গ্লানিও সমাজের অন্য সবার মতো তাঁদের বয়ে বেড়াতে হয়েছে। অতীতের এই যন্ত্রণার স্মৃতি স্বাভাবিকভাবেই রেখাপাত করে ফজলুল হকের মন এবং মানসে। তার মধ্যে পাশাপাশি সমাবেশ ঘটতে দেখা যায় মজনু শাহ্র বৈপ্লবিক চেতনার, হাজী শরিয়ত উল্লাহ্র সামন্ত শোষণ-বিরোধী গণসংগঠন শক্তির, তিতুমীরের অমিত স্বাধীনতা প্রীতির, নবাব আবদুল লতিফের শিক্ষা-সংস্কার প্রতিভার এবং সৈয়দ আমীর আলীর মনীষা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের। ফজলুল হকের রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা, তাঁর সংগ্রাম এবং সাধনার গভীরে দৃষ্টিপাত করলেই এই ঐতিহাসিক প্রভাব ও সত্যগুলোর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। উচ্চ

www.nagorikpathagar.org

মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও দেশের দরিদ্র, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের প্রতি ছিলো তাঁর সহজাত সহমর্মিতাবোধ। মানুষের প্রতি এই ভালোবাসা এবং সম্ভ্রমের অনুভূতি তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল পারিবারিক আদর্শ শিক্ষা ও ঐতিহ্যের কল্যাণে। তাঁর পিতা-পিতামহ এবং উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের প্রায় সকলেই জনহিতকর কাজে ব্রতী ছিলেন। তাঁর পিতামহ বরিশালের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁদের বাড়িটি ছিলো দরিদ্র ছাত্রদের আশ্রয় সদন। অন্যদিকে, এই বংশের পূর্ববর্তীরা ছিলেন স্বাধীনচেতা পুরুষ। ফজলুল হকের চরিত্রে এসব গুণাবলী এবং ঐতিহ্যের সুগভীর প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। ১৯১২ সালে জামালপুরে মহকুমা প্রশাসকের দায়িত্বে থাকাকালে স্থানীয় কৃষকদের সমস্যা নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি প্রায় সংগে সংগে এই উচ্চ সরকারি পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। জমিদার-মহাজনদের শোষণে-নির্যাতনে যমুনা নদীর ভাঙনগ্রস্ত এই অঞ্চলের কৃষকরা তখন প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলো। এদের পুনর্বাসনের জন্যে সরকারি সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন ফজলুল হক। প্রধানত এ কারণেই ব্রিটিশ সরকারের দাসত্বের প্রতি তাঁর মনে ঘৃণার সঞ্চার হয় এবং তিনি উপলব্ধি করেন আমলাগিরি করে দেশ-সমাজ ও জাতির প্রকৃত কোনো কল্যাণই তিনি করতে পারবেন না। তখনকার দিনে মহকুমা প্রশাসকের পদের মতো অমান একটি উচ্চপদের আকর্ষণ ত্যাগ করা যেকোনো লোকের পক্ষেই খুব কঠিন ছিল। কিন্তু ফজলুল হক ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া মানুষ। তাই তাঁর পক্ষেই নির্দ্বিধায় আমলাতন্ত্রের বিলাসবহুল এবং নিরাপদ জীবনের নিগড় ভেঙে বাইরের মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিলো।

তাঁর এই দৃঢ় মনোভাব এবং সৎসাহসের পেছনে বিশেষ উপাদান যুগিয়েছিলো তাঁর রাজনীতিমনস্কতা, আইনজ্ঞের মূল্যবোধ আর গণচেতনা। ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনেই তরুণ ফজলুল হকের প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্বের এই প্রভাব তদানীন্তন উপমহাদেশীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিলো। আমরা লক্ষ্য করি, চাকরি ত্যাগ করার পরই তিনি আবার ওকালতির স্বাধীন পেশায় ফিরে যান এবং কৃষক আন্দোলনকে তাঁর রাজনীতির প্রধান উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেন। সেকালের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, রাজনৈতিক নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং কংগ্রেস, মুসলিমলীগ ও অন্যসব ধারার রাজনীতির গতিপ্রবাহকে সামনে রেখে বিচার করলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে গোটা উপমহাদেশে এটা ছিলো একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। এই শতাব্দীর সূচনাপর্বে রাজনীতিকে শহুরে ভদ্রলোকদের ড্রয়িং রুম, নবাব-নাইট আর রাজা মহারাজাদের দরবার কক্ষ এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রভাবের আওতা থেকে মুক্ত করে ফজলুল হকই প্রথম সাধারণ মানুষের সমতলে নামিয়ে এনেছিলেন। তিনি শোষিত কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। জমিদার মহাজনের শোষণ এবং উৎপীড়ন থেকে তাদের রক্ষা করার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানালেন। জামালপুরে এক বিশাল কৃষক সমাবেশের আয়োজন করলেন তিনি। এই সমাবেশে তিনি কৃষি জমির উপর ফসল উৎপাদক শ্রেণীর তথা মেহনতি চাষীদের মালিকানার আইনসঙ্গত

www.nagorikpathagar.org

অধিকারের কথা ঘোষণা করলেন। ঘোষণা করলেন : ফসল উৎপাদন এবং জমি চাষের সাথে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই, সেই মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার ভূস্বামীদের জমি দখলের আইনসঙ্গত কোনো অধিকার থাকতে পারে না। লাংগল যার জমি তার। কৃষকদের আইনানুগ এই মৌল অধিকারটির কথা ফজলুল হকই প্রথম উচ্চারণ করলেন ১৯১৩ সালে জামালপুরের সেই ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলনের মঞ্চ থেকে।

রাজনীতির গতানুগতিক ধারায় এভাবে ফজলুল হক এক বিপ্লবাত্মক আলোড়নের সূচনা করলেন। গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটতে লাগলেন তিনি। অনুষ্ঠিত হতে থাকলো একটার পর একটা কৃষক সভা, সমাবেশ এবং সম্মেলন। কৃষকরা ফজলুল হকের মধ্যে যেন তাদের মুক্তিদূতকে খুঁজে পেলো। তিনি হলেন তাদের নেতা, বন্ধু এবং দিশারী। তাদের মোটা ভাত এবং মোটা কাপড়ের জিম্মাদার হলেন তিনি। রাজনীতিকদের কাছে তিনি ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক আর কৃষকদের কাছে ছিলেন শুধু 'হক সাহেব'। সারা বাংলাদেশে 'হক সাহেব' বলতে একমাত্র তাঁকেই বোঝাতো। কৃষকদের প্রিয় 'হক সাহেব' ছিলেন তিনি।

কৃষি জমির ওপর কৃষকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি, তাদের ভাত কাপড়ের দাবি, কৃষক সন্তানদের শিক্ষার অধিকারের দাবি এবং জমিদার মহাজনদের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ধূমায়িত বিক্ষোভ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে গোটা বাংলা জুড়ে শুরু হলো ফজলুল হকের প্রজা আন্দোলন। তাঁর নেতৃত্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাঢোলের মধ্যেই গঠিত হলো 'প্রজা সমিতি' এবং অল্পকালের মধ্যেই সর্বত্র গড়ে উঠলো এর অসংখ্য শাখা সংগঠন। ফজলুল হকের রাজনীতিও দেশের মাটির তৃণমূল স্পর্শ করে প্রচণ্ড শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। ১৯১৩ সালে তিনি বংগীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হলেন। ঢাকা বিভাগ থেকে এই নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন প্রতাপশালী জমিদার রায়বাহাদুর কুমার হেমেন্দ্র মিত্র। লক্ষ্য করার বিষয়, পার্লামেন্টারি রাজনীতিতেও ফজলুল হকের যাত্রা শুরু হলো একজন ভূস্বামী রাজার বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে। নির্বাচনে ফজলুল হকের পক্ষে দৃঢ় সমর্থন যুগিয়েছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ ও অশ্বিনীকুমার দত্ত।

বংগীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে আসন লাভের প্রথম সুযোগেই (১৯১৩) ফজলুল হক মহাজনদের চক্রবৃদ্ধিহারের নিপীড়নমূলক সুদের যাঁতাকলে পিষ্ট কৃষকদের দুর্গতির করুণচিত্র তুলে ধরলেন তাঁর ভাষণে। পরিষদ সদস্যদের সামনে কৃষকদের পর্বত প্রমাণ ঋণের বোঝার একটি খতিয়ানও তিনি উপস্থাপন করলেন। তখনকার দিনে ঋণের এই অঙ্কটি ছিলো চারশ কোটি টাকার মতো। তাঁর প্রচেষ্টায় কৃষি ঋণ সংক্রান্ত একটি বিশেষ আইন পাস হলো ব্যবস্থাপক পরিষদে। এই আইনের কল্যাণে মহাজনী সুদের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেলো দেশের লাখ লাখ কৃষক। এছাড়া সরকারি খাতে প্রদত্ত চলতি কৃষি ঋণও বিপুল পরিমাণে মওকুফ করে দেয়া হলো। এভাবে আইন সভার ভেতরে এবং বাইরে কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে একযোগে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন ফজলুল হক। বঙ্গবিভাগ রহিত করার পর বড়ো বড়ো উপাধি দিয়ে বাংলার বিক্ষুব্ধ মুসলমান

www.nagorikpathagar.org

নেতাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছিলো ব্রিটিশ সরকার। সলিমুল্লাহ্‌কে তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেসিআইসি উপাধি দেয়া হয়েছিলো। তিনি দৃঢ়তার সাথে এই উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ফজলুল হক ১৯১৩ সালে আইন পরিষদে ব্রিটিশ শাসকদের এই ভোট প্রদান নীতির কঠোর সমালোচনা করে বলেছিলেন : "ব্রিটিশ শাসকগণ যদি মনে করেন আমাদের নেতাদের উপাধি এবং পদবী বিলিয়েই পরিতৃপ্ত রাখতে পারবেন গোটা বিক্ষুব্ধ সমাজকে, তবে তাঁরা মস্তবড়ো ভুল করবেন।"

ফজলুল হকের এই উক্তিতে বঙ্গভঙ্গ রহিতকরণের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজের আহত অনুভূতিরই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যাবে। ১৯০৫ সালে এই অঞ্চলে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের রূপরেখার মধ্যে এখানকার অনুন্নত মুসলমান সমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের যে বিপুল সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছিলো, বঙ্গবিভাগ রদ করে দিয়ে ব্রিটিশ শাসকগণ সেই সম্ভাবনা থেকে তাদের বঞ্চিত করেছেন এই ক্ষোভটিই ফজলুল হক স্পষ্টস্বরে ব্যক্ত করলেন আইন পরিষদে। ১৯১১ সাল পর্যন্ত স্থায়ী তখনকার সেই বিভক্ত বঙ্গের ভৌগোলিক রূপরেখাই আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের রূপরেখা। একে ঘিরেই ফজলুল হকের রাজনীতি, তাঁর কৃষক আন্দোলন, তাঁর সংগ্রাম এবং স্বপ্ন ক্রমাগত আবর্তিত হয়ে চলছিলো। তিনি বিশ্বাস করতেন জনগণই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। আর এই জনগণের বিরাট বিপুল অংশই হলো ভাগ্যাহত কৃষক শ্রেণী। সুতরাং কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনের উপরই নির্ভর করছে গোটা সমাজের ভাগ্য এবং এই ভূখণ্ডের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। ১৯১৩ সালে নবপর্যায়ে মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে, এই সংগঠনে গণমুখী রাজনীতির ধারা সঞ্চার করে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের পথেই তিনি দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। স্মরণ রাখা দরকার, এই সময় ফজলুল হকের নেতৃত্বেই মুসলিম লীগ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের নীতি গ্রহণ করে। ব্রিটিশের কাছ থেকে মৌলিক অধিকারসমূহ আদায়ের বৃহত্তর স্বার্থেই লীগ-কংগ্রেস ঐক্য প্রয়াসে তিনি গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৬ সালে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি'তে তিনি স্বাক্ষর করেন বাংলার মুসলমানদের যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে। এই চুক্তি দ্বারা লীগের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি মেনে নেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। ১৯১৮ সালে ফজলুল হক নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। আর মাওলানা মোহাম্মদ আলী হলেন সাধারণ সম্পাদক। এই বছর একই সংগে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে হলো ফজলুল হককে। মতিলাল নেহেরু ছিলেন তখন কংগ্রেসের সহকারী সাধারণ সম্পাদক। ১৯২০ সালে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশসহ সর্বভারতীয় নেতাদের উপস্থিতিতে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় খিলাফত সম্মেলন। ফজলুল হকের নেতৃত্বেই খিলাফত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা উপহাদেশে। প্রকৃতপক্ষে যৌথভাবে পরিচালিত লীগ ও কংগ্রেসের খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতকে নড়বড়ে করে দিয়েছিলো। ব্রিটেনের তুর্কী ভূখণ্ড গ্রাসের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে ফজলুল হক সেদিন উদ্দাত্ত আহবান রেখেছিলেন উভয় সম্প্রদায়ের

www.nagorikpathagar.org

জনগণের কাছে। কিন্তু কংগ্রেসের ভ্রান্তনীতি এবং দোটানা মনোভাবের দরুন ১৯২১ সালেই আন্দোলনে ভাটা পড়ে যায়। লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে মতপার্থক্যের ব্যবধান বিস্তৃত হতে থাকে অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করেই। কংগ্রেসের আইন সভা বয়কট এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জননীতি ফজলুল হক সমর্থন করতে পারেননি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের ফলে লাখ লাখ ছাত্রের জীবন নষ্ট হয়। এতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দরিদ্র মুসলমান ছাত্ররা। ফজলুল হক অনুন্নত মুসলমান সমাজের এ ক্ষতিতে বিক্ষুব্ধ হলেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ১৯২১ সালে তিনি ত্যাগ করলেন কংগ্রেস এবং আর কখনও ফিরে যাননি এই সংগঠনে।

ফজলুল হকের অনুভূতির এই তীব্রতার মধ্যে আবিষ্কার করা যাবে তাঁর আত্মাকে। এখানেও পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে সাধারণ মানুষের প্রতি তার ভালোবাসার স্বরূপটি। এদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই যেহেতু আবর্তিত তাঁর রাজনীতি, তাই কোনো রকম অদূরদর্শিতাপ্রসূত হঠকারিতার সাথে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুনামের স্বার্থে আপস করে বৃহত্তর গণস্বার্থকে বিসর্জন দিতে তিনি অস্বীকার করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন: শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কেবল সম্ভব হিন্দু-মুসলমান বৈষম্যের অবসান। সাম্প্রদায়িক হানাহানির অবসানও একমাত্র সম অধিকার এবং সমমর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠার পথেই ঘটতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। এখানে স্মরণ রাখা দরকার বাংলাদেশের মুসলিম মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং কৃষক শ্রেণী তখন কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রে পা রাখতে শুরু করেছিলো। তাদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিলো সে সময় মাত্র ছয় শতাংশ। এর মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা ছিলো হাতে গোনার মতো। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলতে সর্বসাকুল্যে ছিলো জনকয়েক। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাবর্জন নীতি দীর্ঘস্থায়ী হলে অনুন্নত মুসলমান সমাজ কতখানি পিছিয়ে যেতো, তা সহজেই অনুমেয়। ফজলুল হক-এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতোই অগ্রিম আঁচ করতে পেরেছিলেন এবং তার জন্যেই নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে বিতর্কিত করার ঝুঁকি নিয়েও তিনি সর্বশক্তিতে বাধা দিয়েছিলেন স্বাদেশিকতার স্থূল উচ্ছ্বাসতাড়িত সেই অদূরদর্শী প্রবণতাকে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনসহ অনেক উদারপন্থী রাজনীতিকই পরবর্তীকালে উপলব্ধি করেছিলেন অসহযোগ আন্দোলন সঠিকভাবে লক্ষ্যে উপনীত হয়নি। ফজলুল হকের রাজনৈতিক বাস্তবতাবোধকেও তাঁরা স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই শেরে বাংলাই ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে উত্থাপন করেন এক ঐতিহাসিক প্রস্তাব যেখানে উপমহাদেশের উত্তরপশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অধুষিত এলাকাসমূহে একাধিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ছিল। লাহোরে সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালিত হলেও ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে লাহোর প্রস্তাবের পূর্বাব্দ বাস্তবায়ন ঘটেনি। এ জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয় আরও ২৪টি বছর। একাত্তরে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় একই সাথে ছিল শেরে বাংলার স্বপ্ন এবং লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন।

www.nagorikpathagar.org

এডভোকেট কে. এম. তাজউদ্দিন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলার অবদান

পাকিস্তান আন্দোলন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির খেয়াল-খুশির ফলশ্রুতি ছিল না। উপমহাদেশে দীর্ঘদিনের ইংরেজ শাসন ও শোষণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার স্বীকারে অনীহার প্রেক্ষিতেই এই আন্দোলনের পটভূমি রচিত হয়েছে। উপমহাদেশের কোটি কোটি অবহেলিত ও শোষিত জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ আর তাদের সার্বিক অধিকার আদায়ের দাবীই ছিল এই পরিকল্পনা ও সংগ্রামের মূল লক্ষ্য। এই আন্দোলনের সূচনা হয় পূর্ববাংলার সূর্য সন্তান নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌র উদ্যোগে ১৯০৬ সালে ঢাকার শাহবাগে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, বিকশিত হয় ডক্টর ইকবাল, চৌধুরী রহমত আলী ও হায়দরাবাদের ডক্টর লতিফের চিন্তায়, আর সুস্পষ্ট লক্ষ্যের সংগ্রামে রূপলাভ করে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের জীবন সাধনায়।

বিরাট বিশাল ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ একটি দেশ নয়—একটি উপমহাদেশ। এর আয়তন প্রায় আঠার লক্ষ আট হাজার ছয়শত আশি বর্গমাইল। সোভিয়েত রাশিয়াকে বাদ দিলে সমগ্র ইউরোপের সমান। দু'হাজার মাইল এর দৈর্ঘ্য। ১৯৪১ সালে আদমশুমারী অনুযায়ী লোকসংখ্যা চল্লিশ কোটির মত—তখনকার পৃথিবীর লোকসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ, সমগ্র ইউরোপের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশি।

ভারতবর্ষ অখণ্ড দেশ নয়। ধর্মে, ভাষায়, গোত্রে, বর্ণে বহুজাতির আবাসভূমি এই উপমহাদেশ যাদের আচার-ব্যবহার, জীবন-প্রণালী, ধর্মকর্ম, চিন্তাধারা, আঞ্চলিক চাহিদা, ইতিহাস এবং উন্নয়নেও বৈপরীত্য এত প্রকট যে, এককেন্দ্রীক শাসন এই বিশাল ভূখণ্ডের বহুধাবিভক্ত জনসমষ্টির কল্যাণের সহায়ক নয়। পরাধীন ভারতবাসীকে ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের সুবিধার্থে মানচিত্রে ভারতবর্ষ হিসেবে একটি দেশের পরিচয় দিলেও ব্রিটিশরা আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত সমগ্র অঞ্চলকে একই প্রকার শাসন ব্যবস্থার অধীনে আনতে পারেনি। তাদের ব্যবস্থাধীনে ১১টি গভর্নর শাসিত প্রদেশ, ৫৫৬টি দেশীয় করদমিত্র রাজ্য এবং চীফ কমিশনার শাসিত ব্যাপক অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ ভারতবর্ষ। প্রাদেশিক গভর্নররা গভর্নর জেনারেলের নির্দেশে শাসন করতেন। দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসকদের ব্রিটিশ সরকারকে শুধু কর দিতে হতো, সৈন্যবাহিনী রাখা বা পররাষ্ট্র বিষয়ে তাদের কোন প্রকার স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে উক্ত রাজ্যসমূহ দেশীয় শাসকদের স্বেচ্ছাধীনে শাসিত হতো। চীফ কমিশনার শাসিত অনুন্নত অঞ্চলসমূহ বা পার্বত্য অঞ্চলসমূহ চীফ কমিশনারের Ragulation দ্বারা বা গভর্নর জেনারেলের Agent দ্বারা ভিন্ন ব্যবস্থাধীনে ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন আইনে শাসিত হতো। কাজেই একক কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট এই বিচিত্র উপমহাদেশের উপযোগী নয়—চরম বাস্তবতার এই পরম স্বীকৃতিই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শাসনতান্ত্রিক পটভূমি।

www.nagorikpathagar.org

এদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার পরও ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি ভাষা ভারতীয় মুসলমানরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশত বৎসরের স্বকীয় ঐতিহ্যকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য বিসর্জন দেয়া মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় গোড়ার দিকেই ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহণ করে। ফলে ইংরেজি শিক্ষায় নব্য শিক্ষিত তরুণ হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিমের দেয়া উপহারের প্রায় ষোল আনাই দখল করে ফেলে। স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানরা পিছিয়ে পড়তে থাকে। একশত বৎসরব্যাপী এই অনগ্রসরতা মুসলমানদের রূপান্তরিত করে এক সর্বহারা অধিকারবিহীন বঞ্চিত সম্প্রদায়ে।

এদেশে ইংরেজ শাসনের পত্তন হয় ব্রিটিশ বণিক সঙ্ঘ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে। কাজেই এই বণিকদের অধিক মুনাফা লাভ ও শোষণই ছিল শাসনের আসল উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে তারা এদেশে প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে নতুন শহর ভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তোলে। এদেশের গ্রামীণ শিল্পকে ধ্বংস করে নিজেদের পুঁজি বিনিয়োগের পথ সুগম করার জন্য বণিকরা শহরে কারখানা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এ প্রক্রিয়ায় নিছক স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে কোম্পানি আমলে ভারতে অনুগ্রহ ভিখারী এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি করে। এদেশের মাটি থেকে এদেশের সামাজিক ও আর্থিক কল্যাণ সৃষ্টি থেকে এ শ্রেণীর জন্ম হয়নি। ব্রিটিশরা এ শ্রেণীর বিকাশের সহায়তা করেছিল তাদের তাবেদার অনুকারী হওয়ার বীজমন্ত্র দিয়ে, নতুন ও মহৎ মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়ে নয়।

ব্রিটিশ শিক্ষানীতির ফলে যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হলো, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারি চাকরিতে ও কাউন্সিলে ব্যক্তিগত পদ মর্যাদায় টিকে থাকা, জনশিক্ষার প্রসার বা দেশের মানুষের সার্বিক আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন নয়। কাজেই মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা বর্জনের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারি চাকুরে, ডাক্তার, উকিল, ইংরেজ বণিকদের এজেন্ট, গোমস্তা, মুৎসদ্দি বা দেওয়ান রূপের যে সৌভাগ্যবান শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে তারা হিন্দু ধর্মানুসারী বাবু সম্প্রদায়।

পক্ষান্তরে পলাশীর পর অর্ধ শতকের মধ্যে বাংলার তুলা ও রেশম বস্ত্র শিল্প এবং অন্যান্য কুটির শিল্প একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায়। নিজেদের শিক্ষা-বাণিজ্য লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় বিদেশীর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লো পরনের বস্ত্র ও প্রাত্যহিক আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির জন্য। এদেশের কাঁচামাল তুলা ইত্যাদি বিলেতে বহন করে তা দিয়ে তৈরি পণ্য এদেশে আমদানি করে কোম্পানি দ্বিমুখী মুনাফা লুটে। ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে আর এদেশ পুরোপুরি কৃষিজীবী দেশে পরিণত হয়।

অন্যদিকে ইংরেজদের প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তন ও পরিবর্তনের ফলে এদেশের কৃষি অর্থনৈতিক কাঠামো ধসে পড়ে। যদৃচ্ছা তালুক বিলি, জমিদার সৃষ্টি, দশশালা-পাঁচশালা-একশালা বন্দোবস্ত, সূর্যাস্ত আইন এবং পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যমেই ইংরেজ তার রাজস্ব আদায়ের পন্থাকে সুনিশ্চিত করেছে সত্য, কিন্তু ভূমির সংগে সম্পর্কহীন একদল লোককে ভূমির মালিক বানিয়ে, বহু মধ্যস্বত্ব ভূম্যাধিকারীর সৃষ্টি করে কৃষক এবং কৃষিজীবীকে শোষণের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

www.nagorikpathagar.org

এখন শিল্পখাতে পথ যখন রুদ্ধ; কৃষিতে জীবন যখন বিপর্যস্ত, একমাত্র ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ ছাড়া মানুষের আর কোন গত্যন্তর রইল না। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া এ পথ অনুসরণ সম্ভব ছিল না। মুসলমানরা প্রথমদিকে ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করলেও এক শতাব্দী পরে স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলন এবং নওয়াব আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করে। এবার চাকরির অন্বেষণে বের হয়ে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে। ১৮৬৯ সালের দূরবীন পত্রিকার এক চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়—নিচে লেখা রয়েছে যে, মুসলমানদের কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। বাংলাদেশে সরকারের এক সার্কুলারে দেখা যায় : "When the head ministerial officer in the department is a Hindoo, it is asserted that he makes every offort to secure that all subordinate officers in his department are filled by Hindoos (Circular No. 8 of 27th January, 1986 Para— 3)। তাছাড়া ১৯০২ সালে জনৈক K. P. Ghosh বাংলাদেশে Inspector General of Registration এর পদে নিযুক্ত হয়ে নির্দেশ দেন, যেন কোন মুসলমানকে Registration বিভাগে চাকরিতে নিযুক্ত করা না হয়। এ ধরনের অসংখ্য নজীর ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষের উন্মেষ এ প্রেক্ষাপটেই উপমহাদেশে তীব্র আকার ধারণ করে। এছাড়া গো-হত্যা বন্ধ এবং মসজিদের সম্মুখে বাদ্য বাজানো নিয়েও এই বিদ্বেষ তীব্রতর হয়ে ওঠে।

এ পরিস্থিতেতে ১৮৮২ সনের ৬ ফেব্রুয়ারি নওয়াব আবদুল লতিফের নেতৃত্বে কলিকাতার Central National Muhammadan Association লর্ড রিপনের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করে : The memoralists described at length the causes which led to the gradual imperishment of the Muslims of India under British rule. English educated Hindu Youths, trained for the most part in missionary institutions from which the Mussulmans stood aloof; now poured into every Govt. office and completely shut out the Muhammadans (Memorial to Marquies Ripon, para II).

১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর মহামান্য আগা খানের নেতৃত্বে সারা ভারতের ৩৪ জন মুসলিম নেতা বড়লাট লর্ড মিন্টোর সংগে সাক্ষাৎ করে মুসলমানদের দৈন্যতার চিত্র তুলে ধরেন এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী জানান।

ব্রিটিশ আই. সি. এস. স্যার হিউম ১৮৮৫ সালে শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের সংগে যোগসাজস রাখার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত করে। ব্রিটিশ আমলাদের সহায়তায় অতি অল্পকালেই কংগ্রেস শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। প্রথমদিকে দাদাভাই নওরোজী ও গোখেলের মত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন নেতা থাকলেও পরবর্তীতে বালগংগাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা রাজপত রায় এবং বিপিন পাল প্রমুখ উগ্রপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নেতাদের আবির্ভাবে কংগ্রেস অচিরেই সংখ্যাগুরু

www.nagorikpathagar.org

হিন্দু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই উগ্রপন্থীদের মতে, হিন্দু সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির মূলভিত্তি, অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনুসারীরা বহিরাগত এবং ভারতীয় সংস্কৃতির খণ্ডিত অপভ্রংশ, শিবাজী ভারতীয় জাতীয় চেতনার প্রতীক, গণপতি পূজা ভারতের জাতীয় অনুষ্ঠান এবং "বন্দোমাতরম" ভারতের জাতীয় সংগীত। এই ধারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। কংগ্রেসের ভিতরে অনেক মুসলমান নেতা থাকলেও তারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এই অপব্যাখ্যাকারীদের কার্যক্রম রোধ করতে পারেননি। পরিণতিতে ইংরেজ শাসনে পরিপুষ্ট, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত অগ্রসর এক শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক অবহেলা ও অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয় বৃহৎ ভারত ভূখণ্ডের বিভিন্ন সংখ্যালঘু বহু জনগোষ্ঠী। সারা ভারতে দেখা দেয় ব্যাপক সামাজিক নৈরাজ্য ও রাজনৈতিক সঙ্কট।

কায়েমী স্বার্থবাদীদের এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠে উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠী, তৎকালীন জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ, দশকোটি মুসলিম জনতা। ১৯০৬ সালে তাই স্বাধিকার আদায় ও শোষণ মুক্তির জন্য ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। উক্ত সম্মেলনে নওয়াব ভিকার-উল-মূলক সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন : "Time and circumstance have made it necessary for Mohomedans to unite in asociation so far as to make their voice heard above the din of other vociferous parties in India and across the wide seas in England" (The Pioneer, 2nd January, 1907).

উক্ত সভায় নওয়াব সলিমুল্লাহ্ বলেছিলেন : "Now political movement had been forced upon them. Had the party now in power in England been familiar with the position of Moslems and had Indian public men represented justly, Moslem claims of the movement might perhaps not been heard of, but quite unobtrusive work was now at a discount and only those who cried loudest had a chance of being heard. Moslems had therefore been forced against own wishes to abandon their traditional policy in order to secure easement of very real disabilities and to aviod danger that their interests might be neglected, while other communities in India were benefited" (The Pioneer, 2nd January, 1907).

উপরোক্ত বক্তব্যে বুঝা যায় যে, কি পরিস্থিতির দরুন মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বোধের উদ্রেক হয়। এরপর কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে শুধু সংখ্যালঘু মুসলমানদের ন্যায্য হিস্সা বা দাবী স্বীকারের জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে বহু বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্যাক্ট ও রিপোর্ট প্রণীত হয়। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট, পরবর্তীতে জিন্নার চৌদ্দ দফা প্রভৃতি। ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম নেতারা যখন এ ব্যাপারে ব্যর্থ হলেন, লন্ডন থেকে পাঁচজন শ্বেতাঙ্গ সম্বলিত Symond Commission

www.nagorikpathagar.org

ভারতে আসেন। কিন্তু এই কমিশনের রিপোর্টও গ্রহণীয় হলো না। ১৯২৮ সালে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু মুসলমানদের সব রকম দাবী অস্বীকার করে নেহেরু রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্ট হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক চিরদিনের জন্য কবরস্থ করে।

অপর দিকে ব্রিটিশ-ভারতের ভাবী শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর জন্য ব্রিটিশ রাজ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য আগ্রহী ছিলেন। এটা তাদের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল। তাই হিন্দু-মুসলিম নেতারা যখন ব্যর্থ, ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ সরকার তখন ১৯৩০ দশকে পর পর তিন বৎসর হিন্দু-মুসলিম নেতাদের লন্ডনে পর পর তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন। কংগ্রেস এবং মুসলিম নেতারা তিনটি সম্মেলনেই ঐকমত্যে পৌঁছতে পারলেন না। গান্ধীর নেতৃত্ব সেদিন মুসলমানদের আনুপাতিক বাঁচার দাবী পর্যন্ত স্বীকার করতে পারেনি। শাসনতান্ত্রিক এই সঙ্কটে ১৯৩৫ সালে ইংল্যান্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে মেক ডোনাল্ড নিজে এওয়ার্ড জারী করে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পাস করেন। এই আইনে ব্রিটিশ-ভারতে ১১টি গভর্নর শাসিত প্রদেশ সৃষ্টি হয়। পৃথক নির্বাচন প্রথা স্বীকৃত হয়। সিন্ধু, সীমান্ত অঞ্চল এবং আসামকে গভর্নরের অধীনে প্রদেশে রূপান্তরিত করা হয়। নতুন প্রদেশগুলো প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এবং স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার ভিত্তিতে দুই পরিষদ বিশিষ্ট আইন সভার সমন্বয়ে স্বায়ত্ব শাসন লাভ করে।

১৯৩৫ সালের আইন বলে ১৯৩৭ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথায় তাদের অভিব্যক্তি, অভাব-অভিযোগ আইন সভায় প্রকাশের প্রথম সুযোগ লাভ করে। কিন্তু কংগ্রেস সদস্যরা প্রত্যেক প্রদেশেই সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে বঞ্চিত সম্প্রদায়কে তাদের অধিকার আদায়ে বাধা দেয়। তাই দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়– স্বাধীনতার দাবীদার কংগ্রেস মুসলিম জনগণের উপকার হবে ভয়ে বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় সেদিন প্রাথমিক শিক্ষা বিল, মহাজনী আইন বা জমিদারী উচ্ছেদ বিলের সমালোচনায়ও মুখর হয়ে ওঠে। সেকালে মুসলিম-বিদ্বেষ হিন্দুদের মধ্যে কতখানি তীব্র ছিল, তার অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতির দরুন ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। নাজিম সরকার জরুরি ভিত্তিতে বিহার এবং উড়িষ্যা থেকে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ক্রয় করার প্রস্তাব করলে ব্যবস্থাপক সভার বাঙালি হিন্দু সদস্যরা হিন্দু অধ্যুষিত বিহার এবং উড়িষ্যায় খাদ্যাভাব দেখা দেবে এই খোঁড়া অজুহাত তুলে উক্ত প্রস্তাবে বাধা দেন। নাজিম সরকার জরুরি ভিত্তিতে পাঞ্জাব থেকে গম আনার সিদ্ধান্ত নেন। পাঞ্জাব সরকারও গম পাঠাতে রাজী ছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাসভা পন্থী শিবনাথ শাস্ত্রী মহাযুদ্ধের অজুহাতে খাদ্য চলাচলে কর্ডন প্রথা চালু করায় পাঞ্জাব থেকে সেদিন বাংলায় খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। ফলে ৫৫ লক্ষ বঙ্গ-সন্তান খাদ্যাভাবে মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

কংগ্রেস নেতৃত্ব যখন সাম্প্রদায়িক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অনড়, ন্যায়ভিত্তিক সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার মেনে নিয়ে সহ-অবস্থানে কোন ফরমুলা কোনমতেই কংগ্রেসের নিকট যখন গ্রহণীয় হলো না, তখন অবশেষে ১৯৪০ সালে লাহোরে মিন্টো

www.nagorikpathagar.org

পার্কে ২৩ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ সম্মেলনে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধান কল্পে এক ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন তৎকালীন বাংলার প্রধান মন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

প্রস্তাবের প্রথম অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে পরিকল্পিত ফেডারেশন দেশের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও অকার্যকর এবং মুসলমানদের পক্ষে তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়, যদিও ১৯৩৯ সালের ১৮ অক্টোবর তারিখে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভাইসরয় ঘোষণা করেছেন যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন যে সকল নীতির ভিত্তিতে পরিকল্পিত হয়েছে, সেগুলো আবার ভারতের বিভিন্ন দল, স্বার্থ ও সম্প্রদায়সমূহের সহিত পরামর্শের পর পুনর্বিবেচনা করা হবে এবং যদিও এই ঘোষণাটি আশাব্যঞ্জক তথাপি মুসলিম-ভারত জানিয়ে দিচ্ছে যে, যদি সমগ্র শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নতুনভাবে পুনর্বিবেচনা না করা হয় এবং যদি তা মুসলমানদের অনুমোদন ও সম্মতি ব্যতীত তৈরি করা হয় তাহলে সেরূপ পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করবে না।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়, ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সন্নিহিত স্থানসমূহ অঞ্চল বা জোন হিসেবে নির্দিষ্ট করতে হবে, প্রয়োজনানুযায়ী সীমানা সুসামঞ্জস্য করে এই সকল অঞ্চল এমনভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই সকল অঞ্চলসমূহকে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে পরিণত করা যায় এবং এই রাষ্ট্র গঠনকারী অংশসমূহ স্বায়ত্বশাসিত ও সার্বভৌম হবে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলা হয়, এই সকল অঞ্চল ও অংশসমূহের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় তমুদ্দনিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও বাধ্যতামূলক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ভারতের অন্যান্য অংশে যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ, সেখানে তাদের সংগে পরামর্শ করে, অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত কার্যকর ও বাধ্যতামূলক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং এটা সমর্থন করেন ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের মুসিলম নেতৃবৃন্দ।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, এই প্রস্তাবে "পাকিস্তান" শব্দের কোন উল্লেখ নেই, এ শব্দটি কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। অথচ পরদিন হিন্দু সংবাদপত্রগুলো উপহাসস্থলে এ প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান' প্রস্তাব আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু উপহাসস্থলের এই শব্দটি পরবর্তীকালে জনপ্রিয় আন্দোলনের রূপ নেয়। প্রস্তাবে কংগ্রেসের তল্পীবাহকরা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে ওঠে এবং সোচ্চারে বলে উঠে, "এ অসম্ভব লক্ষ্য, উন্মাদের প্রলাপ।"

১৯৪০ থেকে '৪৭ মাত্র সাত বৎসরেই পাকিস্তান আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। তার মূলে রয়েছে উপমহাদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি। মুসলিম সমস্যার সমাধান টেবিলে বসেই কংগ্রেসীরা করতে পারতেন। ১৯১৭ সালে কলিকাতা

www.nagorikpathagar.org

কংগ্রেসে জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছিলেন হিন্দু নেতাদের মধ্যে একমাত্র চিত্তরঞ্জন দাস। কংগ্রেসকে বুঝাতে ব্যর্থ হয়ে পরে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করলেন এবং বাংলাদেশ স্বরাজ পার্টি গঠন করলেন। বেঙ্গল প্যাক্টে স্বাক্ষর করে তিনি স্বীকার করলেন বাংলাদেশে শতকরা ৫৪ জন মুসলিমের জন্য শতকরা চুয়ান্নভাগ সরকারি চাকরি মুসলমানদের দিতে হবে। যতদিন এই কোটা পূরণ না হবে আগামী নিয়োগের শতকরা ৮০ ভাগ বঞ্চিত মুসলমানদের জন্য রিজার্ভ থাকবে। কিন্তু দেশবন্ধুর এই অভিমত কংগ্রেস স্বীকার করেনি। কাজেই সমস্যার সমাধানও হয়নি।

পাকিস্তান প্রস্তাব পাসের পর মুসলিম লীগ দুই রাষ্ট্রতত্ত্ব ছাড়া অন্য কোন প্রস্তাবে রাজী হয়নি। ১৯৪৪ সালে জিন্নাহ-গান্ধী বৈঠক এবং পরবর্তীকালে সিমলা কনফারেন্স কোথাও সমস্যার সমাধান হলো না। ১৯৪৬ সালের ব্রিটিশ কেবিনেট মিশনের গ্রুপসিস্টেম স্বীকার করে জিন্নাহ সাহেব ফেডারেশন পন্থায় ঐক্যের শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু প্রথমে স্বীকার করে পরে তা অস্বীকার করায় জিন্নাহ সাহেবও প্রস্তাবটি অস্বীকার করেন। ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে গঠিত এক ফেডারেশনের বাস্তব ন্যায়ানুগ সম্ভাবনা চিরদিনের জন্য তিরোহিত হয়।

অবশেষে বহু রক্তক্ষয়ের পর নেহেরু-প্যাটেল-গান্ধী-রাজেন্দ্র প্রসাদরা বাংলা পাঞ্জাব বিভাগের প্রেক্ষিতে অর্থাৎ খণ্ডিত পাকিস্তান স্বীকার করেন। ১৯৪৭-এর ৩ জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেশ-বিভাগের ব্রিটিশ নীতি ঘোষণা করেন। ১ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলের সম্মতিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা বিল পাস হয়। ১৪ আগস্ট মাঝরাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দলিলে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের প্রতিভূরূপে লর্ড মাউন্টব্যাটেন সই করলে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়।

পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলাদেশের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। ১৯০৬ সালে বাংলার তদানীন্তন মুসলিম নেতা নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌র প্রচেষ্টায় উপমহাদেশে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয় ঢাকার শাহবাগ উদ্যানে। In the establishement of the League, Bengali Muslims played a most important role. Much of the initative came from Nawab Salimullah of Dhaka. He drew up a scheme for an all-India Muhammadan confederacy (The Indian Spectator, 22 December, 1906)। সম্মেলনে আগত বোম্বের ব্যরিস্টার রফিউদ্দিন এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "The Nawab of Dhaka has rendered the Muhammadan of India a great service in inviting the delegates to the conferance to sit at Dhaka to discuss the present political situation. By this meeting his objects of the establishment of a central political organisation for Muhammadans has been achieved. What is more, more but the Nawab of Dhaka could have brought this to paess (the

www.nagorikpathagar.org

Englishman, 4 January, 1907)। মুসলিম লীগ গঠনের পর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সম্পাদনায় প্রকাশিত 'The Bengalee' পত্রিকার ১০ জানুয়ারি সংখ্যায় মুসলিম লীগকে "Nawab Salimullah's fad" বলে আখ্যায়িত করা হয়- "The congress paper went on to make comment". A man knowing him personally cannot help regretting that such an amount of energy should be misdirected..... for an ignorimous cause (The Bengalee, 10 January, 1907).

এভাবে ১৯০৬ সালে বাংলার মাটিতেই মুসলিম লীগের উদ্ভব হয়। বাংলার আরেক কৃতী সন্তান স্যার আমির আলী লন্ডনে ১৯০৭ সালে মুসলিম লীগের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইংল্যান্ডের জনগণের কাছে ভারতের মুসলমানদের দুর্দশার কাহিনী তুলে ধরেন। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে বাংলার চারজন জননেতা স্বাক্ষর করেন। ১৯২০ সালের খিলাফত আন্দোলনেও বাংলার মানুষ সক্রিয়ভাবে সমর্থন দিয়েছে। ১৯২৮ সালের কুখ্যাত নেহেরু রিপোর্ট কলিকাতায় বিরাট জনসভায় নিন্দিত ও ধিকৃত হয়। ৩০-এর দশকের বিলাতের তিনটি গোলটেবিল বৈঠকে বাংলার মুসলিম নেতারা সর্বভাতীয় মুসলমানদের কল্যাণে সোচ্চার ছিলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে জিন্নাহ সাহেবের আহ্বানে ইউনাইটেড পার্টির নাম পাল্টিয়ে কলিকাতায় শক্তিশালী মুসলিম লীগের শাখা গঠিত হয়। নির্বাচনের পরে ফজলুল হক সাহেব মুসলিম লীগে যোগ দিলে বাংলাদেশে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৩৭ সালের পরবর্তী সময়ে বাংলার মুসলিম লীগ নেতারা উড়িষ্যার মুসলিম লীগ গঠনে সহায়তা করেন, বিহারে মুসলমানদের আন্দোলনে সাহায্য করেন এবং মাদ্রাজের মুসলিম লীগ পুণর্গঠনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যান। উত্তর প্রদেশের দাংগায় বাংলার মুসলমান নেতারা আর্থিক এবং নৈতিক সমর্থন দেন। ঐ সময়েই লক্ষ্ণৌর এক জনসভায় বাংলার তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক উর্দুতে তেজোদৃপ্ত ভাষণে বলেছিলেন, "যদি উত্তর প্রদেশে একটি মুসলমানকে হত্যা করা হয় আমরা বাংলাদেশে দশজন হিন্দুর উপর এর দাদ নিব।" এ ভাষণের সময়েই সমাগত জনতা ফজলুল হককে "শেরে বাংলা" বলে অভিহিত করে এবং এই নামেই তিনি আজ সমধিক পরিচিত। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পেশ করার জন্য বাংলার তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শেরে বাংলাকেই ভারার্পিত করা হয়। স্বাগতিক প্রদেশ হিসেবে পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রীর এ প্রস্তাব পেশ করা উচিত ছিল। কিন্তু পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী খিজির হায়াত খানের পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি আন্তরিক সমর্থন ছিল না। তাই বাংলার প্রধান মন্ত্রীই সারা ভারতের মুসলমানদের মুক্তির আওয়াজ তুলে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের চরম চাওয়া পাওয়ার দিনে পাকিস্তান ইস্যুর উপর সারা ভারতের মুসলমানদের মতামত যাচাইয়ের জন্য ব্রিটিশ সরকার সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দেন। সেই পরম মুহূর্তে বাংলার মুসলমানরা শতকরা ৯৫ ভাগ ভোট মুসলিম লীগকে প্রদান করে পাকিস্তান দাবীর সত্যতা, জনপ্রিয়তা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের লীগ দলীয় সদস্যদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ৪৭০ জন মুসলমান পরিষদ সদস্য উপস্থিত

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন। উক্ত সম্মেলনের ঐতিহাসিক প্রস্তাবের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়, "ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বাংলা ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান অঞ্চলসমূহ—অর্থাৎ পাকিস্তান অঞ্চলসমূহ যেখানে মুসলমানরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলোর সমন্বয়ে একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হোক এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে দেওয়া হোক।" লাহোর প্রস্তাবের মত এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবটিও পেশ করেন বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সমর্থন করেন চৌধুরী খালিকুজ্জামান, মালিক ফিরোজ খান নুন, শওকত হায়াত খান, বেগম শাহনাওয়াজ প্রমুখ।

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বোম্বাই অধিবেশনে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই কর্মপন্থার প্রথম ধাপে খেতাবধারীদের ব্রিটিশের দেওয়া খেতাব বর্জনের অনুরোধ করা হয়। বাংলার মুসলিম লীগ নেতা স্যার নাজিমউদ্দীন তৎক্ষণাৎ মঞ্চে উঠে স্যার খেতাব বর্জন করেন। দ্বিতীয় ধাপে ১৬ আগস্ট তারিখে সর্বত্র সভা করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মুসলিমবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ১৬ আগস্ট তারিখে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে বাংলার রাজধানী কলিকাতার বুকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চারদিনব্যাপী হিন্দু ও শিখ গুণ্ডাদের আকস্মিক আক্রমণে বীভৎস দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। বহু মুসলমান এতে প্রাণ হারায়, জখম হয়। বেসরকারি হিসাবে হতাহতের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। মেমন ও লাম্বি লিখেছেন ১৫,০০০ ও ১৪,০০০ হতাহত। আয়ান স্টিফেনসনের হিসাবে হতাহত ২০,০০০ তার চাইতেও বেশি। কলিকাতার মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের এই পূর্বপরিকল্পিত দাঙ্গার সময়ে মুসলমানদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য নিজের জানকে বাজী রেখে দৃঢ় ভূমিকা পালন করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। যাহোক সেদিন কলিকাতায় হাজার হাজার মানুষের জীবনের বিনিময়ে পাকিস্তানের প্রাথমিক ভিত রচিত হয়েছিল। এই দাঙ্গার পর সেপ্টেম্বরে নোয়াখালীতে হাঙ্গামা হয়। পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর সেনাপতি টুকার লিখেছেন : "The number of casualties will be from two hundred to three hundred but terrible and delibarately false stories were blown all over the world by hysterical Hindu press" (While Memory Serves : Francis Tucker : page 176). যার ফলে বিহারে তৎপরে গড়মুক্তস্বরে ইচ্ছাকৃত পরিকল্পিত উপায়ে মুসলিম নিধন শুরু হয়। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলীর নির্দেশক্রমে ২৪ আগস্ট লর্ড ওয়াভেল কলিকাতার হাঙ্গামা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য সেখানে যান। মেনন লিখেছেন, "সেখানে সব দেখেশুনে ভাইসরয়ের বিশ্বাস হয়েছিল যে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা করতে না পারলে কলিকাতার ঘটনার পনরাবৃত্তি হবে সারা ভারতে।" কলিকাতায় খাজা নাজিমউদ্দিনের সংগে লর্ড ওয়াভেলের সাক্ষাৎ হয়। নাজিমউদ্দিন ওয়াভেলকে মুসলিম লীগের সংগে অন্তর্বর্তী সরকারের এবং ১৬ তারিখের ক্যাবিনেট মিশনের ঘোষণার ব্যাপারে আলাপ করার অনরোধ করেন। জি. আল্লানা

www.nagorikpathagar.org

লিখেছেন, "এই সময় বাংলার উজিরে আলা (হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী) এক বিবৃতিতে বলেন যে, "যদি ভাইসরয় কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন তিনি (সোহরাওয়ার্দী) বাংলাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ঘোষণা করবেন এবং এই প্রদেশকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে গণ্য করা হবে এবং এই অঞ্চল থেকে কোন রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হবে না অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নির্দেশ এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র মানবে না।" (Quaid-i-Azam Jinnah : G. Allana. Page 415-416)। তবুও ওয়াভেল ২ সেপ্টেম্বর পণ্ডিত নেহেরুকে দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করান আর সংগে সংগে বোম্বাই, আহমদাবাদে ব্যাপক হাঙ্গামায় কয়েক হাজার মুসলমান প্রাণ হারায়। ১৯৪৬ সাল অতীত হয়ে গেলে শুরু হলো ১৯৪৭ সাল। জেনারেল টুকার লিখেছেন : The year was born in torment. In north Bihar, U.P, all over Bengal and in the alleyways of Calcutta, the minds of men were taunt with fear and benumbed with contemplation of dradful things that they and their brothers had done. Terror had given place to revenge and revenge in turn once be one to terror" (While memory serves, Page 107).

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী মি: এটলী ঘোষণা করেন, ব্রিটিশ সরকার ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহ যদি কোন সিদ্ধান্তে না পৌছতে পারে তবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। ১৯৪৭ সালে ৪ এপ্রিল বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কামিটি একটি প্রস্তাব আনলেন- ২০ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা অনুসারে ব্রিটিশ সরকার যদি প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন তাহলে বাংলার যে অংশ ভারতীয় ইউনিয়নের সংগে থাকতে ইচ্ছুক তাকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে হবে। ঐ বৎসরের জানুয়ারি মাসে ***আজাদ হিন্দ ফৌজের এ. সি. চাটার্জি বাংলাকে ভাগ করার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন।*** শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বপ্রথম বাংলার হিন্দুদের একটি স্বতন্ত্র প্রদেশের জন্য সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন এবং হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন জেলায় প্রবল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু করে। ***তারেকশ্বর মেলায় এ. সি. চাটার্জি বলেন, "বঙ্গদেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের একটি মাতৃভূমি চাই।"*** ২২ এপ্রিল নতুন দিল্লীতে ডা. শ্যামাপ্রসাদ ঘোষণা করেন, "পাকিস্তান যদি গঠিত না-ও হয়, মুসলিম লীগ যদি মন্ত্রী মিশন পরিকল্পিত দুর্বল কেন্দ্রীয় ক্ষমতা মেনে নেয়, তাহলেও বাংলার হিন্দু মেজরিটি অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করত হবে।"

এমতাবস্থায় বাংলার প্রধান মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী বলেন, "যদি বঙ্গ বিভাগ সফল হয় তবে ভারত কিংবা পাকিস্তান উভয় দেশেই বাঙালিরা দুর্বল হয়ে পড়বে।" মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলা আর পাঞ্জাব বিভাগকে অস্বীকার করলেন এবং সমগ্র আসাম দাবী করলেন। বড়লাট মাউন্টব্যাটেন শুধু গণভোটে আসামের সিলেট দিতে রাজী হলেন, কিন্তু পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগে অটল রইলেন। এবার জিন্নাহ সাহেবের পরামর্শক্রমে বাংলার নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলাদেশ অবিভক্ত রাখার জন্য স্থানীয় হিন্দুনেতা শরৎচন্দ্র বসু এবং কিরন

www.nagorikpathagar.org

শংকর রায়ের সাথে আলোচনা শুরু করেন। তাদের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা এবং কয়েকবার পত্র বিনিময়ও হয়। কিন্তু হঠাৎ সে আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। কৃত্তিবাস ওঝা, "আমি মুজিব বলছি" পুস্তকে লিখেছেন যে, শরৎ বসু ভারত ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছাড়া যুক্ত বাংলায় রাজী হননি, অবশ্য শহীদ সিরাজুদ্দিন হোসেন রচিত 'ইতিহাস কথা কও" বইয়ে দেখা যায়, গান্ধীর বিরোধিতার কারণেই যুক্ত বাংলার প্রস্তাব নস্যাৎ হয়। এদিকে বাংলাদেশের মুসলিম লীগ দলের পরিষদ সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গ প্রদেশকে অবিভক্ত রাখার সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেন, আর অন্যদিকে হিন্দু সদস্যরা বাংলাদেশকে ভাগ করার জন্য সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে। কি বিচিত্র এ দেশ। ১৯০৬ সালের বঙ্গ বিভাগে যেসব হিন্দু নেতা "সোনার বাংলা তোমায় ভালবাসি" বলে কবিতা পড়ে, গান গেয়ে সুরের মূর্চ্ছনায় আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছিলেন, এই সেদিনও অবিভক্ত বাংলার প্রেমে হিন্দু মেয়েরা প্রতিবৎসর ৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিনে শোক স্বরূপ কোন প্রকার অলঙ্কার না পড়ে মুখে ছাই মেখে ম্লানমুখে দিবসটি কাটাতেন, আর ৪০ বছর পর তাদের উত্তরসূরীরাই বাংলা মায়ের ব্যবচ্ছেদের জন্য হন্যে হয়ে উঠলেন। বাংলা বিভাগের এই জঘন্য কাজটা ষোলকলায় পূর্ণ করেন **বিলাতের হাউস অব লর্ডসের সদস্য লর্ড র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে বাউন্ডারী কমিশন**। সঙ্গে কলিকাতার হাইকোর্টের দু'জন মুসলিম বিচারপতি যতাক্রমে **বিচার পতি আবু সালেহ মোহাম্মদ আকরাম এবং বিচারপতি** এস. এ. রহমান আর দু'জন হিন্দু বিচারপতি যথাক্রমে **বিচারপতি বি. কে. মুখার্জি** এবং **বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস** এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। "কমিশন গঠনের পূর্বেই কলিকাতা হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেসকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে কলিকাতার এক জনসভায় প্যাটেল বলেছিলেন যে, "কলিকাতা হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর আমরা বিভাগে সম্মত হয়েছিলাম।" (কায়েদে আজম : পৃষ্ঠা ৮৫৯)। ১০ আগস্ট র‍্যাডক্লিফ লন্ডন ফিরে গেলেন। ১৭ আগস্ট র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ প্রকাশিত হলো। বাংলার মুসলমানরা সংগ্রাম করেছিল আসাম ও বাংলাদেশকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান কায়েমের জন্য। কিন্তু ১৪ আগস্ট গভীর রাতের অন্ধকারে যে রাষ্ট্রের পত্তন হলো– মানচিত্রে সেখানে আবির্ভূত হলো সিলেটসহ পূর্ববঙ্গের মাত্র ১৯টি জেলা সমন্বয়ে পূর্ব পাকিস্তান।

www.nagorikpathagar.org

আবদুল গফুর

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

১৯৪৭ সালে তদানীন্তন ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রায় সর্বসম্মত দাবী এবং হিন্দু নেতৃবৃন্দের সম্মতির ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি ছিল ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। এই লাহোর প্রস্তাব ছিল হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত এ উপমহাদেশের শত শত বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির ফসল। লাহোর প্রস্তাবের দুটি দিক ছিল : এক. উপমহাদেশকে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলের ভিত্তিতে বিভক্ত করা, দুই. উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম এলাকাসমূহের সমন্বয়ে একাধিক পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন। লাহোর প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' শব্দ ছিল না। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের যে অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় তার সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে হিন্দু সংবাদপত্রগুলোই প্রথম এটাকে 'পাকিস্তান' প্রস্তাব বলে উল্লেখ করে এবং মুসলিম লীগও পরবর্তীকালে এ নামকরণ মেনে নেয়। ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ লেজিসলেটার্স কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাব আংশিক সংশোধনের মারফৎ উপমহাদেশের দুই প্রান্তের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের সমবায়ে একাধিক রাষ্ট্রের স্থানে একটি মাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন মুসলিম-বাংলার কৃতী সন্তান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সেদিন উপমহাদেশের মুসলমানদের দাবী-দাওয়ার বিরুদ্ধে হিন্দু-ব্রিটিশ অশুভ আঁতাতের মোকাবিলায় বৃহত্তর মুসলিম সংহতির প্রয়োজনে এই সংশোধনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, এরূপ ধারণা করবার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে।

লাহোর প্রস্তাবে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলের ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভক্ত করার কথা বলা হলেও এ প্রস্তাবের কোথায়ও সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। এ প্রস্তাব বরং ছিল সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার একটি বাস্তব প্রচেষ্টা মাত্র। লাহোর প্রস্তাবের যাঁরা প্রবক্তা, শেরে বাংলা, কায়েদে আজম প্রমুখ, তাঁরা সবাই জীবনভর হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলেমিশে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁদের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব ও তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই মুসলিম নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে দেশ বিভাগ দাবী করতে বাধ্য হন। এই দাবী হিন্দু নেতৃবৃন্দ মুখে স্বীকার করলেও পরবর্তীকালে অবশ্য প্রমাণিত হয়– তাঁরা কখনও এ দাবী অন্তর থেকে স্বীকার করেনি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা থেকে বাংলাদশের অভ্যুদয় পর্যন্ত এই চব্বিশ বৎসর নানা কারণেই জাতির ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম শাসনের অবসানের পর উনিশশো সাতচল্লিশ পর্যন্ত ছিল দেশী-বিদেশী অমুসলিম শক্তির মোকাবিলায় স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার সংগ্রাম, যার শেষ পর্যায়ে এ

www.nagorikpathagar.org

সংগ্রাম মুসলিম নব জাগরণের আন্দোলনে উন্নীত হয়েছিল। এক হিসেবে সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত ছিল যেন এই রেনেসাঁ থেকে পশ্চাদপসরণের পালা। একটা দুর্ভাগ্যজনক ভুল বোঝাবুঝি, আত্ম-বিস্মৃতি, অবিবেচনা ও বিদ্বেষ হলাহলের পরিণতিতে একটি রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের মাধ্যমে উন্নয়নশীল মুসলিম রাষ্ট্রের দ্বিধাবিভক্তি। চিত্রের এ হচ্ছে একটি দিক। চিত্রের আরেক দিকে এ হচ্ছে বৈষম্য, অবিচার, অত্যাচারের অবসানে স্বাধীনতার এক নব উদ্বোধন- পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নবতর স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের সংযোজন। উপমহাদশের পরিস্থিতির বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে হলেও একটি স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীর নবতর পদচারণা। শতাব্দীর ইতিহাসের প্রেক্ষিতে অনিশ্চয়তার আশংকায় দোদুল্যমান মনে হলেও দুঃসাহসিকতার অভিধায় উচ্চকিত এক নব অভিযাত্রা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলার ভূমিকা ছিল যে-কোন বিচারে গৌরবদীপ্ত। বাংলাদেশ শুধু পাকিস্তান আন্দোলনকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত মুসলিম লীগেরই জন্ম দেয়নি, পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপকও ছিলেন বাংলার কৃতী সন্তান শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। ব্রিটিশ-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভাই সেই চরম দিনগুলোতে পাকিস্তান আন্দোলনে কায়েদে আজমের হাতকে সর্বাধিক শক্তিশালী করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান যখন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন দেখা গেল এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে বাংলার স্থান হয়ে গেল অত্যন্ত সঙ্কুচিত। প্রশাসন, সেনাবাহিনী, ব্যবসায়-বাণিজ্য সর্বত্রই তাদের এই দুর্বল অবস্থান বাঙালিদের কারো কারো মনে যদি অভিমান সৃষ্টি করে থাকে, তবে তাকে অস্বাভাবিক বা অসংগত বলা যাবে না।

পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলার বিশিষ্ট ভূমিকার একটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যায়- পরাধীনতার অভিশাপ বাংলাকেই সবচাইতে অধিক সহ্য করতে হয়। আর যেহেতু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার পূর্বে এদেশের শাসনকর্তা (নবাব) ছিলেন মুসলমান, তাই ইংরেজ রাজত্বে বাংলার মুসলমানদেরই সর্বাধিক বৈষম্য-বঞ্চনা ও শোষণ-নিপীড়নের শিকার হতে হয়। ইংরেজদের এসব শোষণ-নিপীড়নে সহযোগী শক্তি হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা দেয় এক শ্রেণীর হিন্দু। তাই ব্রিটিশ-হিন্দু যৌথ শোষণ-নিপীড়নের যন্ত্রণা বাংলার মুসলমান যতটা সহ্য করেছে, ততটা অন্যেরা করেনি। বাংলাদেশে পাকিস্তান আন্দোলন বিশেষ জনপ্রিয় হবার এটা ছিল বড় কারণ। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার এই প্রেক্ষাপটেই পাকিস্তান থেকে বাংলার মুসলমানদের পাবার আশা ছিল বিরাট। কিন্তু তুলনামূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে তারা পেয়েছে যথেষ্ট কম।

এই কম পাবার অবশ্য অন্য কারণও ছিল। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ব বাংলা প্রদেশ) হিসেবে যে অঞ্চল চিহ্নিত হয়, তা ইংরেজদের চক্রান্তে বিভাগপূর্ব আমলে ছিল একটি চরমভাবে অবহেলিত অনুন্নত অঞ্চল। মুসলিম শাসনামলে যে বাংলায় ছিল

www.nagorikpathagar.org

গোয়াল ভরা গরু, গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, মাঠ ভরা সবুজের সমারোহ, যে বাংলার মসলিন সমেত গোটা বস্ত্রশিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় হতো– সেই বাংলার বস্ত্রশিল্প একেবারে ধ্বংস করে দেয়া হলো। দুনিয়ার সেরা পাট উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে পূর্ববঙ্গ বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও পাটকল সব পরিকল্পিতভাবে স্থাপন করা হলো ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে। পূর্ববঙ্গকে পরিণত করা হলো কলিকাতাসহ হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিম বঙ্গের হিন্টারল্যান্ড।

১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের সময় দেখা গেল নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনসংখ্যার মেজরিটি অংশ পূর্ববঙ্গের হলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান অনেক পেছনে। ব্রিটিশ শাসনকালেই পাঞ্জাবে গড়ে উঠেছিল একটি অতি উন্নত সেচ ব্যবস্থা, যার ফলে সুফল পড়েছিল সেখানকার কৃষির উপরে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা লগ্নে ১৩টি বস্ত্র কলের এবং ১১টি চিনি কলের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ছিল দেশের পশ্চিমাঞ্চলে। এছাড়া সরকারি প্রশাসনযন্ত্রে অবাঙালি মুসলমানদের অবস্থা বাঙালি মুসলমানদের অবস্থা হতে পূর্ব থেকেই উন্নত ছিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় প্রশাসনে প্রথম দিকে তাদের প্রভাব ছিল প্রবল। সেনাবাহিনীতেও একই অবস্থা। উপমহাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশ থেকে মোহাজের হিসেবে আগত মুসলমানদের অনেকেই শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কারিগরি ক্ষেত্রে অগ্রসর থাকাতে এসব ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব গোড়া থেকেই অধিক অনুভূত হলো। পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে এই বৈষম্য নিয়েই পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়। এ সবের ফলে উভয় অঞ্চলের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি গোড়া থেকেই সৃষ্টি হওয়াটা ছিল প্রায় অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের মাতৃভাষার পার্থক্য পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির পথ আরও সুগম করে দেয়। কিন্তু যে কারণটি দুই অঞ্চলের পার্থক্যকে বাড়িয়ে তুলতে সর্বাধিক সাহায্য করে– সেটা হলো উভয় অঞ্চলের মধ্যেকার বিরাট ভৌগোলিক ব্যবধান। প্রায় পনের শত বাইশ মাইল শত্রুভাবাপন্ন দেশের দ্বারা বিচ্ছিন্ন দুটি পৃথক ভূখণ্ডের সমবায়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের নজীর ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। একাজ এমনিতেই ছিল দুরূহ এবং প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ভূখণ্ড, ভাষা, আবহাওয়া প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পার্থক্য সত্ত্বেও দু'অঞ্চলের মধ্যে যে বস্তুটি বন্ধন অটুট রাখতে পারতো, তা হলো ইসলাম। অর্থাৎ, ইসলামের বাস্তব অনুসরণ। দুঃখের বিষয় পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ইসলামের নাম ভাঙিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধারে যতটা উৎসাহী ছিলেন, ইসলামের সাম্যভ্রাতৃত্ব ও সুবিচারের নীতি প্রতিষ্ঠায় ততটা উৎসাহ কখনও বোধ করেননি। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পাকিস্তানের ইসলামের ন্যায়নীতি কায়েম করা হবে বলে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা এমনিতেই যথেষ্ট সুকঠিন কাজ। তদুপরি পাকিস্তানের মত দুটি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড-ভিত্তিক রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার জন্যও প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট প্রজ্ঞাবান ও ত্যাগী নেতৃত্বের, পকিস্তানে যার অভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ দুটি ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন পৃথক ভূখণ্ড নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন সে সম্পর্কে সন্তা

www.nagorikpathagar.org

গলাবাজি যত করেছেন, উপমহাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ টিকিয়ে রাখার জন্য একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তার তুলনায় যথেষ্ট কম। একাত্তর-পূর্ববর্তী (অবিভক্ত) পাকিস্তানের মত চ্যালেঞ্জিং রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখা তো দূরের কথা, একটি সাধারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতার প্রমাণও তাঁরা দিতে পারেননি—এ এক ঐতিহাসিক সত্য। ফলে কায়েদে আজমের মত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের তিরোধানের পর হতেই পাকিস্তানে যে নেতৃত্ব সঙ্কট শুরু হয়, তা থেকে জাতি কখনও মুক্ত হতে পারেনি।

এগুলো ছিল যেখানে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যা, সেখানে পাকিস্তানের বৈদেশিক সমস্যা ছিল গোড়া থেকেই কঠিনতর এবং এক হিসেবে জটিলতর। অবতীর্ণ ধর্মাদর্শের যে সর্বশেষ ও আধুনিকতম রূপ ইসলাম নামে পরিচিত, তা আধুনিকতম হবার সুবাদে পূর্ববর্তী ধর্ম সম্প্রদায়সমূহের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হয়েছে স্বাভাবিক কারণেই। ইসলামের প্রসার ঘটেছে ঐসব ধর্মাদর্শের ব্যর্থতার পটভূমিতে। তাই তাদের ইসলামবিরোধী ক্ষোভ, বিদ্বেষ ও মর্মবেদনার যৌথ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ইতিহাসের বহু ঘটনাতেই। যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্র ছিল আধুনিক বিশ্বের অন্যতম মুসলিম নব জাগরণ আন্দোলনের ফলশ্রুতি, তাই ক্রুসেডের উত্তরসূরী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্তরসূরী ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক অলিখিত আঁতাতে আবদ্ধ হয় গোড়া থেকেই। উনিশশো সাতচল্লিশের নেহেরু-মাউন্টব্যাটেন মাখামাখি আদপেই ছিল দুটি কায়েমী স্বার্থের আঁতাত, শুধু দুজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব মাত্র নয়। এ আঁতাতের প্রথম ফলশ্রুতিতে কায়েদে আজমের আশীর্বাদপুষ্ট বসু-সোহরাওয়ার্দীর সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনাকে গান্ধী এই বলে নস্যাৎ করে দেন যে, এই পরিকল্পনা কংগ্রেসের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হলে সার্বভৌম বাংলার সংস্কৃতি হিসেবে হিন্দু উপনিষদের আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। গান্ধীর এই অন্যায় প্রস্তাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে শরৎচন্দ্র বসু এক পত্রে তাঁকে লেখেন: "যে কংগ্রেস একদা মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল, তা দ্রুত একটি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে দেখে আমি মর্মাহত" (In Retrospection, Abul Hashim. P. 161)।

১৯৪৭-এর বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা যে ব্রিটিশ সমর্থনও লাভ করেছিল সে খবর হয়ত অনেকেই রাখেন না। এ বিষয়ে কমরুদ্দিন আহমদ বলেন: 'Jinnah, however, soon found out that the idea of partitioning Panjab and Bengal was engineered by Lord Mountbatten and it was futile to convince the leaders of Congress or Sikhs regarding the danger of partitioning the provinces. Mountbatten later on admitted his part in his address to Royal Empire Soitry in London on 6th October 1948" (Vide—"A Socity-Political Hisory of Bengal and the Birth of Bangladesh"— Kamruddin Ahmad, 4th edition, 1975. P. 83).

www.nagorikpathagar.org

এ বিষয়ে পণ্ডিত নেহেরুর ভূমিকা ছিল আরও তাৎপর্যপূর্ণ। তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা কুমিল্লার আশরাফউদ্দিন চৌধুরীর এক পত্রের জবাবে ১৯৪৭ সালের মে মাসে নেহেরু তাঁকে যে চিঠি লেখেন, তাতে তিনি বলেন: "অখণ্ড ভারতের নীতিকে আমরা জলাঞ্জলি দিয়েছি, এ কথা সত্য নয়। তবে আমরা কোন কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না। ভারত বিভাগ মেনে নেব আমরা একটি শর্তে যে, বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করতে হবে। কারণ একমাত্র এ পথেই অখণ্ড ভারত পুনরায় ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে।' ('রাজবিরোধী আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরী'– জামালুদ্দিন আহমদ চৌধুরী)।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি ব্রিটিশ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এই দৃষ্টিভঙ্গির ভয়াবহ প্রতিফলন ঘটেছিল কুখ্যাত র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে, যার মাধ্যমে বেশ কতকগুলো মুসলিম সংখ্যাগুরু জেলা অন্যায়ভাবে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়া হয়। মোটের উপর পাকিস্তান যাতে আঁতুড় ঘরেই ধ্বংস হয়ে যায় তার জন্য ব্রিটিশ ও কংগ্রেস কারোরই চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। এই যেখানে বাস্তব আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, সেখানে পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের যে প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও সাবধানতার পরিচয় দানের প্রয়োজন ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে তা তাঁরা দিতে পারেননি এবং তাঁরা এ ব্যর্থতার পরিচয় দেন বলতে গেলে গোড়া থেকেই।

সর্বপ্রথম যে ক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসকবর্গের এই ব্যর্থতার প্রমাণ একটভাবে ধরা পড়ে, তা হলো রাষ্ট্রভাষা। যেকোন জনগোষ্ঠীর উন্নতি ও বিকাশের জন্য মাতৃভাষাই যে শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম, এ স্বাভাবিক সত্যের স্বীকৃতি রয়েছে পবিত্র কুরআনেও। পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলার দাবীকে অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানি শাসকবর্গ চাইলেন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে। উর্দু ভাষার বিকাশে মুসলমানদের অবদান ঐতিহাসিক এবং ইসলামী উপাদানেও উর্দু ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সেই সুবাদে বাংলার বহু ধর্মীয় ব্যক্তিত্বই ছিলেন উর্দুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধাশীলতার সুযোগ নিয়ে মুদ্রা, মানিঅর্ডার ফর্ম, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় দলিলপত্রে ইংরেজির পাশাপাশি শুধু উর্দু ব্যবহারের প্রচেষ্টা হলো। পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ইংরেজ সচিব মি. গুডইন স্বাক্ষরিত একটি সার্কুলার সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। তাতে কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার যে বিষয়সূচি ছিল তার মধ্যে ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, উর্দু, হিন্দী, এমন কি সংস্কৃত ও ল্যাটিনের মত মৃত ভাষাও অন্তর্ভুক্ত ছিল– কিন্তু ছিল না পাকিস্তানের মেজরিটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা। বাংলার প্রতি এ ধরনের অবহেলার প্রতিবাদে সাতচল্লিশের সেপ্টেম্বরেই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ক্রমেই এ আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। প্রথম প্রথম কর্তৃপক্ষ এ আন্দোলনকে রাষ্ট্রদ্রোহীদের কারসাজি বলে বুঝাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আন্দোলন জোরদার হলে তার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। আন্দোলনকারীদের মূল দাবী ছিল বাংলাকে উর্দুর সংগে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদি ও শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে বাংলা ভাষা। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কায়েদে আজম পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে একটি জনসভায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কনভোকেশনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার উপরে বক্তৃতা দেন। পরবর্তীতে তিনি ভাষা

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সংগে ঘরোয়া বৈঠকেও তাদের দাবীর বিরোধিতা করেন। নেতৃবৃন্দ কিন্তু তাঁদের বক্তব্যে অটল থাকেন। ঢাকা ত্যাগের পর থেকে ঐ বছরের ১১ সেপ্টেম্বরে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে কায়েদে আজম আর কোন কথা বলেছেন বলে জানা যায় না। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বের লিখিত "সাংবাদিকের রোজনামচা" গ্রন্থ পাঠে জানা যায়—কায়েদে আজম পরবর্তীকালে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তবে কায়েদে আজম তাঁর ভুল বুঝলেও ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রধান মন্ত্রীত্বের আমলে পুনরায় বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এ সময় বুকের তাজা রক্ত ঢেলে বাংলার তরুণ ছেলেরা ১৯৫২ সালে ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়।

ভাষা আন্দোলনকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বসূরী বলে অভিহিত করা হয়। কারণ ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই পরবর্তীকালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যা ১৯৭০ সালে স্বাধিকার আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং আরও পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাতে টিক্কা শাহীর বর্বর হামলার পরিণতিতে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে।

ভাষা আন্দোলনের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, এর মাধ্যমেই লাহোর প্রস্তাবের কঠোর বাস্তবতা সকলের সামনে নতুন করে ধরা পড়ে। ১৯৪৭ সালে তদানীন্তন অবস্থার প্রয়োজনে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল মিলে এক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন থাকলেও লাহোর প্রস্তাবের মর্মকথা যদি স্মরণ রাখা হতো, তাহলে পরবর্তীকালের অনেক দুর্ঘটনা, অনেক রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হতো। কিন্তু রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে যেমন এই বাস্তবতার কথা প্রথম প্রথম বিবেচনায়ই আনা হয়নি, তেমনি হয়নি আরও অনেক প্রশ্নে।

শাসনতন্ত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টাও ছিল এমনি এক প্রশ্ন। পাকিস্তানের প্রথম প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৫০ সালে গণপরিষদে যে শাসনতান্ত্রিক মূলনীতির খসড়া পেশ করেন, তাতে পূর্ব পাকিস্তানকে সিন্ধু, সীমান্ত প্রভৃতির ন্যায় মাত্র একটি প্রদেশ হিসেবে বিবেচনার চেষ্টা করা হয়, যা ছিল লাহোর প্রস্তাবের মর্মবাণীর সম্পূর্ণ বিরোধী। এর প্রতিবাদে ঢাকায় একটি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানকে একটি অঞ্চল হিসেবে গণ্য করে ফেডারেল শাসনতান্ত্রিক মূলনীতির বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা দাবীর ভিত্তিতে যে ঐতিহাসিক ব্যালট যুদ্ধ পরিচালিত হয়, তাতেও লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হয়। নির্বাচন যুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়, কিন্তু প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কল্যাণে গণতন্ত্রের ধারা প্রতিহত হয়। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রথমে সিভিল ব্যুরোক্র্যাসী, পরে মিলিটারী ব্যুরোক্র্যাসীর প্রভাব প্রকট হতে থাকে। এই সুবাদে প্রথমে গোলাম মোহাম্মদ, পরে ইস্কান্দর মীর্জা এবং সর্বশেষে প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইউব খান দেশের সর্বময় ক্ষমতা কব্জা করেন। পাকিস্তান আমলে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা সূচিত হয় প্রথম দশকে। দ্বিতীয় দশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা

www.nagorikpathagar.org

অব্যাহত থাকলেও গণতান্ত্রিক পরিবেশ চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়। এমনিতে কেন্দ্রীয় রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকার ফলে উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা প্রধানত পশ্চিমাঞ্চলের জন্য উন্মুক্ত হয়, তদুপরি পশ্চিমা-অধ্যুষিত সেনাবাহিনী ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পরিবেশে মেজরিটির সুবাদে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও সরকারে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের প্রভাব প্রবলতর হবার কথা, অথচ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে উভয় অঞ্চলের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বদলে প্যারিটির নীতি গৃহীত হয়। আরও পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে পশ্চিমা প্রভাবিত সশস্ত্র বাহিনীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবার ফলে অবস্থা আরও নাজুক হতে থাকে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক রংগমঞ্চ হতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অন্তর্ধানের ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনে এডভেনচারিস্টদের উপদ্রব বেড়ে যায় বহুগুণে। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অংগনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা কখনও পূরণ হয়নি। ফলে আইউব খান কর্তৃক প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়া এবং ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কৃতিত্ব প্রদর্শনের পর মাত্র দু'বছরের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে প্রবল গণ-আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। একই প্রশ্নে ইতিপূর্বে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে একইভাবে প্রবল গণ-আন্দোলন সৃষ্টি হওয়া এবং পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে একই সংগে সমগ্র পাকিস্তানের বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান পাকিস্তানের তেইশ বৎসরের ইতিহাসে সেই ছিল প্রথম। সে হিসেবে সাধারণ বিচারে এর ফলাফল অবিভক্ত পাকিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য ভাল হবারই কথা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা হয়নি। কারণ এই আন্দোলন ও আন্দোলন-পরবর্তী নির্বাচন দেশের দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র ও আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী নেতৃত্বের জন্ম দেয়—যার একটি পূর্বাঞ্চল, আরেকটি পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে।

এই দুই নেতৃত্বের মধ্যমণি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো সম্পর্কে শেষ কথা বলবার মুহূর্ত হয়ত এখনও আসেনি। কারণ তাঁদের সম্পর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যের অভাবই এ ব্যাপারে বড় বাধা। শেখ সাহেব নিজে পাকিস্তান আন্দোলনে বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ করেছিলেন, এ এক ঐতিহাসিক সত্য। তিনি পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া নিয়ে আগাগোড়া লড়েছেন, তবে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কখনও পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গড়তে চান, এসব কথা প্রকাশ্যে বলেননি। বরং ছয় দফা আন্দোলন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জোর দিয়ে বলতেন, ছয় দফা পাকিস্তানকে জোরদার করার লক্ষ্যে প্রণীত। এমন কি সত্তরের নির্বাচনে জয়লাভের পরও একাধিক সমাবেশে তিনি তাঁর বক্তৃতা সমাপ্ত করেছেন 'জয় বালা' 'জয় পাকিস্তান' বলে। অথচ সেই শেখ সাহেবই বাহাত্তরের দশই জানুয়ারি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করে ঘোষণা করলেন যে, তিনি সাতচল্লিশ সাল থেকেই এদিনটির স্বপ্ন দেখছিলেন। আবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন সময়ে বলা হতো, তিনি কখনও গোপনে ভারতে যাননি এবং এ মামলা ছিল একটা মিথ্যা সাজানো মামলা। অথচ পরবর্তীকালে প্রকাশ্যে বলা হয়েছে,

www.nagorikpathagar.org

তিনি গোপনে ভারতে গিয়েছিলেন। এখানে কাউকে বড় বা ছোট করার প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন প্রকৃত সত্য কোন্‌টি, তা উদ্ধার করা। কারণ একই সাথে পরস্পরবিরোধী দুটি কথা সত্য হতে পারে না। একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পূর্ববর্তী দিনগুলোতে মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কি কি বিষয় আলোচিত হয়, তাও এ প্রসংগে প্রামাণ্যভাবে জানা দরকার। দুর্ভাগ্যক্রমে এ ব্যাপারেও পরস্পরবিরোধী দাবী পাওয়া গেছে।

অনুরূপ সমস্যা ভুট্টো সম্পর্কেও। ভুট্টো পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন কি-না জানা যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে ভুট্টো যে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আইউব খানের কাঁধে সওয়ার হয়ে ধূমকেতুর মত ঝড়ের গতিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এটা ঠিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কি ছিলেন? পাকিস্তানের জন্য বাহ্যত তাঁর মায়াকান্নার অন্ত ছিল না। যে পাকিস্তানের জন্য প্রয়োজন হলে হাজার বছর ধরে ঘাস খেয়ে হলেও তিনি এটম বোমা বানাতে চেয়েছিলেন, সেই পাকিস্তান ভাঙ্গার পেছনে তাঁর দান তো ছিল সবার চাইতে অনেক বেশি। ১৯৭০ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলন যখন তুংগে তখন তিনিও পশ্চিম পাকিস্তানে আরেক 'স্বাধিকার' আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার শ্লোগান ছিল– "হাম মাশরেকী পাকিস্তান কি গোলামী কভু নেহি বরদাশ্‌ত করুংগা।"–অর্থাৎ আমরা পূর্ব পাকিস্তানের দাসত্ব কখনও সহ্য করব না। পূর্ব পাকিস্তান যখন আত্মরক্ষার জন্য স্বাধিকার আন্দোলনে ব্যস্ত, তখন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানকে গোলাম করার এমন কোন্ ফিকিরে ছিল যে তার বিরুদ্ধে এই অযাচিত হুংকার? একি তবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুত্বের রায় অস্বীকার করার পূর্ব প্রস্তুতি নয়? এই আলোকেই কি নির্বাচনোত্তর কালে এক দেশে দুটি মেজরিটি পার্টির অস্তিত্ব আবিষ্কার করে তিনি দু'জন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগের দাবী জানিয়েছিলেন? একাত্তরের পহেলা মার্চে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান পার্লামেন্টের অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যদের যোগদানের বিরুদ্ধে ভুট্টোর হুঁশিয়ারি তাঁর পাকিস্তান প্রীতির প্রমাণ দেয় না। সর্বোপরি ভারতের যে বিমান লাহোর বিমান বন্দরে হাইজ্যাকের ফলে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণার সুযোগ পান, তা কি ভুট্টো ও ইন্দিরার একটি পাতানো খেলা ছিল না? কারণ উক্ত বিমান লাহোরে ছিনতাই হওয়ার পর ভুট্টো স্বয়ং বিমান বন্দরে গিয়ে ছিনতাইকারীদের বাহবা দেন এবং তাদের সাথে একান্তে কথা বলেন।

উনিশশো সত্তরের নির্বাচনে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছিল যে, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের একত্রে বসবাসের দিন শেষ হয়ে গেছে। সত্তর সালেই পাকিস্তানের পশ্চিম অঞ্চলের তুলনায় পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার চিত্র চূড়ান্তভাবে প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। এই পশ্চাদপদতার কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে দায়ী করা যায় ;

ক. ব্রিটিশ আমল থেকেই কৃষি ও শিল্পে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনামূলক পশ্চাৎপদতা,

খ. পার্টিশন কাউন্সিল কর্তৃক সম্পত্তির বুক ভ্যালু ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণের কারণে গোড়াতেই পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত হওয়া,

গ. পশ্চিম পাকিস্তানে দুই দুটি কেন্দ্রীয় রাজধানী নির্মাণে পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনা,

www.nagorikpathagar.org

ঘ. অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার অধিকাংশের প্রধান দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান,

ঙ. কেন্দ্রীয় অফিসাদিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সংখ্যাধিক্য এবং

চ. দেশরক্ষা বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিপুল সংখ্যাধিক্য।

দেশে গণতন্ত্র থাকলে পূর্বপাকিস্তান সংখ্যাধিক্যের সুবাদে সুবিচার আশা করতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ায় পাকিস্তানের ২৪ বৎসর কার্যত বেসামরিক ও সামরিক ব্যুরোক্র্যাসীর শাসনাধীন ছিল। এর ফলে উভয় অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল বেশি। বৈষম্য থেকে বঞ্চনাবোধ, বঞ্চনাবোধ থেকে প্রতিকার ও প্রতিশোধ স্পৃহা, প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে পারস্পরিক অবিশ্বাস, অবিশ্বাস থেকে হিংসাবিদ্বেষ-সংঘাত ছিল অনেকখানি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তবুও বলতে হয়, বঞ্চনাবোধ তো ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা ভুট্টোর সত্তর-একাত্তরের বক্তৃতায় পূর্ব পাকিস্তানবিরোধী বিষোদ্‌গারের উৎস কোথায়? এ কি কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের সংকীর্ণ তাগিদ না বিদেশী মদদপুষ্ট অন্য কিছু?

এ প্রসংগে আরেকটি প্রশ্ন আসে অনিবার্যভাবে– পরস্পর বিদায়ের মনোভাব যদি উভয় পক্ষের মধ্যেই সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে আপসে কি দুই অঞ্চলের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্ভব হতো না? এর জন্য কি রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ একান্তই অনিবার্য হয়ে পড়েছিল? এমন যুদ্ধ কি না করলেই চলতো না, যার শেষ মীমাংসার কর্তৃত্ব যাবে এমন এক শক্তির হাতে, উপমহাদেশের বহু শতাব্দীর ইতিহাসে যার মুসলিমবিদ্বেষ সুপ্রমাণিত? আমাদের মনে পড়ে, সত্তরের শেষ দিক থেকেই মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী বারবার বলেছেন আপস মিলেমিশে দেশ ভাগ করে নিতে। সাতচল্লিশে দুটি অতি পুরাতন প্রতিপক্ষ যদি আপস সাবেক ভারতবর্ষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পেরেছিল, একাত্তরে কেন অনুরূপ বিভাগ সম্ভব হলো না? এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ কি প্রয়োজন পড়েছিল শুধু অনিচ্ছুক জনগণের চোখকে ফাঁকি দিতে? উনিশশো একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের খুব কম সংখ্যকই পাকিস্তানের বিরোধী ছিল। পঁচিশে মার্চের কালো রাতে নিরস্ত্র জনগণের উপর বর্বর আক্রমণের পর খুব কম লোকই পাকিস্তানের সমর্থক ছিল। উভয় অঞ্চলের জনগণের মন পরস্পরের বিরুদ্ধে চিরতরে বিষিয়ে দেবার লক্ষ্যে এই পাতানো খেলায় ইয়াহিয়া-ভুট্টো-টিক্কার সাথে আর কার কার যোগসাজস ছিল, তা জানা প্রকৃত ইতিহাস পুনরুদ্ধারের জন্যই আজ অপরিহার্য।

নেতাদের যার মনে যা-ই থাকুক না কেন, বাংলার দামাল ছেলেরা ঘটনার আকস্মিকতায় কিন্তু এতটুকু মুষড়ে পড়েনি, যেমন কর্তব্য নির্ধারণে এতটুকু ভুল করেনি বাংলার মুক্তিকামী জনগণ। একাত্তরের নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ যেকোন বিচারে ছিল একটি অসম যুদ্ধ। একটি দুর্ধর্ষ বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনতার প্রতিরোধের পেছনে জনগণের শক্ত মনোবল না থাকলে এ যুদ্ধ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতো। তা যে হয়নি তার কারণ জনগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছে তাদের এ সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তারা এও জানত জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেকোন সংগ্রামে আল্লাহ্‌র মদদ অবশ্যম্ভাবী।

www.nagorikpathagar.org

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ। যারা এ যুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে, তারা ছাড়াও প্রায় নয় কোটি মানুষ সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নানা পর্যায়ে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। কেউ খাবার দিয়ে, কেউ আশ্রয় দিয়ে, কেউ অর্থ দিয়ে, কেউ অস্ত্র দিয়ে, কেউ পরামর্শ দিয়ে, কেউ শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে গোপন খবরাদি সরবরাহ করে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এই যুদ্ধে শামিল থাকার সন্দেহে বাংলার কত মানুষ যে পশ্চিমা বাহিনীর অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়েছে, কত বাড়ি-ঘর, দোকানপাট ধ্বংস হয়েছে, কত লোক গৃহহারা হয়ে স্বদেশে পরবাসী হয়ে বনে-জংগলে রাতের পর রাত কাটিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

এই যুদ্ধের কারণে যারা দেশ ত্যাগ করে বিদেশের মাটিতে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চেষ্টা করেছে, তাদেরও অনেকেই বিদেশ-বিভুঁইয়ে শান্তিতে থাকতে পারেনি। যুদ্ধের গতিধারাকে বিদেশী শক্তি বারবার নিজেদের স্বার্থে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছে, বহু মুক্তিযোদ্ধাকে বন্দী ও হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে, তবুও চরম ধৈর্য সহকারে সব কষ্ট স্বীকার করে হলেও তারা যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। বিদেশী জমিনে বিদেশী শক্তির মনমত লোকদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে, বৈষম্য করা হয়েছে শত শত মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে, তবুও মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ স্তব্ধ করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া হতো, যে জাতি তার ভাগ্য পরিবর্তনে চেষ্টা করে না, আল্লাহ্ও তার ভাগ্য পরিবর্তন করেন না। আল্লাহ্র এই বাণীর আলোকে বীর মুক্তিযোদ্ধারা নয়টি মাস ধরে লড়ে যান এক অনন্য যুদ্ধ—মুক্তি ও স্বাধীনতার অন্বেষায় জালিমের জুলুমের দাঁতভাংগা জবাব দিতে। অবশেষে একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরে এলো তাদের ঈপ্সিত দিন—যেদিন পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় স্বীকারের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হলো স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র। নয় মাসের দুঃখ-স্বপ্ন ঘেরা অমানিশার অবসানে মুক্তির আলোয় ঝলমল করে উঠল একটি জাতি।

www.nagorikpathagar.org

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাউয়ুম

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইতিহাসের নিয়মেই বাস্তব রূপ লাভ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে– ইতিহাসের অনেক চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিয়ে ১৯৭১ সালে এসে এক সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। এ যুদ্ধকে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইও বলা যায়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ তাদের শাসনযন্ত্র তুলে নিয়ে এখানে দুটি দেশের পত্তন করে যায়—একটির নাম ভারত অপরটির নাম পাকিস্তান। তদানীন্তন পূর্ববাংলা ও সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি নিয়ে পাকিস্তান নামক দেশটির জন্ম হয়।

পূর্ব বাংলা অংশের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান এবং অন্যান্য প্রদেশগুলোর সমন্বিত নাম হয় পশ্চিম পাকিস্তান। কিন্তু ১৯৪৭ সালের আজাদীর লড়াইয়ে পশ্চিম পাকিস্তান অংশের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তান অংশের অবদান সবচেয়ে বেশি থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমারা সবসময়ই পূর্বাঞ্চলের উপর কৌশলে প্রভুত্ব করে আসছিলো। ফলশ্রুতিতে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান সৃষ্টির কাল থেকেই স্বায়ত্তশাসনের দাবী করে আসছিলো। কিন্তু নানা তালবাহানার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় এ অঞ্চলে কিছু দালাল সৃষ্টি করে তারা পূর্ব পাকিস্তানের উপর যে বৈষম্য নীতি চালিয়ে আসছিলো এ নিয়ে বহু আন্দোলন হয়েছে এখানে। এ অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার প্রয়াসও তারা চালায়। কিন্তু সবক্ষেত্রে এদেশের মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে ৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারির মতো প্রেরণার উৎস।

বাংলাদেশের মানুষের প্রেরণার যে উজ্জীবিত ধারা তা কখনও বেগবান হয়েছে, কখনও ষড়যন্ত্রের মুখে স্তিমিতও হয়েছে। জন্ম নিয়েছে নতুন আন্দোলনের। ১৯৬৯ সালে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের তথাকথিত উন্নয়ন দশকের পূর্তি উৎসবকে এদেশের মানুষ গ্রহণ করতে পারেনি সত্য হিসেবে। সৃষ্টি হয়েছে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। ফলে আইয়ুব বিদায় নিয়েছেন। এসেছেন নতুন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। তিনি এলেন নির্বাচনের বুলি মুখে নিয়ে। নির্বাচন দিলেন। নির্বাচনে বাংলাদেশ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের অধিকারী হলো। শেখ মুজিবুর রহমানের দল এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সমর্থ হলো। কিন্তু বাংলাদেশের নেতৃত্বে পাকিস্তান চালিত হোক এটা পশ্চিম পাকিস্তানি স্বার্থান্বেষী মহল মেনে নিতে রাজী হলো না। লারকানার সামন্ত-প্রভু জেদী কূটনীতিক ক্ষমতার অন্ধমোহে আচ্ছন্ন জুলফিকার আলী ভুট্টোকে তারা ব্যবহার করলো ঘুটি হিসেবে। জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও তিনি মূলত দ্বিতীয় স্থান দখল করেন। তবুও তাঁর বায়না প্রধান মন্ত্রীত্ব তাঁর চাই-ই। অথচ সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ মোট ৩১৩টি আসনবিশিষ্ট প্রস্তাবিত পার্লামেন্টে শেখ মুজিবুর রহমানের দল ১৬৭ আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই বজয় ছিলো বাংলাদেশের মানুষের বিজয়। এতে শঙ্কিত পশ্চিম পাকিস্তানি স্বার্থান্বেষী চক্র প্রমাদ গুণলো। ২০ ডিসেম্বর ১৯৭০-এ

www.nagorikpathagar.org

ভুট্টো সাহেবতো বলেই ফেললেন তাঁর দলের সহযোগিতা ছাড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন চলবে না এবং কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে দেয়া হবে না। পরের দিন তিনি তাঁর সুর আরও চড়িয়ে বললেন, "পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। বিরোধী দলীয় আসনে বসার জন্যে তাঁর দল (P.P) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। সব ব্যাপারে আমাদের মতামত নিতে হবে।"

এদিকে বাংলাদেশে স্বায়ত্তশাসনের দাবী আরও জোরদার হতে লাগলো। নির্বাচনের বিজয় স্বায়ত্তশাসনের দাবীর বিজয় হিসেবে জনগণ গ্রহণ করলো। ইয়াহিয়া খান যেনো কোন অজানা হাতে পরিচালিত হতে লাগলেন। ১৪ জানুয়ারি ১৯৭১-এ তিনি বললেন, "শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন দেশের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী। যখন তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আমি আর থাকবো না।" তাঁর এ বক্তব্যে কতটুকু আন্তরিকতা রয়েছে তা নিয়ে দেশের মানুষের মনে বেশ সন্দেহের উদ্রেক হয়। ইতিমধ্যে লাহোরে হাইজ্যাক করা একটি ভারতীয় বিমানের ধ্বংসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে অশুভ সংকেত এসে দানা বাঁধে। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া—বাংলাদেশের দাবীর প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের জন্য একটা সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ সকাল নয়টায় ঢাকায় প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করলেন। কিন্তু ভুট্টো সাহেব বেঁকে বসলেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি ঘোষণা করলেন, নির্বাচিত সংখ্যাগুরু দল প্রকাশ্যে অথবা গোপনে আমাদের কিছুটা 'কনসেশনের' প্রতিশ্রুতি না দেয়া পর্যন্ত তিনি ও তাঁর পার্টি (পি. পা) ঢাকায় ৩ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবে না। সংখ্যাগুরু দল কর্তৃক ইতিমধ্যে প্রণীত একটা সংবিধানে কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মতি দেয়ার জন্যে আমার পার্টি সদস্যদের পক্ষে ঢাকা যাওয়া এবং অপমানিত হয়ে ফিরে আসা সম্ভব নয়।

ভুট্টোর এই ঘোষণায় পূর্বাঞ্চলের নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। মাওলানা ভাসানী ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করলেন, জুলফিকার আলী ভুট্টো কর্তৃক প্রদত্ত পূর্বশর্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি হুমকিস্বরূপ। ওদিকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো সাহেব তাঁর জেদের মাত্রাও বাড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে ঢাকায় আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান অর্থহীন। জাতীয় সংসদ একটা কসাইখানায় পরিণত হবে।"

যা হবার তাই হলো। ১ মার্চ ১৯৭১ বেলা বারোটায় খবরে ভেসে এলো ইয়াহিয়া খানের অনির্দিষ্ট কালের জন্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার কথা। তিনি ঘোষণা করলেন, "পাকিস্তানে এখন ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমি জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করলাম।"

এই ঘোষণা রেডিও মারফত প্রচারিত হবার সংগে সংগে ঢাকা ফেটে পড়ে বিক্ষোভে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের সামনে হাজার হাজার ছাত্র 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো' শ্লোগান নিয়ে সমবেত হয়। কলাভবনে উড্ডীন করা হয় স্বাধীন বাংলার পতাকা। ছাত্রদের মিছিল বেরোয়। জংগী মিছিল। শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণার খবর পেয়ে ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, "জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশন স্থগিত করা খুব দুঃখজনক।" ঘোষিত হয় ৩ মার্চ সারা দেশব্যাপী

www.nagorikpathagar.org

হরতাল ও ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কথা। অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের আগুন ফেটে পড়ে। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার এক পর্যায়ে "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ঘোষণা করেন।

৯ মার্চ পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশে মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণার দাবী করে বললেন, "অনেক হইয়াছে আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নাই। লাকুম দ্বীনুকুম অলইয়াদীন এর নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও।"

এখানে উল্লেখ্য যে, মাওলানা ভাসানী ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে কাগমারী সম্মেলনে প্রথম স্বাধীনতার আওয়াজ তোলেন। পরবর্তীকালে এদেশের ছাত্রদের একটি অংশ 'কৃষক শ্রমিক অস্ত্র ধর—পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর' শ্লোগান দিয়ে জাতিকে সম্পূর্ণ ৬০ দশকে উজ্জীবিত করার প্রয়াস চালান। এমনকি ৭০-এর ১২ নভেম্বর উপকূল এলাকায় ভীষণ জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি এবং পাকিস্তান সরকারের এ ব্যাপারে অমনোযোগিতা এবং ঐ সময় এক আন্তর্জাতিক মোটর র‍্যালীর অভিজ্ঞতার আলোকে মাওলানা ভাসানী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বাধীন পূর্ব বাংলা ঘোষণা করেন এবং সারাদেশে প্রচার-পত্র ছড়িয়ে দেন। মওলানা ভাসানী আন্দাজ করতে পেরেছিলেন নির্বাচন বুর্জোয়া রাজনীতিতে টিকে থাকার একটি কৌশল। যে কারণে তিনি ১৯৭০-এর ডিসেম্বরের নির্বাচন বর্জন করেছিলেন। তবুও যখন সবাই দেখলেন সত্যিই নির্বাচনের প্রহসনের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমারা নিজেদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে চায়। নির্বাচনের পর জনতার সঠিক রায় তারা মেনে নিতে নারাজ তখনই সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিলো না। মাওলানা ভাসানী সেদিনের সেই বিশাল জনসমাবেশে বলেছিলেন, "ভাইয়ে ভাইয়ে গণ্ডগোল হয়। নিজেরা আপস যদি পৃথক হয়ে যায় সেখানে শান্তি বিঘ্ন হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আর যদি নিজেরা আপস পৃথক হতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে এক মর্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি হয়।" তিনি ইয়াহিয়া খানকে উদ্দেশ্য করে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা মেনে নেবার জন্যে জোরালো দাবী তোলেন এবং হুঁশিয়ার করে দেন। সেই সভাতেই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, "যদি আপস স্বাধীনতা না আসে তাহলে বাংলার মানুষকে সশস্ত্র লড়াই করতে হবে। তাতে ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটবে। রক্তের বদলে স্বাধীনতা আসবেই।"

৯ মার্চ মাওলানা ভাসানী এক প্রচারপত্রের মাধ্যমে সারা দেশবাসীকে এই বলে আহ্বান জানান যে, "আজ আমি সাত কোটি পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এই জরুরি আহ্বান জানাইতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনারা দল মত ও শ্রেণী নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ একত্রে এবং একযোগে একটি সাধারণ কর্মসূচি গ্রহণ করুন যার মূল লক্ষ্য হবে ২৩ বছরের অমানুষিক এবং শোষণকারী শাসকগোষ্ঠীর করাল কবল থেকে পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণ চূড়ান্তভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম করা।" (দ্র. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র : ২ খণ্ড, ৭১২ পৃ.)।

www.nagorikpathagar.org

এমনিভাবে স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। পূর্ব বাংলার আন্দোলনের তীব্রতা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মসনদ কাঁপিয়ে তোলে।

১৫ মার্চ করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো সাহেব শুধু সংখ্যাধিক্যের জন্যে পাকিস্তান শাসন পরিচালনা করা যাবে না বলে দাবী তুললেন। তিনি আরো বললেন, "তাঁর পার্টিকে বাদ দিয়ে কোন সরকার গঠন করা সম্ভব নয়।"

তাঁর দাবীতে যোগ করলেন, তাঁর পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। তাই কেন্দ্রের ক্ষমতা শেখ মুজিবের ও তাঁর দলের মধ্যে ভাগাভাগি করে দিতে হবে।

ওদিকে ভুট্টোর এই অযৌক্তিক দাবীর প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা নবাবজাদা নসরুল্লা খান, মাহমুদুল হক উসমানী, খাজা মাহমুদ, নাণ্টু মিয়া, নিজামুদ্দীন হায়দার, সৈয়দ আলী আসগর শাহ, হামিদ সরফরাজ, নবাবজাদা শের আলী খান, খাজা মুহাম্মদ সরফরাজ, এ. আর. এস. শামসুদ দোহা প্রমুখ পৃথক পৃথক বিবৃতি দিলেন। পেশোয়ারে এক আইনজীবী সমিতির সভায় আসগর খান বললেন, "সংখ্যাগুরু দলের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক এবং এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রসম্মত।" ন্যাপপ্রধান খান ওয়ালী খানও বললেন, "নির্বাচিত পার্লামেন্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। সত্য বলতে কি, পশ্চিম পাকিস্তানের আর অস্তিত্ব নেই। ১ জুলাই থেকে এখানে চারটি পৃথক প্রদেশ হয়েছে।"

এদিকে ঢাকায় শেখ মুজিব ইয়াহিয়া বৈঠকের প্রস্তুতি চলে। সর্বস্তরের ছাত্রজনতা এই বৈঠকের বিরোধিতা করলো। এই নিয়ে ঢাকায় মিছিলের পর মিছিল বেরুলো। শেষমেশ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা এলেন। কড়া সামরিক পাহারায় প্রেসিডেন্ট হাউসে (পুরাতন গণ ভবনে) এসে উঠলেন। ১৬ মার্চ শুরু হলো ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক। দু'জন প্রথম দফা বৈঠকে কোনো পরামর্শদাতা ছাড়াই একান্তে বৈঠকে বসলেন। পরদিন ১৭ মার্চ আবার বৈঠক বসলো। এবারও উভয়ের পক্ষ থেকে পরামর্শদাতাও উপস্থিত থাকলো। শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে গণতান্ত্রিক রায়ের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা তোলা হলো। সাথে সাথে ৬ দফার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত সংবিধান প্রণয়নের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করা হলো। ৬ দফার প্রতিটি দফার উপর বিস্তারিত আলোচনা হলো। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক সাহায্য এবং ব্যাংকিং প্রশ্নে কিছুটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো। কিন্তু শেখ মুজিবুরের পক্ষ থেকে জোরালো যুক্তি উত্থাপিত হলে ইয়াহিয়া খানের পরামর্শদাতারা হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে শেখ মুজিব সাংবাদিকদের প্রশ্ন থেকে নিজেকে এড়িয়ে গেলেন। এমনিভাবে বৈঠকের পর বৈঠক চলতে লাগলো কিন্তু সারা বাংলাদেশ এটা ইতিমধ্যে উপলব্ধি করতে পারছিলো এই বৈঠক সময় ক্ষেপণ এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। ২০ মার্চ মাওলানা ভাসানী চট্টগ্রাম থেকে ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসকে পতাকা দিবস হিসেবে পালন করার আহ্বান জানালেন। ২১ মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা এলেন বেশ কয়েকজন পরামর্শদাতা সংগে করে। ভুট্টো এসেই বললেন, শেখ মুজিব আর ইয়াহিয়ার সাথে বৈঠকেই সব সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তিনিও একটি পক্ষ। ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার মধ্যেই কেবল সমস্যার সমাধান সম্ভব। এদিকে শেখ মুজিবও আলোচনা 'অগ্রগতির দিকে' বলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন। আলোচনার মূল বিষয় সম্পর্কে জনগণ অন্ধকারেই থাকতে

www.nagorikpathagar.org

লাগলো। ২৩ মার্চ পতাকা দিবস পালিত হলো। আনুষ্ঠানিকভাবে শেখ মুজিবও পতাকা উড্ডীন করলেন। ২৪ মার্চও বৈঠক বসলো। ২৫ মার্চ শেখ মুজিব সন্ধ্যায় জারীকৃত এক বিবৃতিতে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়টি বিলম্বিত হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, "প্রেসিডেন্টের ঢাকায় আগমন ও আলোচনার ফলে জনমনে এরকম একটা ধারণা হয়েছিলো যে দেশের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের চেতনার সৃষ্টি হয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে তা সমাধান সম্ভব। ... ... আমরা আমাদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছি এবং সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্যে সর্বাধিক প্রচেষ্টা করেছি। এখানে আর বিলম্বিত হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। (এম. আর. আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি পৃ. ৩৬৮)।

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান ঢাকা থেকে করাচী গেলেন। এই রাতেই ঢাকা নগরীতে শুরু হলো হত্যাকাণ্ড। ঢাকা শহরে সে রাত ছিলো এক কালোরাত। ইতিহাসের নজিরবিহীন বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিবিজড়িত রাত। মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠলো ঢাকার রাজপথ। এই রাতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দেশপ্রেমিক নেতাদের গ্রেফতার করা হলো। শেখ মুজিবকেও ওরা ধরে নিয়ে গেলো। ২৬ মার্চ এলো স্বাধীনতার দৃঢ় প্রত্যয়ে উদ্ভাসিত মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান নিয়ে। সারা দেশে নেমে এলো নতুন বিপ্লবী উত্তেজনা। ওদিকে ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জোরদার করে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। সাংবাদপত্রের উপর পূর্ণ সেন্সরশীপ আরোপ করা হলো। সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সাজসাজ রব পড়ে গেলো, আর নয়-এবার স্বাধীনতা। জীবন দিয়ে হলেও স্বাধীনতা চাই। ২৬ মার্চ ইতিমধ্যে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। ওদিকে বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক জান্তা প্রচুর সৈন্য সমাবেশ ঘটালো। শুরু করলো হত্যাকাণ্ড। ৩০ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের গণহত্যা রোধ করার জন্য এগিয়ে আসতে জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের নিকট আবেদন জানালেন তা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচারিত হলো। নিম্নে সেই আবেদন পত্রটির হুবহু তুলে দেয়া হলো :

From Major Zia

Declaration:

Punjabis have used 3rd Commando Batalion in Chittagong city area to subdue the valliant freedom fighters of Sadhin Bangla. But they have been thrown back and many of them have been killed.

The Punjabis have been extensively using F-86 air crafts to kill the civilian strongholds and vital points. They are killing the civilians men, women and children brutally. So far at least ..... thousands of Bengali civilians have been killed in Chittagong area alone.

The Sadhin Bangla Liberation Army is pushing the Punjabis from one place to the other.

www.nagorikpathagar.org

At present Punjabis have utilized at least to Brigades of Army, Navy and Air Force. It is in fact a combined operation.

I once again request the United Nations and the big powers to interveue and physically come to out aid. Delay will meam massacre of additional millions. (দ্র. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র : ৩ খণ্ড, পৃ ৩)।

শহর ছেড়ে দলে দলে মানুষ ছুটলো নিরাপত্তার খোঁজে গ্রাম-গ্রামান্তরে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যেয়ে আশ্রয় নিলো অসংখ্য মানুষ। দেশের ভিতরেও মুক্তি সংগ্রামের আয়োজন জোরদার হলো। দামাল ছেলেরা রুখে দাঁড়ালো। গঠিত হলো মুক্তিবাহিনী।

কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি করে গঠিত হলো মুক্তিবাহিনী। সারা বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে মুক্তিযুদ্ধ এগিয়ে চললো। ইতিমধ্যে ১০ এপ্রিল নির্বাচিত বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলো। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের আম বাগানে এই সরকারের শপথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী মরিয়া হয়ে উঠলো। তারা হত্যা, গুম, নারীধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ দুনিয়ার জঘণ্য কার্যকলাপের মাধ্যমে তাদের হিংস্রতার পরিচয় দিতে লাগলো। তারা দেশের মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার সকল রকম প্রয়াস চালাতে লাগলো। তাদের সহযোগিতায় গঠিত হলো রাজাকার আল-বদর বাহিনী। ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান এদেশের মুসলমানদের জীবনে একদিন নতুন আশা সঞ্চারিত করেছিলো। কিন্তু ২৫ বছর ধরে তারা এদেশের মানুষের উপর যে অত্যাচার অনাচার করেছে, শোষণ নির্যাতন করছে তার সব কটাই ছিলো ইসলামবিরোধী। আর এখন তারা যা শুরুর করে দিলো তাকে শুধু পশু প্রবৃত্তির জঘণ্যতম স্তর বললেই ঠিক বলা হয়। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও ভারতে গেলেন। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হলো বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি। ১ জুন ১৯৭১-এ এই কমিটি তাদের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করলো। এর উপসংহারে বলা হলো : "সারা বাংলাদেশব্যাপী মরণপণ যুদ্ধ চলিতেছে—স্বাধীনতার যুদ্ধ। লাঞ্ছিত জাতির আপমান মোচনের পরাধীন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের এই জীবন-মরণ লড়াইয়ে আমরা সকলেই শরীক হইয়াছি। বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধের ক্ষান্তি নাই, শ্রান্তি নাই।" আর বলা হলো : "আমাদের যুদ্ধ ন্যায়ের যুদ্ধ। তাই জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। পাকিস্তান হানাদার দস্যুর পরাজয় অনিবার্য।"

এই সময় বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর থেকে বিভিন্ন প্রচারপত্র সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে প্রচার করা হতো। 'মোনাফেকদের ক্ষমা নেই' শীর্ষক গণ পজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের এক প্রচারপত্রে জাতির কাছে আবেদন রাখা হয় : 'ক্ষমতার দম্ভে, উন্মত্ততায় মানুষ বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে এমন সব কথাবার্তা বলে থাকে তখন মনে হয় মানুষ তার আসল হারিয়ে জানোয়ারের স্তরে নেমে এসেছে।....

বাংলার মানুষ যখনই তাদের হক আদায়ের দাবী জানিয়েছে, ইনসাফের আওয়াজ তুলেছে, সুখে-শান্তিতে, মর্যাদার সাথে বাঁচতে চেয়েছে তখনই পশ্চিম পাকিস্তানি গোষ্ঠী তাদের 'দেশদ্রোহী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'ভারতের দালাল' বলে কুৎসা রটনা করে বাংলার সরল সহজ মানুষের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্ঠা করেছে।

www.nagorikpathagar.org

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস। যে দেশের সিংহপুরুষ মরহুম এ. কে. ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, যে দেশের মানুষ তাদের প্রিয় নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের পক্ষে নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করেছিল, যে দেশের মানুষ তাদের প্রাপ্য আসন কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মরহুম লিয়াকত আলী খান, চৌধুরী খালিকুজ্জামান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, খান আবদুল কাইয়ুম খানকে ছেড়ে দিয়েছিল, সে দেশের মানুষ ও তাদের নেতৃবৃন্দের দেশপ্রেমে কটাক্ষ করা হয়েছে। ....

আজকের এ সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। বাঙালির এ সংগ্রাম বাঁচার সংগ্রাম, সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রাম। মানুষ নিজের গরজে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের জন্য মানুষের সৃষ্টি নয়। মানুষকে মেরে রাষ্ট্র হতে পারে না। বাঙালি তাদের দু'যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতায় নিজেরাই নিজেদের শাসন করার দাবী জানিয়েছে; বাঁচার মত বাঁচতে দাবী জানিয়েছে। বাঙালি তাদের সন্তানদের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা লাভের, চিকিৎসার দাবী জানিয়েছে; অনাহার-অনটনের হাত থেকে মুক্তিলাভের দাবী জানিয়েছে, বন্যা ও প্লাবনের কবল থেকে রক্ষা করার দাবী জানিয়েছে, বেকারত্বের অবসানে কর্মসংস্থানের দাবী জানিয়েছে। মানুষের মৌলিক অধিকার শান্তিতে ও সুখে বাস করার দাবী জানিয়েছে। অন্য কোন অপরাধ করেনি। বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানি অক্টোপাসের কবল থেকে মুক্ত হবেই।

আল্লাহতাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সত্যের জয় ও মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বাঙালি এতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।" (দ্র. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র : ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৩-৩৩৬)।

মুক্তিবাহিনী এবং প্রবাসী সরকারের উপদেশ প্রদানের জন্যে একটি সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। মূলত এই কমিটি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেশ প্রদানের কাজ গ্রহণ করে। মাওলানা ভাসানী এই সর্বদলীয় কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। অন্যান্যদের মধ্যে থাকেন মুজাফ্ফর ন্যাপ থেকে অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ, বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেসের মনোরঞ্জন ধর, বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টির কমরেড মনিসিংহ এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে খন্দকার মোশতাক আহমদ ও প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ।

এই কমিটি গঠনের ফলে মুক্তিযুদ্ধ সর্বদলীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

প্রবাস থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'জয়বাংলা' পত্রিকা এ সম্পর্কে যে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে তা প্রণিধানযোগ্য :

"বর্তমান মুক্তিযুদ্ধে সফল সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে উপদেশ দানের জন্যে বাংলাদেশের চারটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে যে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে এবং এ সম্পর্কে অনেক উৎসাহী আলোচনাও মুদ্রিত হয়েছে। বস্তুত এই সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়ায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতির যে নিবিড় ও অটুট ঐক্য রয়েছে তা আরেকবার প্রমাণিত হয়। .... বস্তুত এই উপদেষ্টা। কমিটি গঠনের গুরুত্ব এইখানেই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনৈক্যের সৃষ্টির জন্যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং উগ্র তত্ত্বসর্বস্বদের সুবিধাবাদী ভেদনীতি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো।"

www.nagorikpathagar.org

সারা বাংলাদেশের জনগণ মুক্তির প্রেরণায় উদ্বেলিত হয়ে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগলো। হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের হাতে প্রাণ দিলো কত তাজা প্রাণ, কত মা বোনের ইজ্জত বিনষ্ট হলো, ধ্বংস হলো সহায়-সম্পত্তি, ঘরবাড়ি সব কিছু। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে আপসহীন বাংলার মানুষ হানাদার নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেলো। এলো ডিসেম্বর মাস। হানাদার বাহিনীর দোসর আল-বদরের হিংস্র থাবায় বুদ্ধিজীবী নিধন অভিযান শুরু হলো। সারা বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে আপ্রাণ লড়াই করে যেত লাগলো। ৬ ডিসেম্বর ভারত স্বীকৃতি দিল স্বাধীন বাংলাদেশকে। ভারত কেন ৭ মাস ১৮ দিন পর এ দেশটাকে স্বীকার কনে নিলো, কেন তারা এর আগে স্বীকার করলো না, কেন তারা মাওলানা ভাসানীকে সুনজরে দেখলো না, সে প্রশ্ন এখনও সকলের। হয়তো একদিন সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। ওদিকে ডিসেম্বরের গোড়া থেকেই পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী মরিয়া হয়ে বিমান আক্রমণ করলো। এবার শুরু হলো ত্রিমুখী যুদ্ধ। মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনীর যৌথ কম্যাণ্ডে যুদ্ধের বেগ তীব্র হলো। মুক্তিবাহিনী একক উদ্যোগেই বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা হানাদার মুক্ত করলো। ৭ ডিসম্বর হানাদার বাহিনীর সবচেয়ে' শক্তিশালী ঘাঁটি যশোর, মাগুরার পতন ঘটলো। এমনিভাবে সারা বাংলাদেশে বিজয় পতাকা উড্ডীন হতে লাগলো। আর এদিকে আল-বদর বাহিনী ঢাকাতে বুদ্ধিজীবীদের হত্যায় রত হলো। মরার আগে পিঁপড়ার নাকি পাখা গজায়—এ যেন তারই মহড়া। 'ঢাকা চলো ঢাকা চলো' এক অপূর্ব অনুভবে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকার পথে পাড়ি জমালো। সে যে কি এক উত্তেজনা, সে যে কি এক অনুভব তা লিখে বুঝানো যাবে না। দুঃখ আর আনন্দ মেশানো সেই যে অনুভব শব্দের গাঁথুনীতে বোঝানো দুরূহ। ভাইয়ের বেদনা, বোনের বেদনা, মায়ের বেদনা, বধুর বেদনা, স্বামীর বেদনা, পিতার বেদনা সব একাকার হয়ে যে মহাবেদেনার অনুভব, তার সংগে বিজয়ের আনন্দ অনুভব একত্র করে যদি বুঝানো যেতো তাহলে সেই ক্ষণটিকে তুলে ধরা যায়। ১৬ ডিসম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের দিন তাই সবার চোখে ছিলো অশ্রু। সেই আনন্দ আর বেদনা মিশ্রিত অশ্রু।

১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৪-৩১ মিনিটে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজীর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে বিজয়ের বারতা ঘোষিত হয়। লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা বাংলাদেশের মানুষের অর্জিত স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা, এ সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশের মানুষের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। কোন হায়েনা শক্তিই একে লুট করতে পারবে না। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি : "বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।"

www.nagorikpathagar.org

আবদুল হাই শিকদার

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং মওলানা ভাসানী

প্রথম পর্যায় : স্বাধীন বাংলার প্রথম স্বাপ্নিক

১৯৪৮-এর ১৯ মার্চ। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলো সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তান। চোখ গোল গোল করে এ-ওর দিকে তাকাতে লাগলেন মুসলিম লীগের বড় বড় সব নেতারা, যারা স্বাধীন পাকিস্তানকে নিজেদের মৃগয়াক্ষেত্র হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশনে ক্রোধে ফেটে পড়লেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী :

"প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট এই যে Sales Tax Central Government-এর-Subject করে দিয়ে আসলেন এবং তাদের কাছ থেকে মাত্র ১ কোটি টাকা নেবেন বলে স্বীকৃত হলেন, এটা মন্ত্রীমণ্ডলী কোন্ স্বাধীনতার বলে করলেন?

"Assembly-র Member-দের সঙ্গে পরামর্শ না করে তারা নিজেরা মোড়লী করলেন কোন্ অধিকারে? আমরা কি Central Government-এর গোলাম? ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গোলামী করি নাই। ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জন্য চিরকাল লড়াই করেছি, আজও করব। আমরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে পাট উৎপাদন করব অথচ Jute Tax, Railway Tax, Income Tax, Sales Tax, নিয়ে যাবে Central Govt. এইসব Tax-এর শতকরা ৭৫ ভাগ প্রদেশের জন্য রেখে বাকি অংশ Central Govt.-কে দেওয়া হোক।"

[বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। দলিলপত্র : প্রথম খণ্ড। সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান। প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮২। পৃষ্ঠা–৭৫]

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কোনো জননায়কের সেই প্রথম চ্যালেঞ্জ স্ব-অধিকারের বিষয়ে সেই প্রথম সচেতনতা। যদিও স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন মওলানা ভাসানী প্রথম দেখেছিলেন ১৯৪০ সালে।

১৯৪০-এর ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে শেরে বাংলা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' পেশ করলেন। পরদিন তা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হলো। এই প্রস্তাবের অভিমত ছিল :

"কোনো প্রকার শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাই এই দেশের জন্য কার্যোপযোগী কিংবা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না তা নিম্নলিখিত মৌলিক নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যথা : ভৌগোলিক নৈকট্য-সম্পর্কিত এলাকাগুলো নিয়ে অঞ্চলের সীমারেখা নির্ধারণ করা হবে এবং এই অঞ্চলগুলো প্রয়োজনবোধে আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাসসহ এমনভাবে গঠিত হবে যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ও পূর্বাঞ্চলগুলোর মতো যেসব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব এলাকা একত্রীভূত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের রূপ নেবে। এই স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের প্রতিটি ইউনিট স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে।"

[ভাসানী। প্রথম খণ্ড। সৈয়দ আবুল মকসুদ। জানুয়ারি ১৯৮৬। পৃষ্ঠা–৯১।]

www.nagorikpathagar.org

ভাসানী গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখেছেন : "লাহোর অধিবেশনের প্রস্তাব মওলানা ভাসানীর মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করে এবং তিনি অবিলম্বে লাহোর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। উল্লেখ্য যে, লাহোর প্রস্তাবে 'রাষ্ট্র' নয় 'রাষ্ট্রসমূহ' (States) বলা হয়েছিল। অতঃপর ১৯৪৬-এ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লেজিসলেটার্স কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাব 'সংশোধন' করে মুসলমানদের 'রাষ্ট্রসমূহে'র জায়গায় 'রাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আবুল হাশিম, ভাসানী প্রমুখ এই বিকৃতির বিরোধিতা করে। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই লীগের নেতারা লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন।"

[ভাসানী। সৈয়দ আবুল মকসুদ। পৃষ্ঠা–৯১]

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ভাসানীর প্রথম প্রচেষ্টা এভাবেই নস্যাৎ করে দেয় মুসলিম লীগের কায়েমী স্বার্থের তল্পিবাহকরা।

দ্বিতীয় পর্যায় : আসসালামু আলাইকুম

স্বপ্ন ভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়েই আসাম থেকে পূর্ব বাংলায় ফিরে এসেছিলেন মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। নতুন করে সংগঠিত হতে হবে আবার। আবার শোষণমুক্ত সমাজ, স্বশাসিত দেশের প্রত্যাশা। কিন্তু নিজ বাসভূমে ফিরে দেখলেন চারদিকে স্তূপীকৃত হতাশা। শাসকের বদল হয়েছে কেবল, শোষণ রয়েছে অবিকৃত। এক প্রভুর বদলে অন্য প্রভু। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির জায়গা অধিকার করেছে পাকিস্তানী অভিজাত নবাব, নাইট, জমিদার, আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনী। অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি। আসেনি বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ—কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত যে তিমিরে ছিল সেখানেই আছে। ধর্মকে উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার করে নিয়েছে মুসলিম লীগের এ দেশীয় অনুগতরা। সামান্য কদিনেই পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে দেখা দিয়েছে সীমাহীন বৈষম্য। রাষ্ট্রভাষা নিয়েও শুরু হয়েছে চক্রান্ত। এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো যে রাজনীতিবিদ হারালেন ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ, তিনি ভাসানী। সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বাতিল করা হলো তাঁর সদস্যপদ। শুরু হলো সংগ্রামের নতুন পর্যায়।

সকল প্রকার শোষণের অবসান ঘটানো, আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা, লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুসলিম লীগের দুঃশাসনের মূলোৎপাটনের জন্য এগিয়ে এলেন মওলানা ভাসানী। আমাদের মুক্তি অর্জনের এই পর্যায়ে তাঁর হাত দিয়েই ভিত্তি স্থাপিত হলো বিদ্রোহের। ১৯৪৯-এর ২৩ ও ২৪ জুন মুসলিম লীগের বিক্ষুব্ধ তরুণ কর্মীদের এক সমাবেশ আহ্বান করলেন তিনি ঢাকার রোজ গার্ডেনে।

সেই সময়কার সবচেয়ে তেজী যুবনেতা শামসুল হক সম্মেলনে পেশ করলেন তাঁর 'মূল দাবি'। মওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে গঠিত হলো স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। এ প্রসঙ্গে একজন রাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ লিখেছেন :

www.nagorikpathagar.org

"পাকিস্তান প্রাপ্তির সাথে সাথে মুসলিম লীগকে প্রাসাদে মঞ্জিলে অবরুদ্ধ করে ক্ষমতাসীনরা গণবিরোধী দৌরাত্ম্য শুরু করলে বৈষম্য আর অবিচারের মুখে পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা অসহায় হয়ে পড়ে। প্রতিবাদহীন সেই প্রাথমিক দিনগুলোতে নির্ভরযোগ্য নেতৃত্বের আশ্বাস নিয়ে বলিষ্ঠতার সাথে এগিয়ে এসেছিলেন মওলানা ভাসানী, পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব বাংলায় জন্ম দিয়েছিলেন স্বাধিকার তথা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের।"

[মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন : তথ্যালোচনা ও মূল্যায়ন। মুহাম্মদ শামসুল হক। পৃষ্ঠা-১৭]

আওয়ামী মুসলিম লীগের মাধ্যমে এরপর থেকে ঘনীভূত হতে থাকলো আমাদের স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম। লিয়াকত আলী খানের ঢাকা সফরের এক পর্যায়ে পূর্ব বাংলায় খাদ্যাভাব ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে মওলানা ভাসানী বের করলেন পাকিস্তানের প্রথম ভুখা মিছিল যে কারণে ১৯৪৯-এর ১৪ অক্টোবর তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলো মুসলিম লীগ সরকার।

যে ভাষা আন্দোলনকে আমাদের সকল চেতনা ও জাতীয়তাবাদের মূল আধার বলে বিবেচনা করা হয়, সেই ভাষা আন্দোলনেরও অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন মওলানা ভাসানী। মওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম জোরালো বক্তব্যই যে শুধু রেখছিলেন তাই নয়; ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরি মিলনায়তনে সমাজের সর্বস্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যে সভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' গঠিত হয় মওলানা ছিলেন তার সভাপতি। ৬ ফেব্রুয়ারির যে সভায় ২১ ফেব্রুয়ারির সম্ভাব্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তার সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন :

"যে সরকার আমাদের নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনকে ইচ্ছাকৃতভাবে বানচাল করিবার জন্য অন্যায়ভাবে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে সরকার কর্তৃক জারিকৃত নিষেধাজ্ঞাকে মাথানত করিয়া গ্রহণ করার অর্থ স্বৈরাচারের নিকট আত্মসমর্পণ।"

[ভাসানী : সৈয়দ আবুল মকসুদ। পৃষ্ঠা-১১৩]

মওলানার মত দু'একজন ছাড়া আর কোনো জাতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ভাষা আন্দোলনের আশপাশে দেখা যায়নি সেদিন। ২২ ফেব্রুয়ারিতে মওলানার ইমামতিতেই প্রথম গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয় মহান ভাষা শহীদদের। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রাখার পুরস্কার হিসেবে মওলানাকে ২৩ ফেব্রুয়ারি জেলে পাঠালেন নূরুল আমিন সরকার।

১৯৫৪-এর নির্বাচনে মওলানা পালন করেন এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা। নির্বাচনকে স্বাধিকার অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। শেরে বাংলা, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত হলো যুক্তফ্রন্ট। প্রণীত হলো ঐতিহাসিক ২১ দফা। পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে পুরো দেশ চষে বেড়াতে লাগলেন নেতারা।

দৈনিক আজাদ ৫ ডিসেম্বর ১৯৫৩ সংখ্যায় লিখলো : "বর্তমান সরকারের স্থলে জনসাধারণের সত্যিকার প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের জন্য মুসলিম লীগের বিরোধী

www.nagorikpathagar.org

দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান কৃষক-শ্রমিক পার্টি ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে–" পরে অবশ্য আরো কয়েকটি দল অংশ নেয় যুক্তফ্রন্টে।

১৯৫৪ সালের ১১ মার্চ নির্বাচনে গোহারা হারলেন ক্ষমতাসীনরা। হক- ভাসানীর যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টিতে জয়লাভ করে বিজয়ীর বেশে ফিরে এল ঢাকা। সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে শেরে বাংলার নেতৃত্বে গঠিত হলো মন্ত্রিসভা।

এদিকে বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রধান বৈজ্ঞানিক জুলিও কুরির আমন্ত্রণে ২৭ মে মওলানা গেলেন ইউরোপ। পাকিস্তানি রাজনীতির কুখ্যাত ব্যক্তিত্ব গোলাম মোহাম্মদ জেনারেল ইসকান্দার মির্জার সরকার জারি করলেন ৯২'ক ধারা। মওলানার জন্য পাকিস্তান হলো নিষিদ্ধ। ঢাকা বিমানবন্দরে ইসকান্দার মির্জা ঘোষণা করলো, দেশে ফেরা মাত্র মওলানাকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

তারপর অব্যাহতভাবে চলতে থাকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের নানা কুটিল অধ্যায়। চড়াই-উৎরাই। লক্ষ্য একটাই : নানা টালবাহানা করে পূর্ব বাংলায় কায়েমী শোষণ অবিচল রাখা। স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে বানচাল করা। এমনি এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী গিয়ে জুটলেন ইসকান্দার মির্জার পাশে। এককালে প্রাইভেট সেক্রেটারী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর অধীনে আইনমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতেও তাঁর বাধলো না। তারপর একরকম পেছনের দরজা দিয়েই বসলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আসনে।

মাওলানা যখন ২১ দফার বাস্তবায়ন এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র রুখবার জোর আন্দোলন করে যাচ্ছেন, তখন যুক্তফ্রন্টের অন্য নেতাদের অবস্থান আপসের আসনে। মওলানা পূর্ব বাংলার স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ক্রমাগত সতর্কবাণী ও আন্দোলনের এক পর্যায়ে বললেন :

"আমি আশঙ্কা করছি, পূর্ব বাংলার ওপর যদি নির্যাতন ও শোষণ অব্যাহত থাকে তবে হয়তো দূর ভবিষ্যতে এই প্রদেশের জনসাধারণের ভবিষ্যৎ বংশধর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে চিন্তা করবে।"

[মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন : তথ্যালোচনা ও মূল্যায়ন। মুহাম্মদ শামসুল হক। পৃষ্ঠা–২৫]

তবু শাসনতন্ত্র পাস হলো। ১৯৫৬ সালের ১৬ মার্চ পল্টনে মওলানা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য দেশব্যাপী জেহাদের ডাক দিলেন।

২১ দফার বাস্তবায়ন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির প্রবক্তা আওয়ামী লীগ নেতা মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দীর ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই দাবি জানালেন ওয়াদা পূরণের। সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করলেন, তাঁর নিজের ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হয়েছে। তিনি মওলানাকে ভারতের চর বলে আখ্যায়িত করলেন। তাঁর অনুসারী মানিক মিয়া, শেখ মুজিব প্রমুখ এ কাজে এগিয়ে গেলেন আরো কয়েক কদম। এই নোংরামীর ফলে সংঘাত দানা বেঁধে উঠলো। দলের

www.nagorikpathagar.org

আদর্শ ও কর্মসূচি পরিপন্থী সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের এ ধরনের তৎপরতা রুখবার জন্য অনেকটা বাধ্য হয়ে ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারীতে মওলানা আহ্বান করলেন কাউন্সিল অধিবেশন। শাহ আহমদ রেজা লিখেছেন :

"এই সম্মেলনে মুখোমুখি হয়েছিলেন পাকিস্তানি রাজনীতির দুই বিতর্কিত পুরুষ : একজন দেশ জনগণ এবং দলের স্বার্থে সংগঠনের নীতি ও কর্মসূচি সমুন্নত রাখতে উচ্চকিত অনমনীয় প্রতিবাদী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অন্যজন ক্ষমতা রক্ষার প্রয়োজনে দলের ঘোষিত নীতিবিরোধী কার্যক্রমের পক্ষ সমর্থনে ব্যস্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।"

[ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম। শাহ আহমদ রেজা]

কাগমারী সম্মেলনে প্রদত্ত নিজের ঐতিহাসিক ভাষণে মাওলানা বললেন : এখন পর্যন্ত আমাদের অনেক কাজ বাকি। ২১ দফা ওয়াদার মূল দফা এবং আওয়ামী লীগ ম্যানিফেস্টোরও প্রধান কথা হলো পররাষ্ট্রনীতি মুদ্রা এবং দেশরক্ষা বিভাগ ছাড়া আর সকল বিভাগের ভার প্রদেশকে দিতে হবে। কারণ যতদিন না শিল্প ও বাণিজ্য, রেলওয়ে, পোস্ট অফিস প্রভৃতি বিভাগগুলোর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থানীয় সরকারের হাতে আসছে, যতদিন না পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক বিচারে দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইউনিট বলে স্বীকার করা হচ্ছে ততোদিন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সম্ভব নয়।

[বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। প্রথম খণ্ড। সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান। পৃষ্ঠা-৫৯৬]

তারপর মওলানা উচ্চারণ করলেন তাঁর সেই অবিস্মরণীয় বাণী : "যদি পূর্ব বাংলায় তোমরা তোমাদের শোষণ চালিয়ে যাও, যদি পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত না হয়—তাহলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী, তোমরা আমাদের কাছ থেকে একটি কথাই শুনে রাখো, 'আসসালামু আলাইকুম' তুমি তোমার পথে যাও, আমরা আমাদের পথে যাবো।"

[কিশোর মাওলানা ভাসানী। আবদুল হাই শিকদার। পৃষ্ঠা ৩৯]

মাওলানার এই অভিভাষণের পরে সারা পাকিস্তানে ঝড় উঠলো। কায়েমী স্বার্থের ধারক-বাহক সংবাদপত্রগুলো মওলানার বিরুদ্ধে লাগামহীন বিষোদগার করা শুরু করলো। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষার নামে সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিব প্রভৃতি নেতৃবর্গও মওলানার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করলেন। আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে গেল। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক আতাউর রহমান, শেখ মুজিব ও মানিক মিয়া প্রমুখ যত অপবাদই দিন, তবু এ কথা সত্য যে, কাগমারী আমাদের স্বায়ত্তশাসন তথা মুক্তির সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল বিপুলভাবে। কাগমারী সম্মেলন পাকিস্তানের রাজনীতিতে আনে মৌলিক পরিবর্তন। আমাদের চৈতন্যলোকের দরজা খুলে দেয় একাত্তরের দিকে। মওলানা ভাসানী এবং একমাত্র মওলানা ভাসানীই সেদিন ছিলেন বিমুখ প্রান্তরে একাকী প্রমিথিউস, পূর্ব বাংলার অধিকার আদায়ের প্রশ্নের ক্লান্তিহীন লড়াকু।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় পর্যায় : স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা

পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর তা ষোলকলায় পূর্ণ হলো। জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী দখল করলো রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতা। জারি হলো অমানবিক সামরিক শাসন। নিভে গেল পাকিস্তানী রাজনীতির সুস্থতার সর্বশেষ শিখা।

নিষিদ্ধ হলো রাজনীতি। মওলানা ভাসানীসহ অনেক রাজনৈতিক নেতা নিক্ষিপ্ত হলেন জেলখানায়। ভয়াবহ সংকট ও ত্রাস চারদিকে। জেলে কেটে গেল কয়েকটা বছর।

দেশে দেখা দিল বন্যা। মওলানা অনশন করলেন। তারপর এল কারামুক্তি। শুরু হলো নতুন পর্যায়ের সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মুখবন্ধ রচনার জন্যই যেন লিখলেন 'দেশের সমস্যা ও সমাধান'। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত তাঁর এই গ্রন্থে লিখলেন :

"দেশের প্রকৃত রক্ষক, জাতির মেরুদণ্ড কৃষক সমাজ। তাহারাই দেশের জনসংখ্যার ৮৫ জন। তাহদেরই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে ধান, পাট, আখ, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এককথায় তাহাদের রক্ত পানি করিয়া তাহারা যে সোনার ফসল উৎপন্ন করে তাহাই প্রকৃত পক্ষে দেশের উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী, সদস্য, মন্ত্রী, সেক্রেটারী, এমন কি দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের জীবিকা নির্বাহ, তথা জীবন ধারণের একমাত্র উৎস। এই কৃষকদের উপরেই দেশের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি, উন্নতি, অগ্রগতি, দেশের স্বাধীনতা ও সভ্যতা নির্ভরশীল। অথচ আজ সেই কৃষকের ঘরে খাবার নাই। এক মুঠো ভাতের অভাবে মা-বাবা গলায় দড়ি লাগায়, এক ফোঁটা ওষুধপথ্যের অভাবে কোলের শিশু মারা যায়, কৃষকের পরিবার আজ অর্ধ উলঙ্গ, কৃষকের সন্তান আজ সামান্য প্রাইমারী শিক্ষার আলো হইতেও বঞ্চিত। ইহা কি একটি স্বাধীন সভ্য দেশের পক্ষে কলঙ্কস্বরূপ নয়?"

[ভুরুঙ্গামারী কৃষক সম্মেলন এবং মওলানা ভাসানী। আবদুল হাই শিকদার। বিচিত্রা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৮। পৃষ্ঠা-৪৭]

অতঃপর এই কলঙ্ক মোচনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিলেন মহানায়ক। স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামের সাথে যুক্ত হলো আরো একটি মাত্রা, শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার। এই সময়, ১৯৬৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর, গণচীন সফর তাঁর জীবনে বয়ে আনে নতুন প্রাণ। আমাদের রাজনীতি লাভ করে নতুন দর্শন। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত চলতে থাকে এই অধ্যায়। ১৯৬৬ সালে স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাঁর ন্যাপের প্রদত্ত ১৪ দফা নতুন উত্তেজনা সঞ্চার করে চারদিকে। মওলানার আইন অমান্য আন্দোলনও এই পর্যায়ে যুক্ত করে নতুন পালক।

১৯৬৮ সারে আইয়ুবী স্বৈরশাসনের ১০ বছর পূর্ণ হলো। ঘটা করে 'উন্নয়ন দশক' উদযাপনে মাতলেন ক্ষমতাসীন মহল। হয়তো আড়ালে নিয়তি নির্ধারণ করেছিল অন্য রকম কিছু। জাতীয় রাজনীতির প্রধান নায়ক হিসেবে হাঠাৎ করে ঝলসে উঠলেন মাওলানা ভাসানী। ক্ষমতার শিখর থেকে এক ধাক্কায় ধুলায় ছুঁড়ে দিলেন আইয়ুব খানকে।

www.nagorikpathagar.org

১৯৬৮-এর ৫ ডিসেম্বর, আইয়ুব খান এলেন ঢাকায়। ওইদিনই বিকেলে পল্টনের জনসভায় মওলানা ঘোষণা করলেন, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। এ দাবী মানা না হলে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করে 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' কায়েম করা হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সেই প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে স্লোগান এল, 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা জিন্দাবাদ'।

৭ ডিসেম্বরের পাকিস্তান অবজারভার লিখলো, 'Bhashani's call for Mass Movement.' সভাশেষে লাখ লাখ লোকের মিছিল নিয়ে গভর্নর হাউস ঘেরাও। জন্ম হলো ঐতিহাসিক ঘেরাও আন্দোলনের। মওলানা দ্রুত আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিলেন সারাদেশে। হাতিরদিয়া হত্যাকাণ্ডের পর সেখানে ছুটলেন ক্ষুব্ধ জননায়ক। জনসভায় বললেন, 'অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজনবোধে খাজনা– ট্যাক্স বন্ধ করা হইবে।' [দৈনিক আজাদ। ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৯]।

১৯৬৯-এর ২০ জানুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল। ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে বেরুলো মিছিল। পুলিশ নির্মমভাবে হত্যা করলো ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানকে। বিক্ষোভে ফেটে পড়লো সারাদেশ। অবস্থা বেগতিক দেখে আইয়ুব গোলটেবিলের প্রস্তাব দিলেন। মওলানা তীব্র বিরোধিতা করলেন এবং বললেন :

'ব্রিটিশ গোলটেবিল বৈঠকের মারফত যেমন পাক-ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন হইতে পারে নাই, ঠিক তেমনি বর্তমান গোলটেবিল বৈঠকেও জনসাধারণের দাবি আদায় সম্ভব নয়।'

[দৈনিক ইত্তেফাক। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ। ২য় খণ্ড]

১৫ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হলেন সার্জেন্ট জহুর। গায়েবানা জানাজায় মওলানা বললেন, প্রয়োজনে বাস্তিল দুর্গের মতো ক্যান্টেনমেন্ট ভেঙ্গে শেখ মুজিবকে মুক্ত করে আনবো। মুক্তি পেলেন মুজিব। মুক্তি পেয়েই ভাসানীর কথা না শুনে ছুটলেন রাওয়ালপিণ্ডির গোলটেবিলে। ব্যর্থ হলো বৈঠক, ২৫ মার্চ ১৯৬৯ পদত্যাগ করলেন আইয়ুব খান। জারি হলো আবারও সামরিক আইন। এবার নাটের গুরু ইয়াহিয়া খান।

১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর সারা পাকিস্তানে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হলো। শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগসহ প্রায় সব দলই ব্যস্ত নির্বাচন নিয়ে। এই যখন রাজনৈতিক অবস্থা, সেই সময় ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের দক্ষিণের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানলো স্মরণকালের ভয়াবহ ও নৃশংসতম জলোচ্ছ্বাস। রাতারাতি নিশ্চিহ্ন হলো জনপদের পর জনপদ। ১০ লক্ষাধিক মানুষ নিহত হলো তাণ্ডবে। মওলানা তখন ঢাকার এক ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন। গায়ে ১০৪° ডিগ্রী জ্বর। ওই অবস্থায় ছুটলেন উপদ্রুত অঞ্চলে। সেখানে গিয়ে মানুষের সীমাহীন দুঃখ ও দুর্দশা দেখে ভেঙ্গে পড়লেন কান্নায়। সারা পৃথিবী তখন সাহায্য দিতে উন্মুখ। অথচ ঘটনার সাত দিন পরেও বাঙালি জাতির সেই মহাদুর্দিনে সামান্য আশ্বাস জানাতেও এগিয়ে এল না পাকিস্তানী শাসকরা।

www.nagorikpathagar.org

সমুদ্রপীড়িত দক্ষিণ বাংলা থেকে ঢাকায় ফিরে পল্টনের জনসভায় ক্ষোভে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন মজলুম জননেতা। পাকিস্তানের শাসকবর্গের কথা উল্লেখ করে বললেন, 'ওরা কেউ আসেনি। কারণ ওরা আমাদের কেউ না। ওরা আমাদের মানুষ মনে করে না। অনেক দেন-দরবার হয়েছে। দাবি পেশ হয়েছে। আর নয়। নির্বাচনও আর নয়।'

তারপর যে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করেছিলেন, সেই পাকিস্তান ভাঙ্গার ডাক দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে আমরা স্বাধীন। আমি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।' সারাদেশে লাখ লাখ প্রচারপত্র বিতরণ করে বলা হলো :

'জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর ডাক' : পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন। .... 'পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' 'জনগণের সংগ্রামী ঐক্য জিন্দাবাদ।' [বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ ২য় খণ্ড। পৃষ্ঠা–৫৭৮]

মওলানা যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিচ্ছেন, সে সময় শেখ মুজিবুর রহমান বলছেন : 'নির্বাচন নস্যাৎ হলে প্রয়োজনে আন্দোলন হবে।'

[বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ২য় খণ্ড। পৃষ্ঠা–৫৭৩]

বলছেন, "We are the Majority, we are Pakistani" [বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। ২য় খণ্ড। পৃষ্ঠা-৫৭৪]

শেখ মুজিবের এই ধরনের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা বললেন : 'মুজিব তুমি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামে যোগ দাও। যদি আমেরিকা ও ইয়াহিয়ার সাথে কাজ কর তাহলে আওয়ামী লীগের কবর '৭০ সালে অনিবার্য।' [বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। ২য় খণ্ড। পৃষ্ঠা–৫৮৪]

মওলানার স্বাধীনতা ঘোষণার বিরোধিতা করলেন অনেকেই। শেখ মুজিব বললেন : 'আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি জানিয়েছি, স্বাধীনতার নয়।' নির্বাচন হলো। এদিকে নির্বাচন জয়ী আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব ১৯৭১-এর ৩ জানুয়ারি রেসকোর্সে যখন শপথ নিচ্ছেন স্বায়ত্তশাসন অর্জনের, সেই সময় সন্তোষে (৯ জানুয়ারি) মওলানা আহ্বান করলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের পন্থা ও কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য সম্মেলন। প্রণীত হলো ৫ দফা প্রাথমিক কর্মসূচি। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকৃতি কেমন হবে সে সম্পর্কেও রেখেছেন বিস্তারিত রূপরেখা :

'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বরূপ, সাম্য ও মুক্তির আদলে রচিত হইবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এবং সামাজিক ন্যায়বিচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া সাত কোটি পূর্ব পাকিস্তানী ইতিহাসের পাতায় সোনালী দিনের যোজনা করিবে। সেই সময় মওলানা ভাসানীর চেয়ে এতখানি স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার কর্মসূচি দেয়া আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।'

[মাওলানা ভাসানী রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম। সম্পাদনা শাহরিয়ার কবির। পৃষ্ঠা xiv)

মোটকথা বাংলাদেশে ১৯৭০-এর নভেম্বর থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে একমাত্র মওলানা ভাসানীই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিরামবিহীন প্রচারণা চালিয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে জটিল পরিস্থিতি দেখা দিল। ৭ মার্চ শেখ মুজিব রেসকোর্সে তাঁর ঐতিহাসিক বক্তব্য পেশ করলেন।

৯ মার্চ মওলানা ভাসানী পল্টনে বললেন : ইয়াহিয়াকেও তাই বলি, অনেক হয়েছে, তিক্ততা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন-নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নাও। ২৫ মার্চের মধ্যে স্বাধীনতা মেনে নাও।..... শেখ মুজিব বা ভাসানী বা অন্য কেউ যদি আপস করতে চায় জনতা তাকে আস্ত রাখবে না।

[মাওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন : তথ্যালোচনা ও মূল্যায়ন। মুহাম্মদ শামসুল হক পৃষ্ঠা-৪৫]

কিন্তু না ইয়াহিয়া না শেখ মুজিব কেউ মাওলানার কথা শুনলেন না। তারা ১৬ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্য আলোচনা চালিয়ে গেলেন। ১৭ মার্চ মাওলানা চট্টগ্রামের জনসভায় ঘোষণা করলেন, 'শেখ মুজিব আপসের রাস্তা বাদ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নাও। আপস করলে ৭ কোটি বাঙালি তা মানবে না।' *[কিশোর মাওলানা ভাসানী, পৃষ্ঠা-৬]*। ২৩ মার্চ ১৯৭১ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাথে শেখ মুজিবের রুদ্ধদ্বার বৈঠকের তীব্র নিন্দা জানালেন মহা নায়ক ভাসানী।

২৫ মার্চ ঘুমন্ত ঢাকাবাসীর ওপর হিংস্র হায়েনার মতো হামলে পড়লো পাকিস্তানী বাহিনী। শুরু হলো ব্যাপক গণহত্যা। ২৬ ও ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে বেতারে প্রথমে নিজের নামে পরে শেখ মুজিবের নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করলেন মেজর (পরে জেনারেল) জিয়াউর রহমান। শুরু হলো মওলানা তথা সমগ্র জাতির বহু কাংক্ষিত মুক্তিযুদ্ধ।

চূড়ান্ত পর্ব : রণাঙ্গনে মহানায়ক

২৫ মার্চ মজলুম জননেতা ছিলেন সন্তোষে। ৩ এপ্রিল সন্তোষে পাকিস্তানি বাহিনী প্রবেশ করে জ্বালিয়ে দিল মাওলানার মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু। মাওলানা আশ্রয় নিলেন বিন্নাফৈড় গ্রামে। বিন্নাফৈড় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন রাশেদ খান মেনন। দেশত্যাগে মওলানার দ্বিধা ছিল। যে কারণে রাশেদ খান মেননের উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে বললেন :

"যেতে হলে ভারতে যেতে হয়। নেহরু আমার বন্ধু ছিল। ইন্দিরা আমাকে আদর করে রাখবে! কিন্তু সুভাষ বসুও দেশত্যাগ করে কিছু করতে পারেননি। জাপানীরা তাঁকে আটকে রেখেছিল। তাঁরা তাকে আটকে রেখে চেয়েছিল ভারতবর্ষ তাদের দখলে নিতে। *[ভাসানী : সৈয়দ আবুল মকসুদ। পৃষ্ঠা-৩৪৬]*

আসলে মওলানা চেয়েছিলেন লন্ডনে যেতে। সেখানে গিয়ে প্রবাসী সরকার গঠন করে মুক্তিযুদ্ধকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যাবেন। কায়েম করবেন তাঁর বহু কাঙ্ক্ষিত শোষণমুক্ত সমাজ। যার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় সাইফুল ইসলামের লেখায় :

'চাইছিলাম লন্ডনে যাব, প্রবাসী সরকার গঠন করবো। কিন্তু কুটুমবাড়ি বেড়ায়া গেলাম।'

[স্বাধীনতা ভাসানী ভারত। সাইফুল ইসলাম, পৃষ্ঠা- ১৯৯]

www.nagorikpathagar.org

তা কেরতে হলে তাঁকে দেশত্যাগ করতে হতো বার্মার মধ্য দিয়ে। তখনকার অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতে তা ছিল অসম্ভব। অগত্যা ৫ এপ্রিল ভারতের পথেই নৌকা ভাসালেন জননায়ক। আসামের ফুলবাড়িতে মওলানাকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রথম এগিয়ে এলেন ভারতের কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী, তাঁর সাবেক সহকর্মী মইনুল হক চৌধুরী।

ভারতের মাটিতে পা দিয়েই মওলানা বুঝলেন তাঁর অনুমান সঠিক হয়েছে। কারণ ভারতে তখন ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন ছিল একটি আধিপত্যবাদী সম্প্রসারণবাদী সরকার। এই সরকার নকশাল ও পাকিস্তানি গুপ্তচরদের কাল্পনিক আক্রমণের ভয় দেখিয়ে নিরাপত্তার কথা বলে নজরবন্দী করে ফেললো মাওলানা ভাসানীকে। ইন্দিরার ভয় ছিল মাওলানা মুক্ত থাকলে এ মুক্তিযুদ্ধ চলে যাবে কৃষক শ্রমিক নিম্নবিত্ত মানুষদের হাতে। প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ। তখন ভারতের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। তাই মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত মওলানাকে থাকতে হলো নজরবন্দী, কখনো দিল্লীতে, কখনো দেরাদুনে, কখনো বা কলকাতায়।

এই অবস্থায় থেকেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সাধ্যাতীত ভূমিকা পালন করে চললেন মহানায়ক। ১৮ এপ্রিল ১৯৭১। আনন্দবাজারে খবর বেরুলো :

গৌহাটি–এপ্রিল ১৭, পিটিআই, জাতীয় আওয়ামী পার্টির নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, "স্বাধীন বাংলাদেশের দাবি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দাবি নয়, বরং পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে এ এক পবিত্র সংগ্রাম।'

১৭ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠিত হলে মাওলানা পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে, সারা বিশ্বের কাছে আকুল আবেদন জানালেন এ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য। ১৯ এপ্রিল জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট, গণচীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ, প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই, সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগোর্নি, সেক্রেটারী জেনারেল ব্রেজনেভ, প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন, ফরাসী প্রেসিডেন্ট পম্পিডু, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্ট টিটো, মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদত, আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল আবদেল খালেক হাসাওয়ানার কাছে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পূর্ণ সমর্থন জানানোর জন্য আলাদা আলাদা তারবার্তা পাঠালেন। চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ প্রেরিত তারবার্তায় লিখলেন :

Ideology of Socialism is to fight against oppression, I appeal to save seven and half crores of oppressed people of Bangladesh from the atrocities, committed on them by the military junta of dictator General's Yahya Khan. Yahya' Military Government, by the help of modern war weapons supplied by your Government are mercilessly and brutally slaying the innocent, unarmed, helpless, peas, Labours studen, inteligent's antsirea womean and childern of Bangladesh if your Goverment, do not protest this brutal atrocities, committed on appressed masses of Bangladsh, by the millitary Junta, with the help of vested interests of west Pakistan, the world many think that you are not the friends of oppressed people.

[বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। চতুর্থ খণ্ড। পৃষ্ঠা–৪৭০–৪৭১]

www.nagorikpathagar.org

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে লিখলেন, 'আপনার দেশের সরবরাহকৃত অস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশে পাশবিক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে।'

১২ এপ্রিল এক প্রচারপত্রে স্বাধীনতা যুদ্ধের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বললেন, 'এ যুদ্ধ বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, এ যুদ্ধ বাঙালি জাতির বাঁচা-মরার প্রশ্ন'। ২৩ এপ্রিল আনন্দবাজারে বেদনাবিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'বর্তমান দুর্যোগের মুহূর্তে মানবজাতির কাছে বাংলাদেশের জ্বলন্ত প্রশ্ন : বর্বর পশুশক্তির কাছে কি ন্যায়সঙ্গত মহান সংগ্রাম চিরতরে নিষ্পেষিত হবে'? ওই একই সংখ্যায় মওলানার ঘোষণা :

'পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, মাঝি, তাঁতী, কুটির শিল্পী, ছাত্র, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবীসহ চাকরিজীবী আপামর জনসাধারণের কাছে মওলানা ভাসানীর আবেদন, আপনারা ইস্পাত দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলুন।

..... বর্তমান মুহূর্তে একতা আর মনোবল ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমই হইতেছে আমাদের অস্ত্র। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। আল্লাহ্ জালিমকে ঘৃণা করেন। আমাদের মহান সংগ্রামের পক্ষে আমরা আল্লাহর সাহায্য নিশ্চিত পাইব এবং পূর্ব বাংলাকে সুখী-সমৃদ্ধশালী 'স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে গড়িয়া তুলিব।'

পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতি মওলানা ভাসানীর আবেদন –'দালাল, বিশ্বাসঘাতক ও মোনাফেক হইতে সাবধান।' প্রকাশিত হলো ৫ মে, ১৯৭১-এ। এই আবেদনে মাওলানা নির্দেশ দিলেন :

১. আপনারা বিশ্বাসঘাতক এই সকল দালালদিগের কোনো প্রচারণাতেই কান দিয়া নিজেদের মনোবল ও একতা নষ্ট করিবেন না।
২. পূর্ব বাংলার ৪ হাজার ইউনিয়নে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গড়িয়া তুলুন।
৩. প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং সেন্টার খুলুন। গেরিলা যুদ্ধের তালিম নিন।
৪. মুক্তিফৌজদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন।
৫. জানমাল ইজ্জত বাঁচাইবার জন্য যাহারা হিজরত করিতে বাধ্য হইতেছে, দালালদের অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষ করুন।
৬. চাউল, ডাউল, খড়ি, নুন, তেল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য অথবা রন্ধনকৃত খাদ্যদ্রব্য দিয়া মুক্তিফৌজদিগকে সাহায্য করুন।
৭. সকল শ্রেণীর যুবক মুক্তিফৌজে যোগ দিন।
৮. দালাল ও শত্রুর প্রতি কড়া নজর রাখুন!
৯. দালালদিগকে সামাজিকভাবে বয়কট করুন এবং তাহাদিগের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করুন।
১০. সমরদানব ইয়াহিয়া টেক্কার নির্মম অত্যাচারে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে অথচ জীবনের অন্তিম বাসনা অনুযায়ী কাফন-দাফন, জানাজা ও কবরের মাটি পায় নাই সে সকল হতভাগ্য মানুষের এবং ঘূর্ণিবার্তায় যে লক্ষ লক্ষ মানুষের জানাজা ও কবর হয় নাই, গ্রামে গ্রামে ও শুক্রবার মসজিদে মসজিদে জমায়েত হইয়া তাহাদিগের আত্মার মাগফেরাত কামনায় গায়েবানা জানাজার নামাজ আদায় করুন।

www.nagorikpathagar.org

১১. গ্রামে গ্রামে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শপথ গ্রহণ করুন—যত রক্ত দিতে হয় দিব কিন্তু শোষিত নির্যাতিত অবহেলিত পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করিয়া ছাড়িব।

১২. দলমত ভুলিয়া গিয়া সর্বদলীয় ঐক্য মোর্চা গড়িয়া তুলুন।' *[বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। চতুর্থ খণ্ড পৃষ্ঠা-৪৯৬]*

মওলানা যখন স্বাধীনতাবিরোধীদের মোকাবিলার ডাক দিয়ে পুরো জাতিকে শামিল হতে বলছেন মুক্তিযুদ্ধে, তখনও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বেসামাল ঘর গোছাতে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রক্তস্নাত দিনে মাওলানা ভাসানী জনমত গঠনে পৃথিবীব্যাপী চালিয়ে গেলেন এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা। আর কোনো জাতীয় নেতাকে খুঁজে পাওয়া গেল না সেই সংকট সময়ে। ১৫ মে ইয়াহিয়ার প্রতি ছুঁড়লেন চ্যালেঞ্জ। ১৬ তারিখের আনন্দবাজারে তা ছাপা হলো। ২২ মে উদ্ভূত অবস্থার প্রেক্ষিতে জাতির করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে পত্রিকায় পাঠালেন দীর্ঘ প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

মওলানার আশীর্বাদে প্রতিষ্ঠিত হলো 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'। ১ জুন প্রকাশিত হলো কমিটির ঘোষণাপত্র। ঘোষণাপত্রের এক জায়গায় যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা গেরিলাদের উদ্দেশ্যে বলা হলো :

'–জনগণকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে।

–জনগণকে সাহায্য করিতে হইবে।

–জনগণকে রক্ষা করিতে হইবে।'

[বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চতুর্থ খণ্ড। পৃষ্ঠা-৫১৩]

৩১–মে আনন্দবাজারে বললেন : 'রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা আসবে।'

মওলানা যখন স্বাধীনতার জন্য বন্দীদশা থেকেও প্রাণপণ চালাচ্ছিলেন তৎপরতা, সেই সময় প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের মধ্যে শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড অন্তর্কলহ। ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে এক নির্লজ্জ কমড়া-কামড়ি। আওয়ামী লীগের একটি বিশেষ মহল তখন প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। শেখ মুজিবের আত্মীয় শেখ ফজলুল হক মণিসহ অনেকেই তাজউদ্দীন সরকারের বিরুদ্ধে রীতিমতো জেহাদ ঘোষণা করে বসে আছেন। অপর দিকে আওয়ামী লীগের অন্য একটি মহল পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন করার চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছে। আবার আওয়ামী লীগের বাইরে মণি সিং মোজাফফরগংও ক্ষমতার ভাগ দাবি করে বসলেন। সেই দুঃসময়ে তাজউদ্দীন সরকার ধরণা দিয়ে পড়লেন নজরবন্দী মওলানার দেরাদুনের আবাসস্থলে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে, এই ক্ষমতালোলুপ, জাতীয় অঙ্গীকারবিমুখ প্রবাসী নেতৃবৃন্দকে হুঁশিয়ার করে ৩১ মে প্রচারিত বিবৃতিতে মাওলানা বললেন, 'আমাদের সামনে মাত্র দুটো পথ– হয় পূর্ণ স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু!'

এম আর আখতার মুকুল লিখেছেন : 'মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। আবার তিনি জানতেন যে, এতদিন ধরে সমর্থনদানের পরে রুশপন্থীরা মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হতে আগ্রহী। এছাড়া তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এই সুযোগে মনোরঞ্জন ধরের কংগ্রেসও মুজিবনগর মন্ত্রিসভার অন্তর্ভূক্ত হতে চায়। তিনি আরও

www.nagorikpathagar.org

জানতেন যে, প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের প্রতি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সংখ্যাগুরু অংশের সমর্থন নাই। সুতরাং একবার মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ অথবা পুনর্গঠনের কর্মকাণ্ড শুরু হলে উপদলীয় রাজনীতির ভয়াবহ বহিঃপ্রকাশ দেখা দেবে এবং তা মুক্তিযুদ্ধের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক হবে।'

[আমি বিজয় দেখেছি। এম আর আখতার মুকুল। পৃষ্ঠা ৩৭৮-৩৭৯]

অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে মওলানা সর্বদলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সভায় ঘোষণা করলেন, আপসের পথে কোনো সমাধান নাই। ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব করারও দিন নয় এটা। বাংলাদেশ আজ জীবনপণ মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত। এ রক্তপাত ওই আত্মত্যাগকে কতিপয় স্বার্থান্বেষীর কারণে রাস্তায় নস্যাৎ হতে দেয়া হবে না। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হলো 'সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ'।

অশুভ তৎপরতা তবু থামে না। আওয়ামী লীগের একটি অংশ যে কোনো মূল্যে ক্ষমতার স্বাদ পেতে অস্থির। আপসের চক্রান্ত থামে না। দায়িত্ববান অভিভাবকের মতো মওলানা ৩০ জুনের টাইমস অব ইন্ডিয়ায় বললেন :

"NO COMPROMISE WITH YAHYA ON INDEPENDENCE"

২৮ জুলাই টাইমস অব ইন্ডিয়ায় বললেন : সার্বভৌম বাংলাদেশই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

১৮ অক্টোবর ১৯৭১। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় আওয়ামী দলের তরফ থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হলো :

"বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রাম যখন জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হতে চলেছে ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংগ্রাম শুরু হয়েছে তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধানের নামে আজ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের গতিরোধ করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এ সম্পর্কে বাংলার মুক্তিকামী জনগণকে হুশিয়ার করে দেয়া প্রয়োজন মনে করছে।

বাংলার মুক্তি সংগ্রাম আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে শাসকচক্রের সঙ্গে কোনো আপসের চিন্তাও করা যায় না। বাংলার মানুষ আজ নির্মম নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এটাই বুঝতে পেরেছে যে, বাংলার মুক্তি আপসের সরল পথে আসবে না। হানাদার দস্যুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই অব্যাহত রেখেই বাংলার মুক্তি সম্ভব।

বাংলার মুক্তি সংগ্রামকে নস্যাৎ করে দেয়ার যে ষড়যন্ত্র চলছে, সে সম্পর্কে বাংলার মজলুম ও প্রবীণ জননেতা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মাওলানা ভাসানী ইতিপূর্বে ২৪ জুন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন– বাংলাদেশের জনগণ রাজনৈতিক সমাধানের নামে ধোঁকাবাজি কিছুতেই গ্রহণ করবে না। তাদের একমাত্র পণ—হয় দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু। এর সঙ্গে গোঁজামিলের কোনো স্থান নাই।"

[বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। চতুর্থ খণ্ড। পৃষ্ঠা–৫৯৪–৫৯৫]

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে ২৩ এপ্রিল প্রদত্ত মওলানার বিবৃতি ভারত তথা সারা পৃথিবীতে অসামান্য অবদান রেখেছিল। এই বিবৃতির পূর্ব পর্যন্ত ভারত সরকার বা অন্যরা কেউ

www.nagorikpathagar.org

আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের কথায় কান দেননি। কারণ শেখ মুজিব ছাড়া বলতে গেলে আর সকলেই ভারতের কাছে ছিলেন অচেনা মুখ। ভারতীয় পত্রপত্রিকাগুলোতে ভাসানীর বক্তব্য, বিবৃতিকে অসামান্য গুরুত্ব দিয়ে ছাপাতে শুরু করে। কিন্তু ভাসানী অনুসারীরা যতই সংগঠিত হতে শুরু করে, যুদ্ধ যতই জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হতে থাকে, তত বেশি শঙ্কিত হয়ে পড়ে ভারত সরকার এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব। এক পর্যায়ে মওলানাকে মুছে দেয়া হয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে। বন্দী ভাসানী এই পর্যায়ে তাঁর প্রিয়জনদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতে পারতেন না। এ সম্পর্কে সৈয়দ আবুল মকসুদ লেখেন :

"চীন মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করার জন্য ভারত সরকার স্বয়ং এবং মাওলানা ভাসানীর প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করার ফলে শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি কিছুটা ম্লান হতে পারে আওয়ামী লীগের এই আশংকা ভারত সরকারকে অবহিত করার পরে জুলাই, আগস্ট থেকে ভাসানী সম্পর্কে ভারতীয় পত্রপত্রিকা কোনো এক বিশেষ নির্দেশে নীরবতা পালন করে।"

[ভাসানী । সৈয়দ আবুল মকসুদ পৃষ্ঠা–৩৬৬]

সেই সময় ভাসানী সম্পর্কে অস্বাভাবিক নীরবতায় জনমনে সন্দেহের উদ্রেক হতে থাকে, হয়তো ভাসানীকে হত্যা করেছে ভারত সরকার। দু-একটা সভা-সেমিনারে প্রবাসী বাঙালিরা জানতে চাচ্ছে ভাসানী কোথায়? পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে ওঠে ভারত সরকার। ১৯ মে ভুটানের এক সংবাদ সম্মেলনে অনেকটা আগ বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী বললেন, ভাসানী যে কোনো সময় দিল্লী আসতে পারেন। বললেন, ভাসানী চীনপন্থীও নন, শেখ মুজিবের বিরোধীও নন। এ বিষয়ে সৈয়দ আবুল মকসুদের পর্যালোচনা :

'এর আগের প্রায় সকল রিপোর্টেই দেখা গেছে যে, বাংলাদশের কোনো জায়গায় মাওলানা ভাসানী রয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সহসা কী ব্যাপার ঘটলো যে তিনি তাঁর খুশিমতো যে কোনো সময় দিল্লী আসতে পারেন বলে ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন হলো ভারত সরকারের একজন মুখপাত্রের এবং তার কাছ থেকে এ সার্টিফিকেটও নেয়ার প্রয়োজন হলো যে, তিনি চীনপন্থীও নন, শেখ মুজিবের বিরোধীও নন।' এর বহু কারণের মধ্যে একটি হলো স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাসানীর অবদানকে খাটো করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের ভারতীয় বন্ধুরা ভাসানীবিরোধী নির্বাচিত প্ররোচনায় লেগে যায়। তিনি 'মাওবাদী', তিনি শেখ মুজিবের বিরোধী অর্থাৎ স্বাধীনতাবিরোধী ইত্যাদি প্রমাণের জন্য সত্য-মিথ্যা যত রকম প্রচারণা করা সম্ভব তা করা হয়।'

[ভাসানী। সৈয়দ আবুল মকসুদ পৃষ্ঠা–৩৮৫]

তবুও সূর্য ওঠে। তবুও মিথ্যাকে সরিয়ে মহীয়ান হয়ে ওঠে সত্যের সূর্য। সকল ষড়যন্ত্র সকল হীন প্রচার মিথ্যা প্রমাণ করে ১৬ ডিসেম্বর হানাদারদের কবল থেকে মুক্তি পেল বাংলাদেশ। লাখ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে দামাল মুক্তিযোদ্ধাদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে মুক্ত হলো বাংলাদেশ। সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাংলাদেশ। মওলানা ভাসানীর বাংলাদেশ। কিন্তু ভাসানী তখন কোথায়? ভাসানী তখন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহুদূরে দেরাদুনে কড়া প্রহরী বেষ্টিত একটি বাড়িতে অন্তরীণ।

www.nagorikpathagar.org

আবদুল গফুর

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন অধ্যায়

স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতা ব্যতিরেকে কোন মানুষ বা মানব গোষ্ঠীর সুস্থ বিকাশ ও উন্নতি কল্পনা করা যায় না। কোন দেশের স্বাধীনতা বলতে সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা মনে করা হয়। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। স্বাধীনতা বলতে কোন দেশ বা জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সাথে তার অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতাও বুঝানো হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা একটি ব্যাপক ধারণা এবং একে কোন সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যাখ্যা করার কোন অবকাশ নেই।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার হলেও এ দুনিয়াতে কোথাও স্বাধীনতার শত্রুর অভাব নেই। আজকের দুনিয়ায় সভ্যতা ও বিজ্ঞানের আলো ঝলমল এ বিশ্বে কত ছুতায়, কত রূপে, কত চেহারায় যে স্বাধীনতার শত্রুরা বিচরণ করে তার ইয়ত্তা নেই। সেই কত বছর আগে মনীষী রুশো যে বলে গিয়েছিলেন, 'Man is born free, but everywhere he is in chains'—'মানুষ জন্মায় স্বাধীন, কিন্তু সর্বত্র নিজেকে সে শৃঙ্খলিত দেখতে পায়'–এ কথার সত্যতা যেন মানুষ প্রতি পদে পদে উপলব্ধি করে থাকে। এ সত্য যতটা সমাজ জীবনে, তার চাইতেও যেন বেশি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। জোর যার মুল্লুক তার—এই জংলী নীতিকেই পোশাকী রূপ দেয়া হয়েছে survival of the fittest— নীতিতে এবং এর সংগে যুক্ত হয়েছে পাশ্চাত্যের মেকিয়াভেলী এবং প্রাচ্যের চানক্য প্রমুখের 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'–মার্কা সুবিধাবাদী নীতি। এরই সাথে আবার সংযুক্ত হয়েছে 'বিপ্লবের স্বার্থে যে কোন কৌশলও প্রতারণা বৈধ' ভাবার একটি আধুনিক তত্ত্ব। ফলে বাইরে সভ্যতা, প্রগতি, মুক্তি ও বিশ্বশান্তির জন্য লীগ অব নেশন্‌স ও ইউনাইটেড নেশন্‌স-এর মায়াকান্নার অন্তরালে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের পাশাপাশি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদের লীলাখেলায় ক্ষুদ্র ও দুর্বল দেশসমূহের স্বাধীনতা একেবারেই কাগুজে আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আর কোন কোন সময় সমস্ত রকমের লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে বিভিন্ন দুর্বল রাষ্ট্র ও দুর্বল প্রতিবেশীর প্রতি রক্তচক্ষু প্রদর্শন এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নগ্ন হস্তক্ষেপ বৃহৎ ও উঠতি বৃহৎ শক্তিবর্গের একটি অপরিহার্য বদভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা উনিশশো একাত্তরে অর্জিত হলেও এ স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছিল বহু পূর্বে, বলতে গেলে পলাশীর পর পরই। স্বাধীনতার সুদীর্ঘ সংগ্রামের এক পর্যায়ে উনিশশো চল্লিশে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। লাহোর প্রস্তাব হিসেবে পরিচিত এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালিত হয়। এই আন্দোলনের বিজয় পর্বে ছয়চল্লিশ

www.nagorikpathagar.org

সালে এর আংশিক সংশোধন করে উভয় অঞ্চল মিলে একটি পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সাতচল্লিশে সেই অনুযায়ী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সম্মুখীন হয়। এই যুদ্ধের ফলাফলের ভিত্তিতেই একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সেই বিচারে বলা যায়– বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবেরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে, যদিও লাহোর প্রস্তাবের আলোকে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের পরিকল্পিত রাষ্ট্রটির আকার আরও অনেক বড় হবার কথা ছিল।

এক হিসেবে উনিশশো সাতচল্লিশের পর একাত্তরের এ স্বাধীনতা ছিল দ্বিতীয় স্বাধীনতা। সাতচল্লিশে স্বাধীন পাকিস্তানের অংশ হিসেবে প্রথম যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করি, তা কালের বিচারে অপ্রতুল প্রমাণিত হয়। তাই স্বাধীনতাকে অধিকতর অর্থবহ এবং অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার খাতিরে একাত্তরে নতুন করে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করতে হয়। এ স্বাধীনতা আরেকটি স্বাধীনতার উপর পূর্ণতর স্বাধীনতার লক্ষ্যে পরিচালিত বলে এর মর্যাদা অবশ্যই উচ্চতর। একই কারণে এই স্বাধীনতার নিকট জনগণের দাবী ও প্রত্যাশা ছিল স্বাভাবিক কারণেই বৃহত্তর।

উনিশশো একাত্তরে ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে নয় মাসের দুঃসহ পরিস্থিতির অবসান ঘটে। জনগণের বুকের উপর থেকে টিক্কাশাহী জগদ্দল পাথর অপসারিত হবার ফলে তারা মুক্তির উল্লাসে ফেটে পড়ে। সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুণেরা নিজ নিজ আপনজনদের নিকট ফিরে এলে আনন্দ বেড়ে যায় আরও বহুগুণে। মুক্তিযুদ্ধে অগণিত তরুণের শাহাদতের বিয়োগ ব্যথাকে ভুলে জাতি নবলব্ধ স্বাধীনতাকে নিয়ে খুশি হবার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু এরি মধ্যে তাদের মনে দুএকটা ব্যাপারে খটকা বাধতে শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন জেনারেল ওসমানী। পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা গেল না। মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তির পর মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকার খবরটা জনমনে প্রশ্নের উদ্রেক করে। ইতিমধ্যেই জেনারেল ওসমানীর হেলিকপ্টারে গুলি বর্ষণের খবর পাওয়া যায়। এর পর পরই শুরু হলো আরেক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত কোটি কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র ভারতীয় সেনাবাহিনী ট্রাকের পর ট্রাক ভর্তি করে ভারতে পাচার শুরু করে দিল। শুধু অস্ত্রশস্ত্রই নয়—এই সাথে পাচার শুরু হলো বাংলাদেশের কলকারখানার যন্ত্রপাতিও। মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই এদিকে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের তদানীন্তন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধমক খেলেন। কোন কোন দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা ভারতীয় বাহিনীর এ লুণ্ঠনে বাধা দিতে গিয়ে হলেন কারারুদ্ধ।

যে ভারতীয় বাহিনী দু'দিন পূর্বেও বাংলাদেশের 'মিত্রশক্তি' হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, তাদের এ আচরণ মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিকামী জনগণকে করল বিস্মিত। কিন্তু জনগণের বিস্ময়ের তখন আরও বাকি

www.nagorikpathagar.org

ছিল। সাবেক পাকিস্তানকে শায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে ভারত ইতিপূর্বে ফারাক্কাতে গংগা নদীর উপর যে বাঁধ নির্মাণ করেছিল, বাংলাদেশ সৃষ্টির অল্প কাল পরই ভারত তা চালু করার জন্য জিদ ধরে। ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের আটটি জেলার অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে জেনেও ভারত এ ব্যাপারে তার জিদ অব্যাহত রাখে। শুরু হয় বাংলাদেশের সংগে ভারতের আলোচনা। কিন্তু আলোচনায় ভারত বাংলাদেশকে তার ন্যায্য প্রয়োজন পূরণে শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করে এবং নানা বাহানা তুলে গংগার পানি বণ্টনের ব্যাপারে বাংলাদেশের সংগে স্থায়ী চুক্তি সম্পাদনে অসম্মত হয়। স্থায়ী চুক্তি সম্পাদনে এই অস্বীকৃতি যে ভারতের উপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা জিইয়ে রাখারই নামান্তর, তা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

কিন্তু না, শুধু ফারাক্কাই নয়। পরবর্তীকালে তিস্তা, কুশিয়ারা প্রভৃতি অন্যান্য নদীর কোনটাতে বাঁধ দিয়ে, কোনটাতে গ্রোয়েন নির্মাণ করে ভারত বাংলাদেশের অর্থনীতি পঙ্গু করে দেবার নেশায় মেতে উঠল। এছাড়াও বেরুবাড়ি, দহগ্রাম, আংগুরপোতা, তালপট্টি প্রভৃতি প্রশ্নে ভরত যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে তাতে বন্ধুত্বের কোন প্রমাণ ছিল না, ছিল বৃহৎ মৎস্য কর্তৃক ক্ষুদ্র মৎস্য গিলে খাবার একটা অবাঞ্ছিত আধিপত্যবাদী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। মুক্তিকামী বাংলার মানুষ এতে বিস্মিত হয়েছিলেন স্বাভাবিকভাবেই। অবাক বিস্ময়ে বাংলার মানুষ ভাবতে শুরু করে, একাত্তরে বাংলাদেশের প্রতি প্রদর্শিত তার দরদ কি তবে ছিল নেহায়েৎ লোক দেখানো একটা ব্যাপার? স্বাধীন শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সৃষ্টির চাইতে শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান ধ্বংস করাই কি তবে একাত্তরে ভারতের প্রধান লক্ষ্য ছিল? বলা বাহুল্য, একাত্তর থেকে পরবর্তীকালের অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারত এই সত্যই প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশকে একটি তাবেদার রাষ্ট্র হিসেবে দেখলেই যেন সে খুশি হবে। বাংলাদেশের কোন স্বাধীনতাকামী নাগরিক, বিশেষ করে নিজেদের জীবন বাজি রেখে যারা একাত্তরের মুক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেই মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কি এই অবস্থা মেনে নেয়া সম্ভব? কারণ পিণ্ডির বদলে দিল্লীর তাবেদারী মেনে নেবার জন্য তো তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে সেদিন অংশগ্রহণ করেনি।

এ কারণেই স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন পর্যায়ের কথা আজ ভাবতে হয়। বলা হয়ে থাকে, স্বাধীনতা অর্জনের চাইতে স্বাধীনতা রক্ষা করা অনেক কঠিন। এ কথাটা অন্যান্য দেশের জন্য যতটা সত্য, তার চাইতেও বেশি সত্য বাংলাদেশের জন্য। কারণ উপমহাদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসের বাস্তবতার আলোকে একাত্তরে আমাদের নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধে যেসব বিদেশী শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য সেদিন আমরা পেয়েছিলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও সুসংহত করার ব্যাপারে তাদের অনেকের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করার কোন সম্ভাবনা নেই।

আজ বরং বিপরীতে তাদের অনেকেই আমাদের নাজুক পরিস্থিতির সুযোগে আমাদের স্বাধীনতাকে অর্থহীন করে তুলবার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় রত রয়েছে। বাংলাদেশের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান এবং উপরে আলোচিত বাস্তবতার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে যথেষ্ট নাজুক অবস্থায় রয়েছে, এ কঠোর

www.nagorikpathagar.org

সত্য যত শীঘ্র অনুধাবন করি ততই মঙ্গল। এই সাথে এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা আমাদের স্বাধীনতার যে শত্রুর মোকাবিলা করেছিলাম, তার তুলনায় আমাদের স্বাধীনতার নবতর প্রতিপক্ষ ঢের বেশি শক্তিশালী। এ জন্যেই আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিটি পদক্ষেপ হতে হবে অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত।

স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি দেখা যায় যে কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনে। অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা হয়ে পড়ে অর্থহীন। আমাদের স্বাধীনতার বয়স এক যুগেরও বেশি। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বস্ত্রকল ছিল ৪টি, চিনিকল ৪টি এবং পাটকল একটিও ছিল না। পাকিস্তানের ২৪ বছরে নতুন বস্ত্রকল সংযোজিত হয় ৫৫টি, চিনিকল ১১টি এবং পাটকল শূন্য থেকে ৭৬টি। বাংলাদেশের ৩০ বছরে এই তুলনায় আমাদের শিল্পায়নের অগ্রগতি কিন্তু মোটেই গৌরবজনক হয়নি। মুদ্রার বিনিময় হার থেকেও যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিমাপ করা যায়। ১৯৭১ সালের পূর্বে আমাদের ১০০ টাকার সমান ছিল ভারতের ১৪৫ রূপী, আর আজ আমাদের ১০০ টাকার মূল্য ভারতের ৭০ রূপী। ১৯৭১ সালের পশ্চিম বংগে এক কে. জি. চাউলের মূল্য ছিল ৪ রূপী, তখন আমাদের বাংলাদেশে, তথা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সমপরিমাণ চাউলের মূল্য ছিল ৭০ থেকে ৮০ পয়সা। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী অভিযানকালে চাউলের মূল্য ছিল সেরপ্রতি ৬৫ পয়সার মত। তখন চাউলের মূল্য ৫০ পয়সায় নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেদিনের প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশ সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যেই চাউলের মূল্য লাফাতে লাফাতে চৌদ্দ/পনের টাকায় উঠে। চাউলের মত সমস্ত নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যও এমনভাবে বেড়ে গেছে যে, সরকার মাঝে মাঝে বেতন বৃদ্ধি করেও পরিস্থিতি সামাল দিয়ে উঠতে পারছেন না। ফলে জনগণের বিশেষ করে নিম্ন আয়ের জনগণের জীবনে চরম নাভিশ্বাস উঠেছে। স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এ ছিল না। এ অবস্থা থেকে অবশ্যই আমাদের পরিত্রাণ পেতে হবে। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব না হলে স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়বে বলে যেকোন মূল্যে আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতিকার করতে হবে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা আশাকরি অপ্রাসংগিক হবে না। একাত্তরের পর একটি মহল প্রায়-প্রায়ই আমাদের এই মর্মে বোঝাতে চেষ্টা করে, বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থনীতি পরস্পর সম্পূরক। অথচ এর চাইতে বৃহত্তর অসত্য কিছু হতে পারে না। প্রকৃত বিচারে ভারত ও বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূরক নয়, প্রতিযোগিতামূলক। সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত ২৪ বছর এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকার ফলে বরং আজকের পাকিস্তান তথা সেদিনের পশ্চিম পাকিস্তান ও সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি কিছুটা সম্পূরক হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তখনকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে এমন অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হতো, যা এক অঞ্চলে উৎপন্ন হতো এবং অন্য অঞ্চলে ব্যবহৃত হতো। সুতরাং আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনে আমরা ভারত পাকিস্তানসহ যেকোন দেশের সংগে অর্থনৈতিক সহযোগিতার

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। কিন্তু এ না করে আমরা যদি সম্পূরক অর্থনীতির নামে প্রধানত একটি মাত্র দেশের সংগে অর্থনৈতিক বন্ধনে নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ করি এবং সফল বৈদেশিক বাণিজ্যের পূর্বশর্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের ডাইভারসিফিকেশনের পথ পরিহার করে বিশেষ দেশের পণ্যের বাজার হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করি– তবে আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন হবে সুদূর পরাহত।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অন্যতম পূর্বশর্ত সুষম শিল্পায়ন। শিল্পায়ণের সাফল্যের জন্য ভারি ও মৌলিক শিল্পের ক্ষেত্রে বিদেশের উপর পরনির্ভরশিলতা পরিহার করা অপরিহার্য। একাত্তর পর্যন্ত ধীর গতিতে হলেও এদেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া কিছুটা এগিয়ে চলেছিল– তাই এই প্রক্রিয়া কেন বন্ধ হলো, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখতে হবে এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থে যেকোন মূল্যে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করতে হবে।

তবে শুধু বিদেশের প্রতিকূল প্রভাব থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে এমন মনে করবার সংগত কারণ নেই। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পর্যাপ্ত সংস্কার না করা হলে পরিস্থিতির সন্তোষজনক উন্নতি সম্ভবপর নয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূনর্গঠন এমনভাবে করতে হবে যেন শ্রমজীবী মানুষেরা জাতির অর্থনীতিতে তাদের ন্যায্য হিস্সা নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে। সেই সংগে দেশে সামাজিক নিরাপত্তা প্রবর্তনের বিষয়ও গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতে হবে। মনে রাখতে হবে– সন্তুষ্ট জনগোষ্ঠীই যে কোন দেশের স্বাধীনতার সবচাইতে বড় গ্যারান্টি। সুতরাং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ যথাযথ পূরণের কথা অবশ্যই চিন্তা করতে হবে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন অর্থহীন, তেমনি সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকেও একটি দেশের স্বাধীনতা কখনও পূর্ণাংগ রূপ লাভ করতে পারে না। প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক মরহুম আবুল মনসুর আহমদের মতে– সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রাজনৈতিক আগ্রাসনের চাইতেও অধিক ভয়াবহ, কারণ রাজনৈতিক হামলা বা রাজনৈতিক পরাধীনতা সহজ চোখে দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বা সাংস্কৃতিক পরাধীনতা সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া সাধারণত অন্যদের চোখেই পড়ে না। যা চোখে পড়ে না তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়া সম্ভব নয় বলেই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পরিণাম অতি ভয়াবহ।

যেকোন জাতির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যই তার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জাতিসত্তার মূল ভিত্তি। সেই হিসেবে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধই যে কোন জাতির স্বাধীনতারও মূল বুনিয়াদ। যেকোন প্রকারে যদি একবার সেই বুনিয়াদে ঘূণ ধরিয়ে দেয়া যায়, তবে সে জাতিকে পদানত করা হয়ে পড়ে সহজ ব্যাপার। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বুনিয়াদরূপী এর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করার কাজ বর্তমানে পূর্ণমাত্রায় এগিয়ে চলেছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন গণ-মাধ্যম ও শিল্প-মাধ্যমে প্রায়শই জীবনের যে চিত্র প্রদর্শিত হয়, তাতে না আছে এদেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্রণ না আছে তাদের জীবনবোধ ও মূল্যবোধের সঠিক প্রতিফলন। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসমূহে পর্যন্ত নিকট ও দূরের ভিন্ন

www.nagorikpathagar.org

দেশী সংস্কৃতির উপদ্রব এতটা বেড়ে গেছে এবং শিল্প-সংস্কৃতির নামে অশ্লীল কাতুকুতু ও অপ-সংস্কৃতির বাড়াবাড়ি এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, এর কুপ্রভাব থেকে দেশের তরুণ সমাজকে রক্ষা একটা সুকঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর দশের তরুণ সমাজের সামনে যদি নিজস্ব সংস্কৃতি ও আদর্শের পরিবর্তে ভিন্‌দেশী সংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি ও বেলেল্লাপনার ছাড়াছড়ি ক্রমাগত তুলে ধরে তাদের মধ্যে পরানুকরণপ্রিয়তা ও দায়িত্বহীনতার সবক দেয়া চলতে থাকে তবে আমাদের স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ খুব সুখকর হবার কথা নয়।

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার আরেকটি দিক হচ্ছে ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি। যে জাতি তার নিজের গৌরবজনক অতীত সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তার ভবিষ্যৎ গৌরবজনক হবার কথা নয়। পাকিস্তান আমল থেকেই এর ব্যাপারে আমাদের অনীহা, অবহেলা ও দায়িত্বহীনতা পর্বতপ্রমাণ, যার ফলে আমাদের মধ্যে বিকৃত ইতিহাস চালু রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের নবপর্যায়ে আজ আমাদের অবশ্যই দেশ ও জাতির প্রকৃত ইতিহাস, তার স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস পুনরুদ্ধার করতে হবে। জীবনের কোন্ বাঁকে, ইতিহাসের কোন্ প্রান্তরে জাতির দুশ্‌মনেরা কীভাবে ওঁৎ পেতে থাকে তা অবহিত থাকা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একেবারেই অপরিহার্য। এ জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসসহ জাতির সঠিক আদ্যোপান্ত ইতিহাস জানা আমাদের একান্তই প্রয়োজন। অতীত ইতিহাসের সাথে সাথে সমসাময়িককালের ঘটনাবলীর সাথে আমাদের তরুণ সমাজের নিবিড় পরিচয় ঘটানো একান্তই প্রয়োজন।

মনে রাখতে হবে– আমাদের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রায় আড়াই যুগ ধরেই আমরা হাংগরের প্রায় মুখ-গহ্বরের মধ্যে অবস্থান করছি। প্রতি মুহূর্তের সচেতনতাই নাকি স্বাধীনতার মূল্য নির্ধারণ করে। বাংলাদেশের জন্য এটা যেমন সত্য, পৃথিবীর অন্য খুব কম দেশের জন্যই তদ্রূপ। পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ চব্বিশ বৎসর ধরে যে ভুল করেছে, তার অর্ধেক ভুলেও আমাদের উপড় চরম সর্বনাশ নেমে আসতে পারে। এ জন্য জাতিকে যেকোন মূল্যে স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এখানে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণস্বার্থবোধকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেয়া চলবে না।

স্বাধীনতার অন্যতম বড় গ্যারান্টি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নিশ্চয়তা। অতীতে গণতন্ত্র হত্যা করে পাকিস্তান ধ্বংস হয়েছিল। গণতন্ত্রকে আঁকড়ে ধরেই ভারত তার বিভক্তি এড়াতে পারছে। গণতন্ত্রে ভুল-ভ্রান্তি থাকে, এমন কি থাকে দুর্নীতির অবকাশ। কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ মানুষটিই বা ফেরেশ্‌তা? সুতরাং জাতির অব্যাহত অগ্রগতি ও নিরাপত্তার স্বার্থে গণতন্ত্রের যে কোন বিকল্প নেই, এই সত্যটি কখনও ভুললে চলবে না।

স্বাধীনতার স্বার্থে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে যে কোন মূল্যে রাজনীতির উর্ধ্বে, সর্ব বিতর্কের উর্ধ্বে রাখতে হবে। প্রতিবেশী দেশের সংগে কোন সময়ই আমরা সামরিক মোকাবিলায় টিকতে পারব না– অতএব সশস্ত্র বাহিনী তুলে দিতে হবে– এ ধরনের যুক্তি বাস্তবতার ধোপে টেকে না। দেশরক্ষা বাহিনী যেকোন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। সবল প্রতিবেশীর সংগে কুলিয়ে উঠতে পারবে না বলে কোন দুর্বল প্রতিবেশী

www.nagorikpathagar.org

তার প্রতিরক্ষা বাহিনী তুলে দিয়েছে এমন নজীর পাওয়া মুশকিল। তবে হ্যাঁ, স্বাধীনতার স্বার্থেই প্রতিরক্ষা বাহিনীকে দেশের বেসামরিক প্রশাসন থেকে দূরে রাখা প্রয়োজন।

দেশরক্ষার বিরাট দায়িত্ব অবশ্য বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশে কখনই শুধু প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপর ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না। দেশের সমস্ত তরুণ শক্তিকে সামরিক শিক্ষা দিয়ে যে কোন জরুরি মুহূর্তে দেশরক্ষার প্রয়োজনে তাদের স্বল্প নোটিশে তলব করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের মত প্রতিকূল শক্তি পরিবেষ্টিত দেশের স্বাধীনতার সবচাইতে বড় গ্যারান্টি হলো– সমগ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ইসলামে উদ্বুদ্ধ করতে পারা। তবে একশ্রেণীর সুবিধাবাদীর মত এ কাজটি শুধু কথায় সীমাবদ্ধা রাখলে চলবে না, একে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। ইসলাম শিক্ষা দেয়– এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন শক্তির কাছে মাথা নত না করতে। ইসলামের আদর্শে সত্যিকারভাবে উদ্বুদ্ধ জাতি, যে জাতি স্বাধীনতার প্রয়োজনে আল্লাহ্র রাহে শাহাদত বরণ করাকে গৌরবের ব্যাপার মনে করে তার স্বাধীনতা কেউ ধ্বংস করতে পারে না। অতীতে রসূল (স.)-এর জামানায় আদর্শপ্রাণ মুসলমানরা ক্ষুদ্র শক্তি হয়েও আল্লাহ্র নামে উৎসর্গীকৃত হয়েই শুধু নিজেদের আত্মরক্ষা করতে নয়, সারা দুনিয়ায় নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। আল্লাহ্র নামে উদ্বুদ্ধ জাতিকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যে গায়েবী মদদ দিয়ে সাহায্য করেন, তার প্রমাণ যেমন অতীতে বদর-ওহোদ-খন্দকে পাওয়া গেছে, তেমনি সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসেও তার নজীর দেখা গেছে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা রক্ষার নব পর্যায়ে আজ আমাদের অবশ্যই কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে। তবেই আমরা ইন্‌শাআল্লাহ্ তাঁর সাহায্য লাভে সক্ষম হব। কিন্তু মীরজাফর-উমিচাঁদের প্ররোচনায় যদি আমরা বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থেকে আত্মকলহে নিমজ্জিত হই, অথবা পতনোন্মুখ মুসলিম-স্পেনের অথবা পলাশী-পূর্ব বাংলার মত আত্মঘাতী কলহে নিমজ্জিত হয়ে জাতীয় স্বাধীনতার প্রতি আমাদের কঠোর ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে আমরা ব্যর্থ হই, আর তার ফলে বাংলার ভাগ্যাকাশে যদি পলাশীর পুনরাভিনয় অনিবার্য হয়ে পড়ে অথবা স্পেন, সিকিম বা আফগানিস্তানের দুর্ভাগ্য নেমে আসে, তবে আল্লাহ্ যেমন তা মাফ করবেন না, তেমনি সেজন্য ভবিষ্যৎ বংশধরেরাও আমাদের কিছুতেই ক্ষমা করবে না।

www.nagorikpathagar.org

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

বাংলায় মুসলিম নবজাগরণ

বাংলায় ইসলামী জাগরণ এক অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামী ধারা। সাত শতকের মধ্যভাগ থেকে বারো শতকের শেষ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ বছর এদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের সুদীর্ঘ অধ্যায়। ইসলাম প্রচারক আলেম, সূফী ও মুজাহিদগণের অব্যাহত চেষ্টা-সাধনা, ত্যাগ ও কুরবানীর মধ্য দিয়ে এ সময় বাংলায় ইসলামের প্রতি নৈতিক সমর্থনের ভিত্তি গড়ে ওঠে। সে ভিত্তির উপর তেরো শতকের শুরুতে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম মুসলিম শাসন। তেরো শতকের সূচনা থেকে আঠারো শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ বছর মুসলিম শাসন যুগ। এটি ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, মুসলমানদের নৈতিক জীবনের পুনর্গঠন, সামজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ; ঈমান ও অধিকার সংরক্ষণ তথা ইসলামী জাগরণের এক উজ্জ্বল, ব্যাপ্ত ও বিস্তীর্ণ অধ্যায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর পতনের পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় দুশ বছর এদেশে মুসলমানদের ঈমান ও অধিকার সংরক্ষণ ও আযাদী পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম যুগ। ১৭৫৭ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে মুসলমানদের এ গণ-সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন নিরাপস, সংগ্রামী, বিপ্লবী আলেম সমাজ। ১৮৭০ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এদেশের মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সূচিত হয় নব জাগরণ। জাতীয় রাজনীতির ধারণা বিকাশ এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষিত 'আলোকপ্রাপ্ত' আপসকামী মুসলিম অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণও এ সময়ের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ১৯০৬ সালে এই অভিজাত শ্রেণীর নেতৃত্বেই মুসলমানদের জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে মুসলিম লীগের জন্ম। ১৯০৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ ও পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব ছিল এই আপসকামী শ্রেণীর হাতে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর তাদের নেতৃত্বই এদেশের প্রশাসনে এবং রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে সেকুলার ধারা জোরদার হয়। অন্যদিকে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও বিকাশ, মুসলমানদের নৈতিক উজ্জীবন তথা ইসলামী নবজাগরণের পৃথক ধারা গড়ে ওঠে আলেম সমাজ ও পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের একাংশের চেষ্টায় বিভিন্ন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে।

২.

সাত শতকের মধ্যভাগ থেকে বারো শতকের শেষ পর্যন্ত ইসলামের প্রাথমিক প্রচার যুগ এবং তেরো শতকের শুরু থেকে আঠারো শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিম শাসন যুগে বাংলায় মুসলিম জাগরণের নেতৃত্বে ছিলেন ইসলাম প্রচারক আলেম, সূফী ও মুজাহিদগণ। ইসলামের প্রভাবসীমা বিস্তার, মুসলিম সমাজ নির্মাণ, রাজ্য বিস্তার, রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বিধান, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ইসলামী শরীয়তের নীতি বাস্তবায়নে পরামর্শ ও প্রেরণা দান এবং প্রেশার গ্রুপ হিসেবে দায়িত্বপালনে ইসলাম প্রচারকগণ ছিলেন অগ্রণী।

www.nagorikpathagar.org

সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তার, দুঃস্থ ও বিপন্ন, বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষকে আশ্রয় ও সাহায্য দান এবং তাদের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম প্রচারকদের ভূমিকা সুচিহ্নিত। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, অভাব, বঞ্চনা এবং চাওয়া-পাওয়ার সাথে সম্যক পরিচয়ের কারণে ইসলাম প্রচারকগণ ছিলেন শাসক ও জনতার মাঝে কার্যকর সংযোগসূত্র।

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক আগে ছোট ছোট হিন্দু রাজা ও জমিদারদের এলাকায় মুসলমান ও অন্যান্য প্রজাদেরকে জুলুম থেকে বাঁচাতে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন শাহ মখদুম রূপোস ও আদম শহীদ মক্কীর মতো বিখ্যাত ইসলাম প্রচারকগণ। মুজাহিদ দরবেশ জাফর খাঁ গাযী ও শাহ শফিউদ্দীন হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাতগাঁও অঞ্চল মুসলিম শাসনের অধীনে এনেছেন। শাহ্জালাল ও তাঁর সাথীগণ অত্যাচারী হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে সিকান্দার শাহের মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিতভাবে যুদ্ধ করে সিলেটে প্রতিষ্ঠা করেছেন মুসলিম অধিকার। রুকনুদ্দীন বাবরক শাহের আমলে বিখ্যাত দরবেশ সিপাহসালার ইসমাইল গাযী উড়িষ্যার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মান্দারন জয় করেন। বাংলার সুলতানের আনুগত্য করতে তিনিই বাধ্য করেন কামরূপের রাজাকে। দরবেশ সিপাহসালার খান জাহান আলী ইসলামের প্রভাবসীমা বিস্তার করেছেন যশোর ও খুলনা এলাকায়। ইলিয়াস শাহী প্রশাসনে হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের আসন্ন পরিমাণ সম্পর্কে সিকান্দার শাহকে সতর্ক করেছেন প্রখ্যাত আলেম শেখ গ্রালাউল হক। এ ব্যাপারে গিয়াসউদ্দীন আযম শাহকে সাবধান করে চিঠি লিখেছেন মাওলানা মুজাফফর শামস বলখী। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আলেমদের সতর্কবাণীর নির্মম বাস্তবতা প্রমাণিত হয় ভাতুরিয়ার জামিদার গণেশের আচরণে। ইলিয়াস শাহী বংশের তিনজন শিখণ্ডী সুলতানকে একের পর এক হত্যা করে গণেশ বাংলায় সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনের মাঝখানে চার বছরের স্বল্পস্থায়ী হিন্দুরাজ কায়েম করেন। তিনি 'মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার সঙ্কল্প করলেন' এবং 'রাজ্য থেকে ইসলামের মূলোচ্ছেদ করাই হয়ে দাঁড়ালো তাঁর লক্ষ্য'। বাংলার বৃহত্তম আদিনা মসজিদকে কাচারী ঘরে রূপান্তর গণেশ রাজত্বের অন্যতম 'সেরা' কীর্তি। গণেশের সামনে মাথা নোয়াতে রাযী না হওয়ায় শিরোচ্ছেদ করা হয় প্রখ্যাত আলেম শেখ বদরুল ইসলামের। একই দিনে এক দল আলেমকে একই সাথে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয় গণেশের নির্দেশে। বাংলার মুসলমানদের জাতীয় জীবনে যখন কিয়ামতের বিভীষিকা, মুসলিম রাজন্যবর্গ তখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন প্রাণ নিয়ে। সে ভয়াবহ সঙ্কটকালে গণেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন সংগ্রামী আলেম সমাজ। সে সময় মুসলিম সমাজে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও মনোবল প্রতিষ্ঠা, দেশের ভিতর ও বাইরে মুসলমানদের সামাজিক নেতা আলেম ও দরবেশদের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং জৌনপুরের সুলতান ইবরাহিম শর্কিকে গণেশের বিরুদ্ধে অভিযানে অনুপ্রাণিত করে যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ নূর কুতুবুল আলম মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজকে এক মহা সঙ্কট থেকে রক্ষা করেন। সম্রাট আকারের দীন-ই-ইলাহী নামক নব জাহেলিয়াতের ঢেউ আকবরের দীন-ই-ইলাহীর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন শায়খ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফিসানী (১৫৬৪–১৬২৪)। তাঁর আন্দোলনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা বাংলাসহ উপমহাদেশের সবখানে ছড়িয়ে পড়েন এবং শির্ক, বিদ্'আত ও কুসংস্কার দূর

www.nagorikpathagar.org

করে মুসলমানদের ঈমান-আকিদা পরিশুদ্ধকরণ, চিন্তার পুনর্গঠণ ও মুসলিম জাগরণের পক্ষে কাজ করেন। আকবরের বিরুদ্ধে জৌনপুরের কাযীর ফতোয়া এ সময় বাংলার পাঠান মুসলিম বারো ভূঁইয়াদের আযাদী রক্ষার সংগ্রামে বিপুল শক্তি যোগায়। আকবরের মৃত্যুর পর যেসব মুসালম রাজন্য মুজাদ্দিদে আলফিসানীর হাতে বায়আত হন এবং ইসলামী শরীয়তবিরোধী কাজে আর কখনো অংশগ্রহণ না করার শপথ করেন, ঢাকার মুঘল সুবাদার ইসলাম খাঁ তাঁদের অন্যমত। ইসলাম খাঁর সুবাদারী আমলেই (১৬০৮–১৩) বাংলায় মুঘল শাসন দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে। মুজাদ্দিদে আলফিসানীর আদর্শিক ভাবধারায় পুষ্ট দরবেশ সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের শাসনামলে বাংলার মুসলমানরা 'প্রথম বারের মতো যথার্থ ইসলামী শাসনের সাথে পরিচিত হয়েছিল এবং ইসলামী শাসনের সুফল ভোগ করেছিল।' ইংরেজ পদানত বাংলার মুসলিম জাগরণ আন্দোলন সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র চিন্তার দ্বারা। উপমহাদেশের ইতিহাসের এক বিশেষ ক্রান্তিলগ্নে সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর চার বছর আগে ১৭০৩ সালে তাঁর জন্ম। তিনি ইন্‌তিকাল করেন ১৭৬৪ সালে অন্ধ সম্রাট শাহ আলমের আমলে। দিল্লীর দশজন সম্রাটের শাসনকাল অতিক্রান্ত হয়েছে তাঁর জীবদ্দশায়। উপমহাদেশের বহু বিপর্যয়–বিশৃঙ্খলা এবং একটি বিদেশী শক্তির উভ্যুদয় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। মুজাদ্দিদে আলফিসানীর বিশিষ্ট খলিফা শাহ আদম বিন্নৌরীসহ বহু বিশিষ্ট আলেমের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত গভীর অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন এই মনীষীর কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে ইসলামের মূল সত্য থেকে বিচ্যুতিই মুসলমানদের বিপর্যয়ের কারণ। তনি ইসলামী আদর্শ, ভাবধারা ও জীবন বিধানের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজকে পুনর্গঠনের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম পর্যায়ের কাজ ছিল ইসলামী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে মুসলমানদের চিন্তা সংশোধন ও পরিশুদ্ধি। তিনি মুসলিম শাসক, আমীর-ওমরা, সৈনিক, আলেম সুফি, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী সকল স্তরের মানুষকে আহ্বান জানান তাদের আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি চরিত্র ও রাজনীতি অন্য যেকোন প্রভাব থেকে মুক্ত করে কুরআন-হাদীসের আলোকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি মুসলমানদের জ্ঞান ও চিন্তার পুনর্গঠনের কাজে অগ্রসর হন। তিনি মুসলমানদের মযহাবী বিরোধ মিটানোর পথ নির্দেশ করেন এবং ইজতেহাদ ফরযে কিফায়া বলে উল্লেখ করেন। তিনি ইজতিহাদের নিয়ম-বিধান ও শর্তাবলী রচনা করেন। কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের সাথে জনগণের প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তখনকার সামাজিক ভাষা ফারসীতে আল-কুরআন অনুবাদ করেন। হাদীসের প্রথম সংকলিত গ্রন্থ মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র.)-এর তরজমা ও তাতে টীকা সংযোজন করেন। কুরআন-হাদীস চর্চা ব্যাপক করার লক্ষ্যে শিক্ষা-পদ্ধতিতেও তিনি সংস্কার সাধন করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর কয়েকটি সুবিখ্যাত গ্রন্থের মাধ্যমে কুরআনের জীবন-ব্যবস্থা, ইসলামী জীবন দর্শন, ইসলামের নৈতিকতা, সংস্কৃতি, শরীয়ত ব্যবস্থা লিখিত আকারে পেশ করেন। মুসলমানদের পারিবারিক জীবন সংগঠন, সামাজিক রীতিনীতি, বিচার ব্যবস্থা, কর ব্যবস্থা, দেশ শাসন, সামরিক সংগঠন প্রভৃতি দিক তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তিনি সমাজ সভ্যতার বিকৃতি ও বিপর্যয়ের কারণসমূহের উপর আলোকপাত করেন এবং ইসলাম ও

www.nagorikpathagar.org

জাহেলিয়াতের মধ্যেকার ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কেও একটা আবছা ধারণা তুলে ধরেন। খিলাফত ও রাজতন্ত্র এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও জাহেলী রাষ্ট্রের ধারণা তাঁর আলোচনায় এমন বলিষ্ঠ ও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যে, জাহেলী রাষ্ট্র ব্যবস্থা খতম করে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার আগে কোন ঈমানদারের পক্ষেই নীরব, নিশ্চেষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। তৃতীয় পর্যায়ে সঠিক ইসলামী চিন্তা ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে 'ভারতের তদানীন্তন সরকারের পরিবর্তে নতুন একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার' উদ্দেশ্যে আন্দোলনের অংশ হিসেবে দীর্ঘমেয়াদী গণবিপ্লবের কর্মসূচিও তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় পেশ করেন। কিন্তু চিন্তার সংশোধন ও পরিশুদ্ধি এবং জ্ঞান ও চিন্তার পুনর্গঠন– এই দুই পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজেই তাঁকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়। তৃতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজে তিনি অগ্রসর হতে পারেননি।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র বিপ্লবী চিন্তাধারাকে উপমহাদেশের আনাচে-কানাচে পরিচিত করেন তাঁর যোগ্যপুত্র শাহ আবদুল আযীয (১৭৪৬–১৮৩৪)। খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে তিনি একটি সংগঠন কায়েম করেন। এ সংগঠনে প্রবীণদের মধ্যে তাঁর তিন ভাই শাহ রফিউদ্দীন, শাহ আব্দুল কাদির ও শাহ আবদুল গনি এবং তরুণদের মধ্যে মওলানা শাহ ইসমাইল, মওলানা মুহাম্মদ ইছহাক ও সৈয়দ আহমদ বেরেলভী শামিল ছিলেন। শাহ আবদুল আযীয শেষোক্ত তরুণ তিনজন আলেমকে সামনে রেখে উপমহাদেশীয় মুসলিম গণবাহিনী গঠন করেন। ইংরেজ পদানত হিন্দুস্তানকে তিনি দারুল হরব ঘোষণা করেন। এবং আযাদী পুনরুদ্ধার ও মুসলমানদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদের আহ্বান প্রচার করেন। জিহাদ আন্দোলন নামে সমধিক খ্যাত তাঁর তরিকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলন এদেশে বিজাতীয় আগ্রাসন প্রতিরোধ, আযাদী পুনরুদ্ধার ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আপসহীন লড়াই দীর্ঘকাল অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। বাংলার মুসলিম জাগরণে এ আন্দোলনের প্রভাব গভীর, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

৪.

বাংলায় দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ' বছরের মুসলিম শাসন শেষে ১৭৫৭ সালের পর রাজনৈতিক আযাদীহারা হতচকিত মুসলমানদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। সৈন্য বিভাগ, পুলিশ, ফৌজদারী, দেওয়ানী বিচার বিভাগ, রাজস্ব আদায় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে তারা হয় বিতাড়িত । সরকারি চাকরি ও বেসরকারি কর্মক্ষেত্রের দুয়ার তাদের জন্য রুদ্ধ হয়। ইজারা চুক্তি (১৭৭২-৯৩) ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) প্রভৃতির ফলে মুসলমান জমিদাররা রাতারাতি পথে বসেন। মুসলমান জমিদারদের অধিকাংশ জমিদারী খ্রিষ্টান পাদ্রীদের সুপারিশে কোম্পানি সরকার খাস করে নেয় এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেয়। ফলে মুসলমান জমিদারদের নায়েবগোমস্তা এবং দেব, মিত্র, বসাক, সিংহ, শেঠ, মল্লিক, শীর এমনকি তিলি আর সাহারা হঠাৎ জমিদারে রূপান্তরিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। অনুস্বত্বের অধিকারী নতুন জমিদাররা জমির উপর লাভ করে পূর্ণস্বত্ব মালিকানা। বাংলার কৃষক, যাদের ৭৫ ভাগই ছিল মুসলমান, জমির স্বত্ব হারিয়ে

www.nagorikpathagar.org

জমিদারদের মর্জির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। নব্য জমিদার ভূস্বামীদের শোষণ অত্যাচার কতটা চরম ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে মুসলমান প্রজাদের দাড়ির ওপর ট্যাক্স আরোপের দৃষ্টান্ত থেকে। শিল্প ক্ষেত্রে কারিগর শ্রেণীর উপর নির্যাতন চালিয়ে দেশীয় সামগ্রীর উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এদেশকে বিলাতি বস্ত্রের বাজারে পরিণত করা হয়। ইংরেজ বেনিয়াদের ব্যবসায়িক কুঠিগুলোকে কেন্দ্র করে বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, মুন্‌শী ও দেওয়ান নামে এক নতুন দালাল শ্রেণীর উদ্ভব হয়। নতুন আর্থিক বিন্যাসের ফলে সৃষ্ট এই নব্য ভূস্বামী ও দালাল শ্রেণীতে একজনও মুসলমান ছিল না।

ইংরেজ বণিকদের প্রবর্তিত নীতির ফল হিসেবে ১৭৭০ সালের (বাংলা ১১৭৬) মহা দুর্ভিক্ষে বাংলা ও বিহারের এক কোটি পঞ্চাশ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। 'এদেশীয় জনশত্রুদের সহাযোগিতায় (ইংরেজ বণিকদের) একচেটিয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তি অনিবার্য পরিণতি' এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে ইংয়ং হাসবেন্ড তাঁর ১৭৮৬ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে লিখেছেন : 'বাংলাদেশের সমগ্র ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ এরূপ একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছে, যা মানব সমাজের সমস্ত অস্তিত্বকালব্যাপী ব্যবসানীতির এই ক্রুর উদ্ভাবনী শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, আর পবিত্রতম অলংঘনীয় মানবাধিকারসমূহের ওপর কত ব্যাপক, কত গভীর ও কত নিষ্ঠুরভাবে অর্থ লালসার উৎকট অনাচার হতে পারে, এই নতুন অধ্যায়টি তারও একটি কালজয়ী নিদর্শন হয়ে থাকবে।"

১৮২৮ সালের নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইনের মাধ্যমে এক বাংলাদেশেই অন্তত পঞ্চাশ হাজার লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফলে এসব সম্পত্তির আয়ে পরিচালিত মসজিদ-মাদ্রাসা খানকাহ্‌সহ অসংখ্য মুসলিম শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান লুপ্ত হয়। ম্যাক্সমুলারের তথ্য অনুযায়ী ইংরেজদের ক্ষমতা দখল কালে বাংলায় প্রায় আশি হাজার মাদ্রাসার অস্তিত্ব ছিল। তার মধ্যে এমন বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল এমনকি বাইরে থেকেও ছাত্ররা আসতো উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য। ইংরেজদের গৃহীত নীতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার অবসান ঘটে। ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রগুলো বন্ধ হবার পাশাপাশি 'খ্রিষ্ঠান মিশনারীদের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে" ইংরেজি শিক্ষার জন্য সরকারি অর্থ সাহায্যে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা করা হয়। লর্ড ক্যারিংটন মেকলের মরামর্শে ১৮৩৫ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত আইন বলে কেবল ইংরেজি স্কুল ছাড়া অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি সাহায্য লাভের অনুপযুক্ত ঘোষিত হয়। ইংরেজি প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য বর্ণনা করে এ সময়ে মেকলে বলেন, 'বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে সমাজে যারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। তারা রক্ত-মাংসের গড়নে, দেহের রংয়ে ভারতীয় হবে বটে, কিন্তু রুচি, মতামত ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজি।" ১৮৩৭ সালে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজিকে সরাকরি ভাষারূপে গ্রহণ করা হয় এবং ১৮৪৪ সালে সরকারি চাকরিতে কেবল ইংরেজি শিক্ষার অগ্রাধিকার ঘোষণা করা হয়। ইংরেজরা মুসলমানদের শিক্ষার জন্য নির্ধারিত হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি আত্মসাত করে। সে বিরাট সম্পত্তির আয় থেকে ১৮৩৬ সালে ইংরেজি শিক্ষার জন্য হুগলী কলেজ খোলা হয়। ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে

www.nagorikpathagar.org

কোন মুসলমান ছাত্র ভর্তির সুযোগ না থাকলেও হাজী মুহসিনের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির টাকায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি কলেজে হিন্দুদের পড়ার সুযোগ থাকে অবারিত। চট্টগ্রামে মীর ইয়াহিয়া মুসলমানদের শিক্ষার সুবিধার্থে যে বিপুল সম্পত্তি রেখে যান, কোম্পনি সরকার সে দানের টাকায় ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। সে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। নতুন গজিয়ে ওঠা হিন্দু জমিদার ও বিত্তশালী শ্রেণী নিজেদের মুসলিম প্রধান এলাকার পরিবর্তে স্কুল-কলেজ স্থাপন করেছেন হিন্দু প্রধান অন্য এলাকায়। নেয়াখালীর প্রতাপচন্দ্র কিংবা জোড়াসাঁকের ঠাকুর পরিবার সবার দৃষ্টিভংগী ছিল অভিন্ন। খ্রিস্টান মিশনারী ও অবস্থাপন্ন হিন্দুদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত 'দেশীয় ভাষা' শিক্ষার স্কুল বা 'বাংলা' পাঠশালাগুলোতে সংস্কৃতপ্রধান বাংলা শিখানো হতো। পাঠ্য-পুস্তকের অধিকাংশ রচনা ছিল হিন্দু দেব-দেবীদের পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে। ছাত্রদের জন্য ক্লাসে স্বরস্বতী বন্দনা শিক্ষা করা ছিল বাধ্যতামূলক।

ইংরেজদের শিক্ষানীতি সম্পর্কে হান্টার লিখেছেন "আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যাবস্থা হিন্দুদেরকে শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে তাদের নিষ্ক্রিয় জনসাধারণকে মহৎ জাতিগত প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারলেও তা মুসলমানদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী, তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং তাদের ধর্মের কাছে ঘৃণার্হ। ... আমাদের প্রবর্তিত জনশিক্ষা ব্যবস্থা যেমন তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি, তেমনি তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য যে আর্থিক সাহায্য এতকাল তারা পেয়ে আসছিল, সেটাও আমরা বিনষ্ট করেছি।"

ইংরেজশাসনে বাংলার মুসলমানদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মারাত্মক আঘাত আসে। ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে বাংলা ভাষার উন্নতি হয়েছে তাতে মুসলমানদের অবদান অসাধারণ। ভৌগোলিক বাংলাকে যেমনি মুসলমান শাসকরাই রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছেন, তেমনি তাদের হাতেই মৃত ও অবহেলিত বাংলা নব জীবন পেয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও মুসলমানদের একটি প্রবল ধারা সুচিহ্নিত।। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে রাজনৈতিক কারণে মুসলমান অভিজাত শ্রেণী ধ্বংস হবার ফলে মুসলমানরা বাংলা সাহিত্যকে পৃষ্ঠপোষকতা করার ক্ষমতা হারায়। ইংরেজ শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে যে আধুনিক সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে, সেখানে হিন্দুদের মংগল কাব্যরূপ সাহিত্যই প্রাধান্য বিস্তার করে। ইংরেজ প্রসাদধন্য ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে বাংলা সাহিত্যের গতি পাল্টে যায়। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য ও আচার-প্রথার প্রভাব বিদূরিত হয়। ভারতচন্দ্র হতে শুরু করে নন্দ কুমার, জগতধীর রায় প্রমুখের বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দের যে প্রাধান্য ছিল তাও মুছে যায়। হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নেয়।

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়ন, দীনী সমস্যার সমাধান, বিয়ে-সাদী, জানাযা, জুমার নামাযসহ তাদের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা তথা মুসলমানদের ইসলামী জীবনের সার্বিক সুরক্ষার জন্য মুসলিম শাসনামলে প্রত্যেক পল্লীতে মুফতী, কাযী, মুহতাসিব ও নায়েব নিযুক্ত করা হতো। ইংরেজরা মুসলিম সমাজের ধর্মীয় শিক্ষা ও বিধি বিধানের এই

www.nagorikpathagar.org

অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থাটি তুলে দেয়। ফলে মুসলমানদের স্বাভাবিক সামাজিক প্রক্রিয়ায় শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

ইংরেজশাসনে মুসলমানদের সামগ্রিক বিপর্যয়ের উল্লেখ প্রসংগে উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন, "তারা (মুসলমানরা) প্রচার করে থাকে যে, আমরা যারা মুসলিম সমাজের ভৃত্য হিসেবে বাংলার মাটিতে পা রাখার জায়গা পেয়েছিলাম তারাই বিজয়ের সময় কোনরূপ পরদুঃখকাতরতা দেখাইনি এবং গর্বোদ্ধত রুঢ়তা প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদের সাবেক প্রভুদের কর্দমে প্রোথিত করেছি।"

বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ ইন্ডিয়া কোম্পানির ভয়াবহ শোষণ প্রত্যক্ষ করেই তাঁর অর্থনীতি ও রাজনীতির সংজ্ঞায় বলেছেন "কোনব্যবসায়ি কোম্পানির একচ্ছত্র শাসনই যে কোন দেশের বিভিন্ন প্রকার শাসন ব্যবস্থার মধ্যে নিকৃষ্টতম শাসন।"

৫.

বিদেশী ইংরেজ কোম্পানি ও দেশীয় হিন্দু মুৎসুদ্দি দালাল শ্রেণীর লুণ্ঠন শোষণের মুখে বাংলার মুসলমানদের সামনে পথ ছিল মাত্র দু'টি। এক. অনিবার্য ধ্বংসের কাছে আত্মসমর্পণ, কিংবা দুই. বিদেশী দখলদার ও তাদের এদেশীয় কোলাবোরেটরদের উচ্ছেদ করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম। দ্বিতীয় পথটিই ছিল মুসলমানদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। বিদ্রোহ ও বিপ্লবের রক্ত পিচ্ছিল রাজপথে তাই শুরু হয় তাদের পথ চলা।

পলাশীর পতনের ছয় বছরের মাথায় মীর কাসিমের দেশীয় সৈন্যরা যখন পাটনায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে রত, বাংলা ও বিহারে ইংরেজ ও তার দালাল জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে সে সময় বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে ধরেন বোরহানা তরিকার দরবেশ ফকির মজনু শাহ্। মাত্র হাজার খানেক লোক নিয়ে যে বিদ্রোহের সূচনা, কয়েক বছরে তাতে বিদ্রোহীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজার। জমিহারা, গৃহহারা নিরন্নচাষী, দিন মজুর, শিল্প ধ্বংসের ফলে বিভিন্ন পেশা থেকে বঞ্চিত কারিগর, বেকার তাঁতী, চাকুরিচ্যুত বুভুক্ষু সৈনিক সকল স্তরের মানুষ শরিক হন এই বিদ্রোহে। খানকাহ্‌বাসী একজন দরবেশের নেতৃত্বে পরিচালিত আমাদের আযাদী পুনরুদ্ধার ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রথম এই গণসংগ্রাম ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় আটত্রিশ বছর স্থায়ী হয়। বেশির ভাগ সময় রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ, পাবনা ও মোমেনশাহীতে এবং মাঝে মধ্যে ঢাকা ও সিলেটে ফকির বিদ্রোহীদের অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় একের পর এক সংঘটিত হয় ত্রিপুরা জেলার শমশের গাযীর বিদ্রোহ (১৭৬৭–৬৮), সন্দ্বীপে আবু তোরাবের বিদ্রোহ (১৭৬৯), ফকির করম শাহের নেতৃত্বে মোমেনশাহী সুসংগ ও শেরপুর জমিদারী এলাকায় গারো, হাজং, কোচ, মেচ, হাড়ি ও অন্যান্য অধিবাসীদের জাগরণ (১৭৭৫), শের দৌলত খাঁ, রামু খাঁ ও জান বখশ খাঁর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঝুম চাষীদের বিদ্রোহ (১৭৭৬–৮৯), রংপুর, দিনাজপুরে কোম্পানির ইজারাদার 'রাজা' দেবী সিংহ ও 'দেওয়ান' হরে রামের বিরুদ্ধে নূরল দীনের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), ফকির বোলাকী শাহের নেতৃত্বে বাকেরগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহ (১৭৯২), মোমেনশাহী ও জাফরশাহী পরগণায় জমিদার যুগোল কিশোর রায়

www.nagorikpathagar.org

চৌধুরী, গোবিন্দ চাকি, পাঁচু বসু ও রামচন্দ্র মুখার্জীদের অত্যাচারের প্রতিবাদে কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২), হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও দুদু মিয়ার ফরায়েজী আন্দোলন (১৮১৮-৭০), সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর জিহাদ আন্দোলন (১৮২১-৭০), মওলানা নিসার আলী তিতুমীরের নেতৃত্বে জিহাদপন্থী কৃষক বিদ্রোহ (১৮৩১), সিপাহী বিপ্লব (১৮৫৭), সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩), ধর্ম প্রচারক টিপু পাগলার পরিচালিত দ্বিতীয় পাগলপন্থী গারো বিদ্রোহ (১৮৩৭-১৮৮২) প্রভৃতি বিদ্রোহ ও বিপ্লব। এসব গণবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার মসিলিপ্ত ইতিহাস রক্তরঙিন, গৌরবময়, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশসাসনের প্রথম একশ' বছর মুসলমান মানেই ছিল 'রাণীর বিদ্রোহী প্রজা'। ভারতের ক্ষুব্ধ রাজ প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং তাই প্রশ্ন করেছেন, "মহারাণীর বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করাই কি মুসলমানদের ধর্মের অনুশাসন?" সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন: ... ... 'মুসলমানরা তাহাদের রাজ্য গ্রাসকারী বিদেশী ইংরেজদের ক্ষমা করে নাই। তাই দেখা যায়, ইংরেজ শাসনের আরম্ভকাল হইতে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ওয়াহাবী বিদ্রোহের অবসান পর্যন্ত এই একশত বৎসর একদিকে হিন্দু মধ্যশ্রেণী ইংরেজ শাসনের সহিত পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা করিয়া ভূমি ব্যবস্থা, শাসনকার্য, শিক্ষা প্রভৃতি শাসন ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে বহু সুবিধাজনক স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল, আর অপর দিকে সকল শ্রেণীর মুসলমানগণ সমবেতভাবে এই বিদেশী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করিয়া ভারতের মাটি হইতে এই শাসনের মূলোচ্ছেদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম)।

বাংলার কৃষক বিদ্রোহগুলো প্রথমে বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হয়ে ক্রমশ সংগঠিতন রূপ লাভ করে; বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোন কোনটি সারা দেশে বিস্তার লাভ করে। সব ক'টি বিদ্রোহের অভিন্ন মূল সুর ছিল বিদেশী শাসনের অবসান, জমিদারদের হাত থেকে ভূমিস্বত্বের পুনরুদ্ধার এবং সকল প্রকার শোষণ-পীড়ন থেকে মুক্তি। সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও এ বিদ্রোহগুলো ছিল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একের সংগ্রাম থেকে অন্যরা শিখেছেন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং ফলে একের পর অন্যটি হয়ে উঠেছে বেশি শক্তিশালী, সংহত ও বিস্তৃত। বাংলার কৃষক বিদ্রোহে ইসলামের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার কথা স্বীকার করে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন, "ধর্মের এই সংগ্রামী ভূমিকা ধর্ম সংস্কারের আন্দোলনরূপে আরম্ভ হইয়া ক্রমশ জমিদার, তালুকদার-মহাজন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণার উৎসে পরিণত হইয়াছিল।" (পূর্বোক্ত)

৬.

ইংরেজশাসনের প্রথম একশ' বছর ধরে বাংলায় মুসলমানদের যেসব আপসহীন বিদ্রোহ, বিপ্লব ও আন্দোলন পরিচালিত হয় তার মধ্যে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর সর্বভারতীয় তরিকায়ে মুহাম্মদী বা জিহাদ আন্দোলন এবং শরীয়ত উল্লাহদুদু মিয়ার নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক ফরায়েজী আন্দোলনের উৎস ভূমি, সংগঠন ও কর্মসূচিতে ভিন্নতা সত্ত্বেও মুসলমানদের ঈমান-আকীদা, আচার-আচরণ রীতি-প্রথা ইসলামের আলোকে পুনর্গঠন, বহিঃশক্তির প্রভাব থেকে ইসলামের হিফাজত এবং দেশ থেকে

www.nagorikpathagar.org

ইংরেজদের উৎখাত করে মুসলমানদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের ব্যাপারে তাদের পরম লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। জিহাদপন্থীদের মতো খোলাখুলিভাবে শুরু থেকে ইংরেজবিরোধী রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত না হলেও ফরায়েজীদের ইংরেজবিরোধী নীতি কোন গোপন ব্যাপার ছিল না। তারাও ইংরেজ পদানত বাংলাকে দারুল হরব ঘোষণা করে দেশ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ঈদ ও জুমার নামায বর্জন করেন। জিহাদ আন্দোলনের নেতা মওলানা ইনায়েত আলী কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য পল্লী-বাংলার জনগণকে প্রকাশ্যে আহ্বান জানান এবং ইসলামের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার ও ইসলামী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। অন্যদিকে ফরায়েজীরা ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত করেন। দুদু মিয়া 'লাংগল যার জমি তার' শ্লোগান তুলে কোন ক্ষতিপূরণ ছাড়াই কৃষকদের হাতে জমি ফেরত দাবি করেন এবং আল্লাহ্‌র জমিনে খাজনা ধার্য করার অধিকার কারো নেই বলে ঘোষণা করেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব সংগঠনে জিহাদী আদর্শে উজ্জীবিত শীর্ষস্থানীয় আলেমদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সে বিপ্লবের চরম পর্যায়ে ফরিদপুরের কালেক্টর রিপোর্ট করেন যে, ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা দুদু মিয়া বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। তাঁকে তখন দু'বছরের জন্য আটক রাখা হয়। সিপাহী বিপ্লবে ফরায়েজী ও জিহাদী আন্দোলনের ভূমিকা উল্লেখ করে হান্টার লিখেছেন, "বাংলার মুসলমানরা ভীরু হিসেবে উপেক্ষণীয় নয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা আফগান সৈন্যদের চাইতেও হিংস্রভাবে লড়তে জানে। বিপ্লবের সময় ঘাঁটিতে কিংবা ইংরেজ সরকারের কাঠগড়ায় বাংলার ফরায়েজী ও ওহাবী আযাদীকামী সৈন্যরা উত্তর ভারতীয় মুসলিম ভাইদের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত থাকতো।"

জিহাদ আন্দোলনের সাথে শুরু থেকেই বাংলার আলেমগণ যুক্ত ছিলেন। ১৮২৫ সালে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর প্রত্যক্ষ জিহাদের অংশীদার পাঁচ-ছয় হাজার মুজাহিদের মধ্যে বাংলার মুজাহিদ ছিলেন এক হাজারের কাছাকাছি। তার মধ্যে অন্তত চল্লিশ জন ছিলেন বিভিন্ন প্রধান দায়িত্বে নিয়োজিত। সীমান্ত প্রদেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পর সেখানে মজলিশে শুরার প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন বাংলার মওলানা ইমাম উদ্দীন বাংগালি। ১৮২৮ সালে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর সংকটকালে সর্বপ্রথম জনশক্তি ও অর্থ সাহায্য পৌঁছেছে বাংলা থেকে। ১৮৩১ সালের ৬ মে বালাকোট প্রান্তরে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী ও মওলানা শাহ ইসমাইলের সাথে যে দু'শতাধিক মুজাহিদ শহীদ হন, তাদের মধ্যে বাংলার শীর্ষস্থানীয় অন্তত নয় জনের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। মাওলানা ইমাম উদ্দীন বাংগালিসহ বাংলার প্রায় চল্লিশ জন মুজাহিদ এ জিহাদে আহত হন। বাংলার মুজাহিদ গাযীগণ বালাকোটের ময়দান থেকে দেশে ফিরে বিভিন্ন স্থানে জিহাদ আন্দোলনের আস্তানা কায়েম করেন। আন্দোলনের গোপন কেন্দ্র ছিল ঢাকার বংশালে। সারা দেশ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেগুলো এখান থেকে পাটনার জিহাদ কেন্দ্রে পাঠানো হতো। বাংলার মুসলমানরা হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব,পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতিকূলতা ও বিপদ-বাধা তুচ্ছ করে নিজেদের জান-মাল নিয়ে জিহাদ আন্দোলনে অংশ নেন। ১৮৬১ সালেও বাংলায় জিহাদ আন্দোলন খুবই প্রভাবশালী ছিল। মালদহের ম্যাজিস্ট্রেট এই বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংস্কারবিরোধী মোল্লাদেরকে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়ে সে সময়

www.nagorikpathagar.org

বলেন, বর্তমান বাংলায় ওয়াহাবী আন্দোলন এমন শক্তিশালী যে, এই মওলবীদেরকে তাদেরই অস্ত্রে মুকাবিলা না করা পর্যন্ত দমানো যাবে না। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত পরিচালিত 'ওয়াহাবী' মামলাগুলো থেকেও সে সময় জিহাদ আন্দোলন সক্রিয় ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বছরগুলোতে মাদারীপুরের এস. ডি. ও. নবীনচন্দ্র সেন সে মহকুমায় ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা নয়া মিয়ার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। মহকুমার প্রতিটি গ্রামে নয়া মিয়ার একজন করে প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁরা বিচারকার্য পরিচালনা থেকে শুরু করে আন্দোলনের অনুসারীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। নয়া মিয়ার নির্দেশ অমান্য করার শক্তি কারো ছিল না। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ আদালতে যাবার দুঃসাহস করতো না। ১৯০১ সালের জনসংখ্যা জরিপে উল্লেখ করা হয় যে, বগুড়ার ফরায়েজীরা তখনো বিলুপ্ত হয়নি। তারা সরকার বিরোধী জিহাদের চাঁদা তুলতো। প্রতিটি ফরায়েজী পরিবারে জিহাদের জন্য দৈনিক মুষ্টি চাউল রাখা হতো।

ফরায়েজী আন্দোলনের বেশি প্রভাব ছিল মোমেনশাহী থেকে বাখেরগঞ্জ পর্যন্ত নিম্নবংগে। আর জিহাদ আন্দোলন শক্তিশালী ছিল উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে। ফলে ভৌগোলিক দিক দিয়ে সে সময় ইংরেজ ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সংগ্রাম, মুসলমানদের নৈতিক সংস্কার তথা মুসলিম জাগরণ আন্দোলন বাংলার ব্যাপক এলাকায় বিস্তৃত ছিল। এই আন্দোলনের ফলে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষেরাই বেশি সংগঠিত হয়। লঙ-এর মতে, দর্জি, কসাই, চামড়ার কারবারী, ছোট ব্যবসায়ি ও দোকানদারদের ছেলেরা জিহাদ আন্দোলনে শক্তি যোগায়। ফরায়েজী আন্দোলনে জোলা ও কলুসহ সমাজের সবচেয়ে নীচুতলার মানুষ শামিল হয়েছে। ইংরেজদের মতো শহুরে নব্য ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানদের কাছেও জিহাদী ও ফরায়েজী আন্দোলনের প্রভেদ ধরা পড়তো না। তারাও এই উভয় আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন নামে অভিহিত করতেন।

৭.

সিপাহী বিপ্লব-পরবর্তী সময়টি ভারতীয় তথা বাংলার মুসলমানদের জন্য ভয়াবহ দুযোর্গ কাল। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ লিখেছেন, "বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে প্রশমিত হওয়ার পূর্বেই ১৯৫৮ সালের ১ নভেম্বর ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। বড়লাট ক্যানিং উক্ত দিবস এলাহবাদে এক দরবারের অনুষ্ঠান করিয়া মহারাণীর ঘোষণা পাঠ এবং ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয় হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ... ... মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সেই অর্ধ লক্ষাধিক নর-নারী মধ্যভারত ও নেপালের জঙ্গল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রিটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করে, বিদ্রোহোত্তর কালে প্রথম আঘাত পড়িয়াছিল তাহাদেরই উপর। বিদ্রোহ, ইংরেজ হত্যা, ট্রেজারী ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি অভিযোগে ইহারা অভিযুক্ত হয়। ... ... কত জনের যে ফাঁসি হইল, কত হাজার হাজার লোকের প্রতি যে স্বল্পমেয়াদী কারাবাসের আদেশ হইল তাহার হিসাব এক্ষণে পাওয়া দুষ্কর। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসে যাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছিলেন, শুধু তাঁহাদেরই সংখ্যা ছিল দশ হাজারের উর্ধ্বে। ... ... বিদ্রোহে উস্কানি, ইংরেজ নরনারী হত্যায় প্ররোচনা, পলাতকদের আশ্রয় এবং আর্থিক সাহায্য দান,

www.nagorikpathagar.org

বিদ্রোহীদের গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্যাদি ও সংবাদ গোপন প্রভৃতি নানা কাল্পনিক অভিযোগে হাজার হাজার মুসলমান তাহাদের জোত-জমি, তালুকদারী, জমিদারী, নগদ টাকা পয়সা ব্রিটিশের হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। সদাশয় সরকার ইহার সমস্ত নিজেরা হজম না করিয়া কিছু কিছু হিন্দুদের মধ্যেও বিলি-বন্টন করিয়া দিয়া নূতন আর একটি রাজা ভক্তের দল সৃষ্টির প্রয়াস পান" (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃ. ১২৪-১২৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৮ইং)। অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান লিখেছেন, "সিপাহী অভ্যুত্থানের সমস্ত দায়িত্বটাই কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের ঘাড়ে এসে পড়েছিল। দেশে ও বিলেতে শাসক মহলে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, মুঘল শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলমানরা এই বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মোটা অংশটাই তাদের ভাগ্যে জুটেছিল।" (মুসলিম মানস ও বাংলা সহিত্য, ১৯৬৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। এ সম্পর্কে মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী লিখেছেন : "স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তবেই কোন হিন্দুকে আটক করা হতো। কিন্তু পালাতে পারেনি এমন মুসলমান সেদিন বাঁচেনি।" ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ সংগঠনে আলেম সমাজের মুখ্য ভূমিকার কারণে শুধু ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ভারতের সাতশ' আলেমকে শহীদ করা হয়। বহু আলেম আরো নানাভাবে ইংরেজদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন শত শত আলেমকে পাঠানো হয় দ্বীপান্তরে।

মুসলমানদের উপর ব্যাপক জুলুম নির্যাতন এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দের ফাঁসি দ্বীপান্তর সত্ত্বেও বিপ্লবের জের চলে আরো বেশ কিছু বছর। ১৮৬৪ সালে আম্বালায়, ১৮৬৫ সালে পাটনায় এবং ১৮৭০ সালে মালদহে পরিচালিত সরকার উৎখাত সংক্রান্ত মামলাগুলো সে সময়কার জিহাদী ও ফরায়েজী আন্দোলনের সক্রিয় তৎপরতার প্রমাণ বহন করে। এসব মামলার বেশির ভাগ অভিযুক্তকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নর্মান কয়েকজন অভিযুক্তের আপীল আবেদন গ্রহণে অস্বীকার করলে আবদুল্লাহ নামক একজন মুসলমান তাকে ১৮৭১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর হত্যা করেন। আবদুল্লাহকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শহীদ করা হয়। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে ইংরেজরা কোন তথ্য বের করতে পারেনি। আবদুল্লাহ জিহাদ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। বিচারপতি নর্মান খুন হবার মাত্র চার মাস পর ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আন্দামানের দ্বীপান্তর কেন্দ্র পোর্ট ব্লেয়ারে লর্ড মেয়োকে গুরুতরভাবে যখম করেন আন্দামান বন্দী আফগান যুবক শের আলী। ধরা পড়ার পর শের আলী জানালেন, ভারতীয় মুসলমান এবং এই দেশের মুক্তির জন্যই তিনি শাহাদাত বরণ করতে যাচ্ছেন।

বিপ্লব-পরবর্তী দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে জিহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলনের কর্মীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামী তৎপরতা অব্যাহত থাকলেও তা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছিল। জিহাদ আন্দোলনের নেতা মওলানা ইনায়েত আলী ১৮৫৮ সালে এবং ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা দুদু মিয়া ১৮৬২ সালে ইন্তিকাল করেন। এর আগে ১৮৫৩ সালে জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবীপুরুষ মাওলানা বিলায়েত আলীর মৃত্যু হয়। ১৮৬৮ সালে আন্দোলনের বহু নেতাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ইংরেজ শাসকরা কিঞ্চিত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পায়। বিদ্রোহ দমনের নামে ইংরেজদের ব্যাপক দমননীতির ফলে

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম সমাজ খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনি পরিস্থিতিতেই প্রথম বারের মতো ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের আপোষের একটি ধারা প্রবল হয়ে ওঠে। প্রখ্যাত আলেম মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী ১৮৬৭ সালে তরিকায়ে মুহাম্মদী বা জিহাদ আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এ সময় তিনি মুসলমানদের মধ্যে 'ভিতর থেকে সংস্কার' (reform from within) তথা অন্তবিপ্লবের ধারণা প্রচার করেন। সংগ্রামী আন্দোলনের ধারাবাহিকতা থেকে সরে এসে তিনি প্রচার যুদ্ধের মাধ্যমে অশিক্ষিত গ্রামীণ জনগণের অনৈসলামী আচার-বিশ্বাস, হিন্দুয়ানী রীতি-নীতি দূর করে বাংলায় ইসলামের ভিত্তি শক্তিশালী করার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ইংরেজদের প্রতি নমনীয় নীতি গ্রহণ করে তিনি জিহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলনের জিহাদ নীতির প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। ১৮৭০ সালে নওয়াব আবদুল লতিফের 'ক্যালকাটা মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি'র সভামঞ্চ থেকে তিনি ফতোয়া দেন যে, ইংরেজ পদানত ভারত 'দারুল হরব' নয় এবং এখানে জুমা ও ঈদের নামায বর্জন যুক্তিযুক্ত নয়।

বাংলার সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে মাওলানা কারামত আলীর অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল। তাঁর তাইয়ুবী আন্দোলন উনিশ শতকের শেষ সিকিতে বাংলার মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়। দুদু মিয়ার পুত্র আবদুল গফুর ওরফে নয়া মিয়াও (১৮৫২-৮৪) এ সময় ব্রিটিশ সরকারের সাথে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের নীতি গ্রহণ করেন। শহুরে ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে এই যুগ সন্ধিক্ষণেই নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আহমদ খান ও সৈয়দ আমীর আলীর 'আলোকপ্রাপ্ত' নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে।

৮.

উনিশ শতকের শেষের দিকে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর সনাতনপন্থী অনুসারীদের সাথে তরিকায়ে মুহাম্মদী পন্থীদের মযহাবী বিতর্ক চরম আকার ধারণ করে। সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এ সময় 'বাহাস' মুসলিম সমাজে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে। 'বাহাস'-এর খোলাখুলি আলোচনা ও বির্তকের মধ্য দিয়ে মুসলমানগণ জিহাদের তাৎপর্য, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যকার পার্থক্য এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন হবার সুযোগ পায়। বাহাসের আলোচনা ধারায় অনেক সংকীর্ণতা প্রশ্রয় পেলেও এবং কোন কোন বাহাসের মাহফিলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষীদের উপস্থিতির প্রয়োজন দেখা দিলেও এই বিতর্কবিতণ্ডার মধ্য দিয়ে মুসলমানরা নিজেদের মুসলমানিত্বের মেধ্যে গৌরব খুঁজে পায়। এসব বাহাস আলোচনা বিভিন্ন গ্রাম ও অঞ্চলের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগের পথ খুলে দেয়। বিভিন্ন মুসলিম গ্রুপের মধ্যেকার উত্তেজনা ও অস্থিরতা দূর করতে এসব বাহাস আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হিন্দুদের গ্রাম্যমেলাসহ বিভিন্ন উৎসব পার্বণে মুসলমানদের অংশগ্রহণের প্রবণতাও 'বাহাস' অনুষ্ঠানের ফলে ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এসব 'বাহাস' সাধারণ মুসলমানদের জন্য ছিল একাধারে শিক্ষামূলক, সামাজিক যোগাযোগমূলক এবং বিনোদনমূলক। এ সম্পর্কে রফিউদ্দীন আহমদ লিখেছেন : 'The 'bahas' provided a rare opportunity for rural Muslims to come out of their closed social environment and join fellow villagers

www.nagorikpathagar.org

from distant areas in a semi religious festival (The Bengal Muslims 1871-1906: A Quest for Identity; Oxford University Press, 1981).

ইসলামের বিভিন্ন নীতিগত প্রশ্নে ব্যাপক 'বাহাস', বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার সকল স্তরের মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করে। এসব আলোচনা ও ভাব-বিনিময়ের ফলে বহু ফরায়েজী, জিহাদী এবং তাইয়ুনী কর্মীর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু ফরায়েজী ও জিহাদী কর্মী মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পন্থা হিসেবে মাওলানা কারামত আলীর ভিতর থেকে 'সংস্কার' কর্মসূচির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

মুসলমানদের বিভিন্ন চিন্তা ও মতকে কেন্দ্র করে পরিচালিত 'বাহাস' পরবর্তীকালে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যকার 'বাহাসে' রূপ নেয়। এ পর্যায়ে মুসলমানদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যকার বিভেদ অনেকাংশে প্রশমিত হয়। জনগণের আমল আকীদা চিন্তা ও চেতনা ইসলামীকরণের ব্যাপক প্রক্রিয়া এ সময় পরিলক্ষিত হয়। সকল মুসলমান এ সময় নিজেদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্রের ব্যাপারে সজাগ ও আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। বাংলার সনাতনপন্থী এবং জিহাদী ও ফরায়েজীপন্থীদের মধ্যে সহযোগিতার বৃহত্তর ক্ষেত্র রচনায় জামালউদ্দীন আফগানীর (১৮৩৮–৯৭) প্যান ইসলামবাদও এ সময়টিতে বিশেষ অবদান রাখে। ফলে গ্রামীণ জনগণের আমল-আকীদা ইসলামের আলোকে পুনর্গঠন সকল ইসলাম প্রচার-কর্মীর অভিন্ন লক্ষ্যে পরিণত হয়। এই পর্যায়ে এসে ইংরেজি শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ মুসলিম পরিবারগুলো আলেম সমাজের সাথে যোগদান করেন। তাঁরা নতুনভাবে সংগঠিত এই ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে মুসলিম জনগণকে রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ, জাগ্রত ও সংগঠিত করার এবং হিন্দু এলিটদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার এক বিরাট সম্ভাবনাময় শক্তির সন্ধান পান। ঢাকা, কলকাতা, হুগলী ও চট্টগ্রামের উচ্চতর মাদ্রাসাগুলো থেকে পাশ করে বেরিয়ে আসা গ্রাজুয়েটরা এ সময় মুসলিম জাগরণে মুখ্য ভূমিকায় এগিয়ে আসতে থাকেন। মুসলমানদের এইসব জাগরণে দেওবন্দ মাদ্রাসা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শাহ ওয়ালিউল্লাহর বিপ্লবী সমর্থকগণ ১৮৬৭ সালে এই মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। শাহ সাহেবের নিজের প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর রহীমিয়া মাদ্রাসার অনুরূপ দেওবন্দ মাদ্রাসাটিও সাধারণভাবে ইসলামী শিক্ষার সংরক্ষণ এবং বিশেষভাবে দীনী আন্দোলনের মুজাহিদ তৈরির মাধ্যমে শাহ ওয়ালিউল্লাহর বিপ্লবী চিন্তার ঘাঁটি হিসেবে কাজ করে। দেওবন্দী আলেমগণ বাংলার মুসলমানদের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা লাভ করে বেরিয়ে আসা ব্যক্তিগণ গ্রামের মক্তব ও জুনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক এবং মসজিদের ইমামরূপে মুসলিম ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক ও আচরণগত শিক্ষার বিস্তার ঘটান। ধর্মীয় পুস্তিকা রচনা ও মাহফিলে বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। এ সময় বহু নতুন মাদ্রাসা গড়ে ওঠে এবং ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তার ঘটে। তখনকার আলেম ও ইসলাম প্রচারকদের ভূমিকা সম্পর্কে এইচ. এইচ. রিসলী লিখেছেন : "At the present day ... the efforts of the reformers are directed mainly to the eradication of the superstitous practices not sanctioned by the Koran and the inculcation of the true principles of the religion." (Cansus of India-1901).

www.nagorikpathagar.org

৯.

শহুরে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানগণ ফরায়েজী ও জিহাদ আন্দোলনের মৌলিক পুনর্গঠন এবং তাদের ইংরেজবিরোধী নিরাপোষ সংগ্রামের সাথে একাত্ম হতে পারেননি। ইসলামের পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন যদিও তাঁরা দেখেছেন, কিন্তু সেই সাথে পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যেও তাঁরা গৌরব খুঁজেছেন। তাই তাঁরা ইংরেজদের সাথে আপোষ করেছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। নিরাপোষ ফরায়েজী ও জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী ভাবধারায় পরোক্ষভাবে প্রভাবিত, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও ভাবধারার চাকচিক্যে বিমোহিত এই দোদুল্যমান শহুরে শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির নেতৃত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসেন নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আহমদ খান ও সৈয়দ আমীর আলীর মতো 'আলোকপ্রাপ্ত' ব্যক্তিবর্গ। ইংরেজ প্রশাসনের সাবেক ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারপতি নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালে 'ক্যালকাটা মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' গঠন করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে 'স্যার' খেতাব প্রাপ্ত সাবেক মুন্সেফ সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বে ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গাজীপুর ট্রানস্লেশন সোসাইট। ব্রিটিশ বিচার বিভাগের কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলী ১৮৭৭ সালে গঠন করেন 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'। দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা ভিন্নতা সত্ত্বেও এই তিনজনই ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলমানদের স্বাধিকার আদায়ের নীতিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা মনে করতেন, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে 'আধুনিকীকরণ' ছাড়া মুসলমানদের পক্ষে ভারতে আত্মমর্যাদা নিয়ে টিকে থাকা সম্ভব নয়। নওয়াব আবদুল লতিফ ও স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদেরকে সংঘাতের রাজনীতি থেকে সরিয়ে এনে শিক্ষায় উন্নতির মাধ্যমে সামাজিকভাবে যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা ছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী নৈতিক পুনর্গঠন ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুসলমানদের সঙ্গত দাবি আদায়ের কথা বলেছেন। জনগণের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার, ইসলামের আলোকে তাদের চিন্তা ও কর্মের পরিশুদ্ধি তথা ইসলামী সিংস্কারের ব্যাপারে এই নব উত্থিত নেতৃত্ব আগ্রহী ছিলেন না। মুসলিম সমাজের মধ্যবিত্ত অংশই ছিল তাঁদের চিন্তার কেন্দ্র। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে গড়ে তোলাই ছিল তাঁদের স্বপ্ন। পাশ্চাত্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করে স্যার সৈয়দ আহমদ ইসলামের যে আত্মরক্ষামূলক ব্যাখ্যা পেশ করেন তা ছিল বিভ্রান্তিমূলক এবং সকল শ্রেণীর আলেমদের কাছেই অগ্রহণযোগ্য। মুসলিম এলিট ও ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনায় তাঁর আকাঙ্ক্ষাও সাধারণ মানুষের কাছে ছিল দুর্বোধ্য, অর্থহীন। সৈয়দ আমীর আলী তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে যে অবদান রাখেন তার আবেদন শহরে পাঠক ও পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই ছিল সীমিত। তাৎক্ষণিকভাবে গ্রামের সাধারণ লোকদের সাথে তাঁর চিন্তার সংযোগ ঘটতে পারেনি।

কলকাতায় মুসলমানদের অন্যতম প্রাচীনতম সংগঠনরূপে নওয়াব আবদুল লতিফের প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার এক শক্তিশালী রাজনৈতিক লবিতে পরিণত হয়। সৈয়দ আমির আলীর 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' সম্ভবত বাংলার মুসলমানদের প্রথম প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

সংগঠন। নব্যশিক্ষিত পেশাজীবী মুসলমানগণ একটি রাজনৈতিক মঞ্চ পাবার জন্য এ সংগঠনে একত্রিত হন। ১৮৭৮ সালে এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচশ'র কিছু বেশি। ১৮৮৪ সালে তা সাতশ' ছাড়িয়ে যায়। সরকারি চাকুরে, আইনজীবী, শিক্ষক ও ভূস্বামী শ্রেণীর লোকেরাই ছিলেন সি. এন. এম. এ-র বেশির ভাগ সদস্য। সৈয়দ আমীর আলীর সাংগঠনিক যোগ্যতার বলে উনিশ শতকের শেষ বছরগুলোতে সি. এন. এম. এ. ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেশার গ্রুপে পরিণত হয়। নওয়াব আবদুল লতিফের মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি ও সৈয়দ আমীর আলীর সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের মধ্যে সামাজিক পটভূমির পার্থক্য ছিল। তবে দৃষ্টিভঙ্গীর খুব বেশি ভিন্নতা ছিল না। সাংগঠনিকভাবে সি. এন. এম. এ. বেশি শক্তিশালী ছিল। কলকাতায় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন স্থানে এর শাখা ছিল। পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের উত্তেজনাকর মুহূর্তে সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল লর্ড মর্লের সাথে সাক্ষাৎ করে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা আদায় করতে সমর্থ হন। এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে মুসলমানদের পৃথক জাতিসত্তা, তথা হিন্দু-মুসলিম রাজনীতির দু'টি স্বতন্ত্র ধারার স্বীকৃতি আদায় হয়, যা মুসলমানদের নিজস্ব পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার পথ রচনা করে।

১০.

বাংলার মুসলিম জাগরণের নব পর্যায়ে ধর্মীয় বিধি-বিধান সংক্রান্ত 'নসিহতনামা' ধরনের বহু বইপত্র প্রকাশ পায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে এসব বই প্রকাশ শুরু হলেও এ শতকের শেষ সিকিতে পাঠক সংখ্যা ও প্রকাশনার সংখ্যা-উভয়ই বৃদ্ধি পায়। ১৮৪৮ সালে মুন্সী সমিরুদ্দীনের 'বেদার আল গাফিলিন' থেকে শুরু করে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত নসিহতনামাগুলো সাহিত্য রসহীন সরল ভাষায় সরাসরি কথা বলার ভংগিতে লেখা হয়। সাহিত্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার চেয়ে সমাজ সংশোধনের প্রেরণাই এসব বই লেখার পিছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। উনিশ শতকের শেষভাগের এ 'নসিহতনামা' জাতীয় বই-পুস্তিকাগুলো বাংলার মুলসমানদেরকে তাদের আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ এবং প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে নিজেদের স্বকীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে সহায়ক হয়। এসব বইয়ের ভাষাই ধীরে ধীরে মুসলমানী বংলার পৃথক ধারা সৃষ্টি করে। সুনীল চ্যাটার্জীর মতে, সে ভাষার সাথে গ্রামের মুসলমানদের ভাষার পুরোপুরি মিল ছিল। ১৮৭৩ সালে উচ্চশিক্ষিত আলেম মুহাম্মদ নাইমুদ্দিন (১৮৩২-১৯০৮) 'জুবদাত আল মাসাইল' নামে একটি বই লেখেন। আধুনিক, সহজ-সরল ভাষায় লিখিত এই চমৎকার বইটি লেখকের জীবদ্দশাতেই অষ্টম সংস্করণ প্রকাশের জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মুহাম্মদ নাইমুদ্দিন ১৮৯২ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আল-কুরআনের বাংলা তরজমা করেন। বাঙালি মুসলমানদের প্রত্যাশা পূরণে এই তরজমাটি সে সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর আগে ১৮৮১ থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০) আল-কুরআনের বাংলা তরজমা পারা অনুক্রমে প্রকাশ করেন। কুরআন শরীফ একজন ব্রাহ্মধর্মী কর্তৃক বাংলায় অনুবাদের ঘটনা মুসলিম সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এ সময় বাংলা ভাষায় ইসলামী বই-পত্র

www.nagorikpathagar.org

রচনার ব্যাপারে ব্যাপক সাড়া দেখা যায়। এ সময় বহু সংখ্যক বই-পুস্তক প্রকাশ পায়। তার মধ্যে শেখ আবদুর রহীমের (১৮৫৯–১৯৩১) 'হজরত মুহাম্মদ (দ.) জীবন চরিত্র ও ধর্মনীতি' (১৮৮৭), 'ইসলাম' (১৮৯৬), 'নামাজ তত্ত্ব' (১৮৯৮) ও 'হজ্জবিধি' (১৯০৩); ইকীনুদ্দীন আহমদের 'ইসলাম ও ধর্মনীতি' (১৯০০); সমিরুদ্দিন আহমদের 'মুহাম্মদীয় ধর্ম সোপান' (১৯০২); সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর 'ঈদুল আযহা' (১৯০০) ও 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৩) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ সময় ইসলামী অতীতকে উপজীব্য করেও বহু বইপত্র প্রকাশিত হয়। মওলানা জাকাউল্লাহ (১৮৩২–১৯১০), চিরাগ আলী (১৮৪৪–৯৫), মওলানা শিবলী নোমানী (১৮৫৭–১৯১৬) প্রমুখ বিশিষ্ট লেখক ইসলামী ঐতিহ্যকে তুলে ধরে তাদের রচনার মাধ্যমে মুসলিম জাগরণের যে প্রয়াস চালান, তার আবেদন শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে এই শিক্ষিত শ্রেণীটি সে উন্নত রচনার দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়ে বই-পত্র রচনায় হাত দেন। তাঁদের প্রকাশিত বিভিন্ন বই ও পত্র-পত্রিকা মুসলিম সামাজে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে অবদান রাখে। এ সময় বাংলা ভাষায় 'আল ইসলাম', 'আখবারই ইসলামিয়া', 'হাফেজ', 'ইসলাম প্রচারক', 'মিহির ও সুধাকর' প্রভৃতি বেশ কিছু সংখ্যক পত্রিকা প্রকাশ পায়। এসব প্রকাশনার তাৎপর্য ছিল ব্যাপক। পত্র-পত্রিকার পাশাপাশি তখন প্রকাশিত হয় রিয়াজউদ্দীন আহমদের 'সূর্য বিজয়' (১৮৯৫) এবং 'গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ' (১৮৯৯-১৯০৮); আবদুল করিমের 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' (১৮৯৮); মুইজুদ্দীন আহমদের 'তুরস্কের ইতিহাস' (১৯০৩); শেখ আবদুল জব্বারের 'মক্কা শরীফের ইতিহাস' (১৯০৬), ও 'মদীনা শরীফের ইতিহাস' (১৯০৭)। এছাড়া উপমহাদেশীয় মুসলমানদের জাতিসত্তাকে উপজীব্য করে রচিত হয় নওশের আলী খান ইউসুফ জাঈয়ের 'বংগীয়মুসলমান' (১৮৯১); কায়কোবাদের (১৮৫৭–১৯৫২) 'অশ্রুমালা' (১৮৯৫) ও 'মহাশ্মশান কাব্য' (১৯০৪); ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বিখ্যাত 'অনল প্রবাহ' (১৯০০) সে সময়েরই সৃষ্টি।

এ পর্যায়ে শহুরে নব্যশিক্ষিত মুসলমানগণ ইসলাম প্রচার, দীনী সংস্কার ও মুসলিম জাগরণ প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের উদ্যোগে শহর ও গ্রাম এলাকায় বহু সমিতি ও আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী বই-পত্র রচনায়ও তাঁরা বিশেষ আগ্রহ দেখান। রংপুর জেলার মহীপুরের জমিদার ও সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের রংপুর জেলা শাখার সভাপতি খান বাহাদুর আব্দুল মজীদ ১৯০২ সালে একটি মুসলিম মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ উপলক্ষে প্রকাশিত একটি প্রচারপত্রে ইসলামের সকল রচনাবলী আরবী ও ফার্সী ভাষা থেকে বাংলায় তরজমা করে মুসলিম জনগণের মধ্যে প্রচার করার আহ্বান জানানো হয়। (দি মুসলিম ক্রনিন্‌লস, ১০ ডিসেম্বর, পৃ. ৬৯৭)।

শহুরে নব্যশিক্ষিত মুসলমানদের ইসলাম প্রচারমূলক কার্যক্রম আলেমদের আন্দোলনের সমকক্ষ ছিল না। মুসলিম নবজাগরণের বাণী প্রচারে আলেম সমাজ অন্য যে কোন সময়ের মতোই ছিলেন অগ্রণী। নব্য শিক্ষিতগণ তাঁদের বাণী প্রচারের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে আলেমদের উপরই ছিলেন নির্ভরশীল।

www.nagorikpathagar.org

১১.

উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলার মফস্বল এলাকায়, বিশেষত নদীয়া, যশোর, খুলনা ও মালদহে খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদের বইপত্রে ইসলাম, মুসলমান ও রসূল (স.) সম্পর্কে আপত্তিকর অপপ্রচার চালায়। গ্রাম এলাকায় বিলিকৃত তাদের বইপত্রে ইসলামের অবমূল্যায়ন করা হয়। খ্রিস্টান মিশনারীদের এ তৎপরতার বিরুদ্ধে নব্যশিক্ষিত মুসলমান ও আলেম সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাঁরা খ্রিস্টানদের মুকাবিলায় এগিয়ে আসেন। খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতা মুকাবিলার উদ্দেশ্যে কলকাতায় 'ইসলাম মিশন ফান্ড' গঠন করা হয়। কলকাতার একদল মুসলমান এ সময় 'এহ্‌লাম তত্ত্ব' নামে একটি বই লেখেন। 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকাটিও এ সময়ই প্রকাশিত হয়। খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতার বিরুদ্ধে সে সময় সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন যশোরের মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১–১৯০৭)। তিনি ১৮৮৬ সালে 'খ্রিষ্টীয় ধর্মের অসারতা' নামে একটি বই লেখেন। তিন বছর পরে খ্রিস্টান মিশনারী হুমকির মোকাবিলায় তিনি শিক্ষিত মুসলমানদের নির্বিকার ভূমিকার সমালোচনা করে 'সুধাকর' পত্রিকায় চিঠি লেখেন। এই চিঠিটি শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

দরিদ্র পরিবারের সন্তান মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর উত্থান ঘটে পূর্ব বাংলার গ্রামীণ পরিবেশে। প্রাথমিক জীবনে শিক্ষার সুযোগ কম পেলেও অদম্য আগ্রহে তিনি আরবি, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। মাতৃভাষা বাংলায় ছিল তাঁর অসাধারণ দখল। তিনি বাংলা ভাষায় বই-পত্র রচনা করেন এবং ইসলাম প্রচারক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর কাজ শুরু হয় যশোর থেকে। জনগণের ভাষায় কথা বলে শীঘ্রই তিনি সারা বাংলায় জনমত সংগঠনে অন্য সকল নেতার উপর স্থান করে নেন। খ্রিস্টানদের সাথে বেশ কিছু বাহাসে অবতীর্ন হয়ে তিনি খ্রিস্টধর্মের অসারতা প্রমাণ করেন এবং মুসলিম জনগণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার করেন। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ শীঘ্রই উপলব্ধি করেন যে, খ্রিস্টানদেরকে যুক্তির ভিত্তিতে পরাভূত করার চাইতেও মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজন অনেক বেশি। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইসলামী দাওয়াত প্রচার, জনগণের ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে বইপত্র রচনা এবং দীনী সংগঠন বা আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠার ত্রিমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর শিষ্য ও ফুরফুরার পীর সাহেব শাহ আবুবকর সিদ্দিকী তাঁর এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজে সাথী হন। সে সময় শেখ আব্দুর রহীম (১৮৫৯–১৯৩১), মুহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬২–১৯৩৩) ও পণ্ডিত রিয়াজউদ্দীন মাশহাদীসহ সে-যুগের বেশ ক'জন প্রধান মুসলিম লেখক কলকাতার 'মিহির ও সুধারকর' পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়েছিলেন। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ এই লেখকদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। 'সুধাকর গ্রুপ'-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ শহরে শিক্ষিত কিংবা গ্রামের অশিক্ষিত সকল স্তরের মানুষের সাথে ব্যাপক সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। শহরের মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্সগুলোতে বুদ্ধিবৃত্তিক অংশগ্রহণ ও পাণ্ডিত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য তিনি ছিলেন প্রশংসিত, জনপ্রিয়।

www.nagorikpathagar.org

আবার গ্রাম এলাকার ওয়াজ মাহফিলগুলোতেও তাঁর আকর্ষণ ছিল অতুলনীয়। ফলে তাঁর পক্ষে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, শহুরে ও গ্রামীণ মুসলিম সমাজের চিন্তা, চেতনা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যোগসূত্র ও অন্বয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। তাঁর রচনাবলী শহুরে এবং গ্রামীণ জনগণকে একইভাবে আকর্ষণ করে। হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষী রচনাবলীর জবাবে তিনি 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' নামে বই লেখেন। গ্রামের অশিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত লোকদের শিক্ষিত করে তুলতেও তিনি বহু রচনা প্রকাশ করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে ইসলামকে এক জীবন্ত, প্রতিষ্ঠিত শক্তিরূপে দেখতে চেয়েছেন। ধর্মীয় গোঁড়ামী নয়, ইসলামের বাস্তব অনুশীলন তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর উদ্যোগে গ্রাম এলাকায় বিভিন্ন আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তিপূর্ণ সুসংগঠিত ধর্মীয় সম্মেলন হিসেবে ওয়াজ মাহফিলের ব্যাপক প্রচলন সম্ভবত বাংলার মুসলমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে মুনসী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর সর্বাপেক্ষা ইতিবাচক অবদান। ইসলামী জীবন যাপনের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষামূলক ভাষণের উদ্দেশ্যে সংগঠিত ও আয়োজিত এই ওয়াজমাহফিল 'বাহাসে'র বিতর্কমূলক, প্রায়শ অশান্ত সম্মেলনের তুলনায় অসাধারণ শান্তিপূর্ণ এবং বেশি প্রভাব বিস্তারক। মুন্সী মেহেরুল্লাহ নিয়মিত বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে বক্তৃতা করতেন। উনিশ শতকের শেষ ধাপে তিনিই সম্ভবত এই ওয়াজ মাহফিলের অনুষ্ঠানকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলেছিলেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রচারক ও রাজনীতিবিদগণের কাছে এই মাহফিল সম্মেলনের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এই চমৎকার জনসংযোগ মাধ্যমটির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে জনগণের মধ্যে সাড়া সৃষ্টি হয় এবং আঞ্জুমান ও মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সংখ্যাসহ মসজিদগুলোতে মুসল্লীর আগমন বৃদ্ধি পায়।

বাংলার মুসলিম নবজাগরণে মুন্সী মেহেরুল্লাহর কর্মধারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। মুসলমানদেরকে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর শিক্ষিত করে তুলতে তিনি নিজে সনাতনপন্থী হয়েও সনাতনী ধারা অনুসরণ করেননি। আবার ফরায়েজী বা জিহাদপন্থী বিপ্লবী সংস্কারকদের কর্মপন্থারও তিনি অনুসারী ছিলেন না। বিধবা বিবাহের বিরোধিতার জন্য তিনি 'আশরাফ' মুসলমানদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। আবার মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ ও রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হবার জন্যও তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর সার্বক্ষণিক সাথী ছিলেন শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন। তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে জন জমিরুদ্দীন নামে কিছু দিন খ্রিষ্টান পাদ্রী হিসেবে কাজ করেন। পরে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর প্রভাবে তিনি ইসলামে ফিরে আসেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহর ক্যারিজমাসম্পন্ন বিশাল ব্যক্তিত্বের ছায়া হিসেবেই কাটে তাঁর জীবনের সবচে গুরুত্বপূর্ণ সময়।

১২.

১৮৭১ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত সময়টিতে মুসলিম সমাজ জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ, গভীর ও ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। উনিশ শতকের শুরুতে বাংলার মুসলমানরা ছিলেন গোষ্ঠী ও অঞ্চলে বিভক্ত। আরো সূক্ষ্মভাবে দেখলে, গ্রামীণ ক্ষেত্রে বর্ণবিভক্তি ছিল তখনকার এক প্রচ্ছন্ন সামাজিক বৈশিষ্ট্য। মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম নিজেদের গোষ্ঠী কিংবা অঞ্চলে ছিল সীমাবদ্ধ। ফরায়েজী ও জিহাদ আন্দোলন তাদেরকে

www.nagorikpathagar.org

সেই বদ্ধ সামাজিক গণ্ডি থেকে বের করে আনতে শক্তিশালী উপাদান যোগায়। উনিশ শতকের শেষ বছরগুলোতে পরিচালিত আন্দোলন মুসলিম সমাজের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেয়। এই পরিবর্তন সৃষ্টিতে বিভিন্ন সামাজিক শক্তির ভূমিকা মূল্যায়ন করে ১৯০৫ সালে 'ইসলাম প্রচারক' লিখেছে যে, 'ব্রিটিশ শাসনের সার্বিক পরিণতি সম্পর্কে নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা পুরোপুরি বুঝে উঠার আগেই ধর্ম প্রচারকগণ মুসলিম স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।" (বাংলা ১৩১২ সনের চৈত্র সংখ্যা)। দেরিতে হলেও নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর অংশগ্রহণের ফলে মুসলিম নবজাগরণ আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চার হয়। উনিশ শতকের শেষ বছরগুলোতে ইসলাম প্রচারক আলেম সমাজ এবং নব্যশিক্ষিত মুসলমানদের মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই : ক. মুসলিম সমাজের বিরোধী ভাবাপন্ন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিরোধ ও মতানৈক্য প্রশমিত হয়। তাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরীলিতা ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। খ. গ্রামীণ মুসলমানগণ বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংযোগ ধারায় মিলিত হতে শুরু করেন। গ. মুসলমানদের রাজনৈতিক ও দীনী কার্যক্রম অভিন্ন ধারায় পরিচালিত হতে শুরু করে। ঘ. বহু নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজকল্যাণ সংগঠন ও আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হয়; ঙ. বিপুল সংখ্যক নসিহতমূলক, দীনী সংস্কারমূলক, ইতিহাস ও ঐতিহ্যধর্মী আত্মপ্রত্যয় ও আত্মগৌরবমূলক এবং নিজস্ব জাতিসত্তা ভিত্তিক বই-পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়। চ. বাংলা ভাষায় মুসলমানদের বেশ কিছু সংখ্যক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ছ. মুসলিম সমাজ জীবনে ওয়াজ মাহফিল নামক শান্তিপূর্ণ দীনী সম্মেলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। জ. মুসলমানদের মধ্যে অভিন্ন স্বার্থের সমানুভূতি জাগ্রত হয়। তাঁরা আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ হন। সমস্বার্থ ও অভিন্ন আদর্শের পথ ধরে তাদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য চেতনা সৃষ্টি হয়। এক কথায়, উনিশ শতকের শেষভাগে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে সংঘাত ও স্ববিরোধিতার বহু উপাদানের উপস্থিতি সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও আদর্শিক স্বার্থের দু'টি ধারা বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীকে সম-স্বার্থের এক কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ করে অভিন্ন রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। রফিউদ্দীন আহমদের ভাষায় : "By 1905 the building blocks which eventually went into the making of Pakistan were already there (The Beangal Muslims 1871 - 1906).

১৩.

বিশ শতকের শুরু থেকে বাংলার মুসলমানরা পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক যুগে প্রবেশ করে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে মুসলিম লীগের জন্মের মধ্য দিয়ে এ যুগ শুরু হয়। উনিশ শতকের শেষভাগেই ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। ১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমীর আলী 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' গঠন করেন। ১৮৮৫ সালে সর্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদেরকে এই দলে যোগদানে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিহত করে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য সৈয়দ আহমদ খান ১৮৮৯ সালে

www.nagorikpathagar.org

'ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান ডিফেন্স এসোসিয়েশন' এবং ১৮৯৩ সালে 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অর্গ্যানাইজেশন অব আপার ইন্ডিয়া' গঠন করেন। সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর অভাবে এ দুটি সংগঠন কোন কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। বিশ শতকের শুরুতে উর্দূ-হিন্দি বিতর্ক প্রবল হলে মুসলমানগণ নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। ১৯০১ সালের অক্টোবর মাসে নওয়াব ওয়াকার উল মূল্ক লক্ষ্ণৌতে মুসলমানদের এক ঘরোয়া বৈঠকে এ প্রসংগ উত্থাপন করেন। ১৯০৩ সালে সাহরানপুরে একটি মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ১৯০৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে পাঞ্জাবে ফযল-ই হোসেন 'মুসলিম লীগ' নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন। এ সময় ভারতসচিব লর্ড মর্লি ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের আভাস দেয়ার পর ১৯০৬ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সৈয়দ আমীর আলী দু'টি প্রবন্ধে মুসলমানদের একটি কার্যকর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের পরামর্শ দেন।

১৯০৫ সালে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল ও আসাম নিয়ে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠন করার ফলে এ এলাকায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় মুসলমানদের অবস্থা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। নব গঠিত প্রদেশের মুসলমানদের সংহতি ও উন্নতির লক্ষে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ঢাকায় নওয়াব সলিমুল্লাহর (১৮৭১-১৯১৫) নেতৃত্বে প্রাদেশিক মুসলিম সংঘ গঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু জমিদার, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রবল আন্দোলনের মুখে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে নওয়াব সলিমুল্লাহ একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা করেন। ঢাকায় ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন শেষে সর্বভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধিদের একটি বিশেষ সভায় নওয়াব সালিমুল্লাহর প্রস্তাবক্রমে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর রবিবার ঢাকার শাহবাগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আটশ' প্রতিনিধির এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বঙ্গভঙ্গের ফলে স্বল্পসময়ে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। মাত্র পাঁচ বছরে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এ সময় মুন্সিগঞ্জে এক জনসভায় নওয়াব সলিমুল্লাহ বলেন, বঙ্গভঙ্গ আমাদেরকে নিষ্ক্রীয় জীবন থেকে জাগিয়ে তুলেছে এবং সক্রিয় জীবন ও সংগ্রামের পথে ধাবিত করেছে।" হিন্দু নেতৃবৃন্দ এ অবস্থা সহ্য করতে পারেননি। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তাদের প্রবল আন্দোলনের মুখে বাংলার হিন্দু-মুসলিম বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। তাদের বন্ধুত্ব ও আন্তরিক মেলামেশার সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। রাস্তা-ঘাট, বিদ্যালয়, দোকান-পাট, হাট-বাজার সর্বত্র এই বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। স্কুলে হিন্দু ছাত্ররা তাদের সহপাঠী মুসলমান ছাত্রদের মুখ থেকে পিঁয়াজের গন্ধ আসে বলে অভিযোগ তুলে তাদের পাশে বসা পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়। ক্লাসে মুসলমান ও হিন্দু ছাত্রদের জন্য পৃথক পৃথক শাখার ব্যবস্থা করা হতো। (এন, সি, চৌধুরী - অটোবায়োগ্রাফী অব আননোন ইন্ডিয়ান, পৃ: ২৩৭)।

www.nagorikpathagar.org

কংগ্রেসের আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে মুসলমানদের উন্নতির সুযোগ আবার বন্ধ হয়। ইংরেজদের এই বিশ্বাসভঙ্গের নীতির কঠোর প্রতিবাদ জানান মুসলিম নেতৃবৃন্দ। ইংরেজদের ওপর আপোষকামী রাজভক্ত মুসলিম নেতাদের আস্থাতেও ফাটল সৃষ্টি হয় এ ঘটনায়। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের শান্ত করার জন্য ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি বড়লাট ঢাকায় আসেন এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস দেন। ভারত সরকার ২ ফেব্রুয়ারি এক ঘোষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব প্রকাশ করলে হিন্দু নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন, এর ফলে বাংগালি জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য তীব্রতর হয়ে উঠবে। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা অধিকাংশই কৃষক হবার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র থেকে কোন উপকার পাবে কিনা এব্যাপারেও হিন্দু নেতৃবৃন্দ সন্দেহ প্রকাশ করেন। এ হিন্দু মানসিকতা মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় স্বাতন্ত্রবোধ প্রবলতর করে।

বঙ্গভঙ্গ রদের এক নৈরাশ্যজনক পটভূমিতে ১৯১২ সালের ৩ মার্চ কলিকাতায় মুসলিম লীগের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে নওয়াব সলিমুল্লাহ পাঁচ বছরে মুসলিম লীগের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, ব্যবস্থাপক সভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা, ওয়াকফ সম্পত্তির অর্থদাতাদের ইচ্ছানুযায়ী ধর্মীয় কাজে ব্যবহার এবং সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টির আবেদন জানান।

ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ সে বছরই প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বিদায় নেন। ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলার মুসলমানদের এই অবিসংবাদিত নেতার ইন্তিকালের পর শিক্ষিত যুবকরা মুসলিম লীগ নেতৃত্বে প্রাধান্য বিস্তার করেন। রাজভক্তি ও আবেদন-নিবেদনের নীতির পরিবর্তে এই তরুণ নেতৃত্ব মুসলমানদের অবস্থার উন্নতির জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের নতুন কর্মপন্থা অবলম্বন করেন। এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন বাংলাদেশের মুসলমান যুবকদের এই সংগ্রামী ভাবধারা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। রাজভক্ত প্রবীণ সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসন দাবী মুসলিম লীগের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়।

কংগ্রেসে দাদা ভাই নওরোজী ও গোখলের মতো অসাম্প্রদায়িক নেতার স্থলে বাল গংগাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় ও বিপিন পালের মতো উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটার ফলে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তাদের কাছে হিন্দু সংস্কৃতি ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি, শিবাজী ভারতীয় জাতীয় চেতনার প্রতিক, গণপতি পূজা জাতীয় অনুষ্ঠান এবং বন্দে মাতরম ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। মুসলমান নেতাগণ শঙ্কিত ছিলেন যে, ভবিষ্যত স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। বংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু ছিলেন। এই অবস্থায় চল্লিশ কোটি মানুষের অখণ্ড ভারতীয় শাসনতন্ত্রে নয় কোটি মুসলমানের অধিকার ও স্বার্থের জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করাই ছিল মুসলমান

www.nagorikpathagar.org

নেতাদের উদ্দেশ্য। এ জন্য তাঁরা প্রদেশগুলোর জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যূনতম ক্ষমতা এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রাখার প্রতিশ্রুতি দাবী করেন।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬- ১৯৪৮) ও এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)-সহ মুসলিম নেতৃবৃন্দ ভারতের শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের জন্য রক্ষাকবচের ব্যাপারে একটি মীমাংসায় আসতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তাঁদের চেষ্টায় ১৯১৬ সালে লীগ-কংগ্রেস লক্ষ্ণৌচুক্তি সম্পাদিত হয়। কংগ্রেস ও লীগ মিলিতভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন পরিচালনা করে। কিন্তু ১৯২৮ সালের নেহেরু কমিটির রিপোর্টের মাধ্যমে কংগ্রেস লক্ষ্ণৌচুক্তিতে স্বীকৃত মুসলমানদের সব দাবী অস্বীকার করলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ভিত্তি ধ্বসে পড়ে। জিন্নাহ মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য চৌদ্দ দফা দাবি উত্থাপন করেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব সে দাবি অগ্রাহ্য করে। ১৯৩০ থেকে শুরু করে লন্ডনে অনুষ্ঠিত তিন দফা গোলটেবিল বৈঠকেও ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমানদের দাবী-দাওয়ার সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়নি। এরপরও জিন্নাহ কংগ্রেস নেতাদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখেন। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের সথে তাঁর আলোচনা ব্যর্থ হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে তিনি গান্ধীর সাথে পত্র বিনিময় করেন। গান্ধী মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। জিন্নাহর সাথে পত্রালাপে জওহরলাল নেহেরু হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আলোচনায় মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের সমান মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। ১৯৩৮ সালে জিন্নাহ কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বসুর সাথে পত্র বিনিময় করেও সমস্যার সমাধান খুজে বের করতে ব্যর্থ হন। এভাবেই হিন্দু মুসলিম মিলনের একের পর এক চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রে মুসলিম স্বার্থ বিপন্ন হবার আশঙ্কা অমূলক বলে উড়িয়ে দিলেও কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের প্রতি অবিচারের সুস্পষ্ট অভিযোগ তুলে ধরে মুসলিম লীগ। ওয়ার্দা শিক্ষা পরিকল্পনা, বিদ্যামন্দির শিক্ষা ব্যবস্থা, বন্দে মাতরম সঙ্গীত, শ্রীপদ্ম প্রতীক এবং হিন্দুয়ানী পাঠ্য-পুস্তক চালু করার ফলে মুসলমানরা হিন্দু শাসনে নিজেদের ধর্ম ও কৃষ্টির ভবিষ্যত সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। হিন্দু নেতাদের সীমাহীন বাড়াবাড়ির কারণে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব অখণ্ড ভারতের আদর্শ থেকে দূরে সরে পড়েন। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপনের দাবি উত্থিত হয়।

ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে অভিহিত এই লাহোর প্রস্তাবে ভারতের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপনকালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক বলেন, "১৯০৬ সালে বাংলাদেশেই প্রথম মুসলিম লীগের নিশান উত্তোলিত হয়েছিল। এখন বাংলাদেশের নেতা হিসেবে সেই মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকেই মুসলমানদের জন্য আমি আবাসভূমি স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করার অধিকার পেয়েছি।"

www.nagorikpathagar.org

লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের পর পাক-ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে মুসলমানদের চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। তাঁরা অখণ্ড ভারতের চিন্তা থেকে দ্রুত সরে আসেন। কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাগণ ভারত বিভাগের তীব্র বিরোধিতা করেন। ব্রিটিশ সরকারও ভারতের অখণ্ডতার পক্ষে ছিলেন ফলে মুসলিম লীগ নেতৃত্বকে এ দাবি আদায়ে প্রবল বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়।

ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্বের দাবী যাচাইয়ের জন্য ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় আইন সভার এবং ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠান, একথা প্রমাণ করার জন্য পাকিস্তান দাবির ভিত্তিতে মুসলিম লীগ নির্বাচনে অংশ নেয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা, শক্তি ও সংহতি এবং স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবির প্রতি মুসলমানদের দৃঢ় সমর্থন প্রমাণিত হয়। সারা ভারতে সর্বাধিক মুসলিম জনঅধ্যুষিত বাংলাদেশের মুসলমান নির্বাচনে প্রমান করেন যে, এ প্রদেশই 'মুসলিম লীগের শক্তির প্রধান উৎস' এবং 'ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তির দুর্ভেদ্য দুর্গ'। কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমান আসনের সব ক'টি মুসলিম লীগ দখল করে। প্রাদেশিক আইন সভায় ১১৯টি মুসলিম আসনের ১১৩টি আসনই মুসলিম লীগ লাভ করে। নির্বাচনের রায়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে পাকিস্তান অর্জনের জন্য সংহতি ও সংকল্পের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। তখনকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে এটিই ছিল একমাত্র মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা।

১৪.

মুসলিম লীগ অন্তত প্রথম তিন দশক বাংলার ব্যাপক জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৫ সালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলাদেশেও এ দলটি ছিল কার্যত অস্তিত্বহীন। জমিদার ও শহুরে অভিজাতদের নেতৃত্বে এই দল গণভিত্তি অর্জনে সক্ষম হয়নি। বাংলাদেশের মুসলমানদের অধিকাংশ ছিলেন কৃষক। তাদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিনিধিত্ব করা মুসলিম লীগের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁরা কৃষকদের মধ্যে সাড়া জাগাতে অক্ষম ছিলেন।

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদাররা জমির পূর্ণস্বত্ব মালিক হয়েছিল। আর স্বত্বহারা কৃষকরা জমিদারদের দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত অনুযায়ী খাজনা ও অন্যান্য কর বাবদ জমিদাররা ১৩কোটি টাকা আদায় করে তা থেকে সরকারকে তিন কোটি টাকা রাজস্ব দেয়ার কথা ছিল। অথচ উনিশশ' ত্রিশের দশকে জমিদারদের খাজনা আদায়ের পরিমাণ ছিল ৬৩ কোটি টাকা। সরকারকে রাজস্ব দেয়া হতো ৬ কোটি টাকা। খাতাপত্রে ১৮ কোটি টাকা আদায় দেখিয়ে ৪৫ কোটি টাকা জমিদার ও তাদের আমলারা ভাগ করে নিত। জমিদারদের অতিরিক্ত খাজনা দেয়ার জন্য প্রজারা মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের দুরবস্থা চরম আকার ধারণ করেছিল। ১৮৫৯ সালের বঙ্গীয় ভূমিকর বিধিতে প্রজাদের আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ স্বীকৃত হলেও গরীব, অসহায় প্রজাদের পক্ষে আইনের আশ্রয় গ্রহণ ছিল অসম্ভব ব্যাপার। সৈয়দ আমীর আলী তাঁর এক প্রবন্ধে বাংলাদেশের ভূমি সমস্যা তুলে

www.nagorikpathagar.org

ধরলে অন্যায়ভাবে কর বৃদ্ধি ও প্রজা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল পাশ হয়। কিন্তু এই বিলটিও বাস্তব ক্ষেত্রে ছিল অকার্যকর।

বিশ শতকের শুরুতে কয়েকজন মুসলমান নেতার উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রজা আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করে। শরীয়ত উল্লাহ- দুদু মিয়া ও তিতুমীরের উত্তরসূরী এসব মুসলিম নেতা জমিদার মহাজনদের কবল থেকে মজলুম প্রজাদের রক্ষার উদ্যোগ নেন। ১৯১৩ সালের এক নির্বাচনী বক্তৃতায় এ. কে. ফজলুল হক নিজেকে একজন প্রজা হিসেবে ঘোষণা করে জমিদার ও মহাজনদের কবল থেকে প্রজাদের রক্ষা করাই তাঁর জীবনের ব্রত বলে ঘোষণা করেন। ১৯১৪ সালে জামালপুরের কামারিয়ার চরে এক বিরাট প্রজা সম্মেলনে এ. কে. ফজলুল হক, আবুল কাশেম, মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৯-১৯৬৮), মওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, বগুড়ার রজীবউদ্দীন তরফদার যোগদান করেন। জামালপুরের খোশ মোহাম্মদ ছিলেন এ সম্মেলনের আহবায়ক। ১৯১৫ সালে বরিশালে কয়েকটি প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালে বরিশালে আগৈলঝারার সভায় সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর হাশিম আলী খান। প্রজা আন্দোলন ক্রমে গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯২৪ সালে এ. কে. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রজা সম্মেলনে নিখিল বঙ্গপ্রজা সমিতি গঠন করা হয়। কমরেড মোজাফফর ও কবি নজরুল সম্পাদিত নবযুগ পত্রিকা ছিল এই সমিতির মুখপাত্র। ১৯২৬ সালে মানিকগঞ্জের সাহা-মহাজনদের বিরুদ্ধে প্রজা আন্দোলনের সাফল্য প্রজাদের উৎসাহিত করে। ১৯২৭ সালে এ. কে. ফজলুল হক মানিকগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে বাংলাদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর চেষ্টায় এবং প্রজা আন্দোলনের প্রভাবে ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন গৃহীত হয়। হিন্দু জমিদার-মহাজনদের স্বার্থের প্রতিভূ কংগ্রেস এই আইনের বিরোধিতা করলে মওলানা আকরম খাঁসহ অনেক মুসলমান নেতা কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯২৯ সালে কলকাতায় মুসলমান নেতাদের এক বৈঠকে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতিকে ব্যাপক ভিত্তিক রূপ দেয়া হয়। স্যার আবদুর রহীম সমিতির সভাপতি ও মওলানা আকরম খাঁ কর্মসচিব এবং এ. কে. ফজলুল হক, মুজিবুর রহমান, আবদুল করিম, ড. আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী ও খান বাহাদুর আবদুল মোমিন সমিতির সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। শামসুদ্দীন আহমদ ও তমিজুদ্দীন খাঁ হন যুগ্ম কর্মসচিব। সমিতির শাখা জিলা পর্যায়ে প্রসার করা হয়। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর (১৮৮০-১৯৭৬) ব্যক্তিগত উদ্যোগে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রজা সম্মেলন উদ্বোধন করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯৩-১৯৬৩)। সভাপতিত্ব করেন খান বাহাদুর আবদুল মোমিন (বর্ধমান)। এ, কে, ফজলুল হক ১৯৩৪ সালে কুষ্টিয়ায় এবং পরের বছর মোমেনশাহীতে প্রজা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। স্যার আবদুর রহীম ১৯৩৫ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এ, কে, ফজলুল হক নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির সভাপতির দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সভায় সমিতির নতুন নামকরণ হয় কৃষক প্রজা পার্টি। প্রজা সমিতিতে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য ছিল। দেশের সাধারণ মুসলমানদের অধিকার সচেতন করতে প্রজা

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলন বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। ১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা পার্টি 'ডাল-ভাতের ব্যবস্থা' ও 'লাঙ্গল যার জমি তার' শ্লোগান দিয়ে সাধারণ নির্বাচনে অংশ নেয়। নির্বাচনে ১১৯ টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ৪০টি, প্রজাপার্টি ৩৮টি এবং স্বতন্ত্র মুসলমান প্রার্থীগণ ৪১টি আসন পান। ক'জন স্বতন্ত্র মুসলমান প্রার্থীর যোগদানের ফলে মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা ৫৫ হয়। মুসলিম লীগের সমর্থনে এ, কে, ফজলুল হক প্রজা-লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। প্রায় দু'শ' বছর পর বাংলার মুসলমানরা আবার শাসন ক্ষমতা ফিরে পায়। ফলে তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। এই শাসনামলে ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন পাশ হবার ফলে বাংলাদেশে ষাট হাজার ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা হয়। এই বোর্ড মহাজন-খাতকদের ঋণের দাবি ৯০০ কোটি টাকা থেকে ৬০ কোটিতে হ্রাস করে। মহাজনের কবল থেকে কৃষকদের রক্ষার ভবিষ্যত গ্যারান্টি হিসেবে কুসীদজীবী আইন পাশ করে সুদী কারবারের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয়। ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন পাশ করে প্রজাদের উপর জমিদারী স্বেচ্ছাচার বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়। কৃষকের বুকের ওপর প্রায় দু'শ' বছর চেপে থাকা জগদ্দল পাথরগুলো যেন একের পর এক নেমে যায় এসময়। মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি এবং সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেও এ আমলে অনেক পদক্ষেপ নেয়া হয়।

প্রজা-লীগ মন্ত্রীসভা গঠনের পরপরই এ, কে ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ দেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সভাপতি এবং সোহরাওয়ার্দী কর্মসচিব নির্বাচিত হন। ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা ও সোহরাওয়ার্দীর সাংগঠনিক দক্ষতার জোরে মুসলিম লীগ বাংলাদেশে দ্রুত গণভিত্তি অর্জন করে। আইন সভার উপনির্বাচনে লীগ মনোনীত প্রার্থীরা সব ক'টি আসনে জয়ী হন। মুসলিম লীগকে কেন্দ্র করে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এ সময় থেকেই ব্যাপক জাগরণের সূচনা হয়।

১৫.

বিশ শতকের গোড়ার দিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের আপোষকামী রাজনৈতিক ধারার পাশাপাশি শাহ ওয়ালিউল্লাহর বিপ্লবী ভাবধারায় আপোষহীন জিহাদের মাধ্যমে এদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের পদক্ষেপ নেন দারুল উলুম দেওবন্দের অধ্যক্ষ শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান। (১৮৫১-১৯২০)। মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র ও অঞ্চলগুলোকে সাম্রাজ্যবাদের কবল মুক্ত করতে তিনি জমিয়তে আনছারুল্লাহ নামক সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন কায়েম করেন। এই সংস্থাটি আজাদ হিন্দ মিশন নামেও পরিচিত ছিল। জিহাদ আন্দোলনের প্রাচীন ঘাটি ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ইংরেজ অধিকার বহির্ভূত ইয়াগিস্তানে তিনি তাঁর সংগঠনের কেন্দ্র স্থাপন করেন। এখান থেকেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র, অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা চলে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে সমর্থন আদায়ের জন্য তিনি মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ ও আফগান শাসকদের কাছে প্রেরণ করেন এবং নিজে তুরস্ক সরকারের সাথে যোগাযোগের জন্য হেজাজ গমন করেন। হেজাজের তুর্কী শাসক গালিব পাশা ও তুরস্কের সেনাবাহিনী প্রধান আনওয়ার পাশার সাথে তিনি ১৯১৬ সালে ভারত ও অন্যান্য মুসলিম

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্র থেকে ইংরেজ বিতাড়নের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯১৬ সালের আগস্ট মাসে শায়খুল হিন্দ ও গালিব পাশার মধ্যে সমঝোতা সংক্রান্ত একটি চিঠি ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে। রেশমী কাপড়ে লেখা এ চিঠির সূত্র ধরে শায়খুল হিন্দকে পাঁচ বছরের জন্য মাল্টা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী দেশ থেকে বহিষ্কৃত হন। এ সময় শায়খুল হিন্দের আন্দোলনের প্রভাব বাংলাদেশেও ব্যাপক ছিল। তার প্রমাণ হিসেবে সে সময় এদেশের বিভিন্ন স্থানে উচ্চারিত হচ্ছিল:

"মুসলমানের শেখুল হিন্দ বন্দী আছে মাল্টাতে;
চল খেলাফত উদ্ধারে, মুসলমানী যেতে বসেছে।"

শায়খুল হিন্দ ১৯২০ সালের ১২ মার্চ মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে খিলাফত আন্দোলনের মাধমে আযাদী সংগ্রামে যোগ দেন। সে বছরই তার ইন্তিকাল হয়।

শায়খুল হিন্দের ইন্তিকালের পর দেওবন্দকেন্দ্রিক এ বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (১৮৭৯-১৯৫৭) ও মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (১৮৮৭-১৯৪৯)। ১৯১৮ সালে এই সংগ্রামী আলেমদের নেতৃত্বেই অবিভক্ত ভারতের আলেমদের সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের প্রতিষ্ঠা হয়। জমিয়তের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনেই সর্বপ্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তার দশ বছর পর কংগ্রেস ১৯২৯ সালে এবং সতেরো বছর পর মুসলিম লীগ ১৯৩৬ সালে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

দেওবন্দকেন্দ্রিক আযাদী আন্দোলনের ধারার সাথে মওলানা হাসরাত মোহানী, মওলানা আযাদ সোবহানী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী, মওলানা মুহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলীর পাশাপাশি মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, পীর বাদশাহ মিয়া, মওলানা আকরাম খাঁ, মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী, মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী'র মতো বাংলার নেতৃস্থানীয় সংগ্রামী আলেমগণ শামিল ছিলেন।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার মুসলমানদের জাগরনে ফুরফুরার পীর সাহেব মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক (১৮৪৭-১৯৩৯) বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, সাহিত্য সাংবাদিকতা, রাজনীতি তথা সকল দিক দিয়ে বাংলায় মুসলিম জাগরণের জন্য তিনি কাজ করেন। তাঁর প্রেরণায় বহু ধর্মীয় গ্রন্থ অনূদিত হয়। তৎকালীন গ্রাম-বাংলার স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের প্রিয় সাময়িকী 'মুসলিম হিতৈষী' ছাড়াও তিনি 'মিহির ও সুধাকর', 'ইসলাম প্রচারক','নবনূর', 'ইসলাম দর্শন', 'হানাফী', 'মোহাম্মদী', 'শরীয়তে ইসলাম', 'ছুন্নাতুল জামায়াত', 'হেদায়েত', 'ছোলতান' প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। দীনী সভা সমাবেশের মাধ্যমে মুসলিম জাগরণের কাজ করার পাশাপাশি তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার মুসলমানদের মধ্য থেকে শির্ক, বিদ্আত, কুসংস্কার দূর করা এবং পাশ্চাত্য ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব থেকে তাদেরকে রক্ষার জন্য তিনি আন্দোলন পরিচালনা করেন তাঁর সামাজিক ও দীনী আন্দোলন গ্রাম-বাংলার জনগণের মধ্যে এবং একই সথে আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও প্রফেসর আব্দুল খালেকের মতো ব্যক্তিগণ তাঁর খলিফা ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

বাংলার মুসলমানদের আযাদী আন্দোলনে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। বাংলার প্রায় সব মুসলমান নেতা মুসলমানদের রাজনৈতিক সমর্থন লাভের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন। এমন কি গান্ধী, সি. আর. দাস ও মওলামা মোহাম্মদ আলী তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে অনুরোধ করেছেন। দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রশ্নে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা-আসাম গঠন করেন। বাংলা, আসাম ও ভারতের লাখ লাখ মুরিদকে সাথে নিয়ে তিনি মুসলিম লীগকে সমর্থন করেন। বাংলা-আসামে মুসলিম লীগের অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয়তা সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। বাঙ্গালি মুসলমানদের মধ্যে তিনি পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থনের সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করেন। বাংলার আলেম সমাজ তাঁর দ্বারা বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত হন। ইসলামী শরীয়তবিরোধী আইন পাশ হতে দেখে তিনি আইন পরিষদে ইসলামপন্থী দীনদার মুসলমান ও আলেমদের পাঠানোর প্রয়োজন অনুভব করেন। আলেমদেরকে তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন।

লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার মাত্র এক বছর আগে মওলানা আবুবকর সিদ্দিক ইন্তিকাল করেন। এর পর মরহুমের খলীফা শর্ষিনার পীর মওলানা নেছারউদ্দীন আহমদ (১৮৭২-১৯৫২), সূফি সদরুদ্দীন, মওলানা রুহুল আমীন (১৮৮১-১৯৪৫), অধ্যাপক আবদুল খালেক, ডক্টর মুহাম্মদ শাহীদুল্লাহ(১৮৮৫-১৯৬৯), মওলানা মুয়েজউদ্দীন হামিদী এবং মরহুমের জ্যেষ্ঠপুত্র মওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী পাকিস্তান আন্দোলনের বাণী বাংলা ও আসামের ঘরে ঘরে জনপ্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দে ভারত বিভাগ ও দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রশ্নে তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। একদল আলেমের বক্তব্য ছিল, যে মুসলিম জাতি সারা ভারত শাসন করেছে তারা কেন ভারতের দুঅংশে দুটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড নিয়ে তুষ্ট থাকবে? আরেক দল আলেম হিন্দু মানসিকতা সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে শাহ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তায় উদ্বুদ্ধ আল্লামা ইকবালের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে আসেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে খণ্ড ভারতের যৌক্তিকতা প্রমাণ এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী জোরদার করতে আলেম সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা পালনের প্রয়োজন এ সময় জরুরী হয়ে ওঠে। মিস্টার শ্রেণীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের দ্বারা পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে তা ইসলামী হবে কিনা সে প্রশ্নে জনগণের দোদুল্যমানতা দূর করার প্রয়োজনেই ১৯৪৫ সালে কলিকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে দারুল উলু দেওবন্দের সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানীকে সভাপতি করে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম গঠন করা হয়। ফলে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ দ্বিখণ্ডিত হয়। মওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানীর নেতৃত্বে ওলামায়ে হিন্দ অখণ্ড ভারতের সমর্থনে ও মওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানীর নেতৃত্বে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম পাকিস্তানের সমর্থনে আযাদী আন্দোলনে অংশ নেয়। সে সময় মওলানা আশরাফ আলী থানবী (১৮৬২-১৯৪৩) মওলানা যাফর আহমদ ওসমানী (১৮৮৭-১৯৭৪) মওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী, মওলানা ইহতেশামুল হক থানবী, মওলানা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, মওলানা যাফর আহমদ আনসারী, শর্ষিনার পীর সাহেব মওলানা নেছারুদ্দী আহমদ, ফুরফুরার পীর সাহেব মওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী,

www.nagorikpathagar.org

মওলানা আতাহার আলী (১৮৯৪-১৯৭৬), মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৫-১৯৬৯), পীর বাদশাহ মিয়া, মওলানা মুফতি দ্বীন মোহাম্মাদ খান (১৯০০-১৯৭৪), মওলানা আবদুল আলী ফরিদপুরী প্রমুখ বিশিষ্ট আলেমগণের সক্রিয় সমর্থন ও অংশ গ্রহণের ফলে পাকিস্তান প্রশ্নে জনমনে সব দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে এবং আন্দোলনে প্রবল গতি সঞ্চার হয়। সিলেটের গণভোটের প্রাক্কালে মওলানা যাফর আহমদ ওসমানী ও মওলানা সোলায়মান নদভীকে সাথে নিয়ে মওলানা আতাহার আলী পাকিস্তানের পক্ষে বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলেন। শর্ষিনার পীর মওলানা নেছারউদ্দীন আহমদও পাকিস্তানের পক্ষে সিলেটবাসীর সমর্থন আদায়ের জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বহু ভক্তসহ সিলেটে পাঠান। এ সময় উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের শক্তিশালী ঘাঁটি সিলেট পাকিস্তানভূক্ত হতো কিনা সংশয় ছিল। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে, মসজিদ মাদ্রাসায়, স্কুল-কলেজে. ধর্মীয় সভা-সম্মেলনের পাকিস্তানের পক্ষে আওয়াজ ওঠে। পাকিস্তান দাবি বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে।

আযাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের এই বলিষ্ঠ ধারাটি বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে শুধু রাজনৈতিকভাবে জাগ্রত করেনি, তাদরেকে স্বতন্ত্র জাতীয়বোধে উদ্বুদ্ধ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য-সাংবাদিকতার দিক থেকে অগ্রসর করেছে। আলেমগণ রাজনৈতিক সংগঠন করেছেন, সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা করেছেন, বইপত্র রচনা করেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছেন। তাঁরা মুসলিম সমাজে বহু আলেম, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক তৈরিতে অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশের বহু আলেম একাধারে জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার সাথে সম্পর্ক রেখেছেন, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, প্রজাদের সংগঠিত করেছেন, জমিয়ত, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগে কাজ করেছেন। তাদের ভূমিকা শুধু জনগণকেই সচেতন করেনি, মুসলিম লীগকে সংগ্রামে, সাহসে উজ্জীবিত করেছে। জাতীয় রাজনীতিতে ইংরেজ আনুগত্যের ভাব দূর করতে এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে ইসলাম প্রশ্নে ওয়াদাবদ্ধ করতেও তাদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

মুসলিম লীগের দাবি ও লীগ নেতৃত্বের চরিত্র সম্পর্কে সচেতন শর্ষিনার পীর সাহেব মওলানা নেছারউদ্দীন আহমদ জিন্নাহকে লেখা এক চিঠিতে বলেন : "মুসলিম লীগ আজ যতখানি রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই পরিমাণ ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করিতে সমর্থ হয়নি। এই কারণে জনসাধারণ 'পাকিস্তান' শব্দ বারবার শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিলেও উহা তাহাদের কতখানি আপনার জিনিস উহা তাহারা শুধু রাজনৈতিক সুবিধা লাভের ভিতর দিয়া ভাল বুঝিতে পারে না– তাহারা উহা বুঝিতে চাহে ধর্ম ও নৈতিক উন্নতির স্বীকৃতির ভিতর দিয়া এবং উহা কার্যত কিভাবে আরম্ভ হইয়াছে তাহাও কাজের ভিতর দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে।" (আযাদী আন্দোলনে আলেম সমাজ– পৃ. ১০৫)

এ জাতীয় প্রশ্নের জবাবেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র এর অর্থ কাঠামো ও সমাজ ব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক হবে বলে বার বার ওয়াদা দিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

১৬.

অবিভক্ত ভারতে জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য মুসলিম লীগ ছিল একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে, ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ নীতিগতভাবে সামঞ্জস্যশীল পরস্পরবিরোধী শক্তিসমূহের একটি ছত্র সংগঠন বা Umbrella Organization. সাধারণ অর্থে এটি কংগ্রেসের অনুরূপ কোন রাজনৈতিক দল ছিল না। স্বতন্ত্র সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটি ছিল একটি জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন। এই দলের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন সামন্ত প্রভু, শিল্পপতি, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, আলেম, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক সকল স্তরের মানুষ। সুমহান এক অভিন্ন লক্ষ্য অভিজাত ও সাধারণ মানুষকে একাকার করেছিল। পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্য দৃষ্টিসীমায় উপনীত হলে মিয়া ইফতেখারের মতো সমাজতন্ত্রী এবং দানিয়েল তীফীর মতো চরমপন্থীরাও লীগের সামিয়ানাতলে সমবেত হয়েছিলেন। নিজস্ব আবাসভূমি অর্জনের সুতীব্র প্রেরণা বাঙ্গালি- পাঞ্জাবী সকলকে এক হয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। গৌরবময় অতীতের আলোকে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত রচনার লক্ষ্যে পাকিস্তান ইস্যুই মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে মুসলিম লীগের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

পাকিস্তান লাভের পর সদ্যস্বাধীন দেশের পূনর্গঠনে এই দল এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়। লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত মুহাজিরের পাকিস্তানে আগমনের ফলে সদ্যস্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা তীব্রতর হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্যতা ও দক্ষতার ওপর নির্ভর করে এই সঙ্কট মোকাবিলা করা অসম্ভব বিবেচনা করে জিন্নাহ ব্রিটিশ-ভারতের কাছ থেকে উত্তরধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভাইস রিগাল সিস্টেমের অধীনে গভর্ণর জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। এখান থেকেই পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিতে সর্বাধিক শক্তিশালী ও স্থায়ী উপাদানরূপে আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা লাভের সূচনা হয়। দলের সভাপতির দায়িত্ব ছেড়ে জিন্নাহ গভর্ণর জেনারেল হন এবং চৌধুরী খালিকুজ্জামানের 'দুর্বল কাঁধে' ন্যস্ত হয় দলীয় সংগঠনের দায়িত্ব। সংগঠক থেকে তিনি হন সভাপতি। দলের আভ্যন্তরীন সমর্থন বঞ্চিত উত্তর প্রদেশ থেকে আগত এই সভাপতি তাঁর করাচীর বাড়ির সামনে মুহাজিরদের এক সাধারণ বিক্ষোভের পর দায়িত্বে ইস্তফা দেন। তারপর যাঁরাই এ দায়িত্বে এসেছেন, দায়িত্বের প্রতি সুবিচার করার 'সুযোগ' পাননি। সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রের পুনর্গঠন কাজে জিন্নাহকে অধিক গুরুত্ব দিতে হয় বলে দলীয় পূনর্গঠনের কাজ শুরু থেকেই মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে দলের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী রচনা করা হয় করাচীতে অনুষ্ঠিত এক গোপন কাউন্সিল সভায়। গভর্ণর জেনারেলের সরকারি ভবন থেকে প্রেস নোট আকারে নীতি নির্ধারণী বক্তব্য প্রচারের মাধমে অগণতান্ত্রিকতার সূচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে গঠিত প্রধান সিদ্ধান্তকারী সংস্থা 'কনভেনশন' পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম দশ বছরেও কোন বৈঠকে মিলিত হয়নি। প্রথম নয় বছরে দলের নির্বাচিত নীতি নির্ধারণী সংস্থা 'কাউন্সিল' মাত্র সাতটি বৈঠকে মিলিত হয়। সরকারি অনুমোদন পাবে না এমন কোন প্রস্তাব তোলার সাহস দলের ওয়ার্কিং কমিটির ছিল না। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গঠিত কনসেম্বলী স্বৈরাচারী উপায়ে বিলুপ্ত হবার আগ পর্যন্ত চার বছরে মাত্র তিনটি অধিবেশনে মিলিত হয়ে প্রচারসর্বস্ব কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম লীগ নেতৃত্বের এক বিরাট প্রভাবশালী অংশের পাকিস্তানে কোন নির্বাচনী এলাকা ছিল না। মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশ থেকে আগত ব্যক্তিগত প্রভাব- নির্ভর এসব ত্যাগী নেতার অনেকেই সাধারণ নির্বাচনের গণ রজনীতির চাইতে প্রাসাদ রাজনীতিতে বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

আঠারো বছর বয়সোত্তীর্ণ যে কোন পাকিস্তানী মুসলিম নাগরিকের মুসলিমলীগ দলীয় সদস্য হবার বিধান গঠনতন্ত্রে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু এক শ্রেণীর নেতা পূর্ব পাকিস্তানের দলের রশীদ বই বগলদাবা করে 'মুসলিম লীগের দরজা জনগণের মুখের ওপর বন্ধ করে দেন'। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ লিয়াকত আলী খান ও সরদার আবদুর রব নিশতারের মতো পাঁচজন অস্থানীয় নেতাকে এলাকার আসন ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু মুসলিম লীগের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় এই এলাকায় অবলম্বিত পেড়ামাটি নীতির ফল হিসেবে এখান থেকেই শক্তিশালী বিরোধী দলরূপে আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্ভব ঘটে। চুয়ান্নর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের পিছনে এই কারণ ছিল সক্রিয়।

দলীয় কাউন্সিল ও জিন্নাহর নীতি লংঘন করে এক শ্রেণীর নেতা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুসলিম লীগকে দেশের একক জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে প্রচার করেন। মুসলিম লীগের বিরোধিতা মানেই পাকস্তিানের বিরোধিতা এবং পাকিস্তানের বিরোধিতা মানেই ইসলামের বিরোধিতা এমন একটি ধারণা সৃষ্টিরও প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

মুসলিম লীগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোয় সামন্ত প্রভু ও শিল্পপতিদের প্রাধান্যের কারণে দল ও দেশবাসীর কাছে দায়িত্বশীল হবার পরিবর্তে সরকার গণবিরোধী ভূমিকায় লিপ্ত হয়। সরকারের নীতি ও কর্মসূচীর ব্যাপারে দলের কাছে দয়িত্বশীল থাকার গণতান্ত্রিক রীতিনীতি লংঘিত হয়। ১৯৪৯ সালে লিয়াকত অলী খান দলীয় কাউন্সিল অধিবেশনে তাঁর সরকারের নীতি ও কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া দলের কাছে সরকারের কাজ সম্পর্কে জবাবদিহির দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। দলের গঠনতন্ত্র রদবদল করে দলীয় সভাপতি ও দেশের প্রধানমন্ত্রী একই ব্যক্তি হবার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। কেন্দ্রের দেখাদেখি প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রীরাও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতির আসনে চেপে বসেন। ফলে সরকারের দায়িত্বহীনতা চরম হয়। দলের মাধমে জনগণের দাবি সমর্থিত হবার সুযোগ না থাকায় জনগণের সাথে দলের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। দলীয় কাঠামোর মাধ্যমে জনমত উপলব্ধি করার সুযোগ না থাকায় সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন, সমগ্র জাতিকে তার মাশুল দিতে হয়।

বিরোধী মতের লোকদের সাথে আচরণে মুসলিম লীগারদের দায়িত্বহীনতা সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল গঠনের কথা বলায় কাউকে তারা 'হিন্দুস্তানের লেলিয়ে দেয়া পাগলা কুত্তা' বলে গাল দেন। মুসলিম লীগের সাথে ভিন্নমত পোষণের কারণে লাহোর প্রস্তাব ও দিল্লী প্রস্তাবের উত্থাপক যথাক্রমে শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর মতো পাকিস্তান আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের দেশদ্রোহী ও বিদেশী চর আখ্যা দেয়া হয়। এতে দেশের প্রকৃত শত্রুরাই উৎসাহিত ও লাভবান হয়। বহু রাজনৈতিক কর্মীকে মতপার্থক্যের কারণে কম্যুনিস্ট আখ্যায়িত করে জেলে ঢুকানো হয়। তাঁরা জেলের ভিতর সত্যিকার কম্যুনিস্টদের কাছে সবক নিয়ে বেরিয়ে আসেন।

www.nagorikpathagar.org

পাকিস্তান ইস্যুতে বিভিন্ন স্বার্থকামী গোষ্ঠী ও আঞ্চলিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। স্বাধীনতার পর দলীয় কর্মসূচির মাধ্যমে এসব পরস্পরবিরোধী- গোষ্ঠী স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্বার্থের সমন্বয় ও 'আর্টিকুলেট' করতে মুসলিম লীগ ব্যর্থ হয়। ফলে অভিজাত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। দলীয় নেতৃত্বে অভিজাত শ্রেণীর একচেটিয়া প্রভাব সাধারণ মানুষকে হতাশ করে। 'প্রতি বছর দুই আনা চাঁদা দিয়ে পাকিস্তান মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে একমত পোষণের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী' লাখ লাখ সদস্যকে প্রতিশ্রুত 'ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের' নির্মাতারূপে গড়ে তোলার কোন কর্মসূচি মুসলিম লীগের ছিল না। মুসলিম জাতীয়তাবাদের শ্লোগানের সাথে ইসলামী আদর্শবাদের সংযোগ না ঘটায় দলের নেতা ও কর্মীদের কথা আর কাজে বিরাট গরমিল পরিলক্ষিত হয়। ফলে জনগনের উৎসাহ ও সমর্থনকে ধরে রাখতে বা সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে মুসলিম লীগ ব্যর্থ হয়।

পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, গণতন্ত্র ও ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা, সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার ও ন্যায্য স্বার্থরক্ষা ইত্যাদি শ্লোগানধর্মী কথাবার্তা মুসলিম লীগ বারবার উচ্চারণ করেছে কিন্তু জনগণের মৌলিক সমস্যা সমাধানের কোন কর্মসূচি পেশ করেনি। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার শ্লোগানে পকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে জনগণকে উজ্জীবিত ঐক্যবদ্ধ করলেও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের কোন কর্মসূচী তাদের ছিল না। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি ১৯২৭ সালেই ভারতের জন্য সংবিধানের একটি ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে। কিন্তু 'আল-কুরআনই হবে পাকিস্তানের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র' এই সস্তা অথচ জননন্দিত শ্লোগান ছাড়া পাকিস্তানের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের কোন নীলনক্সা মুসলিম লীগের হাতে ছিল না। শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজেদের উপযোগী করে ঢেলে সাজানোর জন্য কংগ্রেস বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নেতৃত্বে 'ওয়ার্ধা স্কীম' নামে একটি প্রকল্প বহু আগেই হাতে নেয়। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শ ও লক্ষ্য অনুসারে ভবিষ্যত নাগরিক সৃষ্টির উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের কোন চিন্তা-ভাবনা মুসলিম লীগ করেছে বলে জানা যায় না। কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বাধীনতার আগেই ভারতের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ ব্যবস্থার লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র বছর খানেক আগে লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বে গঠিত লক্ষ্যবঞ্চিত অর্থনৈতিক কমিটি স্বাধীনতার পরও অর্থনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেয়া দূরে থাক, একটা উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যন্ত পেশ করতে পারেননি। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে এই কমিটি ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

পশ্চিম পাকিস্তানের সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক কাঠামোগত কারণে মুসলিম লীগ সকল দুর্বলতা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও কিছু বেশি সময় সেখানে রাজনৈতিক প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পটভূমি ভিন্নতর হবার কারণে উপমহাদেশের মুসলিম পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে এখানকার উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষা, চাকরি, রাজনৈতিক সচেতনতা ও উচ্চাভিলাষে অগ্রসর ছিল। তাদের দাবি সমর্থন ও তা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় এই শ্রেণীর সাথে মুসলিম লীগের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়। '৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এই এলাকায় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের অবসান ঘটে। ব্যাপক গণসমর্থনের ভিত্তিতে স্বাধীনতা আনয়নকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ মাত্র সাত বছরের মধ্যে পাকিস্তানের তিনটি প্রধান দলের একটিতে পরিণত হয়। পূর্বাঞ্চলে

www.nagorikpathagar.org

নির্বাচনী পরাজয় এবং পশ্চিমাঞ্চলে সামন্ত অভিজাতদের দ্বারা ক্ষমতা কুক্ষিগত হবার কারণেই গোলাম মোহাম্মদের পক্ষে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে নাজিমুদ্দীনের অপসারণ ও আইন পরিষদ বাতিল করা সম্ভব হয়।

স্বাধীনতার পর দলের পুনর্গঠন কর্মসূচিকে গুরত্ব প্রদানে ব্যর্থতা এবং সুসংহত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জাতীয় ভিত্তিক ও গণভিত্তিক দল রূপে গড়ে ওঠার ব্যর্থতা স্বাধীনতা আনয়নকারী মুসলিম লীগের সকল কৃতিত্ব ম্লান করে দেয়। দলের অভ্যন্তরে নিজস্ব আদর্শভিত্তিক সিস্টেম চালু না করতে পারার দরুণ এর কর্মী ও নেতারা ডান, বাম, চরম ও নরম ধারায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। নেতা হবার লোভে বহু জাঁদরেল কর্মী সেক্যুলার পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়েন। এভাবে নানা উপ সংস্কৃতির ধারক হিসেবে মুসলিম লীগের ভিতর থেকে বহু রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে আদর্শিক কিংবা রাজনৈতিক প্রতিরক্ষার কোন ধারা অবলম্বিত হয়নি। ফলে জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে জাতিসত্তা গড়ে তুলতে এ দল ব্যর্থ হয়। এ দলের আদর্শিক বিভ্রান্তি ও ব্যর্থতা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ বিলম্বিত করে। ফল পাকিস্তানবিরোধী প্রচারণার পথ প্রশস্ত হয়। মুসলিম লীগের সামগ্রিক ব্যর্থতা দেশে সামরিক শাসন ডেকে আনে। স্বৈরাচারের দশক পাড়ি দিয়ে জাতি মুসলিম লীগের ভুলের আবর্জনা মাথায় নিয়ে দ্রুত বিচ্ছিন্নতার পথে অগ্রসর হয়। সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র সে বিচ্ছিন্নতাকে ত্বরান্বিত করে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথ রুদ্ধ করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষকে অনিবার্য করে তোলে।

১৭.

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই ইসলামী শাসনতন্ত্র বাস্তবায়নের দাবিতে আলেম সমাজ সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মওলানা নেছারউদ্দীন আহমদের উদ্যোগে শর্ষিনায় এক ওলামা সম্মেলনে ইসলামী আইন অনুযায়ী সরকার গঠন, ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং বিচার ব্যবস্থা ইসলামীকরণের দাবি জানান হয়। পূর্ব বাংলার আলেম ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ সম্মেলনে যোগ দেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই মওলানা আতাহার আলী, পীর বাদশাহ মিয়া প্রমুখ বাংলার শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী সংগ্রামী আলেমদের নেতৃত্বে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি ইসলামী শাসনতন্ত্র বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৫০ সালে আল্লামা সোলায়মান নদভীর সভাপতিত্বে করাচীতে পাকিস্তানের সকল মতের ৩১ জন নেতৃস্থানীয় আলেমের সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি গৃহীত হয়। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে গৃহীত আদর্শ প্রস্তাব ও মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে দেশের ভাবী শাসনতন্ত্রে কুরআন ও সুন্নাহর পূর্ণ স্বীকৃতি আদায়ের ব্যাপারে মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর নেতৃত্বে এসময় বাংলাদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের দাবি জোরদার হয়। পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র বাস্তবায়ন প্রশ্নে মুসলিম লীগের ওয়াদা ভঙ্গ ও প্রতারণামূলক নীতির প্রতিবাদে মাওলানা আতাহার আলী ও পীর বাদশাহ মিয়ার নেতৃত্বে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেযামে ইসলাম পার্টি '৫৪-র নির্বাচনে হক-ভাসানীর সাথে যুক্তফ্রন্টে যোগ দেন। তাঁদের যোগদানের ফলে যুক্তফ্রন্ট

www.nagorikpathagar.org

শক্তিশালী হয়। ১৯৫৫ সালে মওলানা কাফীর উদ্যোগে পাবনায় বিভিন্ন ইসলামী দলের প্রতিনিধিদের সমবায়ে এক ঐতিহাসিক ইসলামী ফ্রন্ট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য স্থাপনেরও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি 'পাকিস্তানের শাসন সংবিধান' নামে এ সময় একটি বই লিখেন। ১৯৬০সালে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের এই সংগ্রামী নেতা পাকিস্তানকে শোষণহীন ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। মওলানা আতাহার আলী ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন ইসালামী ধারা সংযোজনের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানের দুই অংশের ইসলামী নেতৃবৃন্দই স্বাধীনতার পর থেকে ইসলামী শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের শুরু থেকে শেষ তক্ এ আন্দোলন অব্যাহত ছিল। বাংলার মুসলিম জাগরণে ইসলামী শাসনতন্ত্র বাস্তবায়নের দাবিটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবির মধ্য দিয়ে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের দিকগুলো জনগণের সামনে উচ্চারিত হয়। 'ইসলামী নেযাম', ইসলামী হুকুমত', ইসলামী শাসন','হুকুমতে রব্বানীয়া' প্রভৃতি শব্দগুলো জনগনের মাঝে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবিতে জনগণকে সংগঠিত করার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষনীতি প্রবর্তন ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনা করেন। ইসলামী সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সংরক্ষণ ও প্রসার, ইসলামী রচনা ও চেতনা সৃষ্টি বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব রোধ, শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ইসলামপন্থী নেতৃবৃন্দ অবদান রাখেন। মওলানা আতাহার আলী, মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, মওলানা তাজুল ইসলাম, মওলানা মুশাহিদ আলী, মওলানা মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খান প্রমুখের ইসলামী সংস্কার প্রচেষ্টা বাংলার জনগণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করে। মওলানা আকরম খাঁ, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ, কবি ফররুখ আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ড. হাসান জামান, মওলানা ফজলুল করীম, মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী প্রমুখের রচনাও ইসলামী চেতনা সৃষ্টিতে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে। তমদ্দুন মজলিস, জমিয়তে আহলে হাদীস, নেযামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী, তবলীগ জামাত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ইসলামী চেতনা জাগায়। এর মধ্যে তমদ্দুন মজলিস মুসলমানদের নিজস্ব আবাসভূমির চাহিদা অনুযায়ী একদল সাংস্কৃতিক কর্মী সৃষ্টিতে অবদান রাখে। জামায়াতে ইসলামী শাসনতন্ত্রের আন্দোলনের সাথে সাথে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ করে এবং আধুনিক শিক্ষিত ছাত্র-যুবকদের মধ্যে ইসলামের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করে।

জাতীয় ও ইসলামী চেতনা বিকাশে কিংবা ইসলামী শাসনতন্ত্র, শিক্ষানীতি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কিংবা জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্যের প্রচারসহ জাতি গঠনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে মুসলিম লীগের কোন উৎসাহ ছিল না। ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের অন্তিম মুহূর্তে 'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' নামক বই প্রকাশ কিংবা বিএনআর- এর মাধ্যমে প্রকাশিত বিপুল সংখ্যক ইসলামী ও জাতীয় চেতনামূলক বইপত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বাংলার মুসলমানদের কোন কাজে লাগেনি।

www.nagorikpathagar.org

১৮.

আযাদী সংগ্রামে বাংলাদেশ ছিল ভারতীয় মুসলমানদের 'মুক্তির দুর্ভেদ্য দুর্গ' এবং পাকিস্তান আন্দোলনের 'মূল শক্তি- কেন্দ্র'। কিন্তু মুসলিম জাগরণের মাধ্যমে সৃষ্ট পাকিস্তানে প্রতিশ্রুত ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতারণা, ইসলামের শোষণ মুক্ত সমাজ গঠনে অনীহা এবং মুসলমানদের বিভিন্নমুখী প্রত্যাশার সাথে কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর সংঘাতের ফলে পাকিস্তানের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অঞ্চল এক নাজুক সংগ্রামের পথে পরিচালিত হয়। সিকি শতকেরও কম সময়ের ব্যবধানে নয় মাস স্থায়ী এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্ব ঘোষণা করতে সাধ্য হয়। বাংলাদেশের মুসলমানদের এ সংগ্রাম ও যুদ্ধ কারো কারো কাছে রাষ্ট্রের ধ্বংস এবং তার জনগণের দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক জাতি-স্বাতন্ত্র নস্যাতের সুযোগ বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মাধমে বাংলার মুসলমানরা পৃথক স্বাধীন দেশ কায়েম করে দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক লাহোর প্রস্তাবের মূল কাঠামোতে প্রত্যাবর্তন করে। শতকরা ৯৭ ভাগ মুসলমান মুক্তিযোদ্ধা পরিচালিত বাংলাদেশের এ মুক্তিযুদ্ধ ছিল পশ্চিমা স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে, ইসলাম কিংবা 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' ভিত্তিক মুসলিম জাতীয় স্বাতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু স্বাধীনতার পরপরই এ ব্যাপরে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টির চেষ্টা চলে। বাংলার মুসলিম জাগরণের দীর্ঘ সংগ্রামী গতিধারাকে পাল্টে দেয়ার জন্য মুসলমানদের জীবন থেকে তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো উৎখাত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। স্বাধীনতার পরপরই ঈদুল আযহা প্রাক্কালে কুরবাণীর বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রচার করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ধরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কুরআনের বাণী প্রচার করা হলেও স্বাধীনতার পর 'বাংলাদেশ বেতারে' কুরআন তিলাওয়াত, সালাম, খোদা হাফেজ বন্ধ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসগুলো মনোগ্রাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামের কুরআনের আয়াত মুছে ফেলা হয়। এমনকি দৈনিক পূর্বদেশের এক উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে সে সময় জু'মার খুতবা ও নামায শেষে মুনাজাতে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখার অভিযোগ করা হয়। আযানের সময় কথা বার্তা-বক্তৃতা বন্ধ রাখার ঐতিহ্য এখানে দীর্ঘ দিনের। অথচ স্বাধীনতার পরপর কোন কোন জনসভায় বক্তৃতা চলাকালে আযান দিতে গিয়ে মুয়াজ্জিনগণ বাধাপ্রাপ্ত হন। বিভ্রান্তির সে চোরাবালিতে দাঁড়িয়েই দাউদ হায়দার রচনা করে মহানবী (স.)-এর বিরুদ্ধে এক চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ কবিতা। এসব ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের 'এন্ডার স্টেটসম্যান' আবুল মনসুর আহমদের ভাষায়, "সে বিভ্রান্তি পাকিস্তানের পরিণাম, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জাতীয় স্বকীয়তা, ধর্ম নিরপেক্ষতা ইত্যাদি সকল ব্যাপারে পরিব্যাপ্ত ছিল। ফলে তাঁদের (নেতৃত্ব) মধ্যে এমন ধারণারও সৃষ্টি হইয়াছিল যে, নিজেদের 'মুসলমান' ও নিজের রাষ্ট্রকে মুসলিম রাষ্ট্র' বলিতে সাধারণভাবে হিন্দুরা এবং বিশেষভাবে ভারত সরকার অসন্তুষ্ট হইবেন। এ ধারণা যে সত্য ছিল না, তা বুঝিতে যে রাজনৈতিক চেতনা ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, তরুণ আওয়ামী নেতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেরই তা ছিল না, ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বাংলাদেশকে মুসলিম রাষ্ট্র আখ্যা দিয়ে যে সদিচ্ছা প্রণোদিত প্রশংসা করিয়াছিলেন (১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর

www.nagorikpathagar.org

দিল্লীর রামদয়াল ময়দানে), অতি উৎসাহী 'ধর্ম নিরপেক্ষ' একজন অফিসার সে প্রশংসা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন সে হীনমন্যতা হইতেই। আমাদের রেডিও টেলিভিশন হইতে কোরআন তেলাওয়াত, আস্‌সালামু আলাইকুম ও খোদা হাফেজ বিতাড়িত হইয়াছিল এবং ওসবের স্থান দখল করিয়াছিল 'সুপ্রভাত', 'শুভসন্ধ্যা' ও 'শুভরাত্রি' এই কারণেই। বাংলাদেশের জনসাধারণ আমাদের স্বাধীনতার এই রূপ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল এমন পরিবেশেই।" (আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃ: ৫৮৮)।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তান ভাংগিয়া গিয়াছে, দ্বিজাতিতত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে' এটাকে 'সাংঘাতিক মারাত্মক বিভ্রান্তি' আখ্যা দিয়ে আবুল মনসুর আহমদ বলেন, "বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তানও ভাংগে নাই, 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' ও মিথ্যা হয় নাই। এক পাকিস্তানের জায়গায় লাহোর প্রস্তাব মত দুই পাকিস্তান হইয়াছে। ..... লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটার উল্লেখ নাই, শুধু 'মুসলিম মেজরিটি রাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। তার মানে রাষ্ট্র-নাম পরে জনগণের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়ার কথা। পশ্চিমা জনগণ তাদের রাষ্ট্রের-নাম রাখিয়াছে 'পাকিস্তান'। আমরা পুরবীরা রাখিয়াছি বাংলাদেশ। এতে বিভ্রান্তির কোন কারণ নেই"। (প্রাগুক্ত, পৃ ৬১৭)।

'সাংঘাতিক মারাত্মক' এই বিভ্রান্তির বিপদ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' যদি মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া থাকে, তবে '৪৭ সালের ভারত বাটোয়ারার আর কোনও জাষ্টিফিকেশন থাকিতেছে না। কোরিয়া, ভিয়েতনামে ও জার্মানির মতই ভারতেরও পূনর্যোজনার চেষ্টা চলিতে পারে। ভারতবর্ষের বেলা সে কাজে বিলম্ব ঘটিলেও বাংলার ব্যাপারে বিলম্বের কোন কারণ নাই।" (প্রাগুক্ত, পৃ: ৬১৫)।

হাজার বছর পরে বাংলাদেশ এই প্রথম স্বাধীন হয়েছে বলে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চলে তারও জবাব দিয়েছেন আবুল মনসুর আহমদ : "ইংরাজ আমলের দুইশ' বছর আজকার বাংলাদেশ ছিল কলিকাতার হিন্টারল্যান্ড। কাঁচা মাল সরবরাহের খামার বাড়ি। পঁচিশ বছরের পাকিস্তান আমলে এই খামারে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কিছু শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে ....। ইংরাজ আমলের দুইশ' বছর বাংগালি মুসলমানদের অন্ধকার যুগ।..... কিন্তু ইংরাজ আমলের আগের চারশ' বছরের বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস। সেখানেও তাদের রূপ বাঙ্গালির রূপ। সে রূপেই তারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। সেই রূপেই বাংলার স্বাধীনতার জন্য দিল্লীর মুসলিম সম্রাটের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে। সেই রূপেই বাংলার বার ভুঁইয়া স্বাধীন বাংলা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছিলেন। এই যুগ বাংলার মুসলমানদের রাষ্ট্রিক, ভাষিক, কৃষ্টিক, ও সামরিক, মনীষা ও বীরত্বের যুগ। সে যুগের সাধনা মুসলিম নেতৃত্বে হইলেও সেটা ছিল উদার অসাম্প্রদায়িক। হিন্দু-বৌদ্ধরাও ছিল তাতে অংশীদার। এ যুগকে পরাধীন বাংলার রূপ দিবার উদ্দেশ্যে 'হাজার বছর পরে আজ বাংলা স্বাধীন হইয়াছে' বলিয়া যতই গান গাওয়া, শ্লোগান দেওয়া হউক, তাতে বাংলাদেশের জনগণকে ভুলান যাইবে না। আর্য জাতির ভারত দখলকে বিদেশী শাসন বলা চলিবে না; তাদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত্র, কায়েস্তকে বিদেশী বলা যাইবে না, শুধু শেখ-সৈয়দ-মোগল- পাঠানদেরই বিদেশী বলিতে হইবে, এমন প্রচারের দালালরা পাঞ্জাবী দালালদের চেয়ে বেশি সফল হইবে না।" (প্রাগুক্ত পৃ: ৬১৯-৬২০)।

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাসের চাকা জোর করে পিছনে ঘুরানো যায় না। বংলাদেশের মুসলমানদের প্রতিরোধের মুখে 'অতি প্রগতিবাদী নেতৃত্বের সকল চেষ্টা অনতিবিলম্বে নস্যাত হয়ে যায়। বাংলাদেশের মুসলমানদের চেতনার প্রতীকরূপে রাজনীতির ময়দানে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং সাংস্কৃতিক ময়দানে আবুল মনসুর আহমদ এই প্রতিরোধ সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করে। সামাজিক ও দীনী ময়দানে মওলানা মুফতি দ্বীন মোহাম্মদ খানের নেতৃত্বে সংগ্রামী আলেম সমাজ মুসলিম জনগণের প্রতিরোধ চেতনাকে সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুসলমানদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিরোধ সংগ্রাম বাংলাদেশে মুসলিম জাগরণে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করে।

১৯.

মুসলিম জাগরণের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এসে বাংলাদেশে ইসলামী চেতনা এখন অনেক বেশি সংহত ও সংগঠিত। একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন বিধানরূপে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ এখন জনগণের কাছে অনেক বেশি স্পষ্ট। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে রসূল (স.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে বিধান বাস্তবায়নের আকাঙ্খা এখন প্রবলতর। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কুরআন শরীফের বেশ কয়েকটি তাফসীর, হাদীসের অনুবাদ, রসূল (স.)-এর বেশ কিছু সংখ্যক জীবনী গ্রন্থ, কুরআন হাদীসের এবং ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তির ওপর ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, সমাজতত্ত্ব, আইন প্রভৃতি বিষয়ে বিপুল সংখ্যক বই-পত্র প্রকাশিত হবার ফলে জনগণ সরাসরি কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার এবং রসূল (স.) এর প্রদর্শিত নীতি ও পথের সাথে পরিচিত হবার এবং সেভাবে নিজেদের জীবন গঠনের সুযোগ পেয়েছেন। তাফসীর ও হাদীস এবং অন্যান্য ইসলামী বই-পত্রের বিপুল কাটতি মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জাগরণের দিকনির্দেশক। কুরআন ও হাদীস চর্চা শুধু বইপত্রেই সীমিত নয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মসজিদে এবং ময়দানে নিয়মিত কুরআন তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ওয়াজ নসিহতের মাহফিল গুলোতেও আলেম সমাজ স্রষ্টা ও সৃষ্টির ব্যক্তিগত সম্পর্কে আলোচনায় সীমিত না থেকে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ এবং একমাত্র অনুসরণযোগ্য জীবন বিধানরূপে তুলে ধরছেন এবং সে বিধান বাস্তবায়নের পক্ষে জনমত সংগঠনে সক্রিয় রয়েছেন। আলেম সমাজে মযহাবী বিরোধ দূর হবার ফলে তাদের ভূমিকা এখন অনেক বেশি প্রভাব বিস্তারক। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইসলামের প্রচার, অধ্যয়ন, গবেষণা এবং বইপত্র রচনায় ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় এগিয়ে আসার ফলে ব্যাপক জনগণের মধ্যে জাগরণের প্রবল গতি সঞ্চার হয়েছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাশ্চাত্যমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহ, আলোচনা, অধ্যয়ন এবং ইসলামের পূর্ণ বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হচ্ছে।

ইসলামী বই-পত্রের বিপুল কাটতি, মসজিদ এবং বিভিন্ন ইসলামী সমাবেশে জনগণ বিশেষত তরুণদের উপস্থিতি বৃদ্ধি মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণের প্রত্যক্ষ ইংগিত। টংগীতে প্রতিবছর তাবলীগ সম্মেলনে দেশের প্রত্যন্ত এলাকার লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতি মুসলমানদের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সমাবেশ আরাফাতের দৃশ্যই স্মরণ করিয়ে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের দেড় লক্ষাধিক মসজিদকে মুসলিম সমাজের সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রে পরিণত করার ব্যাপারে আগ্রহ এবং তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব মসজিদের প্রায় তিন লাখ ইমাম, মুয়ায্যিনকে মুসলমানদের সামাজিক নেতা হিসেবে কার্যকর ভূমিকার উপযোগী করে তোলার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মসজিদ সমাজ ও মসজিদ মিশনের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও দীনী দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের সচেতনতা বাড়ছে। মুসলমানদের দীনি জীবনে নেতৃত্ব দান ছাড়াও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কৃষি, পশু পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইমামগণ সক্রিয় ভূমিকায় এগিয়ে আসছেন। জু'মার নামাযে আরবী ভাষায় খুতবা প্রচারের পাশাপাশি এখন বহু মসজিদে জনগণকে সে সাপ্তাহিক ভাষণ বাংলাতে বুঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ফলে মুসলমানদের সামাজিক জীবনে মসজিদের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারেও চেষ্টা চলছে। একাধিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কাজ শুরু করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স বিভাগে 'ইসলামিক ফিনান্স' সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতিসহ সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইসলামী বিষয় অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা চলছে। বেসরকারি কিন্ডার গার্টেন পর্যায়ে খ্রিষ্টানদের মিশনারী শিক্ষার ট্রাডিশনের মুকাবিলায় সারা দেশে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকশ' ইসলামী কিন্ডার গার্টেন স্কুল চালু হয়েছে। শিশু শিক্ষার জন্য ইসলামী আদর্শের ছাঁচে বই পত্র রচিত হচ্ছে।

ইসলামী গবেষণা ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ছাড়াও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব পালন করছে। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে বেশ কিছু বই-পত্র প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের ব্যাপারে ইসলামিক ইকনোমিক রিসার্চ ব্যুরো, বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রকাশনা প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করে চলেছে। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সম্পর্কে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঢাকায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেশ কিছু সেমিনার সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে এসব উদ্যোগের ফলে সুদমুক্ত ইসলামী লেনদেন ও ব্যবসায় বণিজ্য পরিচালনায় জনগণের আগ্রহ বড়ছে। বিভিন্ন সুদভিত্তিক ব্যাংকের সুদযুক্ত একাউন্টে টাকা রেখে সুদ নেয়া হয় না, এমন জমার পরিমাণ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাতশ' কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় বারোশ' কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এটা জনগণের হালাল লেনদেনের আগ্রহ বৃদ্ধিরই প্রমাণ।

স্বাধীনতার পর রাজধানী ঢাকার সাথে বিশ্বের যোগাযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। বাংলাদেশ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সক্রিয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। মুসলিম বিশ্বের সাথে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক বজায় রেখে মুসলিম বিশ্বের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে বিভিন্নমুখী আন্তর্জাতিক ইসলামী তৎপরতার সাথে জনগণ পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ লাভ করছেন। পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের এ সুযোগ বাংলাদেশের মুসলিম জাগরণে বলিষ্ঠতর এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।

www.nagorikpathagar.org

পাশ্চাত্য সভ্যতার অবক্ষয় ও মানব রচিত মতবাদসমূহের ব্যর্থতার পটভূমিতে বিশ্বব্যাপী ইসলামী উত্থান ও মুসলিম জাগরণ বাংলাদেশের জনগণকে বিপুলভাবে উৎসাহিত ও আলোড়িত করছে। বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের পূর্ণাংগ রূপ সম্পর্কে তাত্ত্বিক উন্নতি, সে আদর্শ বাস্তবায়নের সাংগঠনিক বিকাশ এবং আদর্শ বাস্তবায়নে জনগণের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এ যুগে বাংলাদেশের মুসলিম জাগরণের বৈশিষ্ট্য।

তথ্য সূত্র

১. ডক্টর এম, এ, রহীম : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

২. আবদুল মান্নান তালিব : বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০।

৩. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, ভারতী বুক ষ্টল, কোলকাতা, ১৯৮০।

৪. ডক্টর এ, কে, এম, আইয়ুব আলী : হিস্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামীক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাইন্ডেশন, ১৯৮৩।

৫. আবুল আলা মওদুদী : ইসলামী রেনেসাঁ আন্দেলন, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০।

৬. মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী : শাহ ওয়ালীউল্লাহর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯।

৭. সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ডি, এন, বি, এ, ব্রাদার্স, কোলকাতা, ১৯৮০।

৮. সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী : ঈমান যখন জাগলো, ইসলামীক ফাউন্ডেশন, ১৯৮১।

৯. আবদুল মওদুদ : মধ্যবিত্ত সামাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, ইসলামীক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২।

১০. ডব্লিই ডব্লিউ হান্টার : দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৫।

১১. মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লহ : আমাদের মুক্তিসংগ্রাম, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

১২. মেসবাহুল হক : পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলমান সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২।

১৩. পি, এন, চোপরা : রোল অব ইন্ডিয়ান মুসলিমস ইন কি স্ট্রাগল ফর ফ্রীডম, লাইট এন্ড লাইফ পাবলিকেশন্স দিল্লী, ১৯৭৯।

১৪. ড. হাসান জামান : শতাব্দী পরিক্রমা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪।

১৫. রফিউদ্দীন আহমদ : দি বেঙ্গল মুসলিমস, ১৮৭১-১৯০৬ : এ কোয়েস্ট ফর আইডেনটিটি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লী, ১৯৮১।

১৬. রওনক জাহান : পাকিস্তান : ফেল্যুর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন।

১৭. আবুল মনসুর আহমদ : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর।

১৮. জুলফিকার আহমদ কিসমতি : আযাদী আন্দোলনে আলেম সমাজ।

www.nagorikpathagar.org

নূরুল আলম রইসী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা

বাংলাদেশ পৃথিবীর ৪৫টি মুসলিম দেশের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ, যার জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান। অবশিষ্ট নাগরিক প্রধানত হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী।

এদেশটির বিস্তীর্ণ অংশ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে বিরাজমান। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, উত্তরে কিছু অংশ পশ্চিম বঙ্গ ও কিছু অংশ আসাম সীমান্ত বরাবর অবস্থিত আর পূর্বদিকে বার্মার সীমান্ত বরাবর বিস্তৃত। ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত প্রসারিত মুসলিম জাহানে বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঈসায়ী সপ্তম শতক থেকে ইসলামের সুমহান পয়গাম মানবতার সার্বজনীন আবেদন নিয়ে আরব ভূখণ্ড থেকে বাংলায় আসতে থাকেন আল্লাহর ওলি-দরবেশ। তৎকালে দেশ দেশান্তরে চলায় নৌপথই ছিল প্রধান নির্ভর, তাই বঙ্গোপসাগরের কূলঘেঁষা এলাকাতেই প্রথমে এবং পরে ক্রমাগত অভ্যন্তর ভাগে তাঁরাই ইসলামের বাণী পৌছাতে থাকেন। অন্যদিকে ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়, পরে মুসলিম শক্তির আরো বিস্তারে ভারতে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি প্রসার পেতে থাকে। প্রবহমান এই স্রোতধারায় তের শতকের শুরুতে বখ্‌তিয়ার খিলজি বাংলা জয় করেন।

বাংলার মানুষ ছিল দীর্ঘকাল অবহেলিত। এদেশের অনার্য দ্রাবিড় এই জনগোষ্ঠীর ভাষাও ছিল অপাংক্তেয়। বর্ণভেদ প্রথার প্রবক্তরা ঘোষণা করেছিলেন এ দেশের মানুষের ব্যবহারিক ভাষায় শাস্ত্র চর্চা পাপ; এ পাপের সাজা রৌঢ়ব নামক নরকবাস। বর্ণভেদ আর অস্পৃশ্যতার অভিশাপে মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর মানবতার সূর্যকে আড়াল করে রেখেছিল। মনুষ্যত্বের এই চরম দুর্দিনে একদিকে মুসলিম শাসনে মানবিক উদার দৃষ্টিভঙ্গী, অন্যদিকে ওলি- দরবেশগণের তৌহিদী পয়গামে সবাইকে আপন করে বুকে তুলে নেওয়ায় নিপীড়িত বাংলার মানুষ খুঁজে পেল মুক্তির পথ, আলোর সন্ধান। 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু নাই, মুহম্মদ মোস্তফা (স.) তাঁর রসূল' - কলেমার এই উদাত্ত দাওয়াত ছিল এদের কাছে যুগান্তকারী আহবান। কলেমা পাঠের মাধ্যমে এরা সবাই দাঁড়াল এক কাতারে, বিভেদের প্রাচীর ধ্বংস হলো। বহু শতাব্দীর জুলুম ও নিষ্পেষণে ক্লান্ত এদেশের মানুষ লাভ করলো মানব মর্যাদা।

তের শতকের শুরু থেকে আঠার শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিম শাসন ছিল বাংলায়। এ শাসন কখনো দিল্লীকেন্দ্রিক সুবেদারী, কখনো স্বাধীন সুলতানাত। মুসলিম শাসনকালে ইসলামী আদর্শের অনুশীলন ছিল প্রধানত ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। ওলি-দরবেশগণের দাওয়াতে আকৃষ্ট মুসলিম সমাজকে ইসলামী আদর্শে সুসংগঠিত করে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ইসলামী আদর্শে ঢেলে সাজানোর তৎপরতা ছিল না। অবশ্য মাঝে মাঝে কোনে কোনো সুলতানের আমলে বিচার ব্যবস্থায় ইসলামী শরীয়তের প্রবর্তন এই সময়কালের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বস্তুত আদর্শ যতই সুন্দর হোক সমষ্টিগতভাবে তাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর না করলে এই আদর্শ থেকে স্থায়ী ও ব্যাপক সুফল আশা করা যায় না।

www.nagorikpathagar.org

পলাশীর পরাজয় বাংলার আকাশে আনলো ঘন দুর্যোগ। মুসলিম সামাজ হারাল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা। অর্থনৈতিকভাবে এদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবার ষড়যন্ত্র সফল হয়েছিল। ডব্লিউ. ডব্লিউ হান্টার দি ইন্ডিয়ার মুসলমানস গ্রন্থে স্বীকার করেছেন, একশ' বছর আগে মুসলিম সমাজ দরিদ্র ও অভাবী এটা ছিল অচিন্তনীয়; কিন্তু একশ' বছর পর আজ মুসলিম সমাজ স্বচ্ছল ও বিত্তবান এটি অভাবনীয়। বস্তুত মুসলিম সমাজের এই চরম দুর্গতি ইংরেজ ও তার এদেশীয় দোসরদের গভীর ষড়যন্ত্রের ফল। শুধু বাংলাতে নয়, উপমহাদেশের সর্বত্রই মুসলিম সমাজের প্রায় একই অবস্থা। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির পরিবর্তন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বারবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু ছলে-বলে-কৌশলে গভীর ষড়যন্ত্রে এই তৎপরতা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। মনের পর্দায় ছবির মত ভেসে ওঠে পলাশীর প্রান্তর, বালাকোটের ময়দান, তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা, হায়দার আলী, ফতেহ আলী টিপুর প্রতিরোধ, ফকীর মজনু শাহ্ ও হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র তৎপরতা।

বাহ্য পরিচয় যাই থাকুক না কেন, শোষকের কোন জাত নেই। তারা সবাই শোষক এই তাদের পরিচয়। অপরের অধিকার হরণ করে নিজ স্বার্থসিদ্ধি তাদের চরম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য হাসিলের যে কোন হীন ও অমানবিক পন্থা অনুসরণে তাদের বিবেকে বাধে না। বাংলার বুকে এই শ্রেণীর মানুষ যুগে যুগে সৃষ্টি করেছে বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ, ঘরে ঘরে ক্রন্দন উঠেছে অন্ন-বস্ত্রের অভাবে। এরা কখানো অত্যাচারী শাসক, কখনো এদের পরিচয় প্রতাপশালী জমিদার নায়েব-গোমস্তা, মুৎসুদ্দী, সুদী মহাজন, সামন্তবাদী শাসক।

উপমহাদেশের নিপীড়িত মুসলিম সমাজের সাথে বাংলার মুসলমানও স্বপ্ন দেখল স্বাধীন বাসস্থানের। এমন দেশে যেখানে সামাজি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হবে নিশ্চিত; আর মুক্তির এই পথ ও নিশ্চয়তা আসবে মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের ঘোষণা মোতাবেক ইসলামের সুমহান আদর্শ অনুসরণে। ভারত বিভক্তির বিঘোষিত নীতিমালার প্রেক্ষিতে জনসমষ্টির ধর্মীয় পরিচয়ের মানদণ্ডে গোটা বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হবার যৌক্তিকতা রাখলেও রাজনৈতিক কূটনীতি ও মুসলিম বিদ্বেষের ষড়যন্ত্রে বাংলা হলো বিভক্ত। পূর্ব বঙ্গ নামে সৃষ্ট হলো একটি প্রদেশ। আজ এর পরিচয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী অধ্যুষিত এই এলাকা সঙ্গতভাবে অধিকারে হকদার ছিল যে ব্যবহার ও সম্পদের, ইতিহাস সাক্ষী, প্রত্যাশিত সে ন্যায়বিচার ও ন্যায্য অধিকার এদেশ পায়নি। কখনো রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে, কখনো বাঙ্গালি বিহারী সম্পর্ক নির্ণয়ে, কখনো সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগে,রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণে দিনের পর দিন ধূমায়িত হয়েছে অসন্তোষ, যার প্রচণ্ড বহিঃপ্রকাশ ঊনসত্তর থেকে একাত্তরের শেষ অবধি। লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্ত ঝরলো এই বাংলাদেশ। শতকরা আটানব্বই ভাগ ভোট পেয়ে যে নেতৃত্ব ক্ষমতার হকদার হলো, তাকে ক্ষমতা অর্পণ করলে অকারণ রক্তক্ষয়ের বিষাদান্তিক নাটকের দৃশ্যগুলো এতো মর্মান্তিক হতো না।

মুক্তিবাহিনী, সামরিক, আধা সামরিক বাহিনী ও এদেশের জনগণ স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করেছে। যারা ভাবলেন : পাকিস্তান বিভক্তি এই এলাকায় সৃষ্টি করবে বহিঃশক্তির আধিপত্যবাদ, এদেশ হারাবে স্বকীয় স্বাধীন সত্তা, তাঁরা সংগ্রামের স্বপক্ষে থাকতে পারেননি। যুদ্ধ চলাকালেই এঁদের অনেকের মতের পরিবর্তন ঘটে বাস্তব অবস্থার

www.nagorikpathagar.org

আলোকে। অনেকের পরিবর্তন এসেছে আরো পরে। ঢালাওভাবে এদের স্বাধীনতার শত্রু আখ্যায়িত করে মনে আত্মপ্রসাদ পাওয়া যেতে পারে হয়তো, কিন্তু মানুষের ধারণা ও চিন্তার বৈচিত্রের সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না।

বাংলাদেশের মাটিতে জানা-অজানা মুক্তিযোদ্ধার কবরের পাশ দিয়ে হাঁটতে মন শোকাভূত হয়; প্রাণের তাজা রক্ত ঢেলে এরা এনেছে এই স্বাধীনতা, আমরা যার উত্তরাধিকারী। অন্যদিকে এদেশে এমন বহু লোকের মৃত্যুর করুণ কাহিনী শুনি, যারা বিদ্যমান কাঠামো বহাল থাকার স্বপক্ষে থাকলেও পাক বাহিনীর বর্বরতাকে সমর্থন করেনি কোনদিন। এদের জন্যও চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

এদেশের তৌহিদবাদী মানুষেরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ইসলামের নির্দেশ— এই বিশ্বাস ছিল তাঁদের অন্তরে। নামায ও দোয়াদরুদ পাঠ করে নির্ভয়ে অপারেশনে যাত্রা; রাতের অন্ধকারে ঘরে ফিরে মাকে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করার অনুরোধ, নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত, রোযা রাখার মাধ্যমে সন্তানের কোলে ফিরে আসার জন্য মায়ের মুনাজাত ও অশ্রুসজল কান্না, মরণকালে কালেমা পাঠ করে মুক্তিযোদ্ধার জীবনাবসান— এই ইতিহাস মিথ্যা নয়।

এই প্রান্তিকের বাইরে কিছু লোক এমন মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা করেছে যা শুনে মানবতা শিউরে ওঠে। সন্দেহের অক্টোপাশে জ্ঞানী-গুণী, অধ্যাপক, ডাক্তার, শিল্পী-সাংবাদিক, ইমাম, আলিম, মাওলানা বহু লোক প্রাণ হারালেন। মনুষ্যত্ব এখানে স্তব্ধবাক্। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। প্রবল ঝঞ্ঝার শেষে সাগরের প্রশান্তি ছিল কাম্য। হয়তো তাই হতো। কেননা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সামান্য সময়ের জন্য শোনা গিয়েছিল কিছু লোক এদেশকে মুসলিম বাংলা নামকরণের পক্ষপাতী, তাদের বক্তব্য ছিল এতে মুসলিম বিশ্বের সাথে যোগাযোগ হবে সুবিধাজনক। ধীরে ধীরে বাস্তবতা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এদের তৎপরতা বন্ধ হয়। এরা স্বীকার করে নেয়, এদেশের নামকরণ।

দেশের আপামর সকল মানুষের মনে দেশের অস্তিত্ব ও সার্বভৌম সত্তার বিশ্বাস সুদৃঢ় হলেও প্রত্যাশিত শান্ত পরিবেশ বাংলায় আসেনি। রাষ্ট্রীয় আদর্শ নির্ণয়ে মত পার্থক্য, শিক্ষানীতির বারবার পরিবর্তন, ঘন ঘন রাজনৈতিক পট বদলানো দেশকে যুদ্ধোত্তর সুস্থ করে তোলায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা তার অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছি বার বার। জাতি হিসাবে আমরা বহুলাংশে অসহনশীল,অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করতে শিখিনি, এর প্রমাণ দিয়েছি বার বার। মতপার্থক্যের এই তীব্রতা থাকলেও আমরা মনে করি বর্তমানে বাংলাদেশের সকল নাগরিক ভালবাসে দেশকে। দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা বিপন্ন হোক এটা কাররোই কাম্য নয়। আমরা এই বিশ্বাসে স্বাধীনতা মূল্যায়ন ও তার সংরক্ষণে ইসলামী আদর্শের আলোচনায় অগ্রসর হতে চাই। প্রথমেই জানা দরকার স্বাধীনতার লক্ষ ও ইসলাম সম্পর্কে কি অভিমত। বাংলাদেশে পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও ইসলামী আদর্শ এই তিন মতবাদের অনুসারী বুদ্ধিজীবী বিদ্যমান। পুঁজিবাদের সমর্থকদের অভিমত ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার এর সাথে মানুষের কর্মময় বাস্তব জীবনকে গ্রথিত করা অনুচিত। একটি দেশের স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য অর্থনৈতিক মুক্তি। অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মানুষ অধিকার পাবে অর্থ

www.nagorikpathagar.org

উপার্জনের আর এই অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তার পূর্ণ স্বাধীনতা। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাগণ জীবনের সকল পর্যায় থেকে ধর্মকে নির্বাসিত করার কথা দীর্ঘকাল উচ্চারণ করলেও বাংলাদেশে ইদানিং এরা ব্যক্তিগত পার্যায়ে ধর্মকে আবদ্ধ রাখায় সম্মত হয়েছে। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এরা শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। তৃতীয় দলের বক্তব্য শুধু অর্থনীতিতে নয় জীবনের সকল স্তরে ইসলামী বিধান চালু ও তার অনুসরণেই স্বাধীনতার সত্যিকার তাৎপর্য নিহিত।

এই ত্রিধাবিভক্ত বুদ্ধিজীবীরা এদেশের সকল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। এবং এদের আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ করছে এদেশের জাগ্রত ছাত্র সমাজ।

আমরা মনে করি, বিশ্বে ধর্ম নামে প্রচলিত অন্যান্য মতবাদের সাথে ইসলামকে এক করে দেখার ফলেই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি। মহানবী মোস্তফা (স.) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মানুষের মৌলিক অধিকার লাভ নিশ্চিত করেন। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান জীবনের এই অপরিহার্য বিষয়গুলো সবার জন্য নির্ধারিত এ ঘোষণা ছিল। তিনি বলেছিলেন : 'সমাজে যাদের কোন অভিভাবক নেই, আমি তাদের অভিভাবক'। হযরত উমর (রা.) ছদ্মবেশে রাতের বেলায় সাধারণ মানুষের অভাবের খবর নিতেন এবং প্রয়োজন পূরণ করতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল : 'আমার শাসন আমলে সুদূর ফোরাত নদীর তীরে একটি কুকুরও যদি খাদ্য অভাবে মারা যায়, তার জন্য শাসক হিসেবে আমাকে পরকালে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।' হযরত আলী (রা.) তাঁর খিলাফত আমলের সুদীর্ঘকাল শুকনা রুটি পানিতে ভিজিয়ে খেতেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন : 'আমার শাসনকালে দেশে এমন লোক আছে যারা রুটি এভাবেই খায়। আমি খলীফা হয়ে তাদের চাইতে উত্তম কিছু খেতে পারি না।'

মহানবী (স.) ও সাহাবাদের এই আদর্শ অনুসরণ করা হলে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য ভিন্ন মতাদর্শের আকর্ষণ সৃষ্টি হতো না। ইসলাম ব্যক্তিগত ব্যাপার, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে এর কোন কার্যকারিতা নেই– একথা উঠতো না।

এদেশের শতকরা ৮০ জন নিরক্ষর লোকের কাছে স্বাধীনতার অর্থ চাল-ডাল-কাপড়ের দাম কমা, পেট ভরে দুবেলা খাওয়া। এদেশের বড় বড় নেতার সভায় বিপুল জনসমাগমের পেছনে বড় রহস্য- জনতার বিশ্বাস এরা ক্ষমতায় গেলে খাওয়া-পরা সহজ হবে, জিনিসপত্রের দাম কমবে। তাই মূল্যবান ও আকর্ষণীয় যত সংজ্ঞাই স্বাধীনতার স্বপক্ষে প্রদান করা হোক না কেন, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ স্বাধীনতার এই অর্থই ভাল বোঝে।

বুদ্ধিজীবী সমাজের কাছে স্বাধীনতার অর্থ আত্মবিকাশের সুযোগ। অর্থ সম্পদ এর সহযোগী আকর্ষণ। ইসলামী বিধানের আনুষ্ঠানিক বাহ্যরূপ নিয়ে যারা ব্যস্ত, তাদের কাছে স্বাধীনতার প্রধান কথা নামায-রোযা-পোশাক-পরিচ্ছদ, বোরখা, আদব-তমিজ বিষয়ে মানুষের আরো একনিষ্ঠ হওয়া এবং অনইসলামী কাজ- বিশেষত সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া ও অশ্লীল শিল্প- সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া ইত্যাদি।

চতুর্থ একশ্রেণীর মানুষ এদেশে বিদ্যমান যারা স্বাধীনতাকে দেখে ধনী ও বিলাসী হওয়ার সুযোগ হিসেবে। এদের সার্বক্ষণিক লক্ষ্য, কত অবাধে বিপুল অর্থসম্পদের অধিকারী হওয়া যায় সেদিকে। নিবৃত্তিহীন এই আকাঙ্ক্ষা তাদের আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। দুর্ভাগ্য

www.nagorikpathagar.org

আমাদের এদেশে এই শ্রেণীর মানুষের স্বার্থই বেশি সংরক্ষিত হয়ে আসছে। এরাই দেশের পরিচালিকা শক্তি। নইলে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালে চারজন কোটিপতির স্থলে বিগত ৩০ বছরে কি করে এদের সংখ্যা- এত বেশী হতে পারে। বিপরীত দিকে বার বছর আগে এদেশে ছিন্নমূল ও অভাবী মানুষ যা ছিল তা বেড়ে গেছে অনেক গুণ। মধ্যবিত্ত সমাজ ক্রমেই নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে পরিণত হচ্ছে, নিম্নমধ্যবিত্ত দাড়াচ্ছে ফুটপাতে।

জনজীবনের এই সমস্যা সমাধানে পুঁজিবাদী বুদ্ধিজীবী মহল পাশ্চাত্যের আদর্শে অনুরক্ত। সমাজতন্ত্রী সুধীগণের লক্ষ্য কমিউনিস্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুসরণ। এ ব্যাপারে ইসলামী দলসমূহের অভিমত শুধু আনুষ্ঠানিক ইবাদত নয়, অর্থনীতিসহ সকল ব্যবস্থার মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে আল-কুরআনে। এই আদর্শে সত্যিকার অর্থেই জনকল্যাণমূলক আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহানবী মোস্তফা (সং)।

বাংলাদেশের তরুণ যুব সমাজ উপরোক্ত তিনটি মতবাদে পরিচালিত রাজনৈতিক নেতা ও সংগঠনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। ইসলামী বিধানের স্বপক্ষে দল ও ছাত্র সংগঠনের সামনে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট থাকা দরকার। মহানবী (স.)-এর যারা বিরোধিতা করেছিল, তারা মূলত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কোন বাণী উচ্চারণ করেনি বরং দুখী মানুষকে আরো কষ্টে রাখতেই তারা আনন্দ অনুভব করেছে। এই শ্রেণীর মানুষ দীন ইসলাম তথা মানবতার দুশমন। কিন্তু আমাদের দেশে বাহ্যত যাদেরকে ইসলামের দুশমন ভাবা হচ্ছে তারা কি সত্যি সত্যি ইসলাম অপছন্দ করে? বিবাহে, আকীকায়, মরণে, ঈদে কুরবানীতে এমনকি জুমার নামাযেও তারা শরীক হয়। ইসলামী বিধান মেনে চলে। মাওলানা সাহেব ছাড়া তাদের চলে না।

বস্তুত দীর্ঘ অনেক শতাব্দী যাবত ইসলামী আদর্শে দুস্থ মানব সামাজকে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল করে তোলার বাস্তব ইতিহাস না থাকায় এদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে, ইসলামী আদর্শে এই সমস্যা সমাধান অসম্ভব। তাছাড়া পাকিস্তান আমলসহ বিগত চার দশকের ইতিহাস এদেশে ইসলামী দলের কাছ থেকে কুরআন হাদীসের আলোকে দুস্থ মানুষের স্বপক্ষে মিছিল, প্রতিবাদী দুর্বার গণআন্দোলন প্রত্যক্ষ করা যায়নি। বরং এই শ্রেণীর মানুষ যত না গরীব ও নিরন্ন মানুষের সান্নিধ্যে এসেছে তার চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছে বিত্তবানদের এবং এদের সান্নিধ্যের উষ্ণতায় ও প্রভাবে বিত্তবানদের অর্থ কমেনি।

ট্রাজেডি এখানেও যে, পণ্ডিত কার্লমার্কস, বিপ্লবী নেতা লেনিন ও মাওসেতুং-এর বিপ্লবী চেতনা, কর্মজীবন ও তাদের গঠিত সমাজ ব্যবস্থার সাথে এদেশের শিক্ষিত যুব সমাজের নিবিড় পরিচয়– তার তুলনায় কুরআনের আলোকে গঠিত মহানবী (স.)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজের সাথে পরিচয় একেবারে শূন্যের কোঠায়। কুরআন শরীফ আরবী ভাষায়, বাংলায় অনুবাদ করে এই যুব ছাত্র সমাজের হাতে তুলে দেবার তেমন প্রচেষ্টাই গ্রহণ করা হয়নি। তাই ছাত্রদের দোষারোপ করা অযৌক্তিক। সেক্যুলার পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা এদের ইসলামবিমুখ করে তোলার পথে হয়েছে আরো সহায়ক।

স্বাধীনতা রক্ষার সাথে স্বাধীনতার লক্ষ্য সমাজ দেহে বাস্তবায়িত করার প্রশ্ন-বিজড়িত। পূর্বেই বলেছি এদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠির কাছে স্বাধীনতা অর্থ জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার লাভ। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশবাসী সকল মানুষের মধ্যে সম্পদের

www.nagorikpathagar.org

সুষম বণ্টন। দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন-রাত কাটায়। অসুখে পায় না পথ্য ও চিকিৎসা; বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই চিত্র একটি দেশের স্বাধীন থাকার পক্ষে মারাত্মক হুমকিস্বরুপ। এই সমস্যা সমাধানে ইসলামী বিধানের দৃষ্টিতে দেশের বিত্তবানদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে আইনের কঠোরতায় এই সমস্যা সমাধান করতে হবে।

আল-কুরআনের ঘোষণা :

১. "সমাজে যারা অভাবী, ভিক্ষুক ও বঞ্চিত মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার ও মলিকানা রয়েছে ধনীদের অর্থ-বিত্ত ও সম্পদে।"

২. "এমন অবস্থা যেন সমাজে সৃষ্টি না হয় যার ফলে অর্থসম্পদ কেবলমাত্র তোমাদের ধনী ব্যক্তিদের হাতে আবর্তিত হতে থাকে।"

হাদীসে আছে :

"অর্থ সম্পদ ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে গরীব ও অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।"

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা না থাকলে দেশের স্বাধীনতা মানুষের কাছে কোন আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে না। দেশকে ভালবাসবে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় মানুষ প্রাণ দিতে তখনই এগিয়ে আসবে যখন তার পেটে থাকবে খাদ্য, পরণে থাকবে বস্ত্র। দেশ গরীব হলে দেশের সকল মানুষকেই গরীবানা হালতে চলতে হবে। গরীব দেশে যদি গরীব হতে থাকে আরো গরীব, আর সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠতে থাকে কতিপয় লোকের জীবনে, তবে কেন সাধারণ মানুষ শান্ত থাকবে, কেন ভালবাসবে দেশকে? এরূপ অবস্থার নিরসন না হলে মানুষ স্বাধীনতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। অভাবের তাড়নায় মা স্বীয় সন্তান বিক্রি করে দিচ্ছে, সতীত্ব বিসর্জন দিচ্ছে বোনেরা-এঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এই দুরবস্থাকে কোনক্রমেই আর উপেক্ষা করা চলবে না। আলেম সমাজকে আজ এ জবাব দিতে এগিয়ে আসতে হবে।

"তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা দুর্বল, অসহায় নারী ও শিশুদের অবস্থা পরিবর্তন করতে যুদ্ধ করছ না? অথচ ঐ শ্রেণীর মানুষেরা কাতর আর্তনাদে ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব, আমাদের এই এলাকা থেকে সরিয়ে নাও। কারণ এখানকার মানুষেরা জালেম। তুমি আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী পাঠাও।" (সূরা নেসা :৭৫)

কবি নজরুল বলেন :

"ইসলাম বলে সকলের তরে মোরা সবাই
সুখ দুঃখ সমভাগ করে নেব সকলে ভাই
নাহি অধিকার সঞ্চয়ের
কারো আঁখি নীরে কারো ঝাড়ে কিরে জ্বলিবে দীপ
দুজনার হবে বুলন্দ নসীব লাখে লাখে হবে বদনসীব
এ নহে বিধান ইসলামের।"

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে আজ অসহায় সাধারণ মানুষের জন্য প্রথম প্রয়োজন খাদ্য-বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা, পরে নৈতিক মূল্যবোধের তালিম। পক্ষান্তরে ধনীদের জন্য প্রথম প্রয়োজন ইসলামী আদর্শে অর্থ আয় ও ব্যয়ের সঠিক পথ অনুকরণ। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে অর্ধাহারে, অর্ধনগ্ন রেখে সম্পদের স্তুপ গড়ে তোলা, স্ফীতোদর হবার পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করতে হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে তিনভাবে। এক. সাম্রাজ্যবাদী কোন শক্তি সম্প্রসারণ লালসায় আক্রমণ করে বসলে; দুই. দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্ট অরাজকতা ও অত্যাচারে কোন বহিঃশক্তি নিপীড়িত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসে দেশ দখল করে নিলে; তিন. দেশে এমন মতবাদের লোক থাকতে পারে যারা ঐ মতবাদ প্রতিষ্ঠার অভিলাষে বাইরের কোন শক্তিকে আমন্ত্রণ জানালে।

বাংলাদেশ নিকট প্রতিবেশীসহ পৃথিবীর সকল দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নীতিতে বিশ্বাসী। অন্য দেশের প্রতি তার লোলুপদৃষ্টি নেই, অপর কোন শক্তি এদেশ করায়ত্ত করুক এও তার কাম্য নয়।

দেশের অভ্যন্তরে অরাজকতা ও নিপীড়ন চললে সাহায্যে এগিয়ে আসাও বিপদমুক্ত করে ফিরে যাওয়ার ইতিহাসে একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের উদারতা প্রশংসনীয়। সেদিন এই শক্তি ফিরে না গেলে নিশ্চয়ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতো।

বিশেষ কোন মতবাদে দেশ গড়ার লক্ষে মাত্র কয়েক ঘণ্টার বিপ্লব ঘটানোর দম্ভোক্তি শোনা গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতি পরিণামে কি শোচনীয় বিপর্যয় আনতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ আফগানিস্তান।

স্বাধীনতা রক্ষায় অংশগ্রহণ ইসলামী বিধানে শিশু, অসুস্থ নারী ছাড়া সবার জন্য বাধ্যতামূলক। কাজেই সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব সমধিক হলেও বেসামরিক নাগরিককে দেশরক্ষায় সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ- যে পথেই দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হোক, তার মোকাবিলা করতে হবে।

আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা :

"তোমাদের সাথে যারা যুদ্ধ করতে আসে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। এই যুদ্ধ হবে আল্লাহ্র পথে, আর এক্ষেত্রে সীমালংঘন করো না (অর্থাৎ ইসলামী বিধান অমান্য করো না)।" (সূরা বাকারা)

ইসলামের হেফাজত ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় এই হুকুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাদায়ায়েছ ছানায়ে" বিশিষ্ট ইমাম আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ আলফেসানী বলেন : "দেশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এই ঘোষণার সাথে সাথে সবার উপর যুদ্ধে অংশগ্রহণ ফরযে আইন তথা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে।" এই দৃষ্টিতে মুসলিম সমাজের সকল নাগরিককে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ট্রেনিং প্রদান করা অপরিহার্য। বাংলাদেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বি.এন. সি. সি.-র কার্যক্রম আরো ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যক্রম আরো বিস্তীর্ণ করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

দেশের প্রতিরক্ষার ঝাঁপিয়ে পড়ায় কুরআনের আহ্বান :

"হে ঈমানদার লোকেরা। জিহাদের জন্য তোমরা অস্ত্রধারণ কর। অতঃপর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অথবা সবাই সম্মিলিতভাবে রওয়ানা হও এবং (শত্রুর উপর) ঝাঁপিয়ে পড়।" (সূরা নেসা)

"হে বিশ্বাসীগণ! জিহাদের কঠিন মুহূর্তে তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। দুশমনের মুকাবেলায় তোমরা দৃঢ়, অটল ও অবিচল থাক। তোমরা সীমান্ত প্রহরার ব্যবস্থা কর। আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমরাই সফলকাম হবে।"

মহানবী (স.) এরশাদ করেন :

"আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পাওয়ার কামনায় একদিনের সীমান্ত পাহারা পৃথিবীর ও এর সমুদয় সম্পদের চাইতে অধিক মূল্যবান।"

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে ইসলামী বিধান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সূরা আনফালে আল্লাহ্ বলেন :

"সামর্থে ও উপকরণে যতদূর সম্ভব অধিক দক্ষতা, শক্তি ও সদা প্রস্তুত 'ঘোড়া' দুশমনের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত রাখেব। যেন ঐগুলির কারণে আল্লাহ্র শত্রু, তোমাদের শত্রু যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ জানেন, তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকতে পারে। আল্লাহ্র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করা হবে; তোমাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।"

সেনাবাহিনীকে আল্লাহ্ভীরু মর্দে মুজাহিদ হতে হবে। রোমান সেনাবাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধে রোমক সৈন্যের অবস্থা শোচনীয়। এমন সময় রোমক সেনাপতি গোয়েন্দা পাঠালো ছদ্মবেশে মুসলিম বাহিনীর বীরত্বের মূল রহস্য জানতে। গোয়েন্দারা ফিরে গিয়ে জানাল : "হুন বিল্ লাইলে রুহবানুন ওয়া বিন্ নাহারে ফুরসানুন– অর্থাৎ, মুসলিম সৈন্যরা রাত্র বেলায় তাদের উপাস্য আল্লাহ্ভক্ত বান্দা হিসাবে ইবাদতে কাটায়। আর দিনে অশ্বারোহী বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে।"

এই চরিত্রে বাংলাদেশের সকল সশস্ত্র বাহিনীকে উজ্জীবিত হতে হবে। সেনাবাহিনীসহ দেশের সবাইকে আল্লাহ্র উপর গভীর আস্থা রেখে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে।

আল্লাহ্র এরশাদ :

"সাহায্য শুধু আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে।"

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক যদি তোমাদেরে সাহায্য করেন, তবে তোমাদের উপর দুনিয়ার কোন শক্তিই বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি আল্লাহ্ তোমাদের তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত রাখেন তবে কে আর তোমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে?

"তোমরা পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্ব বিভেদ সৃষ্টি করোনা, মনে রেখ, যদি তোমাদের মধ্যে ঐক্য না থাকে তবে তোমাদের সম্পর্কে দুশমনের মনে যে ভীতি ছিল, তা থাকবে না।"

"ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্র বিধানকে সুদৃঢ়ভাবে অনুসরণ করো; দলাদলি করোনা।"

কুরআন শরীফে আল্লাহ্ আরো ঘোষণা করেন : "বলিষ্ঠ ঈমানে উজ্জীবিত হলে তোমরা একশত লোক এক হাজার কাফেরের উপর জয়ী হতে পারবে।"

www.nagorikpathagar.org

"উচ্চস্তরের ঈমান ও ধৈর্য থাকলে দশগুণ বেশি দুশমনের উপর মুসলমান বিজয়ী হতে পরবে।"

শুধু সেনাবাহিনী নয়, আলোচনায় স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছি দেশের আপামর সকলের মধ্যে একটি উজ্জ্বল আদর্শের আলো থাকতে হবে। এই মৌল আকীদা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই শক্তিশালী দেশ তথা বলিষ্ঠ প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলা সম্ভব। এ ব্যাপারে একদিকে যেমন সামরিক, আধা সামরিক, সকল পর্যায়ের অফিসার, কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জাগ্রত ছাত্র সমাজকে কুরআনী আদর্শ ও মহানবী (স.)-এর কর্মবহুল বাস্তব জীবন ইতিহাসের সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে, তেমনি মনে রাখতে হবে, যুদ্ধ জয়ের জন্য সমর উপকরণই শেষ কথা নয়, সামরিক উপায় উপকরণ নিশ্চয়ই প্রয়োজন কিন্তু সবচেয়ে বেশি দরকার আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় মনোবল, কঠোর সংকল্প, আল্লাহ্‌র প্রতি সুগভীর বিশ্বাস, জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। এই বিশ্বাসে সবাইকে সুদৃঢ় হতে হবে। আদর্শিক মজবুতী থাকলে এবং সেই সাথে উপযুক্ত রণসম্ভার, নির্ভুল ও যোগ্য নেতৃত্ব ও ট্রেনিং এবং দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃংখলা বজায় থাকলে দেশের স্বাধীনতাকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না।

অথচ আমরা এ ব্যাপারে সবাইকে অভিজ্ঞ করে তুলতে পারিনি। ভিন্ন মতবাদে আকৃষ্ট দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ এবং উদীয়মান ছাত্র-যুবক-শ্রমিকের কাছে ইসলামী আদর্শের মানবিক দিকগুলো তুলে ধরা আজ একান্ত প্রয়োজন। ইসলামী আদর্শের কথা বললেই যেমন প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিবিরোধী বুঝায় না, তেমনি ইসলামী আদর্শের সাথে নানা কারণে অপরিচিত থাকার ফলে পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদে অনুরক্ত সুধী ছাত্র-জনতার প্রতি ঘৃণা ও তাদেরকে ঢালাওভাবে ইসলামের দুশমন ভাবা ঠিক হবে না। আমরা বলবো, যারা ইসলামী আদর্শে দেশ ও সমাজ গড়ে তোলায় যত্নবান, সচেষ্ট ও আগ্রহী, তাদের উদার হৃদয়ে বাস্তব উদাহরণে প্রমাণ করতে হবে অন্য মতবাদের চাইতে ইসলাম মানবকল্যাণে পূর্ণাঙ্গ বিধান, অধিকতর উপযোগী ও যুক্তিসঙ্গত। যারা ইসলাম সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞান রাখেন তাদের কাছে অনুরোধ, সমাজতন্ত্রের বই, রাষ্ট্রনীতির পাশ্চাত্য মতবাদ পড়ুন কোন আপত্তি নেই, সেই সাথে কুরআন শরীফের সমাজ রাষ্ট্র ও মানবিক কল্যাণের যে মূলসূত্র আছে সেগুলিও জানতে চেষ্টা করুন। মানবদরদী রসূল (স.) তাঁর বাস্তব জীবনে জনকল্যাণ-ধর্মী যে সমাজ গঠন করেছিলেন যে সম্পর্কেও অবহিত হোন।

বস্তুত পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ করে দেশ, দেশপ্রেম, দেশের স্বাধীনতার মূল্য এবং এ বিষয়ে নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে কুরআন-হাদীস এবং ইসলামের ইতিহাসের উল্লেখ্য ঘটনা জানা থাকলে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা রক্ষায় সত্যিকার পথ নির্দেশ পাবে।

রাব্বুল আলামীন আমাদের তৌফিক দান করুন। ইসলামের মানব কল্যাণধর্মী আদর্শে এদেশ গড়ে উঠুক। আমীন।

www.nagorikpathagar.org

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম সমাজের অবদান

উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনে এদেশের আলেম সমাজের ভূমিকা শুধু যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয় তাই নয়, বরং অবিস্মরণীয় এবং অভিনন্দনযোগ্যও। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের গোলামীর শৃঙ্খল থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার জন্য আলেম সমাজের অসাধারণ ত্যাগ ও কোরবানী, কঠোর সংগ্রাম ও সাধনা, এক কথায় তাদের মহৎ দান এ উপমহাদেশের ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় অধ্যায়। আযাদী সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা দেখি আলেম সমাজকে লক্ষ কোটি সংগ্রামী মানুষের নেতৃত্ব করতে, দেখি তাদেরকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলতে, বুলেট-সঙ্গীনের মুখে দাঁড়াতে, কারাগারের অভ্যন্তরে ও দ্বীপান্তরে বন্দীরূপে।

একথা সর্বজনবিদিত যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সর্বপ্রথম ব্যবসায়ের উপলক্ষ্যেই এদেশে আগমন করে। কিন্তু তখনও অনেক আলেম তাদের দূরবীক্ষণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছিলেন দেশের আসন্ন বিপদের কথা। যিনি সর্বপ্রথম দেশের ভবিষ্যৎ দুর্গতি সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তিনি মহামনীষী হযরত শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী (র.)। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির হীন এবং জঘণ্য মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটলো তাদের এই ঘোষণার মাধ্যমে "বান্দা খোদার, মুলুক বাদশার, হুকুম কোম্পানি বাহাদুরের।" তখন তাদের কুমতলব সম্পর্কে কারো মনে এতটুকুও সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তখন সর্বপ্রথম যিনি কোম্পনির এই ঘোষণায় প্রতিবাদ করলেন এবং পাক-ভারত উপমহাদেশকে 'দারুল হরব' বলে ঘোষণা করলেন এবং পরিস্থিতির মুকাবিলা করার জন্য–তথা আযাদী আন্দোলনের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানালেন, তিনি মহামনীষী হযরত ওলিউল্লাহর সুযোগ্য পুত্র সে যুগের দেশবরেণ্য আলেম হযরত মওলানা শাহ আবুদল আজিজ (র.)।

তাঁর উদাত্ত আহ্বানে যাঁরা সাড়া দিয়ে আযাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং গোলামীর ঘৃণ্য শৃঙ্খল ছিন্ন করে দেশকে আযাদ করার মহান ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তন্মধ্যে হযরত আল্লামা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র.), হযরত শাহ ইসমাইল (র.) এবং হযরত মওলানা আবদুল হাই প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা, এরা নিঃসন্দেহে এদেশের আযাদী সংগ্রামের অগ্রনায়ক। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র.) এই উদ্দেশ্যে সমগ্র উপমহাদেশ ভ্রমণ করেন এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের অগণিত মানুষ তাঁর নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করেন, তাঁর নিকট আযাদী সংগ্রামের দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাহাড়ী এলাকাকে সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র রূপে নির্বাচিত করেন। সৈয়দ আহমদ (র.) ১৭৮৭ সালে বেরিলীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং

www.nagorikpathagar.org

১৮১৬ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য দিল্লী গমন করেন। তিনি দেশের তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম মাওলানা শাহ আবদুল আজিজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাত্র তিন বৎসরে কুরআন, হাদীস, ফেকাহ এবং অন্যান্য বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজসংস্কারক, পণ্ডিত, বাগ্মী, সংগঠক, অসিবিদ্যা ও অশ্ব পরিচালনায় পারদর্শী। তিনি কয়েক বছরের কঠোর পরিশ্রমে সমগ্র উপমহাদেশের জনসাধারণকে জিহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর জনপ্রিয়তা শুধু একটি কথা দ্বারা সহজে অনুমেয় যে, তিনি যখন পবিত্র কাবা-শরীফ জেয়ারতে হজ্জব্রত পালনের জন্য রওয়ানা হলেন, তখন ১১ খানি জাহাজ শুধু অনুচরদের জন্য ভাড়া করতে হয়েছিল। হজ্জের পর বিভিন্ন মুসলিম দেশে তিনি ব্যাপক সফর করেন। প্রায় তিন বছর পর যখন তিনি স্বদেশকে মুক্ত করার নব-প্রেরণা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি ঘোষণা করলেন, "মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলাম।" মূলত এর পরই সম্পূর্ণ নতুন পন্থায় শুরু হয় তাঁর সংগ্রাম। তিনি একটা মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে তাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আযাদী আন্দোলনকে রুখে দাঁড়াবার উদ্দেশ্যে ভারতবাসীর মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে, তাই তারা পাঞ্জাবের মহারাজ রঞ্জিৎ সিংকে দলভুক্ত করে। রঞ্জিৎ সিং তখন মুসলমানদের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করেন। মূলত বিদেশী বানিয়ার দল রঞ্জিৎ সিং-এর কাঁধে বন্দুক রেখে মুজাহিদ বাহিনীর বুকে গুলি চালায়। এমনি সংকটময় মুহূর্তে উৎপীড়িত নির্যাতিত মুসলমানদের আর্তনাদে বাধ্য হয়ে অগত্যা মওলানা সৈয়দ আহমদকে শিখদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়, আর তখনই বালাকোটের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অথচ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, মওলানা সৈয়দ আহমদের আযাদী আন্দোলনে শুধু মুসলমানরাই নয়, অমুসলমানরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। দেশের আযাদী অর্জনই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তাই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মাওলানা সৈয়দ আহমদের তোপখানার অধ্যক্ষ ছিলেন রাজারাম রাজপুত, আর এটিই তাঁর উদারতা ও মহানুভবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এ সম্পর্কে মওলানা সৈয়দ আহমদ গোয়ালিয়রের মহারাজা দৌলতরাওকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। আযাদী আন্দোলনের আর একজন বিখ্যাত মুজাহিদ মওলানা হোসাইন আহমদ মদনী কর্তৃক লিখিত 'নক্‌শে হায়াত' বা আত্মজীবনীতে এই চিঠির বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। হিন্দু রাজা দৌলতরাওকে লিখিত চিঠি: "বিদেশী বণিকরা যে আজ রাষ্ট্রের মালিক হয়ে বসেছেন, এ সম্পর্কে আপনি অবশ্যই অবগত রয়েছেন। দেশের আমীর-ওমরাহ তথা সম্মানিত ব্যক্তিদের মান-মর্যাদা আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। রাজ্যের কর্ণধার যারা, তারা এখন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। এমনি অবস্থায় নিতান্ত কর্তব্যের তাগিদে বাধ্য হয়ে কতিপয় দরিদ্র নিঃসম্বল লোক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর নির্ভরশীল হয়ে, তার দীনের খিদমতের জন্য বেরিয়ে এসেছেন। এরা দুনিয়ার লোভী নন। শুধু আল্লাহ্‌র দীনের সেবায় তাঁদের এই

www.nagorikpathagar.org

সংগ্রাম সাধনা। অর্থ সম্পদের লোভ-লালসাও তাঁদের নেই। তাঁদের সংকল্প যেদিন আমরা জয়লাভ করবো, সেদিন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব উপযুক্ত লোকের প্রতি অর্পিত হবে।"

হযরত মওলানা সৈয়দ আহমদ (র.)-এর উদার মনোভাব থাকা সত্ত্বেও ১৮৩১ সালে বালাকোটের ঐতিহাসিক ময়দানে যুদ্ধ হলো। আর তাতে মাওলানা সৈয়দ আহমদ (র.), মওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ ও মওলানা আবদুল হাই প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম দেশ ও জাতির আযাদীর জন্য জিহাদ করে শাহাদত বরণ করেন। যদিও সেদিন তাঁরা বালাকোটের রণাঙ্গনে পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের শহিদী খুন ব্যর্থ হয়নি। বরং আযাদী আন্দোলনের যে বহ্নিশিখা মওলানা সৈয়দ আহমদ (র.) প্রজ্বলিত করেছিলেন, তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ ১৮৫৭ সালে ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সিপাহী বিপ্লবের প্রেরণা ও প্রস্তুতি যে সমস্ত লৌহ মানবের দ্বারা হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বীর মুজাহিদ মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র.)-এর খলীফাদের হাতে গড়া ছিলেন। অবিভক্ত বাংলার ইংরেজ প্রশাসক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান্স মুসলিমস' নামক গ্রন্থে মাওলানা সৈয়দ আহমদ (রা.)-এর জিহাদী জীবনের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাতে আযাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মাওলানা সৈয়দ আহমদ (র.)- এর মুজাহিদ বাহিনীর সংগঠনের বিস্তারিত বিবরণ "জামাতে মুজাহেদীন", "সার গুজাস্তে মুজাহেদীন" এবং "সৈয়দ আহমদ (র.)" নামক তিনটি গ্রন্থের কয়েক সহস্র পৃষ্ঠায় উর্দূ ভাষায় সংরক্ষিত রয়েছে। এতে শুধু যে হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ (র.)- এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং জিহাদী প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায় তাই নয়, বরং পাক-ভারত উপমহাদেশের আন্দোলনে গোটা আলেম সামজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

বস্তুত এদেশের আলেম সমাজ আযাদী আন্দোলনে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং প্রায় দুশ বছর ধরে যেভাবে এই সংগ্রামকে অব্যাহত রেখেছেন, তা সত্যিই অতুলনীয় এবং বিস্ময়কর। আন্দামানের বন্দী মওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী (র.), মওলানা এনায়েতুল্লাহ (র.), হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজেরে মক্কী, এই উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মোহাম্মদ কাসেম (র.) এবং মওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী (র.) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম, যাঁরা এদেশে আযাদী আন্দোলন করেছেন এবং এজন্য অবিরাম সংগ্রাম সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের নাম এদেশের ইতিহাসে চিরদিন অমর ও অক্ষয় হয়ে থাকবে। এঁরা সকলেই শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী (র.) ও হযরত মওলানা আবদুল আজিজ (র.)-এর আধ্যাত্মিক শিষ্য এবং হযরত মওলানা সৈয়দ আহমদ (র.)-এর আযাদী আন্দোলনের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত।

এমনিভাবে দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে উদ্ধার করার জন্য যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং ১৮৫৭-৫৮ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান যাঁদের কঠোর পরিশ্রমের ফল, তাঁদের মধ্যে মওলানা শাহ আহমদুল্লাহর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সারা দেশে ইংরেজ বিরোধী বক্তৃতা করে দেশবাসীকে আযাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে এবং যাবতীয় ত্যাগ স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সরকার তাঁকে অযোধ্যার কারাগারে

www.nagorikpathagar.org

নির্জন প্রকোষ্ঠে বন্দী করে এবং আদালত তাঁর কাঠোর শাস্তির নির্দেশ দেয়। কিন্তু তাঁর ভক্ত ও অনুরক্তের দল আযাদী-পাগল বিক্ষুব্ধ জনতা বলপ্রয়োগ করে তাঁকে অযোধ্যার কারাগার থেকে মুক্ত করে। মওলানা আহমদুল্লাহ সংগ্রামের পুরোভাগে থাকতেন, তাঁর সম্মুখে দাঁড়াবার সাহস করা হতো না। তিনি ১৯৫৮ সালের ৫ জুন অযোধ্যা রোহিলাখণ্ডের সীমান্ত এলাকায় পৌছলে তাঁকে ধোঁকা দিয়ে রাজা জগন্নাথ নামক এক ব্যক্তি তার প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। কথিত আছে যে, শাহজাহানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট এই হীন কার্যের জন্য সেই জগন্নাথকে ৬৫,০০০ টাকা পুরস্কার দেন। এমনিভাবে আযাদী আন্দোলনের বীর মুজাহিদ মওলানা শাহ আহমদুল্লাহর জীবন প্রদীপ চারদিনের জন্য নির্বাপিত হয়। বালাকোটের পরাজয়ের পর মওলানা সৈয়দ আহমদ (র.)-এর মুজাহিদ বাহিনী তাঁদের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে, মহাবন পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত সিতানা নামক স্থানে। বস্তুত পাক-ভারত উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের ইতিহাসে সিতানার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে, কেননা এই অজ গ্রামটিকে কেন্দ্র করেই মুজাহিদ বাহিনী পরাক্রমশালী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে যুদ্ধ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মওলানা এহিয়া আলী খানের কথা উল্লেখ করতে হয়। এককালে তিনিই ছিলেন মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান পরিচালক। তাঁর কার্যালয় ছিল পাটনায়। তিনি সমগ্র দেশ থেকে মুজাহিদ বাহিনী সংগ্রহ করতেন ও পাটনায় তাঁদের শিক্ষা দিতেন এবং পরে সিতানায় প্রেরণ করতেন। সুদক্ষ, সুচতুর, বিচক্ষণ সিংহপুরুষ মাওলানা এহিয়া আলী খান এসব কিছু করতেন অতি সংগোপনে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ইংরেজবিদ্বেষ ও আযাদীর রক্ত প্রবাহিত করতেন নতুন মুজাহিদের শিরায় শিরায়, রন্ধ্রে রন্ধ্রে। মওলানা এহিয়া আলী খান এভাবে সারা দেশে বিপ্লববাদ প্রচার করেন এবং মুজাহিদ বাহিনীর সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু অদৃষ্টের লিখনকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না।

আর পারে না বলেই ১৮৬৩ সালের মে মাসে পাঞ্জাবী 'মীরযাফর' গাজন খাঁর ষড়যন্ত্রে কয়েকজন সরলপ্রাণ মুজাহিদ বন্দী হন এবং পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, আম্বালী, মুলতান প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপক ধরপাকড় হয়। এসময় যাঁরা বন্দী হন এবং পরে ফাঁসির দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হন, তাঁদেরই একজন হলেন মওলানা এহিয়া আলী খান।

১৮৫৭ সালের ব্যর্থ অভিযানের পর ইংরেজরা মুসলমানদের উপর যে অমানুষিক উৎপীড়ন, নির্যাতন চালায় তা বর্ণনাতীত, কিন্তু শাহ ওলিউল্লাহ ও শাহ আব্দুল আজিজের প্রজ্বলিত অগ্নি নিষ্প্রভ হবার নয়। বিশেষত হযরত সৈয়দ আহমদ (র.)-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের পুঁতমন্ত্রে যাঁরা দীক্ষিত, তাদেরও দমবার কথা নয়, তাই আমার দেখি, ১৮৫৭ সালের আযাদী সমরের বীর মুজাহিদ মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম (র.) পুনরায় সংগ্রামের আয়োজনের উদ্দেশ্যে সুবিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। দেওবন্দ মাদ্রাসা বিগত একশত বছর আযাদী আন্দোলনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুপ্রমাণিত হয়। শেখুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হোসেন (র.) মওলানা কাসেমের ছাত্র ছিলেন। মুজাহিদের ছাত্র মুজাহিদ। অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান অগাধ পাণ্ডিত্যের

www.nagorikpathagar.org

অধিকারী মওলানা খ্যাতির দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে দেশ-বিদেশে। ফলে শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশেই নয় বরং মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ, বলখ, কাবুল, কান্দাহার, বুখারা, সমরকন্দ, তুর্কিস্থান ও আফগানিস্তান থেকে অগণিত জ্ঞানপিপাসু সমবেত হয় তাঁর নিকট এবং তার স্বদেশপ্রেম ও আযাদী সংগ্রামের দীক্ষা গ্রহণ করে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মওলানা মাহমুদুল হোসেন ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপক। তাঁর দুর্লভ মনীষার আকর্ষণেই সমবেত হতেন অগণিত মানুষ এবং আযাদী আন্দোলনের দুর্নিবার আগ্রহে তাদের মন হতে উদ্বেলিত। শেখুল হিন্দ, দেওবন্দ মাদ্রাসায় অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে দেশকে আযাদ করার জন্য জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এই জন্য তিনি নিজেই নির্বাচন করেন তাঁর সহকর্মীদের সংগ্রামপথের সহযাত্রীদের এবং হযরত মওলানা সৈয়দ আহমদ (র.)-এর মুজাহিদ বাহিনীর সীমান্ত কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই উদ্দেশ্যে শেখুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হোসেনের গুণমুগ্ধ শিষ্য মওলানা সয়ফুর রহমান, মওলানা ফজল মাহমুদ, মওলানা মোহাম্মদ আকবর প্রমুখ ওলামায়ে কেরামকে সীমান্ত দেশে প্রেরণ করেন।

তাঁরা ইয়াগীস্থানকে কেন্দ্র করে শেখুল হিন্দু মওলানা মাহমুদুল হোসেনের নির্দেশক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উৎখাতের উদ্দেশ্যে তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। গোলা-বারুদ-অর্থ-রসদ সরবরাহ করেন তিনি। সমগ্র দেশ থেকে এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করেন। সুদূর দেওবন্দ থেকে আফগান সীমান্ত পর্যন্ত যোগাযোগ রক্ষা করা, সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য নির্দিষ্ট সময়ে প্রেরণ করা, বিশেষ করে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চক্ষে ধূলা দিয়ে সকল ব্যবস্থা করা সত্যিই এক অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল সমস্যা ছিল। মওলানা মাহমুদুল হাসান ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও অসাধারণ প্রতিভাবাবন ও পরম সাহসী লোক। তিনি অটল অবিচল হয়ে এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন, তাঁর গুণমুগ্ধ শিষ্য মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি, মওলানা উজাইরগুল, মওলানা আব্দুর রহিম রায়পুরী, মওলানা মোহাম্মদ সাদেক, নওমুসলিম মওলানা শেখ আবদুর রহিম ছিলেন এই জটিল পথে শেখুল হিন্দের সহযাত্রী।

সীমান্তের এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সৈন্য প্রেরণ করল, কিন্তু গেরিলা যুদ্ধে চির অভ্যস্ত মুজাহিদ বাহিনীকে পরাজিত করা সহজ ব্যাপার ছিল না, পর্বতের গহীন অরণ্য তাঁদেরকে আত্মগোপন করতে সাহায্য করতো, তাই অনায়াসে ব্রিটিশ সৈন্য তাদের হাতে বিপন্ন হতো। শেখুল হিন্দ ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনায় সাহায্যের জন্য ইস্তাম্বুল এবং আরব দেশ সফর করেন এবং হেজাজের তদানীন্তন অধিপতি গালেব পাশার সংগে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর তিনি মদিনায়ে মোনাওয়ারা গমন করেন এবং তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য মওলানা হোসাইন আহমদ মদনীকে সাথী হিসেবে গ্রহণ করেন, যিনি সুদীর্ঘ সতের বছর ধরে প্রিয় নবী (স.)-এর মসজিদে হাদীস শাস্ত্রের অধ্যাপনায় রত ছিলেন। অতঃপর তিনি মস্কো ও ইস্তাম্বুলে মিশন প্রেরণ করেন। এ সময়ে ব্রিটিশ সরকারের নিকট রহস্য ফাঁস হয়ে যায়, ফলে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বন্দী হন এবং সঙ্গে সঙ্গে ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধক্রমে সৌদি

www.nagorikpathagar.org

আরবের তদানীন্তন অধিপতি শরীফ হোসেন জেদ্দায় শেখুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হোসেনকে বন্দী করে। তাঁর সঙ্গে বন্দী হন হাকিম নুস্‌রত হোসাইন, হযরত মওলানা হোসাইন আহমদ মদনী, মওলানা ওজাইরগোল পেশোয়ার এবং মাওলানা ওহীদ আহমদ (র.) প্রমুখ। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁরা বন্দী হন। একমাস জেদ্দায় রাখার পর তাঁদেরকে কায়রো পাঠানো হয়। কায়রোর "জিয়া" কারাগারে তাঁদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। অতঃপর ইটালীর নিকটবর্তী মাল্টা দ্বীপে তাঁদেরকে প্রেরণ করা হয়। এমনিভাবে তাঁরা এদেশের আযাদী আন্দোলনের জন্য সংগ্রাম করেন। এজন্য আযাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ তাকবে। এদেশকে আযাদ করার জন্য মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, মওলানা হাসরত মোহানী ও মওলানা আজাদ সুবহানী প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের দানও অপরিসীম। বস্তুত আজাদী আন্দোলনের ইতিহাসে মওলানা মোহাম্মদ আলীর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেননা তিনি ছিলেন নির্ভীক মুজাহিদ বিপ্লবী বীর। তাঁর ন্যায় দুর্লভ মনীষী সাধারণত কোন দেশে অনেক দিন পরই পরিদৃষ্ট হয়। তিনি তাঁর কলিকাতা থেকে প্রকাশিত "দি কমরেড" পত্রিকার মারফতে এবং পরে দিল্লী থেকে প্রাকশিত উর্দু দৈনিক "হামদর্দের" মাধ্যমে সারা দেশে আযাদীর অগ্নিমন্ত্র প্রচার করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা সর্বজনবিদিত স্বীকৃত এবং উচ্চ প্রশংসিত ছিল। খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৩০ সালে বিলাতে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকে তাঁর ঐতিহাসিক উদ্দীপনাময় ভাষণে যখন ঘোষণা করেছিলেন, "আমি স্বাধীনতার জন্য বিলাত এসেছি, পরাধীন দেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা আমার নেই, অপরের হলেও কোন স্বাধীন দেশে মৃত্যুবরণ করাকে আমি শ্রেয় মনে করি।" তখনই সমগ্র বিশ্ব উপলব্ধি করেছিল যে আযাদীর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাঁর শিরায় শিরায়। দেশের আযাদী তাঁর নিকট স্বীয় জীবন থেকেও অধিকতর মূল্যবান। এমনিভাবে সর্বপ্রথম যিনি এদশের পূর্ণাঙ্গ আযাদীর দাবি উত্থাপন করেন, যিনি ইংরেজ বিতাড়নের তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কবর দেবার জন্য ছিলেন বদ্ধপরিকর, বিদেশী বেনিয়া শাসক গোষ্ঠীকে দেশের পবিত্র মাটি থেকে বহিষ্কার করে পূর্ণাঙ্গ আযাদী অর্জন ছিল যাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তিনি মওলানা হাস্‌রত মোহানী। তিনি আযাদীর জন্য বহুদিন কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন, সর্বপ্রকার উৎপীড়ণ নির্যাতন সহ্য করেছিলেন।

তদানীন্তন বাংলাদেশে যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম আযাদী আন্দোলনের অগ্রনায়ক ছিলেন তাঁদের মধ্যে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, হাজী শরীয়তুল্লাহ, পীর দুদু মিয়া প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের নাম অবিস্মরণীয়। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সারা দেশে জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে লোকের মনে আযাদীর প্রেরণা জাগিয়েছিলেন এবং তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত, "সুলতান", "আল-ইসলাম" পত্রিকা এবং "কোরানে স্বাধীনতার বাণী" গ্রন্থখানি বাঙালি মুসলমানদের মণে নব-প্রাণ সঞ্চার করে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এজন্য

www.nagorikpathagar.org

কারাবরণও করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত "জমিদার" পত্রিকার সম্পাদক মওলানা জাফর আলী খানের দানও আযাদী আন্দোলনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যদিও মওলানা আবুল কালাম আযাদের রাজনৈতিক মতবাদের সাথে আমরা একমত নই, কিন্তু এদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নে তথা আযাদী আন্দোলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আযাদী অর্জনের জন্য তিনি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের হাতে বর্ণনাতীত নির্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু নির্ভীক চিত্তে, বীরবিক্রমে আযাদীর লড়াই করে তাতে জয়ী হয়েছেন। এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাহলো এই যে, প্রায় দুশ বছর ধরে আলেম সমাজ যে আযাদী আন্দোলন করেছেন এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য যে অবিরাম সংগ্রাম করেছেন, তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁরা ইসলামের জন্য দেশের আযাদী অপরিহার্য বলে মনে করতেন। কেননা ইসলামী জীবন বিধানের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন দেশের আযাদী ব্যতীত আদৌ সম্ভব নয়। তাই ওলামায়ে কেরামের আযাদী আন্দোলনের এই ধারা অবশেষে পাকিস্তান আন্দোলনে শুধু যে সহায়ক হয়, তাই নয়, বরং পাকিস্তান আন্দোলনে তা সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়। তাই, আমরা দেখি ১৯৪৫ সালে কলকাতা মহানগরীতে শেখুল ইসলাম মওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানীর নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম গঠন করা হয়। মওলানা জাফর আহমদ ওসমানী, মাওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম তখন সারা দেশে পাকিস্তান অর্জনের দাবি নিয়ে ব্যাপক সফর করেন।

বস্তুত হযরত শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী (র.) হযরত শাহ আবদুল আজীজ (র.) যে জিহাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র.) যে জিহাদ পরিচালনা করেছিলেন, তা এদেশের আলেম সমাজ অব্যাহত রেখেছেন তাঁদের বুকের রক্ত দিয়ে। আযাদী আন্দোলনে এদেশের আলেম সমাজের অবদান অবিস্মরণীয় অতুলনীয়।

www.nagorikpathagar.org

লেখক-পরিচিতি

আবদুল মান্নান তালিব : সাহিত্যিক, গবেষক, সাংবাদিক। সম্পাদক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক কলম। প্রকাশিত গ্রন্থ : 'বাংলাদেশে ইসলাম' 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান, 'ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন'।

এ. কে. এম. মহিউদ্দিন : সাংবাদিক, সাহিত্যিক, গবেষক। মহা-সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব। সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক, দৈনিক আজাদ। প্রকাশিত গ্রন্থ : শাতিল আরবে বহে শোনিত, গওসুল আজমের দেশে, হাবিলদার রজব আলী, পাগলা টিপু, চার নেতা।

আবু সাইদ মুহাম্মদ ওমর আলী : সাহিত্যিক, গবেষক। পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ : হাদিস পড়ি জীবন গড়ি, ঈমান যখন জাগলো (অনুবাদ), ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (অনুবাদ), খালিদ বিন ওয়ালিদ (অনুবাদ), মহানবীর (সা.) প্রতিরক্ষা কৌশল (অনুবাদ)।

মুহম্মদ মুনসুরউদ্‌দৌলাহ্ পাহ্‌লোয়ান : লেখক, সাংস্কৃতিক সংগঠক। উপ- পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

মোজাম্মেল হক : লেখক, শিক্ষাবিদ, ইতিহাস গবেষক।

মেসবাহুল হক : গবেষক. সাংবাদিক, কথাশিল্পী। সাবেক সহকারী সম্পাদক, দৈনিক পূর্বদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ : পূর্বদেশ, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ।

মুহিউদ্দীন খান : সাহিত্যিক, গবেষক, সাংবাদিক। সম্পাদক, মাসিক মদিনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিপ্লবী সাহাবী হযরত আবুজর গিফারী (রা.), কুড়ানো মানিক, মাকতুবাত ইমাম গাজ্জালী (অনুবাদ), ইমাম জয়নুল আবেদীন, শহীদ ফয়সাল, হযরত মাওলানা ইলিয়াস, তফসীরে মারেফুল কোরআন (অনুবাদ), সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাবে (৫ খণ্ড), আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, জীবনসায়াহ্নে মানবতার রূপ (অনুবাদ), আজাদী আন্দোলন ১৮৫৭ (অনুবাদ), ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম (অনুবাদ)।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : দার্শনিক, সাহিত্যিক, জাতীয় অধ্যাপক। সাবেক অধ্যক্ষ, সুনামগঞ্জ কলেজ, নরসিংদী কলেজ, মতলব কলেজ ও আবুজর গিফারী কলেজ। অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সভাপতি, বাংলাদেশ দর্শন কংগ্রেস। প্রকাশিত গ্রন্থ : তমদ্দুনের বিকাশ, বিপ্লবী সাহাবা আবুজর (রা.) Hadrat Abu Dhar Ghifari (R), Science and Revelation, Emergence of Muslim Culture in Bengal, হাসান রাজা, জাগ্রত অতীত, ইসলাম ও মানবতাবাদ দর্শনের নানা প্রসঙ্গ, ইসলাম : মনীষার আলোকে ধর্ম ও দর্শন, মুক্তির ডাক, ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে, Philosophy and Religion, সিলেটে ইসলাম, Islamic Movement ইত্যাদি।

আবুল আসাদ : সাংবাদিক, গবেষক, সাহিত্যিক। সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম। প্রকাশিত গ্রন্থ : অপারেশন তেল আবিব (১-২), মিন্দানাওয়ের বন্দী, পামিরের আর্তনাদ, রক্তাক্ত পামির, রক্ত সাগর পেরিয়ে।

কাজী দীন মুহম্মদ : সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, গবেষক। সাবেক পরিচালক, বাংলা একাডেমী। প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪ খণ্ড), জীবন সৌন্দর্য, মানব জীবন, সাহিত্য সম্ভার, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, সাহিত্য শিল্প, ভাষাতত্ত্ব, The Verb Structure in Colloquial Bengali ইত্যাদি।

এ. কে. এম. ইদ্রিস আলী : লেখক ও শিক্ষাবিদ।

শামসুল আলম : সাহিত্যিক, গবেষক, প্রশাসক। সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার। সাবেক মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ : ইসলামী অর্থনীতির

www.nagorikpathagar.org

রূপরেখা, পুঁজিবাদ-বিরোধিতায় হযরত আবুজর (রা.), ইসলামী রাষ্ট্র, হযরত শাহজালাল (রা.), ইসলামী চিন্তাধারা, Islamic Thoughts. বর্ণ পরিচয়, আমাদের মহানবী, English Haraf, Islam and Family planning. Al-Hijra Centenary Celebrations, ইসলাম ও সংগীত, ইসলামের ভূমি-নীতি ইত্যাদি।

সানাউল্লাহ্ নূরী : সাংবাদিক, সাহিত্যিক গবেষক। সাবেক সম্পাদক, দৈনিক জনতা। দৈনিক দিনকাল, দৈনিক দেশ ও দৈনিক গণ বাংলা। প্রকাশিত গ্রন্থ : ছোটদের মহানবী, রোহিঙ্গা কন্যা, নিঝুম দ্বীপের উপাখ্যান, আন্ধারমানিকের রাজকন্যা ইত্যাদি।

কে. এম. তাজউদ্দীন : লেখক, গবেষক, আইনজীবী।

আবদুল গফুর : সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক। সাবেক পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। সম্পাদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ও সাপ্তাহিক অগ্রপথিক। সাবেক সম্পাদক, সাপ্তাহিক সৈনিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিপ্লবী উমর (সংকলন), ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ইসলাম (অনুবাদ), ইসলামের জীবন দৃষ্টি, ইসলামে রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য, আসমান জমিনের মালিক, Social welfare ইত্যাদি।

হাসান আবদুল কাইউম : সাহিত্যিক, গবেষক, সাংবাদিক। পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। সহকারী সম্পাদক, সাপ্তাহিক অগ্রপথিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ফুরফুরার চাঁদ, খোকা খুকুর ছড়া, জেহাদ, কাদেরিয়া তরিকা।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : লেখক, গবেষক, সাংস্কৃতিক সংগঠক। ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। প্রকাশিত বই : বাংলাদেশের পুলিশ, ইসলামী গবেষণার নীতি ও পদ্ধতি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তধারা।

নুরুল আলম রইসী : সাহিত্যিক, গবেষক, শিক্ষাবিদ। সাবেক বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড। সাবেক পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ : ইসলামিয়াত শিক্ষা।

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম : সাহিত্যিক, মুফাস্‌সির, গবেষক। সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ। প্রকাশিত গ্রন্থ : তাফসীরে নূরুল কোরআন, বিশ্ব-সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান, পবিত্র কোরআনের দর্পণে মানব জীবন, বিশ্ব সভ্যতায় মহানবীর (দ.) অবদান, পবিত্র কোরআনের আলোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইমাম মাহদীর (আ.) আগমনের পূর্বে ও পরে, মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.), যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা (অনুবাদ), যুগসমস্যার সমাধানে পবিত্র কোরআন, মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত রসূলে করীম (দ.) ইত্যাদি।

আবদুল হাই শিকদার : কবি, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, টিভি উপস্থাপক, সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য, আশি লক্ষ ভোর, মানব বিজয় কাব্য, আগুন আমার ভাই, যুগলবন্দী ভূগোলময়, রেলিঙ ধরা নদী, এই বধ্য ভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো। ছড়া, গান পাখিদের দিন, ইউলিয়ারা পথ হারালো। জীবনী : কিশোর মওলানা ভাসানী, মাওলানা ভাসানী, জানা অজানা মওলানা ভাসানী, মনিরুদ্দীন ইউসুফ ভ্রমণ, পলাশী ট্রাজেডীর ২৩৪ বছর পর, কবিতীর্থ চুরুলিয়া। সোনার গাঁও, গল্প, শুকুর মাহমুদের চুয়াত্তর ঘাট। সম্পাদনা, আমাদের মিলিত সংগ্রাম মাওলানা ভাসানীর নাম, আলমগীর কবির, মনিরুদ্দীন ইউসুফের অগ্রন্থিত কবিতা, চল্লিশ বছরের প্রেমের কবিতা, যে আগুন ছড়িয়ে দিলে।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org